গল্পধারা

অশোককুমার সেনগুপ্ত

দেবেশ রায়

প্রিয়বরেষু

যাঁর লেখাকে শ্রদ্ধা করি।

লেখকের অন্য গ্রন্থ

যে কোন নিশীথে

সামনে নদী

অন্নদাস

বেস্পতির ভাতভিটে

অশোককুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প

ধর্মনদী

অহল্যাভূমি

প্রণয় পদ্মের পাপড়ি

ছোটদের গ্রন্থ

জীবন্ত হাড়

টিয়া যখন পাখি

ভূতের গল্পের খোঁজে

মজার নাম গল্প

সূচিপত্র

বাঁচামরার স্বাধীনতা

সুজন উঁকি বাড়িয়ে দেখে বড়ঠাকুরমা বিছানায় হাঁটু ভেঙে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। দরজার দিকে কাত করা মুখ। মালাইচাকি বুকের কাছাকাছি আনার ফলে নিতান্তই খুদে অবয়বটি। একটা গোটা মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে পাকিয়ে চেপে যেন ছোট্ট করা। মাথায় শণচুল সামান্যই। হাড়ের ফ্রেম শরীর। শ্লথ চামড়ায় বর্ণ মালুম হয় না। পোড়া বাদামি। একদা ফরসা ছিলেন। কাঠ কাঠ পা, অক্ষিকোটরে ঢোকা চোখ, উঁচু কপাল, হনু প্রকট, গালে গর্ত, পুরুষ রমণী শরীর ভেদ নেই। মুখে সময় সময় যে হাসি ফোটে তাও যেন কষ্টের অভিব্যক্তি। কথার সঙ্গে বুকপাঁজরা নড়ে। ফিসফিসানির মতো বাতাস দিয়ে গড়া শব্দ বেরিয়ে আসে। এদিকে চেতন সব ব্যাপারে। চেনাতেও তেমন ভুলভাল নেই। হলেও শুধরে দিলে স্মৃতি জেগে উঠতে ঘোলাটে অক্ষিতারকায় ধূসরতা যেন আরো গাঢ় হয়ে যায়।

দশ ফুট বাই আট ফুট দক্ষিণের প্রান্তে এ ঘরটি। পাশের চাঁপাগাছটা ডালপালা ছড়িয়ে বারান্দা ছুঁয়ে ফেলেছে। ফুল ফুটে শ্যামাকে গন্ধ দেয়। পাশে বাগানের নানা শব্দ, কাঠবিড়ালির চলাচল, পাখিদের ডানা ঝাপটানো কিংবা বোলচাল, টিকটিকির তিন সত্যি কথা, ইঁদুরের ছোটাছুটি আরো কত কী তো! শ্যামা কতটা শুনতে পান কে জানে। তবে সুজন নিবিড় পর্যবেক্ষণে টের পায় তার বড়ঠাকুরমার অনুভব ইন্দ্রিয় এখনও গ্রহণে তৎপর কিন্তু প্রতিক্রিয়ায় অশক্ত।

শ্যামা বিছানায় পড়ে আছেন এক বছরেরও বেশি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত উঠতে বসতে পারতেন, ঘরে বারান্দায় লাঠি হাতে পায়চারি করতেন, দেওয়াল ধরে দরজার মুখ থেকে গলা বাড়িয়ে ডাকতেন, কিছু জিজ্ঞাসাও সময় সময় থাকত। এখন ধরে বসিয়ে দিতে হয়। অবনতির ক্রম হারটা এতই ক্ষীণ যে মৃত্যুর দূরত্বটা পরিবারের কাছে মাপে আসে না।

শ্যামা রোগাটে কাঠোমোয় কাজে কর্মে সচলতায় নিজের বয়সকে চুপিসারে পঞ্চাশ ষাট আশির অংশটাকে কোনদিন সঠিক চিনতে দেননি কাউকে। সুজনের তো মনে হত বড়ঠাকুরমার বয়স বাড়েনি। তার জন্ম থেকে এক আছে। আগে ভয় ভালোবাসার একটা মিশ্রিত ব্যাপার ছিল। এখন বড় মায়াপ্লুত হয়ে পড়ে সে। বয়সের অসহায় এই করুণ পরিণতি যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে তার ভয় তাকেও ঘিরে ধরে। বড়ঠাকুরমার চেতনা থাকাটাই তো কষ্টের। বড়ঠাকুরমা যে মরে না, ধোঁকে, কষ্ট পায়, বেঁচে থাকতে চায়, এটাই তো কষ্টের।

মাস দেড়েক আগে কিছুক্ষণ শ্বাসকষ্ট এবং চেতনা অবলুপ্তির ফলে সংবাদ

ছড়িয়ে পড়ে শ্যামা মারা যাচ্ছেন। ঘরে রাজপুরের মানুষের তলাশ করার ভিড় বাড়ে। দেখা, কথা, হা-হুতাশ সবাইয়ের। বিমানডাক্তারের ঘোষণা, আর দেরি নেই, ব্যাপারটাকে আত্মীয় পরিজন কাছের দূরের মানুষকেও টানে। কিন্তু শ্যামার চেতনা ফেরে। আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে গাঁয়ের জিজ্ঞাসা এবং দেখতে আসা ফুরায় না। এদিকে শ্যামাব মৃত্যু ঘটে না। তার জন্য সম্ভবত কারো কারো টুকরো মন্তব্য কানে যায় শ্যামার।

কয়েকদিন আগে সুজনকে মুখের সামনে কান আনতে বলে বাতাসের আওয়াজে শ্যামা বলেছেন, 'আমার লজ্জা করছে রে।' সুজন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'কেন? কিসের লজ্জা!' শ্যামা বলেছেন, 'আমি মরছি না। সবাই দেখে যাচ্ছে।' সুজন বলেছে 'কেন মরবে? কিসের লজ্জা তোমার?' শ্যামা বলেছেন, 'বাঃ সবাই কী ভাবছে।' সুজন রাগ করা গলায় বলেছে, 'ভাবুক। জানো, তোমাকে দেখতে আসাটায় আমার রাগ হয়ে যায়। বড়ঠামা, আমি আছি। তোমাকে মরতে হবে না। বলো, তুমি বাঁচতে চাও না—বলো।' শ্যামা উত্তর দেননি, হেসেছিলেন। সুজনেরও হাসি এসেছিল। বড়ঠামা বাঁচতে চান তার চাওয়ার মতো। সে কোঁচকানো চামড়ার কপালে চুমু খেয়েছিল। বড়ঠামার শরীরে সেই পুরোনো গন্ধ আছে।

সুজনের বড়ঠাকুরমাটি মায়ের মতো নয়, মা। বড়ঠাকুরদা বিয়ের চার বছরের মাথায় তন্ত্রসাধনার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে। কোনো সন্তান এর মধ্যে জন্মায়নি। বড়ঠাকুরমা তখন দেওরের সংসার নিয়ে পড়ে। সুজনের ব্যাপারটা অন্যরকম। সে নাতি। তার জন্মের আগে একটি পুত্র এবং কন্যা জন্মানোর এক মাসের মাথায় মারা যায়। ফলে সে জন্মাতে তাকে অন্যের কাছে বিক্রির কথা ওঠে। তাতে বেঁচে থাকতে পারে সন্তান। তখন বড়ঠাকুমা বলেন, কাকে বেচবি, আমাকেই বেচে দে বউ। নে, একমুঠো চাল। জ্ঞান হবার পর থেকে সুজন তাই দেখে আসছে তার সম্পর্কে বড়ঠামার অধিকার বেশি। এতে মা, ছোটঠামা, কী বাবা কাকাদের কোনো আপত্তি দেখেনি সে। কীভাবে যেন সে বড়ঠাকুমারই সন্তান হয়ে গিয়েছে।

বাগানের ঝোপে কী যেন ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ হয়। বিড়াল হতে পারে। গেছো ইঁদুর আছে অজস্র। অসম্ভব শক্ত তাদের দাঁত। হিংস্রও বটে। রান্নাঘরের ইঁদুরধরা কলে একটা পড়েছিল। দাঁত দেখিয়ে কামড়ানোর কী জেদ! ঘরের ছুটকো ইঁদুরের মতো দুর্বল নয়। বাগানে খরিশ সাপও আছে। ভোলা দেখেছে। ফণা মেলে দুলছিল। পরিত্যক্ত ওদিকটা অব্যবহৃত। ঝোপঝাড়। এখন শীতের পুরু ধুলোর আস্তরণ, শুকনো ঝোপে বিবর্ণতা, কত কী যে গাছ, বিষফলের লতার সঙ্গে জড়িয়ে ওঠা কত বনজ উদ্ভিদ, দুটো অফলা নারকেলগাছ, একটা আমের গাছ, কুলগাছ, কামরাঙা গাছ, কদমগাছ, ডুমুরগাছগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। খয়েরি ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গায় জায়গায় হাঁ। দক্ষিণে একটা

ডোবা, উত্তরে গাঁয়ের রাস্তা, পশ্চিমে ধানেব খেত। ছেলেবেলায় বাগানের একধারে তারা খেলত। এদিকটায় বড়দির খেলনাপাতির সংসার ছিল। তবে বাগানে লুকোচুরির খেলার সাহস হত না। কুল পেড়ে দেবে বলে দিন সাতেক আগে নূপুরকে সুজন জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে নিয়েছে। নূপুর, 'কী অসভ্য' বলে ছুটে পালায়। ক্লাস নাইনে পড়ছে। পাড়ার মেয়ে। নূপুরকে সে ভালোবাসে। বড়ঠামার ঘরে একদিন নিয়ে গিয়ে সে বলেছে, তোমার নাতবউ। ছোটবোন সুমিতা সব জানে। ওরই তো বন্ধু। বাগানের দিকে তাকিয়ে নূপুরের কথা মনে হতে সুজন যেন একটা গন্ধময় বায়ুতরঙ্গকে ভেসে আসতে দেখে। বাতাসটাও যেন গোলাপী চুড়িদারে ফরসা, আয়তচোখের লাবণ্যভবা মুখের নূপুর। যে তাকে ভরিয়ে দেয়। বি.কম.পাশ করেছে কী, সে চাকরি খুঁজে নেবে। নূপুরকে বিয়ে করবে।

বাগানসমেত দোতালা খয়েরি রঙের বাড়িটা একদার অর্থবানত্বকে বোঝায়। এঁটি বিনোদ ভট্টাচার্যের নির্মাণ। টালিবসানো ছাদ, ঘরের গাঁথুনি চুন সুরকির। বাইরে পলেস্তরা নেই। তবে চুন সুরকির সঙ্গে খয়ের, অমুক তমুকের জল এবং নানান মিশ্রণে, যা সুজনের শোনা কথা, গাঁথুনিকে পোক্ত করা হয়েছিল, তার ফলেই অটুট দেওয়াল। শুধু দু-একটা বট অশ্বত্থের চারা ঢলঢলে পাতা মেলে বাঁচার চেষ্টা করে। বিনোদের কাজ ছিল নিকাশীর জমিদারি সেরেস্তায়। তাঁর দু-পুত্রের মধ্যে বড় কমলের স্ত্রী এই শ্যামা। ছোট কাননের নাতি সুজন। কাননের বাবা অপূর্বর রেলে চাকরি। অসীম বিয়ে করেনি। ঘরের দায়দায়িত্ব জমি, পুকুর ডোবা দেখে। অনিল পুনায় চাকরি করে। বিয়ে করেছে। তার দুটি সন্তান। অনিল মাঝেমধ্যে আসে। সে মহারাষ্ট্র সরকারে একটা বড়সড় চাকরি করে। অরূপ এ পরিবারের উজ্জ্বল সন্তান। বরাবর ভালো রেজাল্ট। জেলায় মাধ্যমিকে ফার্স্ট। প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিল। আমেরিকায় অ্যাডভান্স কম্পিউটারে সুযোগ করে নিয়েছে। চিঠিপত্র দেয়। বছর দেড়েক আগে এসেছিল।

সুজন নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। পাজামার উপর শার্ট, হাতকাটা নীল সোয়েটার রোগাটে শরীরে। ফরসা রঙ, বড় বড় চোখ, সরু করে রাখা গোঁফ। গড়নে তাদের পরিবারে লম্বাপানা ভাব আছে। পড়াশুনায় সে মাঝারি। ক্রিকেটে ভালো ব্যাটসম্যান হিসেবে কলেজে নাম আছে। রাজপুর ক্লাবেও গুরুত্ব আছে।

ঘরে ঢুকে সুজন গন্ধটা পায়। ওষুধের সঙ্গে আরো কিছুর মিশ্রণ। তবে তেমন কটু, অসহনীয় তার মনে হয় না অন্যদের মতো। তক্তাপোশের পাশেই একটা টেবিল। ওষুধের ছোটবড় শিশি, কাপ, চামচ, জলের গ্লাশ, ওয়াটার ফ্লাস্ক ট্যাবলেটের পাতা, কাগজের টুকরো, দুটো টুল। দেওয়ালে চারটে ক্যালেণ্ডার। সবই দেব দেবী। ছোট একটা জামাকাপড় রাখার আলনা। তাতে ঠাকুমারই সব পরিধেয় বস্ত্র সাজানো। এ সব সরলা কাকীমার কাজ। সরলা এ বাড়িতে কাজ করে। বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কারের। বড়ঠামাকে স্নান করানো, মলমূত্র পরিষ্কারও

করে থাকে। বলে, মা বটে। মেয়ে বটি আমি। কেনে করব নাই। আমার অত ঘিন্নে নাই। মা গ, পাপ হবে নাই! তবে সরলার তো সংসার আছে। না থাকলে সে সময় সুজন করে। পাপ ভয়ে নয়, ভালোবাসায়। তার ঘেন্নার কথা মনেই আসে না। বড়ঠামা তার হাতের কাজে, চুল আঁচড়ে দেওয়া, কী পাউডার লাগানো কী বসিয়ে দেওয়াতে খুশি হয়ে বলে, তোর মতো কেউ পারে না। আমার একটুও কষ্ট হয় না।

বড়ঠামার চোখ বন্ধ করা মুখের দিকে তাকিয়ে সুজন ভাবে, মরতে পারছে না বলে লজ্জা। বড়ঠামার আত্মসম্মানজ্ঞান খুবই তীব্র। সাংসারিক কর্তব্যনিষ্ঠায় কোনো বিচ্যুতি নেই। অসম্ভব সহ্য শক্তি। কখনও বিবাদ নেই কারও সঙ্গে। হাসিখুশি এবং তার সঙ্গে নিজের সম্পর্কে গভীর সচেতনতা একটা ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। এক যুবতী যে নব্বই বছরের বৃদ্ধা হয়, তার মধ্যে তো বহু দিনরাত্রির যাপন, বহু বিনিদ্রতা, বহু ক্ষুধা, বহু কামনা, বহু দ্বন্দ্ব, বহু প্রলোভন, বহু ঘটনা সংঘাতের বহমানতা। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যে গুমরানি থাকে তা ঝড় গড়তে পারে। বড়ঠামা কিছুই গড়েনি।

সুজন ভাবে, তার উপর অতিরিক্ত স্নেহচক্ষুর আলো বিকিরণ কী প্রত্যক্ষ করতে দেয়নি তাকে। বড়ঠামার এই যে বেঁচে থাকতে চাওয়ার পরই মৃত্যু না আসার লজ্জা একে কোন ব্যাখ্যায় নিয়ে গিয়ে সে দাঁড় করাবে।

সুজন টেবিলের একেবারে ধারের লাল শিশিটা সরিয়ে রাখে। পড়ে যেতে পারত। তার ছোট্ট শব্দে শ্যামা চোখ মেলেন। চামড়া মোড়া আঙুল তুলে কাছে ডাকের ইশারা করেন। সুজন এগিয়ে গিয়ে তক্তাপোশে বসে।

'বড়ঠামা, শীত করছে? কম্বল নেবে?'

'বসব।'

'তাই বলো।' সস্নেহে বালিশ পিছনে দিয়ে বসায়। চাদর জড়িয়ে দেয়।

বিকৃত মুখে হাড়গোড় ঠিকঠাক করে নিতে সময় নেন শ্যামা। বুকটা ওঠানামা করছে। ঝোলানো মাংসের চোপসানো বুক, কণ্ঠার হাড় উঁচু। ঘনঘন শ্বাস ফেলেন। তারপর ঠোঁটে হাসি রাখেন। বাইরে তাকান।

সুজন জানে, বড়ঠামা দরজার বাইরে তাকিয়ে বেলা জানতে চান। এখন বিকেল। জানলা দিয়ে সে দিনশেষের চুন হলুদ আলো ছুঁয়ে ওদিকে কুলগাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। শীতকাতর বিমর্ষতা। বলে, 'এখন বিকেল। জল খাবে?'

'না যাসনি?'

'কলেজ! আমার তো ছুটি এখন!'

সুমিতা এসে ঘরে ঢুকল, 'দাদা মেজকাকা তোকে ডাকছে।'

ডেকে পাঠায় না মেজকা। নিজেই চেঁচিয়ে ডাকে। তাই সুজন 'কেন' জিজ্ঞাসা করতে ঘাড় তোলে। তার আগে সুমিতার শ্যামোজ্জ্বল মুখভরা হাসি 'বড়ঠামা বসেছে' যেন আনন্দ সংবাদ এমনই চোখ ভালোবাসায় নন্দিত করে

বিছানার কাছে এগিয়ে যায়। পাতলা ঠোঁটে চোখে হাসির অভ্রকুচি ছড়িয়ে রাখে। নীলফুল ফ্রক, মাথার চুল একবিনুনি, কপালে টিপ, কানে সোনার রিং, আলো পড়া কিশোরী মুখের ত্বকের পেলবতা, নাক, গাল, চিবুক, ঠোঁটে রূপের আভা। চুপিচুপি বলে, 'বড়ঠামা বাদামভাজা খাবে? গুঁড়ো করে আনব?'

শ্যামা বাদামভাজা খেতে বড়ই ভালোবাসতেন। এখন খাওয়াদাওয়া হিসেবি। বড়ঠামা কতদিন বাদামভাজা খেতে পারেনি, সুমিতা জানে।

শ্যামা ভালবাসা বোঝেন। বলেন, 'তুই খা।' হাসেন।

সুজন বেরুনোর আগে বলে, 'বড়ঠামা, শোবার চেষ্টা কোরো না। আমি এসে শুইয়ে দেব। সুমি তুই থাক না একটু।'

'কাউকে থাকতে হবে না। আমি এসেছি। বড়মাকে নিয়ে এখন ঢের কাজ।' সরলা ঘরে ঢোকে। চল্লিশের মতো বয়স, গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্যবতী, ফোলা গোল মুখ, লাল ব্লাউস, ছাপা শাড়ি, হাতে একটা ঝাঁটা। ঘব নয়, শ্যামাকেও পরিচ্ছন্ন সে করবে। এ ঘরটা রোগীর হলেও সরলার হাতে সাজানোগোছানো, পরিষ্কার আর যত্নের ছাপ থাকে সব সময়।

ঘর থেকে বেরিয়ে টানা বারান্দা ধরে মেজকার ঘরের দিকে যাওয়ার সময় সুজন নিজের প্রস্তুতি গড়ে নেয়। ডাকটা সে পাবে জানত। ভাবনাটা সকাল থেকেই তাকে পাক দিয়ে ফিরছে। সে সারাদিন ঘর থেকে বের হয়নি, বই নিয়ে বসেনি, বড়ঠামার ঘরের আশেপাশে ঘুরছে, যেন এখন থেকে তার পাহারা দিয়ে রাখা দরকার।

মেজ অসীম এ পরিবারের ব্যতিক্রমী এক মানসিকতার মানুষ। সে অবশ্য শ্যামার স্বামী কমলনাথের তন্ত্র সাধনার জন্য গৃহত্যাগের উদাহরণ দিয়ে বলে, আমাদের বংশে এটা আছে। তাছাড়া বামুনের ছেলে ঠাকুর দেবতা করব না, ধর্ম, শাস্ত্র মানব না, এ কেমন কথা! অসীমের দশাসই চেহাবা, যেমন লম্বা তেমন স্বাস্থ্য। গায়ের রঙ কালো, মাথায় টাক পড়েছে, বাজখাঁই গলা, আস্তে কথা বলতে জানে না, সব ব্যাপারেই একটা উগ্রতা আছে, বিয়ে করেনি। নিজে লাঙল দিতে পারে, মাটি কাটতে পারে, গরুর গাড়ি জুততে পারে, গাই দুইতে পারে। একা মানুষ 'দু-নো' মুনিশের কাজ করতে পারে। মস্তিষ্কের ক্রিয়া এই আসুরিক বল ব্যবহারের ফলেই বোধকরি একটা অচেতন আবেগের মতো প্রবাহ করেছে। ধর্মে যে অনুরাগ তাও একধরণের অন্ধতা। বুদ্ধি এবং যুক্তিগ্রাহ্যতার ধার দিয়ে যায় না। সংসারকে অর্থাৎ অপূর্বের পরিবারেও সে গ্রথিত করার চেষ্টা করে নিজস্বতা। অন্য ভাইরা তো বাইরে।

সুজনকে ইদানীং অসীম সহ্য করতে পারে না। স্নেহ শেষ হয়ে গিয়েছে। নিজের মতো করার প্রবণতা মানুষের থাকে। অন্যকে নিজের মতোটি করতে না পারলে ক্রুদ্ধ হয়। তবে সুজনের লেখাপড়া করাটায়, নিজে যেহেতু স্কুলও পার হতে পারেনি, ফলে দুর্বলতা অনুভব করে থাকে। এমনিতে কম কথা

বলে। বলে, কালাপাহাড়। নাস্তিক। এখনকার ছেলেদের গুরুজনে ভক্তি নেই, ধর্মে বিশ্বাস নেই, ঠাকুর দেবতা মানে না, শাস্ত্র মানে না, জাত মানে না। দেশটা ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষোভের ভাষাটা এত ভদ্র নয় অবশ্য।

অসীম ঘরে বসে আছে গুম হয়ে। ঘরের একধারে চালের বস্তা, একটা খাট, দেওয়ালে মা কালীর নানান ধরণের ছবি কালীঘাট দক্ষিণেশ্বরের সঙ্গে অন্য ধরণের। বিছানার চাদর কোঁচকানো, বালিশটা ওদিকে ফেলা।

'আমাকে ডেকেছ মেজকা?'

'হ্যাঁ। দ্বিজুদার কাছে কেন গিয়েছিলি?'

'আমি তো যাইনি। রাস্তায় দেখা হল।'

দ্বিজুঠাকুর। কুলপুরোহিত তাদের। বয়স্ক মানুষ। ধবধবে ফরসা রঙের গোলগাল চেহারায় টেকো মাথা। গায়ে নামাবলি জড়িয়ে থাকে প্রাতঃস্নানের পর। গ্রামের অর্ধেকের বেশি তাঁর যজমান। বাকি ভাইপো তারকের হাতে।

'কী বলেছিস্!'

'তোমাকে তো বলে দিয়েছে দ্বিজুজ্যাঠা, কী বলেছি।'

'তা বলেছে। সেটাই জানতে চাইছি। কেন বলেছিস্?'

সুজন শান্তগলাতে বলল, 'আমি নিজে থেকে কিছু বলতে যাইনি। রাস্তায় দেখা হতে নিজেই বলল, তোমাকে বলে দেবার জন্য, আগামী শুক্রবার বড়ঠামার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হতে পারে। শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, জানলাম। বড়ঠামার পাপের জন্য মৃত্যু হচ্ছে না। প্রায়শ্চিত্ত করলে দ্রুত হবে মৃত্যু। আবার বেঁচে যেতেও পারে। বাঁচবে না এ আমি জানি। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাটা একটা টর্চার। বড়ঠামা জানবে, দেখবে, তার মৃত্যুকামনা করা হচ্ছে, তার পাপের জন্যে, মেজকা আমি এটা করতে দিতে পারি না। বড়ঠামার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারটা জানে।'

'তুই বক্তৃতা থামাবি।'

'এটা তো কথা। তুমি অযথা রাগ করছ। দ্বিজুজ্যাঠাকে বলেছি, আমি ওসব হতে দেব না। আপনাকে জেঠু কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না।'

'কিন্তু কেন?'

'বাঃ বড়ঠামা কষ্ট পাবে তাই।'

অসীমের দু-চোখ বিশাল হয়। ভেতরের রাগে তার বুক স্ফীত হচ্ছে। বলে ওঠে, 'তুই কে? আমি বড়। আমার জেঠিমা।'

'অস্বীকার তো করছি না। আমারও বড়ঠামা। তাছাড়া বড়ঠামা বলেছে তো তোমাদের, আমি মুখাগ্নি করব, শ্রাদ্ধ করব, এমনকী পোস্টাপিসের টাকাটা সম্পত্তির ভাগ সবই আমার। ফলে তোমাদের অধিকারের চেয়ে আমার অধিকারই বেশি। একটা জীবিত সচেতন মানুষকে নিয়ে আমি মজা করতে দেব না।'

'তুই ধর্মকে মজা বলছিস্।'

'ধর্মকে নয়। বলছি তোমাদের ধর্মের নামে অমানবিক অনুষ্ঠানকে। সতীদাহ প্রথাও তো ধর্মের নামে ছিল। এখন গিয়ে বলো না কাউকে—। আমি বড়ঠামাকে কষ্ট পেতে দেব না।'

অসীমের বুদ্ধির দৌড় সামাল দিতে পারে না সুজনের গতিকে। সে সাংসারিক বুদ্ধিতে যথেষ্ট দড়। ফলে খেলিয়ে মাছ তোলাটা রপ্ত আছে। ক্রোধ প্রশমন করে। গলা নামায়। যেন অনেকখানি সুজনের মতের পক্ষে, এমন করে বলে, 'জেঠিমা কষ্ট পাচ্ছে এটা তো ঠিক। দেহ থেকে প্রাণ বেরুতে চাইছে না। প্রায়শ্চিত্ত করলে মুক্তি পাবে। এর বিধান রয়েছে আমাদের শাস্ত্রে। তাছাড়া আমার একটা সন্দেহও হচ্ছে। জেঠিমা মনে হয়, সেদিনই মারা গিয়েছে।'

'কী বলছ পাগলের মতো—।'

'এমনটি হয়। মারা গিয়েছে। ঘাড়ে অন্য কেউ। এক তন্ত্রসাধক ওরকম একজনকে নিয়ে ক্রিয়াকাণ্ড করতে দেখা যায় মুহূর্তে তার দেহটা পচে গলে দুর্গন্ধ নিয়ে পোকা হয়ে কঙ্কালে পরিণত হল। দেহ ছেড়ে যেতে পচন ধরল সঙ্গে সঙ্গে। এতদিন যা ঘটতে পারত, তা এক মুহূর্তে।'

'বড়ঠামা আমাদেরই আছে। মরেনি। আমি জানি।'

'তুই তর্ক করবি। নে পড়ে দেখ।'

সুজন বোঝে মেজকা প্রস্তুত হয়ে এসেছে। মোটা পুরোহিত দর্পণের পাতাটাও কাগজ আটকে রেখেছে। খুলে দিতে দেরি হয় না।

সুজন অগ্রাহ্য করে না। সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যায়। প্রায়শ্চিত্ত বিধান। না, মৃত্যুর পরেও দেহ অটুট, তারপর ক্রিয়াকাণ্ডে মুহূর্তে দীর্ঘ কালক্রিয়ার অলৌকিক কাহিনী নয়। পাপের নাম। অতিপাতক হল জননী, পুত্রবধূ, কন্যাগমন। মহাপাতক প্রাণীহত্যা ইত্যাদি। অনুপাতক শরণাগত স্ত্রী গমন, মিথ্যা কথা বলা। উপপাতক গোধি, অযাজ্য পরস্ত্রী গমন। জাতিভ্রংশকারী ব্রাহ্মণ পীড়ন, মদ্যের আঘ্রাণ নেওয়া ইত্যাদি। মলাবহ পক্ষীবধ, মাংস ভক্ষণ। প্রকীর্ণপাত; যে সকল পাপের বিশেষ নামান্তর। পাতাভর্তি পাপের ফিরিস্তি। উপর উপর দেখাটুকু দ্রুত সেরে নিয়ে সুজন, স্বর্ণ একখণ্ড, গামছা, দক্ষিণা, মুণ্ডন ব্যবস্থা, গোদান অর্থদান এ সব ছাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়ঠামারও মুণ্ডন ব্যবস্থা হবে নাকি! কী সাংঘাতিক! কিন্তু কোথাও তো মৃত্যু আটক পাপ কারণে, প্রায়শ্চিত্তে মৃত্যু ত্বরান্বিত নেই। নাকি অন্য পাতায়! অন্য শাস্ত্রে!

'কী রে, দেখলি!'

'হ্যাঁ। কিন্তু বড়ঠামা কোন পাপটা করেছে?'

'আহা, আমি কী বলেছি জেঠিমা পাপ করেছে? অজ্ঞাতে পাপ থাকতেই পারে। সংসারী মানুষ ধোয়া তুলসীপাতা হয় না।'

সুজন মেনে নিয়েই বলে, 'থাকতে দাও। ও ঝামেলায় যেও না।'

'তুই তবু বুঝবি না?'

'না।' সুজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অসীম চেঁচিয়েই বলল, 'ঠিক আছে। তুই কেমন করে আটকাস্‌ দেখি।'

বিকেল গায়ের রোদ ঝেড়ে দিয়ে এখন ম্রিয়মান। আঁধার নামার মতলব করছে। শীতের তেমন জোর নেই। আকাশে মেঘ ওড়াওড়ি করছে। বৃষ্টি হতে পারে। সুজন ঘর থেকে বের হতে শ্রীপতি ধরল। দ্বিজুজ্যাঠা সংবাদ প্রচারিত করেছে। শ্রীপতি শিক্ষকতা করে নকোশ হাইস্কুলে। যথেষ্ট উদারমনা শিক্ষিত বলেই সুজন মানুষটিকে জানত। কিন্তু কথায় বোঝা গেল এসব ক্ষেত্রে আঁধার টুকরোকে সযত্নে লালন করে। বলল, 'ধর্মে যখন রয়েছে ছাড়া কেন!' সুজন বিতর্ক করবে না, সে শুধু বলল, 'বড়ঠামা আর ধর্ম নিয়ে কী করবে!'

অরুণের কাছে কলেজের খবর নেবে। ক্লাস হচ্ছে। বড়ঠামাকে সে মিথ্যে বলেছে, ছুটি। তার যেতে ইচ্ছে করেনি ঘর ছেড়ে। আজ কদিনই তার কেন জানি মনে হচ্ছে বড়ঠামা চলে যাবে। প্রায়শ্চিত্ত শোনার পর এই মনে হওয়াটার সঙ্গে শোক যেন বেড়েছে। প্রতিহত করার জন্য জেদ বেড়ে যাচ্ছে। বড়ঠামাকে সে অন্তত ঋণশোধ না হোক মৃত্যুর স্বাধীনতা উপহার দেবে। কষ্ট সে ঘোচাতে পারবে না। কিন্তু ধর্মের নামে আরোপিত যন্ত্রণা দিতে দেবে না। শ্রীপতিকে ছেড়ে পরপর বিলুদা, নরেনকা, সাবিত্রীদির সঙ্গে দেখা হল। বড়ঠামা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করল শুধু নরেনকা। অরুণদের পাশের বাড়িটাই হল নুপূরদের। বাইরের দরজার মুখে নূপুর। রাস্তার উপর ছেলেরা ফুট-টেনিস খেলছে। তাই দেখছিল। তাকে দেখে ঠোঁটের ঝিলিক হাসি উপহার দিল।

'কী ব্যাপার। দাঁড়িয়ে!'

'তোমার জন্য দাঁড়াইনি।' নূপুর গম্ভীর মুখ করে খেলা দেখতে চাইল।

'আমিও এদিকে তোমার জন্য আসিনি!'

'বড়ঠামা কেমন আছে?' মুখ দেখছে না। প্রশ্ন।

'যাক্‌, নাতবউ খবর রাখে।'

'অসভ্য।'

মনটা কেমন প্রফুল্ল হয়ে গেল। অরুণের ঘরে গিয়ে শুনল ক্লাস হয়নি।

বাড়ি ফিরতে মা বলল, 'কাকাকে কী বলেছিস।'

'তুমি এসবের মধ্যে থেকো না মা।'

'খুব রেগে আছে মেজঠাকুরপো।'

'থাকুক। বড়ঠামাকে নিয়ে ওসব করতে দেব না।'

রাত্রিবেলায় খেতে দিয়ে মা বলল, 'আমারও ওসব করার ইচ্ছে নেই। ধর্ম আর শাস্ত্রের চেয়ে বড় মানুষ। কেউ বোঝে না রে! জেঠিমা সব জানে। বুঝতে পারবে তাড়াতাড়ি মারার জন্য ওসব করানো হচ্ছে।'

সুজনের মুখে ভাতের গ্রাস থেকে যায়। মাকে দেখে। লাল নকশাপাড় শাড়ি, রোগাটে শ্যামলা চেহারা, লেখাপড়া পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত, দেববিজে ভক্তি,

ব্রত, উপবাস, লক্ষ্মীপুজো, সত্যনারায়ণ, রান্নাঘর, ঘরের কাজে ব্যস্ততার মধ্যে এমন ভাবনা থাকে। এমন করে বলতে পারে। সে ভুলেই গিয়েছিল বড়ঠামার কাছে তাকে বিক্রি নয়, নিয়ত অধিকার দানের মধ্যে দিয়ে মা তো প্রমাণ করেছে সে মহীয়সী না হতে পারে—মানবী।

বিছানায় শোয়ার পর ঘুম আসার আগে সুজন ঠিক করল সেজকাকাকে চিঠি লিখবে। ছোটকাকাকেও নিউইয়র্কে চিঠি দেবে। তাড়াতাড়ি আসতে লিখবে। কেউ আসবে না হয়তো। চিঠিও পৌঁছাবে না ডাকবিভাগের ঔদাসীন্যে। তবু এটা করবে। বাবা কোনদিকে থাকে কে জানে! কাল সন্ধেয় আসবার কথা আছে। বড়ঠামাকে নিয়ে বাবারও খুবই চিন্তা। কী আশ্চর্য সে ভুলেই গিয়েছিল বড় জামাইবাবুর কথা। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও জড়িত আছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বশালী, আধুনিক মনস্ক। সে এলে যুক্তি উদাহরণ সহযোগে মেজকাকার ধর্ম উন্মাদনাকে ধরাশায়ী করে ফেলবে। পানাগড সুজন কালই যাবে। অরুণ, সঞ্জীব, বিনয়দেরও জানাতে হবে। মেজকাকাকে বাধা দানে সে একাই যথেষ্ট নয়। টের পাচ্ছে সে বিষয়টি গ্রামীণ মানসিকতায় একটা আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি করবে। যেহেতু পারিবারিক ব্যাপার সুতরাং তাদের বিভাজন থাকলেও কোনো পক্ষই ভূমিকা নেবে না। মন্তব্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

পানাগড় যাবে কী সুজন, সেজকাকা মেয়ে তিন্নিকে নিয়ে এসে পড়ল ট্যাক্সি করে। জেঠিমার জন্য কদিন থেকেই মন খারাপ, কাজে মন বসে না, তাই দেখতে এসেছে। কাল বর্ধমানে শ্বশুরবাড়িতে ছিল। বিকেলে পানাগড়ে বড়দির কাছেও গিয়েছিল। ওরাও আজই আসছে।

সুজন খুশি হয়। জামাইবাবু তাহলে আসছে। সকাল থেকে উড়ন্ত মেঘে রোদ ছায়ার দুপুর ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এনে দিল। এবার শীতে নিম্নচাপের বড়ই আধিক্য। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কী পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে! নিয়মের অঙ্ক অচেনা করার বড়বেশি তোড়জোড়। পুরোনো সূর্য সৌর সংসারের সদস্য পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়া তো ঘটবেই সতত পরিবর্তনের, সতত সৃজনের!

সেজকাকা প্যান্টশার্টে একেবারে সাহেব। একাউন্টস্ অফিসার। ইংরেজি হিন্দি শব্দের মিশ্রণে বাংলাটা প্রায় অচেনা করে ফেলেছে। তিন্নি ইংরেজি, হিন্দি, গুজরাতি জানে। মারাঠিও বোঝে। বাংলা চমৎকার বলতে পারে, লিখতে পড়তে জানে না। সুমিতা অল্প সময়ে জেনে ফেলে তিন্নি একটা গুজরাতি ছেলেকে ভালোবাসে। এ জন্যে লজ্জা সঙ্কোচ নেই। বাবা জানে, মা জানে। সুমিতা, জানিস দাদা, তিন্নি প্রেম করছে বলতে ঝকঝকে মুখের যুবতী বলে, সো হোয়াট। যেন সুমিতার বিস্ময়টাই অস্বাভাবিক।

অসীম বাইরে ব্যস্ত। বাল্যবন্ধু শ্যামকান্তর মাতৃশ্রাদ্ধ। ফলে সেখানেই পড়ে আছে। সেজভাইয়ের আসা শুনে দেখা করে গেল। রাতে ফিরতে দেরি হবে।

প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারটা সেজকাকা সুজনের কাছে শুনে বলল, 'তাই নাকি!'

'আমি ওটা করতে দেব না। বড়ঠামার মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধকাজ করব। সে তো বড়ঠামারও ইচ্ছে। তা বলে মরার আগে—। বড়ঠামার সম্পূর্ণ জ্ঞান। দেখলে না কাকীমা, মিনু এমনকী ছোটনের কথাও জিজ্ঞাসা করল। প্রায়শ্চিত্তের মানেটা জানে। মনে হবে আমরা ওর মৃত্যু চাইছি।'

'নেভার। তা কেন চাইব।' সেজর ঠোঁটে সিগারেট; 'ঠিক আছে। আই অ্যাম উইথ ইউ সুজন। ইউ আর রাইট।'

তিন্নিকে বোঝাতে গলদঘর্ম হতে হয়। জন্ম তো পুনায়। তবে ধর্ম কী জিনিস টনটনে জ্ঞান আছে সে সম্পর্কে। বড়ঠামাকে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান হবে এবং মৃত্যুকে দ্রুত আবাহন করা হবে, এটা বোঝে। বলে, 'হরিবল্।'

'তোর অবস্থাও তাই।'

'হোয়াই? কেন?'

'গুজরাতি বিয়ে করছ। সোনার দোকান। তার মানে সুবর্ণবণিক। তুমি ব্রাহ্মণ।'

'সো হোয়াট!'

সুমিতা বিরক্তস্বরে বলল, 'কথায় কথায় সো হোয়াট বলিস্ না। মেজকাকা শুনলে তোকেও প্রায়শ্চিত্ত করাবে।'

'মস্তক মুণ্ডন এবং গোবর ভক্ষণ।'

'কী!'

'বুঝবি না। তোকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মেজকাকাকে চেন না!'

'আই ডু নট কেয়ার।' সঙ্গে সঙ্গে ববছাঁট চুলের মাথাটা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করলেই অল ক্লিয়ার। উই ক্যান ম্যারি!'

'ইয়েস। নো-নো। ইউ মে বী জাতিচ্যুত।'

সুমিতা হাসে। মা সব-শুনছে। বলল, 'মেয়েটাকে ভয় পাওয়াচ্ছিস কেন।'

সুজন একটু বেশি ভাবে। বড় গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সেজকাকাকে তো সে চেনে। বড়ঠামার উপর অধিকার তারই বেশি এটা সংসার এবং গাঁ স্বীকৃত, মেজকাকার দুর্বলতা শুধু ওটুকুই। তবে ধর্মের নামে গাঁয়ে একটা পরিস্থিতি গড়ে ফেলা সম্ভব। সেজকাকাকে সে পাবে। জামাইবাবু তার পক্ষে তো দাঁড়াবেই। বাবা নিরপেক্ষ থাকবে। পরদিন সে টের পেল বড়ঠামাকে নিয়ে অনুষ্ঠান হোক বা না হোক, তাতে গাঁয়ের সিংহভাগ মানুষের বয়ে গেছে ভাবতে। আলোচনার একটা বিষয় ওই পর্যন্ত। তো সময় বদলাচ্ছে, সমাজচরিত্রের রূপান্তর ঘটেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি ঝাপট গাঁয়ের বাতাস বরাবর নানাভাবে ধেয়ে আসছেই।

তিথিপিসি বলল, 'জেঠিমার প্রায়শ্চিত্তর কী ঠিক হল? হবে তো। আহা মুক্তি পাক। বড় ভালোমানুষ ছিল রে!' সুজন শুধু বলল, 'ছিল নয় পিসি, এখনও আছে। মরেনি।' পিসির মুখ ভার। নিত্যদাদু বলল, 'বার্ধক্য বড় যন্ত্রণার। শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে। তার উপর লোকের দয়া। তোমার জেঠিমা ভালো আছেন?' সুজন বলল, 'ভালো। বড়ঠামার কষ্ট আছে। তবে বেঁচে থাকার

আগ্রহও আছে।' বৃদ্ধ খুশি হন, 'মরতে কে চায়—বল না!' প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গ আসে না। বিনয় বলে, 'কী শুনছি, মেজকাকা বড়ঠামাকে নিয়ে কী কাণ্ড করবে। তুই বাধা দিচ্ছিস। সবাইকে বলছে, আজকালকার ছেলেরা ধর্ম মানে না। দেশটা এজন্যেই জাহান্নমে গেল।' সুজন বলল, 'তোদের হেল্প লাগতে পারে।' বিনয় বলল, 'অল ওয়েজ রেডি ব্রাদার। দক্ষযজ্ঞ করে দেব।'

তবে অতদূর গড়াল না। সুজনের মা, বাবা, জামাইবাবু, দিদি, সেজকাকা দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর একটা সিদ্ধান্তে যেতে পারল। যাতে সায় দিতে হল অসীমকে। সে বুঝতে চাইল না তার দাবির পিছনে নিষ্ঠুরতা আছে, মৃতের জন্য কৃতকর্মের যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। সুজনের বলা 'বড়ঠামা মরতে পারছে না বলে লজ্জা পায়, এ লজ্জা অনুষ্ঠান করলে আরো বেশি করে দেওয়া হবে, অথচ লজ্জা আমাদেরই পাওয়া উচিত, বড়ঠামার লজ্জাটা কত বেদনার বোঝ—' সন্দেহ নেই সবাইকে ছুঁয়ে গেল।

অপূর্ব বলল 'জেঠিমাকে জিজ্ঞাসা করা হোক। উনি যদি রাজি থাকেন তা হলে দ্বিজুদাকে খবর দেওয়া যাবে। প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হবে।'

অসীম বলল, 'সেই ভালো। আমি কিন্তু জেঠিমার মঙ্গলের জন্যেই এ ব্যবস্থা চাইছি। পরলোক বলে একটা ব্যাপার আছে।'

'জেঠিমা নিজে মঙ্গল চাইবে তবে তো। তোকে বলেছে এসব করতে?'

'বলেনি। কিন্তু সন্তান হিসেবে কর্তব্য তো আছে।'

সেজ বলল, 'আফটার অল ডিসাইড হল, জেঠিমাকে বলা হবে।'

আলোছায়ায় কেমন যেন জড়তা এসে গিয়েছে প্রকৃতিতে। মেঘবৃষ্টির আয়ত্তে দিনের চেহারা সময় পড়তে দেয় না। এখন হিসেবে সকাল। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। শীত তীব্র নয়। হাওয়ায় ভেসে আসছে ঠাণ্ডা শ্বাস। এ সময় খামারে ধানের পালোই। কিঞ্চিৎ ক্ষতি হতেই পারে এমন দিনের চেহারা ধরা থাকলে। এ ঘরে এতগুলো মানুষ একসঙ্গে হওয়ার ফলে ভালো লাগার যে উৎসব-ছায়া পড়ে, তা প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে চিন্তনে আসতেই পারেনি।

'তাহলে চল, জেঠিমাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক।'

সুমিতা বলল, 'বা রে, এখন তো সরলাকাকীমা বড়ঠামাকে গা মোছা, পরিষ্কার করা, কাপড় ছাড়ানোর ব্যবস্থা করছে ঘর বন্ধ করে।'

'ঠিক আছে। হয়ে যাক্।'

'এরপর তো খাবে বড়ঠামা! কাল রাতে কিছু খায়নি।'

সুজন বলল, 'আমাদের সবাইকে দেখে খুব আনন্দ হয়েছে। ছোটকার খবরও নিচ্ছিল সকালেই।'

সুজন বুঝে উঠতে পারে না বড়ঠামা কী করবে! ধর্মজ্ঞান বড়ই টনটনে। প্রায় বৈধব্যের জীবন অতিবাহিত করার ফলে সারা অঙ্গে বিবিধ উপোস এবং পূজা ইত্যাদির ক্রিয়াকাণ্ড অদৃশ্য অলংকারের মোড়ক হয়ে গিয়েছে। বিছানায়

পড়ার পর অবশ্য সবই বন্ধ। প্রায়শ্চিত্ত আচারটাকে কী মেনে নেবে!

ঘরে ভিড় দেখে শ্যামার কোটরের চোখ বেরিয়ে এসে জানতে চায় কেন! কী হয়েছে! আজ তার মৃত্যু ঘটবে এ কথা কী জানানো হয়েছে, তারই আতঙ্ক ত্রাস কী ঘিরে ধরে তাকে! সুজন বুঝে উঠতে পারে না।

অপূর্ব বলে, 'জেঠিমা, ভালো আছ তো।'

'হ্যাঁ।'

'জেঠিমা, তুমি প্রায়শ্চিত্ত জানো তো!'

অনেকক্ষণ পর বাতাসের শব্দে শ্যামা বলেন, 'জানি।'

'অসীম প্রায়শ্চিত্ত করাতে চায়। কিন্তু সুজনের আপত্তি আছে। ওর কথা হল দরকার নেই। বড়ঠামা বেঁচে থাকুন। যখন মরার মারা যাবেন। তুমি কী বল? দ্বিজুদাকে ডেকে ব্যবস্থা করা হবে, না থাকবে। তুমি যা বলবে তাই হবে। বলে দাও তুমি কার দিকে!'

শ্যামা নীরব। চোখ বন্ধ করে একবার।

সুজনের যেন শ্বাসপাত হয় না। বড়ঠামাকে দেখে। চামড়া কোঁচকানো থলের মধ্যে মানুষের একটা কঙ্কাল নয়, যেন সে দেখে সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, মাথায় ঘোমটা মিষ্টিমুখের মাকে দেখে। তার কপালে রাখা হাত থেকে ঝুঁকে আছে নারী মুখের স্নিগ্ধ চাউনি, স্নেহের বৃষ্টি ঝরছে, ঠোঁটে হাসির চুমকি জ্বলছে। তার সব ইন্দ্রিয় একযোগে ধ্বনি তোলে, বড়ঠামা তুমি বেঁচে থাক।

শ্যামা চোখ খোলেন। ইশারা করেন চোখ সুজনের দিকে। হাত তুলে ডাকেন তারপর সুজন পাশে বসতে সুজনের হাত চেপে ধরেন। বলে দিতে হয় না কিছুই। তখন সুজনের শরীর জুড়ে আনন্দ ধারা, তখন রক্তে সুখের বাজনা, তখন সুজনের চারপাশে আলো আর আলো। সে জিতে গিয়েছে। চিৎকার করে আনন্দধারা বের করতে পারে না।

শ্যামা ওই মুখ দেখেন। নিজস্ব হাসি হাসবার চেষ্টা করেন।

সুজনের আনন্দ জোয়ারের আছালি পাছালি, তরঙ্গ ফেনপুঞ্জ নিয়ে দুরন্ত প্রবাহে উচ্ছ্বসিত এক নদী, আষাঢ়ের বাদল নিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

সুজনের হৃৎপিন্ড যে নদী ধরে রাখতে পারে শ্যামার হৃৎপিণ্ড তা পারবে কেন! হেরে যায়।

লোকদীপ প্রকল্প ও চুকাই বাউরী

লোকদীপ প্রকল্পে চুকাই বাউরী আলো লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। দাসপাড়া গাঁয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আটটা ঘরে সরকার আলো দান করবেন। চুকাই আটের এক। এ সৌভাগ্যে চরম আহ্লাদ চুকাইয়ের। পরম ধন হাতের পাতায় উঠে আসছে এমন ফুল্ললিত। ফুলুর মুখেও সুখের ঝিকির মিকির। মেয়ে জবা আশৈশব পঙ্গু। বাঁ পা দুবলা। অপুষ্ট, বিকৃত। কোমর বেঁকিয়ে টেনে চলে। সকাল বিকেল পোষা পাখির মত বুলি, অ বাবা কবে আলা দিবেক। অ বাবা কবে আলা দিবেক।

চুকাইয়ের নাম তালিকার শীর্ষে। মেয়ে জবার দৌলতে। তোমার মেয়ে প্রতিবন্ধী হে। প্রতিবন্ধী মানে বুঝেছ, ওই যে পা খুঁড়া বটে। তা ভগবান মেরেছে। সরকার ত মারতে পারে না। দেখলে না খুঁড়া বীরু সেলাই কল পেলেক ব্লক থেকে। তোমার নাম তাই ফাস্টে। মেয়ের লেগে। নরেশ দেবাংশী পঞ্চায়েতবাবু, মেম্বার। বলেছেন,মন্ত্রী আসবেন উদ্বোধন করতে। তোর নাম প্রথম। তোকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেন। একটা জামা পরে থাকবি। আর একদম ভয় পাবি না। বলবি আলো পেয়ে তোর খুব আনন্দ হয়েছে।

শোনা ইস্তক ভাবনা। আহ্লাদেও খোঁচা। রঙীন বেলুনটায় লম্বা সুঁচ ঢুকিয়ে দিল। হাওয়া ফুস্। ছোটছেলের মত ভ্যাঁ করে ফেললেই হয়। মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা সহজ কথা! রাজাটাজা চুকাই দেখেনি। রাজা উধাও। বিলকুল মন্ত্রী। রাজার উপরি। ফুলু শুনেই চোখ কপালে তুলল। কালো ক্ষয়া মুখ, মাথায় রুখু চুল। বলল, ওমাগো, কি হবেক। তুমি না বলে দিলে না কেনে!

অশ্বত্থতলার ছায়ায় গোবরের ঝুড়ি নামিয়ে কোমর আলগা করে পুরোন চাকাচাকা দাদটা ঘষর ঘষর করছিল সহদেব। চুলকানির আরামে বিকৃত মুখে বলল, ডর কিসের! মানুষই ত বটে। চুকাই কেমন করে বোঝায় সগ্গমত্তের মত মানুষে মানুষে কি বিষম ফারাক।

তারপর জামা! জামা কোথায় পাবে! বাউরীপাড়ার সঙ্গে জামার সম্পর্ক বিশেষ নেই। কোমরে একটুকরো থাকলেই যথেষ্ট! উদোম গা। শীতে বৌয়ের শাড়ি জড়িয়ে নেওয়া। বড়জোর গেঞ্জি একখান। জামাকাপড় নেহাত কুটুমঘর যেতে কালেকবুষে প্রয়োজন হয়। বছর দুয়েক আগে রায়বাবুদের দান একটা পুরোন পাঞ্জাবি ছিল বটে। তা কবেই সেটা কানি। জামা ধার করতে হবে। মনে পড়ে যায় মেঘাকে গতকালই না নীল শার্ট পরে হেঁটে যেতে দেখল। দাদারও একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আছে। কিন্তু দাদা কি দেবে!

চুকাইয়ের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। বয়সের তুলনায় একটু বেশি দেখায়। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য অভাব নিঃশব্দে চুরি করেছে। লম্বাটে গড়ন। গায়ের রঙ কালো। রোগা হলেও একটা তেজী ভাব আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। পরিশ্রমী। খাড়া নাক। একমাথা চুল। বাপ নেই। মা আছে। দাদার পক্ষে। চুকাই ষষ্ঠ সন্তান। ওতেই চুকে গেল এমন একটা ধান্দা ছিল বোধহয়। ষষ্ঠী ঠাকরুণ তারপরও অবাঞ্ছিত কৃপা করেন আরও দুটি। এখন জীবিত তিন। বোন রয়েছে নাকুরে। দু'ভাই গাঁয়ে। ভিন্ন। ঘরের ব্যবধান সামান্য। কিন্তু মধ্যিখানে অদৃশ্য বহমান দুরন্ত নদী। ভাইয়ের ঘরে বিদ্যুত আসার নামে মাঝের নদী ফুঁসছে—ফুলছে।

বাগ্দী বাউরী পাড়ায় সাকুল্যে পঞ্চাশ ঘর। আটঘর আলো পাবে। এই নির্বাচন নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি। পঞ্চায়েতবাবু পার্টিমেম্বার প্রধান তুমুল বিতর্ক। গাঁয়েও ক'দিন উল্টোপাল্টা কথা, গুজব। শেষতক্ নাম ঘোষণা। একদিকে বিয়াল্লিশ অন্য দিকে আট। মানুষ বড় ঈর্ষাকাতর।

পঞ্চায়েত প্রধান গোলক সাহা ফুটবল গ্রাউণ্ডে মিটিং করল, 'বন্ধুগণ, প্রত্যেকের ঘরেই আলো যাবে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।' ধৈর্যের চরম অভাব মানুষের। গোলক সাহা গলা উঁচু করে বলল, 'আমি জানি আমাদের বিপক্ষ দল, দেশের শত্রু জাতির শত্রু গণতন্ত্রের শত্রু, আপনাদের উত্তেজিত করছে। এই ইস্যু নিয়ে তারা বিভক্ত করতে চাইছে। কিন্তু আমাদের ঐক্য অটুট থাকবে। আসুন আমরা সমবেতভাবে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করি।'

চুকাই উবু হয়ে বসে শুনেছে। হাততালি দিয়েছে। শ্লোগানে গলা মিলিয়েছে। একা সে নয়—সকলেই। তাতে ফারাক ঘোচে না। স্বার্থে ঘা লাগলেই সাপেব মত ফোঁসফোঁসানি। ছোবলও সঙ্গে। বিষ উদগীরণ। পঞ্চায়েতের কঠিন শাসন বলে নিঃশব্দ। গোলক সাহার পার্টি সুখেন দাসের পার্টিকে কুড়ুল চোটা করে গাছের মত ফেড়ে ফেলেছে। বাগ্দী বাউরিপাড়া গোলক সাহার পতাকার বাহক। সুখেনের পতাকাবাহক শূন্যের দিকে ছুটছে। যাবতীয় রস তো গোলক সাহারই সঞ্চারিত করা কুক্ষিগত।

চুকাই যেদিক থেকে আসবে সেদিকে ছোটার মতবাদী। সাধন বলেছে, শালা উরাও ভদ্দরলুক ইরাও। একবার ই পতাকা ধরব, একবার উ·পতাকা। আমাদের নিজের পতাকা কুনুটই লয়। চুকাই বলেছে, ই—মুনের কথাট টেনে বললি!

কিন্তু জামা একটা কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে? মেঘার কাছে যাবে? মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে? চুকাইয়ের আর কোন কাজ নেই, ভাবনা নেই। উঠোনের দক্ষিণে কুলের ছায়ায় বসে মাথা চুলকায়। বেঁটে খাটো ঝাঁকড়া কুলগাছটা ঘন ছায়া ফেলে রেখেছে। মুরগী চরছে ছাইগাদায়। বোশেখের তাপ ওগ্রান দিনের লম্বা বিকেল। আকাশ সহস্র সূর্যময় হয়েছিল। একটা একটা করে গোটাচ্ছে। বাতাস তবু লকলকে অগ্নিশিখা। গা চাটছে তপ্ত জিভে। গাছগাছালিতে আধা ঝোড়ো দাপটের শব্দ। ফুলু ঘরে নেই।

জবা পাশে এসে বাপের পিঠে হাত রাখল। আবার পাখি বুলি, অ বাবা কবে আলা দিবেক। অ বাবা কবে আলা দিবেক!

ঝাঁ করে রাগ উঠে যায়। দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে চুকাই, চুপ কর। খালি কথা। কতবার বলব এখুনও সাতদিন বাকি আছেক।

জবা বকুনি সইতে পারে না। লাবণ্যময় বড় আয়তনের মুখখানার টানা চোখজোড়া ছলছল করে ওঠে। পাতলা ঠোঁট ফোলে। প্যাকাটি শরীর কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম মুখখানার। বিধাতা পুরুষ যেন সম্পূর্ণ শিল্পদক্ষতা ফুটিয়ে তুলেছেন মুখে। চোখ নাক চিবুক কপাল ভ্রু'রেখা দেবীপ্রতিম। বড় মায়াময়। গর্জন তেলের মত লাবণ্যের স্পষ্ট চিকণতা।

অভিমানী মেয়ে। দ্রুত ঘাড় ফেরায় চুকাই। এমনিতে মেজাজ তার বড়ই শীতল। মেয়ের উপর স্নেহও বেশি। বলে, তুকে কুছু বলবার জো নাই। সস্নেহ চোখে তাকায়। ঘুরে বসে মাথার রুখু চুলে হাত রাখে, দিবেক। যখুন ঘরে লাইন টেনেছেক তখুন আলা দিবেক।

জবার মাথা নিচু। বাবার স্নেহধারা যেন তাকে আরও অভিমানী করে।

—হ্যাঁরে, খিদে লেগেছেক?

না।—জবা মাথা নাড়া দেয়।

—মা এসে রাঁধবেক।

জবার গায়ের সবুজ ফ্রক অপুষ্ট শরীরে মিশে আছে। গলার কাছে ছেঁড়া। সেই পূজোয় কেনা। আর একটা দেওয়া গেল না। বার বছর বয়স হল। শরীরের ধর্ম ফুটছে। আলগা গায়ে ত রাখা যায় না।

—বাবা দিনের বিলাতেও আলো জ্বালতে পারব, বল।

—হুঁ। তেবে লাইন থাকলে। পেরায়ই থাকে না।

জবার অভিমান ঘুচে গিয়েছে। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু দিনের বেলা আলো জ্বালা। হুঁ, মেয়ে মিথ্যে বলেনি। চুকাই ভাবে, ঘরের যা অবস্থা। ঘর মানে কুঁড়ে। মাটির দেওয়াল বটে। খড়ের ছাউনি। দরজার কপাট বলতে টিনের আগল। জানলা নেই। ঘুলঘুলি পর্যন্ত না। বর্ষার সময় ঘরের মধ্যে পাতা উনুন জ্বেলে ভাতের হাঁড়ি ফুটুতে হয়। ফলে দেওয়াল খড়ের চাল কালো বর্ণ হয়ে আছে। বছরে বছরে নিকষ অন্ধকারের বিশাল ধারক। দিনের বেলাতেও ঘরের জিনিস হাতড়াতে হয়। লম্ফ জ্বালাতে হয়। আসলে ঘর তো শীত এবং বর্ষার ক'দিন মাত্র রাতে দেহটির আশ্রয়।

—অ বাবা ইঁদুর দুটোর কি হবেক। উরা চমকিন যাবেক বল।

জবার ধারণা একজোড়া ইঁদুর আছে ঘরে। মা বাপ। ওদের ছেলেটিও নেই। ফুলু শোনে আর হাসে। বলে, বিটির কথা শুন। উ চিনে রেখেছেক। ছেলেপিলে নাই, তাও জানে। হ্যাঁ গ আমার ত মুনে হয় ঢেক ক'টা আছেক। সিদিন রুটি খেয়ে দিলেক। আলু নিয়ে গেল। দু'টিতে এত ঝামেলা করতে পারে!

চুকাই বলল, উদের ভালই হবেক। আলাতে দেখতে পাবেক, কুথা খাওয়ার জিনিষ রইছেক।

জবার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে।

ফুলি এসে পড়ল, বাপ বিটিতে এত হাসি হছেক কিসের লেগে। আখা জ্বেলে ভাতের হাঁড়িট ত চাপাতে পারতে। বিলা যেছেক।

উদ্বোধনের দিন গাঁয়ে উৎসব। চরম ব্যস্ত পঞ্চায়েত বাবুগণ। গাঁয়ের মানুষও উৎসাহী। মন্ত্রীদর্শন ভাগ্য কম কথা নয়। তিনি একা নন, আসবেন সাঙ্গপাঙ্গ। ডি. এম. এ. ডি. এম. থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। বাউরীপাড়ার ডাঙায় মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। তক্তপোষ ঘেঁষাঘেঁষি। তার উপর টেবিল চেয়ার। মাথায় ত্রিপল। ডাঙা জমিটা জলাভাবে বন্ধ্যা। গোটাকয়েক শুকনো খেজুরের গাছ আছে। মাইক বেজে উঠল বিকেল থেকেই।

ফটিক একটা শার্ট দিয়েছে চুকাইকে। চমৎকার ফিট করেছে তার গায়ে। ধুতি দিয়েছে নব। চুকাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সন্ধ্যে একটু গড়ানর পর সড়কে দেখা গেল মন্ত্রীর গাড়ির মিছিল আসছে। অন্ধকার চিরে পর পর তীব্র সার্চলাইটের আলো। এক দুই তিন চার। বারখানা গাড়ি। গাড়ির মিছিল দৃশ্য বটে একখানা। দাসপাড়া একা নয়, মাঠ থৈ থৈ করছে মানুষে। ওদিকে বুঙা, হরিশপুর, পাঁচটা সাঁওতালপাড়া ভেঙে এসেছে নানান বয়সের মানুষ। গাড়ি দেখামাত্র উত্তেজনা দেখা দিল মানুষের। মাইকে ওমনি ঘোষণা শোনা গেল, আপনারা বসুন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এসে পড়েছেন। এক্ষুনি সভার কাজ সুরু হবে।

মঞ্চের উপর সাজান পরপর আটখানা চেয়ারই অধিকার হয়ে গেল। ধুতি পাঞ্জাবি, প্যান্ট শার্ট। ভারী মুখে স্বচ্ছলতার লাবণ্যে উজ্জ্বল। মেলে না দাসপাড়া কি আশপাশের সঙ্গে। কোন জন মন্ত্রী। কে জানে! সুরু হল, একের এক বক্তৃতা। শব্দের ফুলঝুরি। কেন্দ্র, গণতন্ত্র, সংগ্রাম, দেশ উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, সাম্য, সকলের জন্য গৃহ এবং অন্ন, ভোট, সহযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। চুকাই সব শুনল। বোঝার দরকার নেই। চুকাই জানে, ফটিক, তারক, পদ, কেউ বোঝেনি। বাবুরা বলবেন, তারা শুনবে। আলো কখন জ্বালবে, তারই প্রতীক্ষায়।

মিটিং সেরে চুকাই উঠোনে এসে দাঁড়াতেই জবা চেঁচিয়ে উঠল, ও বাবা দেখ। দেখ আলা জ্বলেছেক। কি আলা গ। দেখ। দেখ।

ফুলু উঠোনে। ওদিকে দাদার ছেলে দুটো হাঁ করে দেখছে। জবা বসে আছে ঘরের মধ্যে। আলো টিনের আগল পেরিয়ে উঠানে পড়ে আছে।

দ্রুত পায়ে চুকাই ঘরে ঢুকল। ঝকঝক করছে সারা ঘরখানা। মুহূর্তের চমক। তারপরই চুকাই টের পেল কালো দেওয়ালটা যেন দগদগে ঘায়ের মত বিদ্রূপ করছে তাকে। খড়োচালে ঝুল। মাকড়সার জালের এখানে ওখানে কালচে আচ্ছাদন। মেঝেটা উঁচু নিচু। কুলুঙ্গিতে লম্ফ। ঘরের কোণে ডাঁই করা ছেঁড়া

কাঁথা। ত্যাবড়ান কালিপড়া এলুমুনিয়ামের হাঁড়ি। থালা বাটি। মাটির হাঁড়াহাঁড়ি। অন্ধকারে অগোছাল বিকৃত এসব গৃহসামগ্রীর কুৎসিত রূপ ধরা পড়ে না। আলো টের পাইয়ে দিচ্ছে। আলো যেন হা হা করে হাসছে। চোখ টেরিয়ে বলছে, দেখ হে তুমার ঘর। ঘরের রূপ দেখ। সামগ্রীর রূপ দেখ।

দেখে চুকাইয়ের আলোর হর্ষ লোপাট। বুকের মধ্যে কষ্টের মোচড়ানি দেয়। দু'বেলার অন্নসংস্থানেই উপার্জনের অঙ্গে টান। সামগ্রী জুটবে কোথায়! রূপ খুলবে কি! কিন্তু এত কুৎসিত তার ঘরখানা। ছেঁড়া কাঁথা, হাঁড়িকুড়ি, ঘরের মধ্যে এত বিচ্ছিরি হয়ে দাঁত মেলে পড়ে থাকে! জবাকে দেখে। মেয়েটার মুখে হাসি। পা ছড়িয়ে বসে আছে। ঘামছে। কপালে নাকের উপর চিবুকে চকচক করছে ঘামের বিন্দুরা।

চুকাই বলল, বাইরে আয়।

জবা বাপের মুখ দেখে। কি যেন ভাবে। তারপর ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে বলে—না। ঘরে থাকব।

খাওয়া দাওয়ার পরও জবার জেদ, আলা জ্বলবেক। আমি ঘরে শুব।

বৈশাখী দিন ঝড় জল আনে নি। দিনটা তাপের শীর্ষে দোলা খেয়ে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু আগুনটা ফেলে দিয়েছে মাটির পৃথিবীতে। বাতাস সে আগুনের শক্তি ক্ষয় করে যাচ্ছে। একটু রাত হলে হয়ত ঠান্ডা পরিমন্ডল তৈরী হবে।

ফুলু বলল, না। ঘরে শুতে হবেক না। মরে যাবি সিদ্ধ হয়ে। আলো জ্বললে ঘুম হবে নাই।

টিনের আগল টেনে উঠোনে চট বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা হল। বিড়ি গোটা-কয় শেষ হল উত্তেজনায়। একসময় বলল চুকাই, ঘুমুলি?

উহুঁ।—ফুলি কাৎ হল তার দিকে মুখ করে।

—আলা আসতে একদম ভাল লাগছে নাই! ঘরটতে কালিঝুলি। একট জিনিস নাই। ছিঁড়া কাঁথা কানা ভাঙা হাঁড়ি। এমুন কে জানত! আলাতে কুনুদিন ত দেখি নাই। এমন জানলে কোন শালা লিত।

—দিয়ালগলা আমি নিকাপুছা করব। মেঝেতে মাটি দুব। ঝুল ঝাড়ব।

—ছিঁড়া কাঁথা পালটাবি কি করে? নতুন হাঁড়ি কিনার পয়সা কুথা? তা-বাদে এমন শূন্যি ঘর। শালা কুনুদিন জানতম নাই এমন শূন্যি—। আলা! চুকাইয়ের কথা শেষ করে না। কষ্ট যেন ঠোঁটে পাথরের বাঁধ দিয়ে দেয়।

অস্বস্তিটা থেকেই যায় চুকাইয়ের। কাজ জোটে না এর মধ্যে। ঘরে পড়ে থাকা। কিংবা গোবিন্দ ফটিকদের কাছে বসা। জবা দিনেও আলো রাখে। চুকাই আলোর অসুখের কথাটা কাউকে বলে না। ফুলুকে নিয়ে রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে অন্ধকারে সে যৌনসঙ্গ করে। আলো ফুলির জন্য জ্বালানতে সে অনুভব করে এ ঘরের সঙ্গে মানানসই। রূপহীনা যৌবনহীনা ফুলি। শীতল হয়ে পড়ে। ফুলি আলোটা নেবায়। অন্ধকার আবার তাকে পুরনো মানুষটি করে দেয়। ফুলি

বলে, আলো তুমি একদম সহ্য করতে পারছ না।

কিন্তু তিনদিনের দিন আলোটা আর জ্বলে না। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। জবা চেঁচাতে থাকে, অ বাবা আমাদের কেনে জ্বলছেক নাই। অ বাবা।

অন্ধকার ঘর আবার স্বস্তি দেয়। সকালেই জবার জেদে নরেশ মন্ডলকে ডেকে আনতে হয়। ইলেকট্রিক কাজ করে। দেখে শুনে বলে, পাঁচ টাকা লাগবে। বাল্ব ফিউজ। আমার মজুরি নিয়ে মোট সাত।

জবার জেদেই বাল্ব কিনতে হল। সাত টাকা ধার দিল গোপাল মুদী। সুদ বন্ধকী কারবার করে। টাকায় দশপয়সা করে মাসিক সুদ। মূল না দাও, সুদ দাও।

সুদের যন্ত্রণা। মাস মাস পাঁচ টাকা দিতে হবে আলোর জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে। তারপর আবার বাল্ব গেলে সাত টাকা। চুকাই ভাবতেই ফোঁড় পায় কাঁটার।

ফুলি বলে,—তুমার যে কি হল! কাজ কম্ম পেছ নাই। ঘরে বসে থাকছ।

—আলা ত লয়। একট বাঁশ। ভেবেছিস মাস মাস টাকা লাগবেক। রুজগার নাই।

—হ্যাঁ গ আলা কে দিলেক, পঞ্চায়েত।

চুকাই সে উত্তর না দিয়ে বলল, জানিস আমার তো মন হয়, আলা লয়। একট সূচ ফুটিন দিনছেক। দেবাংশীবাবু বললেক, কি হে চুকাই, কেমন আলো জ্বলছে। অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়েছি। তা তুই বল ফুলু আলা ভাল না আঁধার ভাল। তুই বল—।

—আঁধারই ভাল গো। ঘর দেখতে হয় না। মুখ দেখতে হয় না।

—ঠিক। ঠিক। এতকাল জানতাম আলাই ভাল।

চুকাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

ফুলি বলে, সুদের পয়সা লাগবেক। তা বাদ আলো জ্বালার লেগে পাঁচ টাকা মাস মাস। তা বাদে আবার গেলে আবার ধার, আবার সুদ—।

—জবার কিন্তু খুবই সুখ। মেয়েটার কত আনন্দ গো।

—হুঁ। লাভ ওইটুকুন। উর ত সুখ হছেক।

—যদি পা'ট উর ঠিক হত। শরীলট একডুং ভাল হত।

কন্যার সুখের অনুভূতিটুকু তাদের সব ভাবনা মুছে দেয়।

নীরব হয়ে যায় পুরুষরমণী। অযুত দীনতার উৎপাদক জীবনধারায় আলো নামে যন্ত্রণার সংযোজন অজস্র সূচিকাবিদ্ধতার সঙ্গে বাড়তি আর একটা হয়ে দিব্যি মিশে যাবে। মুনিষ-জীবনের সহ্যশক্তি যে অবিশ্বাস্য!

সুখের কথামালা

ভোরবেলায় আমি পৌঁছাব। ভয় নেই, বাড়ি চিনে নিতে আমার কষ্ট হবে না। আমি ঠিক খুঁজে নেব।

শুভেন্দু আর কিছু লেখিনি। ওটুকুই যথেষ্ট। সে আসছে। রাত শেষ হলেই ভোরের দিকে যখন প্রথম আলো ফুটবে তখন সে এসে দরজার কড়া ধরে নাড়া দেবে। দরজা খুলে বলতে হবে, এসো শুভেন্দু! বাড়ি চিনতে কষ্ট হয়নি তো?

বলা কি যায় সব কথা? কি জানি। তবে এখন এই রাতে ঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটার পর একটা সিগারেট আমি ধরিয়ে চলেছি। মনে মনে কথার মালা গাঁথছি। যেন শুভেন্দু আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। আপ্যায়ন ক'রে তাকে এনে ঘরে বসিয়েছি। ওদিকে নীতা ব্যস্ত। সে হিটারে জল বসিয়েছে চায়ের, কিংবা লুচি অথবা আলু কি পাঁপড় ভাজছে। তার গন্ধ এ ঘরে ভেসে আসছে। আমি প্রফুল্ল মুখে শুভেন্দুর কথা শুনছি। তার বর্তমান কথা, সে কোথায় থাকে, কি করে, কেমন ক'রে তার দিন কাটে,সব।

না শুভেন্দু আসে নি এখনও। আসবে কাল সকালে। আমি যে কেন এত ভাবছি! ঘরের ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে এ শান্ত নিরিবিলি নিস্তব্ধ রাতে আমি তো বিছানায় শুয়ে পড়তে পারি, গায়ের উপর বাতাসের চামর দুলবে। এখন তো বসন্তকাল। ফাল্গুন মাসের এটা শুক্লপক্ষ। খোলা জানালা দিয়ে অদ্ভুত ফুটফুটে জ্যোৎস্না গলা বাড়িয়ে ঘরের মেঝেয় আমার উপর, ইজিচেয়ারের গায়ে কি যেন খুঁজছে। ইতিমধ্যে একটা কাকও ডেকে ডেকে গেল। রাতে কাক ডাকা নাকি অশুভ। গতকালই নীতা চোখ বড় বড় করে বলেছে, এ মা কাক ডাকছে। জান, খুব খারাপ। নীতার মুখচোখে কেমন যেন আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল। আমি জানি এমন জ্যোৎস্নায় ভুল ক'রে কাক ডাকে। এর সঙ্গে অশুভ কোনো কিছুর সম্পর্ক নেই। তবে নীতাকে কিছু বলি নি। ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে শুধু বলেছি, তাই নাকি! আমি তো ভেবে পাই না এমন বোকা, ভীরু, একেবারে গ্রাম্য নীতা কেমন ক'রে শিক্ষয়িত্রী হয়েছে। আবার ইংরেজি পড়ায়। ছিঃ ছিঃ, ওর একদম সেকেলে সেই ঘোমটা টানা, ভীরু, পতি-পরম-গুরু সাধারণ বৌয়ের সঙ্গে একতিল যে ফারাক নেই!

নীতার কথা থাক। এক্ষুণি সব তালগোল পাকিয়ে যাবে। আমি আমার চিন্তাটাকে বরঞ্চ পরিষ্কার করার চেষ্টা করি। কেন আমি এত চিন্তিত? অতিরিক্ত সিগারেট খেলে উত্তেজনা বাড়ে, এ আমার জানা। নীতার নির্দেশমতো আমি

গোনাগুণ্‌তি সিগারেট খাই। অথচ আজ কোনো হিসেব নেই। হ্যাঁ, এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আমি খুব চিন্তার মধ্যে পাক খাচ্ছি। ঘরের বাতাস ধোঁয়ার গন্ধে ভারি, কেমন যেন গা গুলিয়ে-ওঠা অনুভূতি আমার দেহাভ্যন্তরে নাড়িভুঁড়ির মধ্যে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ভ্রু'র ঠিক উপরে দীর্ঘ কপালে কয়েকটা রেখাও দাঁড়িয়েছে। অল্প উত্তেজনায় গা ঘামা আমার স্বভাব। গা ঘামছে।

অথচ এ সব তো কিছুই হবার কথা নয়। শুভেন্দু যে একদিন আসবে জানতাম। কবে কোন্ মাস কি ঋতু সকাল বিকেল সন্ধে না রাত্রির কোন্ সময় তা অবশ্য আমি জানতাম না। কিন্তু শুভেন্দু যখন এই মাথার উপর আকাশ, পায়ের তলায় মাটি, জল বাতাস আলোর এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও আছে, পৃথিবীই বা কেন, এই ভারতবর্ষের কি বাংলাদেশের মধ্যেই আছে, তখন সে যে আসতে পারে এ তো অসম্ভব কিছু ব্যাপার নয়।

শুভেন্দু আসার ব্যাপারটা আজ সন্ধ্যায় আমি নীতার সঙ্গে আলোচনা করব ভেবেছিলাম, অথচ আশ্চর্য আমি ও প্রসঙ্গে একটা কথাও বললাম না। নীতা তাদের স্কুলের নানান সমস্যা, আজ সেক্রেটারি এসেছিলেন, বীণাদি রোজ দেরী ক'রে আসেন, অযথা ছুটি নেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ থেকে হেড মিস্ট্রেস যে ঐ বয়সেও খুব শিগ্‌গির একটা বিয়ে ক'রে ফেলতে পারেন তাও চাপা মৃদু হাসি দিয়ে অতি গোপনীয়তার সুরে বলে গেল। খুকখুক ক'রে কিছুক্ষণ হাসলও। আমি হুঁ-হ্যাঁ উত্তর দিয়ে গেলাম।

এখন কি নীতাকে ডাকা যেতে পারে? তারপর বিছানার উপর পাশাপাশি বসে শুভেন্দু আসার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা? ঐ তো বিছানায় শুয়ে নীতা। বোধ করি গভীর ঘুমে ডুবে। নইলে এতক্ষণে আমার দিকে কাত হয়ে ওর বহুবার বলা হয়ে যেত—এই, বসে আছ কেন? এস, শোবে না বুঝি?

বিছানায় উপর চিৎ হয়ে শাড়ির আঁচল বিছিয়ে নীতা তার সুন্দর একখানা বাহু দীর্ঘ করে শুয়ে আছে। অপরূপ কি অদ্ভুত সুন্দরী নয় নীতা। গায়ের রঙ শ্যামলাই বলা চলে। মুখের মধ্যে কিন্তু অদ্ভুত লাবণ্য আছে। সবচেয়ে যা ওর সুন্দর তা হল অঙ্গসৌষ্ঠব। একটা জীবন্ত ছন্দের মতো ওর শরীর। কোথাও এতটুকু গরমিল নেই। এখন নীতার ঘুমন্ত শরীরের উপর বাতাস বইছে। আজকের আবহাওয়া সুন্দর। খুব গরম নয় আবার শীতও নয়। তবু নীতা যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। আমি জানি তার কারণ। ওর যে বহুদিনের অভ্যেস একখানা হাত আমার গায়ের উপর ফেলে রাখা।

শুভেন্দু যেন কোথায় এখন থাকে। পোস্টপিসের ছাপখানা এমন অস্পষ্ট যে শেষে দু-একটা ইংরেজি হরফ বোঝা গেল না। নামটা ধরতে পারা গেল না জায়গাটার। অনেকদিন আগে শুনেছিলাম বিহারের কোন মফঃস্বল সহরে ও থাকে। প্রায়ই বাড়ি যায়। আমার খোঁজখবর একবার এসে নিয়েছিল। তখন আমার মাথার মধ্যে বেশ কয়েকদিন শুভেন্দু ছিল। তারপর কখন যেন ও সেই

শহরেই থেকে গিয়েছে, আমি কলকাতায়। মনের লাইনের তার সময় ইঁদুরের মতো কেটে দিয়েছে।

সেই শুভেন্দুর জন্য আমার এখন এত ভাবনা। কত অনায়াসেই আমি তাকে এই বিশাল শহরের মধ্যে হারিয়ে দিয়েছিলাম। অথচ ওকে আমার এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলার কথা নয়। এই যে চিঠি পেলাম, হুড়হুড় করে বন্যার মতো যে বিপুল বিক্ষুব্ধ জলধারা নেমে আসছে, যাতে আমি টলমল খাচ্ছি, তাল সামলাতে পারছি না, বিছানা ছেড়ে ইজিচেয়ারে বসেছি, ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকছি, ঘর ঘন ধোঁয়ায় ভারি ক'রে বিশ্রী একটা অবস্থা ক'রে তুলেছি, এসব কোনটাই তো আমার সাজান নয়, ইচ্ছাকৃত নয়।

শুভেন্দুর কথা মনে এলেই আমার বুকের মধ্যে শুধু শুভেন্দু নয়, আরো অনেক কিছুর তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। যেন ও একলা নয়, সঙ্গে ক'রে একরাশ মুখ আর একরাশ ছবি এনে হাজির করে। শরবন, আমবাগান, তালখেজুরের অজস্র বৃক্ষ, ধানক্ষেত আর ধানক্ষেতের মধ্যে দুটি দালান অজস্র খড়ের চালের শ'খানেক মাটির ঘর নিয়ে আমাদের সেই গ্রাম, তার ছেঁড়া ছেঁড়া মুহূর্তগুলো টুকরো কাগজের মতো উড়ে বেড়ায়। মনে হয় বুকের মধ্যে অজস্র টিয়ার ওড়াওড়ি, গোরুর গাড়ির চাকার ধুলো, গোধূলির অদ্ভুত গন্ধ, পরিচিত অজস্র মুখ, পথের কুকুর, সন্ধ্যার শব্দ সব শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। অকস্মাৎ নাড়া পাওয়ায় তারা জেগে উঠল। তারমধ্যে কালো জলের গভীর থেকে মুখ তোলা শালুকের মতো মাথার চুল জলে ভিজিয়ে মসৃণ মুখ থেকে রূপালি জলের ফোঁটা ঝরাতে ঝরাতে কিশোর শুভ বলে, হ্যাঁরে, ইংরিজি পড়া হয়েছে তোর? স্যার বলছেন, ইঁট নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। আমি এক গলা জলে দাঁড়িয়ে বলি, ধুস্, ইট হাতে দেবে না ছাই। ভয় দেখিয়েছে।

কৈশোরের সেই এক গলা জলের মধ্যে রোগাটে হাফপ্যান্ট পরা শুভ আর আমি দু'জনে যেন এক বর্ণের এক চেহারার দু'টি মাছ হয়ে খেলা করতাম। ভাবতে পারতাম না আমি আর শুভ আলাদা। তালখেজুর আম জামের গাছ, খেলার মাঠ, কাঁদরের এক চিলতে জলে মাছ ধরা, কালবৈশাখীর মধ্যে আম কুড়ান সবেই যেন একটা সুতোর মতো জড়িয়ে ছিলাম। অথচ আজ তো বুঝি আমাদের দু'জনের মধ্যে স্বভাবে আচারব্যবহারে কতখানি তফাৎ ছিল। আমি ছিলাম দুরন্ত, পড়াশুনোয় অমনোযাগী পাড়ার দুষ্টু ছেলে। শুভ শান্ত, পড়াশুনায় ভাল, লাজুক, কোন অন্যায় করতে আমার মনে কোন বাধা জন্মাত না আর শুভ 'না ভাই' বলে এমন ভঙ্গি করত, যে কখনও তার গালে চড় বসিয়ে দিতাম। অথচ ঐ শুভর আমাকে ছাড়া চলত না, আমারও। কবরেজ মশাই তেঁতুলতলায় বসে হুঁকো টানতে টানতে বলতেন, বিনোদের ভাল ছেলেটা খেপীর ছেলের সাথে মিশে খারাপ হয়ে যাচ্ছে হে। হ্যাঁ, তখন আমার সঙ্গে কোনো ছেলের মেশা মানেই খারাপ হয়ে যাওয়া। কারও বাগানের আমচুরি, কারও

লঙ্কা চুরি, কারও কিছু ভেঙে দেওয়া, কোনো ছেলের মাথায় অযথা চাঁটি বসিয়ে দেওয়া এবং তা নিয়ে মায়ের সঙ্গে পাড়ার লোকের নিত্য বিবাদের জীবন্ত ক্ষুদে নায়ক হয়ে পড়ায় ত্রাসের সৃষ্টি ক'রে থাকি।

শুভ আমার সঙ্গ কোনদিন ছাড়ে নি। বিনোদকাকু, কাকীমা, আরো অনেকের বাধা সত্ত্বেও সে বড় বড় দু'টি চোখ মেলে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলত, এই তোকে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলবে বলছিল। আমি হা হা ক'রে হাসতাম। বলতাম, সব মিথ্যে কথা। ভয় দেখায়।

শুভ আর আমি এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। তারপর কলেজ। এক কলেজ এক বোর্ডিং। সপ্তাহে দু'জনে একসঙ্গে গাঁয়ে আসতাম। সে সময় শুভর সম্বন্ধ হয়েছিল নীতার সঙ্গে। নীতা তখন ফ্রকপরা মেয়ে। শ্যামলা রঙ, পানপাতার মতো মুখ, বড় বড় দু'টি চোখ, মাথায় কোঁকড়ান চুল, দোহারা চেহারা, হাতে সোনার রুলি। নীতাদের অবস্থা তখন পাড়ার মধ্যে ভাল। আমাদের পাড়ায় ওদেরই শুধু দালান কোঠা। ওর দাদু রাজাব ঘরের দেওয়ান ছিলেন। ছেলেবেলায় শুনতাম ওদের বাড়িতে রাজামশায় নাকি হাতির পিঠে চেপে আসতেন। তার জন্যেই ওদের ঘরের দরজা অত বড়। শুধু দরজা নয় নীতাদের বাড়িখানাও ছিল বিশাল। ছিল লাগোয়া বাগান। নারকেল, আম, জামরুল, লিচু আরও অনেক গাছ ছিল। ভয়ে ভয়ে ওদের বাড়িতে আমরা ঢুকতাম। ওর বাবা কিছু করতেন না। শুধু জমি-জায়গা দেখতেন। সারবন্দী গোরুর গাড়ি নিয়ে ধান বেচতে যেতেন। উঃ কত গোরুর গাড়ি এসে যে হাজির হতো! সেই বাড়ির মেয়ে নীতা সেদিন রহস্যময়ী না থাকলেও বিশেষ এক দৃষ্টির মধ্যে ছিল বৈকি! সুতরাং ও পক্ষ থেকে শুভর সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাব শুনে না আশ্চর্য হয়ে পারে নি কেউ। গাঁয়ে তখন ওটা একটা আলোচনার বস্তু। শুভ 'এই কি হচ্ছে' শুধু বলত। কিন্তু আমি ছাড়তাম না। গাঁয়ে এসে পথে ঘাটে নীতাকে দেখলেই আমি চোখের ইশারায় শুভকে ইঙ্গিত করতাম। বিয়ের আগে একটা ভালবাসার সম্বন্ধ যাতে হয় তারও চেষ্টা করেছি। শুনে শুধু 'এই না' বলে বলে আমাকে বিরত করেছে। আসলে ভাল ছেলে হলে যা হয় আর কি। অথচ তখন মেয়েমানুষ এবং ভালবাসা সম্পর্কিত বিপুল রহস্যময়তার মধ্যে আমাদের মন ডুবে। কৈশোর পার হয়ে যৌবনের সদ্য বাতাস লাগা দেহমন অসম্ভব চঞ্চল। এবং ভাল ছেলে শুভর মনেও ফ্রকপরা কিশোরী নীতার ঢলঢল মুখ স্বপ্নের ভিতরে ভেসে বেড়ায়।

এর মধ্যে হঠাৎ সবকিছু ওলোট পালট হয়ে গেল। শুভর বাবা আমাদের বিনোদকাকা মারা গেলেন। হোস্টেল ছেড়ে শুভ গাঁয়ে এসে বসল। আর ফিরে গেল না। পড়াশুনাও শেষ। এবং স্বাভাবিকভাবে অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওদিককার হাওয়ারও বদল ঘটল। নীতার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ একেবারে ফিকে হয়ে গেল। সংসারের মস্ত ভার পড়ল ওর উপর। দিনে দিনে কেমন যেন হয়ে

যেতে থাকল ও। রুক্ষ, রাগী, নোংরা। চোখ সব সময় লাল, দাঁত চেপে চেপে কথা, সবকিছু সম্পর্কে একটা তাচ্ছিল্যভাব। কিছুদিনের মধ্যেই যে ছেলে সিগারেটের নাম শুনলে সাত হাত পিছিয়ে যেত সে বিড়ি ধরল। বিনোদকাকা কিছু রেখে যেতে পারেনি। মাত্র কয়েকটা মাস, তার মধ্যেই ওদের ঘরের দৈন্য জামাকাপড়ে চেহারায় মুখেচোখে ফুটে উঠল।

আর আশ্চর্য, ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের কি উন্নতি! বাবার ব্যবসা যা পড়তির মুখে ছিল তা হু হু ক'রে উপরে উঠতে থাকল। বদলে গেল আমাদের সংসারের চেহারা। নতুন বাড়ি হল, কিছু জমি কেনা হল, মায়ের গায়ে গয়না উঠল, বড়দির বিয়ে হচ্ছিল না—বিরাট বড়োলোকের ঘরে বিয়ে হয়ে গেল। গাঁয়ে আমরা তখন সকলের ঈর্ষার পাত্র। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, যে-আমি খুব সাধারণ ছিলাম সেই আমি কোন মন্ত্রবলে যেন অসাধারণ হয়ে উঠলাম। ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ডিভিশন, পাড়ায় শান্ত ভদ্র, যে কোন ছেলের অনুকরণযোগ্য। এর ভেতর শুভর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও ফিকে হয়ে গেল। পড়াশুনায় ব্যস্ততা, নতুন বন্ধু, ভাল রেজাল্ট করার চেষ্টা, অপর দিকে দিনে দিনে চাকরির অন্বেষণে ক্ষুব্ধ ক্লান্ত দীন শুভ! দু'জনের আকাশ পাতাল তফাৎ।

একদিন মুখে বিড়ি নিয়ে শুভ আমার ঘরে এল। মাথার চুল উসকো-খুসকো, গায়ে ফরসা ভাঁজ খাওয়া সাদা জামা, রঙওঠা পাজামা। এসে বলল, কি রে পড়ছিস্?

আমি মুখ তুলে বললাম, আরে তুই, আয়!

কথায় কথায় শুভ বলল, জানিস আমি ব্যবসা করব। আসানসোলে চাকরির জন্য গিয়েছিলাম। ধুস্ চাকরি কি জোটে!

বললাম, ব্যবসা যে করবি, টাকা পাবি কোথায়?

—কেন? নীতার বাবা দেবে। শুভ এমন স্বরে বলল যেন টাকাটা ওর হাতেই আছে। তারপর হাসি হাসি মুখে বলল, জানিস নীতা আমাকে ভালবাসে।

আমি উৎসাহিত হলাম। ইতিমধ্যেই আমি জেনে ফেলেছি, শুভ নীতার পিছনে আজকাল ঘোরাফেরা করছে। বললাম, প্রেম করছিস!

শুভ কেমন করে যেন হাসল। লজ্জা লজ্জা হাসি। তারপর বলল, জানিস নীতা খুব ভীতু। আমার সঙ্গে কথা বলে না। আর লাজুকও।

অবাক হয়ে বললাম, তাহলে কেমন ক'রে জানলি নীতা তোকে ভালবাসে?

ও কথা ঘুরিয়ে ফেলল। চোখ নাচিয়ে বলল, নীতার চেহারাখানা কেমন হচ্ছে দেখছিস! খাসা! খাসা মেয়েমানুষ হবে একখানা।

শুভর মুখে এ ধরনের কথা শুনব আমি আশা করিনি। বললাম, কি যে বলিস!

ও খুকখুক ক'রে হাসল। তারপর বলল, কেন খারাপ কি বললাম। এই, একখানা কড়া দেখে প্রেমপত্তর লিখে দে তো। তারপর চ দুজনে দিয়ে আসি।

আমি বললাম, না।

ঘাড় দোলাল শুভ। বলল, জানি।

বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা আমি টের পেতে থাকলাম। আমার কোনো কথার কোনদিন প্রতিবাদ করেনি ও। আমার পাশে দাঁড়াতে আপত্তি করে নি। আম চুরি কি দত্তদের কলাগাছ কাটা, আখক্ষেতে আখভাঙা, এমনকি বেনেবৌয়ের ঘরে সন্ধেবেলায় ইঁট ছোড়ার ব্যাপারেও সে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। অথচ আমি.....।

শুভ আমাকে কিছু না বলে সেদিন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর থেকে সে আমায় এড়িয়ে চলত। আসানসোল-রাণীগঞ্জ এলাকায় ওর মামার বাড়ি। প্রায়ই ওদিকে যেত। চাকরির চেষ্টা করত। তবে ওর সব খবরই আমি পেতাম। নীতার পেছনে ঘোরাঘুরি, একদিন পুকুরঘাটে ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা ইত্যাদি নিয়ে গাঁয়ের ভেতর কেলেঙ্কারিও হয়ে গিয়েছিল। নীতার বাবা প্রায় মারতেই গিয়েছিলেন। আসলে শুভ মনে মনে ভালবেসেছিল নীতাকে। ওপক্ষের কোন সাড়াই ছিল না। অবস্থা বিপাকে সেদিনের সেই বিয়ের সম্বন্ধ যে ভেঙে চুরমার তা যেন শুভ বোঝেনি। একটা অধিকার সে আরোপ করেছিল নীতার ওপর। ওর বাবার টাকায় ব্যবসা করার অধিকারও বোধকরি তার ফলেই এসেছিল ওর মনে। শুভকে কাছে পেলে ব্যাপারটা আমি বোঝানর চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমার আসেনি। ওকে বোঝাতে পারিনি নীতা তাকে ভালবাসে না। ভালবাসলে কোনদিন সে বাবার কাছে অত কথা বলত না, তাকে অপমান করত না।

নীতার সঙ্গে আমার বিয়ের দিন সাতেক আগে শুভ একবার এসেছিল আমার কাছে। চেহারায় পোষাকে তখন সে আরও দীন, আরও রুক্ষ। চোখ লাল। মুখে কোন লাবণ্য নেই, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। এসে বলল, হ্যাঁরে, নীতার সঙ্গে তোর নাকি বিয়ে। আমি শুনলাম, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি।

—কেন? আমি অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর ওর নীরবতার সুযোগে বলে উঠলাম, তোর খবর কি? চাকরি জুটল কিছু?

—না। কিন্তু তোর সঙ্গে নীতার বিয়ে হতে পারে না। শুভ এমন স্বরে বলল যেন বিয়ে হলে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে যাবে। একটু থেমে, চোখে রক্ত ফুটিয়ে বলে উঠল, নীতার সঙ্গে বিয়ে হবে আমার।

শুভর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটল কিনা বুঝতে পারি না। বললাম, তা কেমন ক'রে হয়! নীতা তোকে ভালবাসে না, তোকে অপমান করেছে।

ঝাঁঝিয়ে উঠল ও। বলল, করুক। অপমান করার অধিকার ওর আছে।

—তোকে যে ভালবাসে না।

—ভালবাসত! তার জন্যে সময়ের দরকার। শুভ বলল, এমন দিন আমার থাকবে না। আমি আবার আগেকার মতো হয়ে যাব। চাকরি পাবই, না হলে

ব্যবসা করব, তখন নীতা আমাকে না ভালবেসে পারবে না।

সত্য কথা। কিন্তু কেমন ক'রে শুভকে বোঝাই ওর ঐ সময় বস্তুটুকু কি মারাত্মক! আমি চুপ ক'রে রইলাম।

—তুই আমার সঙ্গে শত্রুতা করছিস। শুভর মুখ চোখের বর্ণ পাল্টাচ্ছিল। যেন কিছু একটা সে এক্ষুনি ক'রে ফেলবে।

—শত্রুতা! শব্দটা আমি বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। শুভ মাথা ঝাঁকাল। বলল, তুই আমার সবকিছু ছিনিয়ে নিয়েছিস। এখন নীতাকেও নিয়ে নিচ্ছিস। আমি যা হতাম, তুই তা হয়েছিস আর তুই যা হতিস তা আমি হয়েছি। কেন? বল, তুই বল নীতা আমার নয়?

শুভ একরাশ কথা বলে দ্রুত আমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমি ডাকলাম, শুভ। শুভ, শুনে যা।

না, শুভ এল না। এলেও আমি ওকে ওর ঐ উন্মাদ অবস্থায় কিছু বোঝাতে পারতাম না। কতক্ষণ স্থাণুর মতো বসেছিলাম জানি না। মা এসে বলেছিলেন, হ্যাঁরে শুভ এসেছিল না! অমন ক'রে চলে গেলে কেন? আমি বলেছিলাম, শুভটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে!

আমার স্পষ্ট মন আছে বেশ কয়েকদিন তারপর শুভর কথা নিয়ে মাথা ধরার যন্ত্রণা আমাকে পীড়িত করেছিল। যেন শুভ তার সব পাগলামি আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, শুভকে কেমন করেইবা বোঝান যেত এর জন্য যদি কেউ দায়ী থাকে তবে সে হল স্বয়ং বিধাতা। কেন তিনি শুভর এমন অবস্থা করলেন? কেন শুভর পড়াশুনা বন্ধ হল? কেন বাবা মারা গেলেন? না, নীতার কোনো দোষ নেই। নীতাকে বিয়ে আমার না করাও অযৌক্তিক। নীতা কেন শাস্তি পাবে? পাগলামি নিয়ে তো কারও জীবন চলতে পারে না। আসলে সবকিছু হারিয়ে ওর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। আমার উপর ঈর্ষায় ও অন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি কোন অন্যায় করিনি, ওর কিছুই নিইনি। ও যেটাকে নিজের সম্পদ বলে ভেবেছিল, সেটা ওর নিছকই কল্পনা। আসলে ওর কোনো সম্পদই ছিল না। আমার ছিনিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

কারও পাগলামি নিয়ে পৃথিবী চলে না, কারও জীবনও চলে না। নীতার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের দিনের সেই রাতে আমি শুভকে যেন দেখতে পেয়েছিলাম। আমার বুকের ভিতর সেই আমবাগান, গাঁয়ের খড়ের চালের মাটির ঘর, কাক টিয়া ময়নার শব্দমুখরতার থেকে সে যেন সেই কৈশোরের একগলা জল মেখে উঠে এসে আমার কানে কানে বলেছিল, তুই ছিনিয়ে নিলি। সারা শরীর আমার ঘামে জবজব ক'রে উঠেছিল। শাঁখের শব্দ, ফুল আর এসেন্সের তীব্র গন্ধ, মানুষের কোলাহল, রঙিন শাড়ি, ঝর্ণার মতো হাসি, ঝলমলে বিয়েবাড়ির অজস্র মানুষ, আলো, উলুধ্বনি, বেনারসিপরা অপরূপা নীতা, প্রতিমার মত মুখ, রজনীগন্ধার গুচ্ছের মতো শরীর নুয়ে পড়া লজ্জায়,

সব কিছুর মধ্যেই আমি টের পাচ্ছিলাম একজন যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমি বারবার ঐ সব শব্দ গন্ধ আলোর মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখছিলাম। বাসর ঘরে খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিছানায় লজ্জায় জড়সড় ছোট্ট আশ্চর্য শ্যামলা দেহখানা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা নীতার দিকে চেয়ে একবার আমি বাইরে তাকিয়েছিলাম। তখন বানভাসা জ্যোৎস্নায় সব ডুবে। আকাশে অগণন নক্ষত্র। দোতলার জানলা থেকে অদূরের ঘরবাড়ি গাছপালা সব অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য মায়াবি জ্যোৎস্নায় ভাসছে। আমি সেদিকে তাকিয়ে বারবার শুভর কথা ভেবেছি। যেন শুভর সব সুখ, স্বপ্ন, কামনা, যেন শুভর প্রাপ্য সমস্ত সম্পদ আমি অপহরণ করেছি। কেউ বাধা দিচ্ছে না। কেউ আপত্তি করছে না।

কলকাতায় অনেক দিন পরে শুভেন্দুর কথা উঠতে নীতা মুখ কুঁচকে বলেছিল, ও ঐ বাজে ছেলেটা ও তোমার বন্ধু হল কি ক'রে গো? অসভ্য! আমার সব মনে আছে। একটু পাগলাটে ছিল।

আমি খুব শান্ত ধীর গলায় বলেছিলাম, ও খুব ভাল ছেলে ছিল। হঠাৎ ওরকম হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, ওর সঙ্গে তো তোমার বিয়ে হবার কথা ছিল।

—বিয়ে! চোখ বড় বড় করে আঁতকে ওঠার ভঙ্গি ক'রে নীতা বলেছিল, এ মা! জান বিয়ে হলে ওর সঙ্গে আমি ঠিক আত্মহত্যা করতাম।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছি, ওর সঙ্গে, তোমার যে সম্বন্ধ হয়েছিল মনে নেই?

—না। ভ্রু তুলে একটু চিন্তার ভঙ্গিমা ক'রে নীতা বলেছিল, কখন?

—তুমি তখন খুব ছোট নও। কিশোরী। মনে থাকার কথা।

—না বাবা আমার মনে নেই। নীতা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল।

ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম আমিও। বাবার ব্যবসা বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল। মা মারা গেলেন বছর ঘুরতে না ঘুরতে। ছোটভাই পাটনায় চাকরি নিয়ে চলে গেল। আমি আর নীতা কলকাতায়। বাবার ধানকলের ব্যবসায় কোনদিন আমার মন ছিল না। চাকরি কলকাতায়। বাবা বেঁচে থাকার সময় থেকেই গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আমার মুছে আসছিল, বাবা মা মারা যাবার পর সে সম্বন্ধ একেবারেই গেল। সেজকাকু বরাবর আমাদেরটা দেখতেন। এখনও দেখেন। ঘরবাড়ি জমি জায়গা সব তাঁর হাতে। বৎসরান্তে তিনি মোটা টাকা পাঠিয়ে দেন। যাবার কথাও বলেন। মাঝে মাঝে গিয়েওছি। এখন আর সময় হয়ে ওঠে না। দেখতে দেখতে একটার পর একটা বছর পার হয়ে চলেছে। কৈশোর শুধু নয় যৌবনও প্রায় শেষ।

নীতার সঙ্গে আমার দাম্পত্যজীবনের সেই সব উচ্ছ্বাস কামনা বাসনা কবে যেন ফুরিয়ে এসেছিল। নীতা আমার সন্তানের জননী হয়নি। এ অক্ষমতা কার আমি জানি না। কিছুদিন এ নিয়ে ভাবনা এসেছিল। তারপর নীতা চাকরি নিল,

হবে না বলে একটা স্থির ধারণা ধীরে ধীরে তার মনের ভেতর গড়ে উঠল! ব্যস্, চুপ। এখন আমাদের দাম্পত্যজীবন নিস্তরঙ্গ দিঘির মতো শান্ত ধীর, আশ্চর্য নীরব। কোন ঢেউ নেই, মাছের লাফানি নেই, পানকৌড়ির ঝপাৎ ক'রে ডুব নেই। দিন যেন ছকে বাঁধা। সকাল বিকেল দুপুর রাত্রির রুটিন যেন আঁকাজোকা। হেরফের নেই, পরিবর্তন নেই। আমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ নেই, কোন অসন্তোষ নেই। কেন, কে জানে! আমরা কি কেউ কারও কাছে আর কোনো আশা করি না? এ কি মৃত্যুরই সামিল? কে জানে কার নাম জীবন, কার নাম মৃত্যু! এ নিয়ে কোনো ভাবনা তো ছিল না মনে।

শুভেন্দুর চিঠি পাওয়ার পর ভাবনা হচ্ছে। যেন শুভেন্দুর চিঠি সমগ্র জীবনকে আমার চোখের উপর তুলে ধরল। চিঠিতে অনেক কথা লিখেছে ও। ও এখন সুখী। কাঠের ব্যবসায় টাকাকড়ি হয়েছে, ওখানকার সমাজে সুনাম হয়েছে, ভোটে এবার ওকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হচ্ছিল ইত্যাদি। শুভেন্দু এখন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। সমাজের চোখে সে সৎ, ভদ্র, মানী। শুভেন্দু বলেছিল, আমি যখন দাঁড়াব তখন নীতা আমাকে ভালবাসবে। এখন আমি জানি শুভেন্দুকে একথা বললে সে হাসবে। বলবে, উঃ কি ছেলেমানুষ তখন ছিলাম বল দেখি।

অথচ আমার কেন এমন হচ্ছে? চিঠিখানা পাওয়ার পর কেন আমি ছেলেমানুষ হয়ে গেলাম? চোখের উপর আমার পৃথিবী যেন বনবন ক'রে ঘুরতে থাকল। শুভেন্দুর সুখী পরিতৃপ্ত মুখ, নীতার রোজকার দেখা অদ্ভুত নিঃস্পৃহ চোখ, আমার গ্রাম, বিধাতার আশ্চর্য লিখন, পাগলামি ছায়াছবির মত বনবন করে ঘুরতে থাকল। আচ্ছন্ন হয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। সেই নীতা সেই খাওয়া সেই ঘর সেই বিছানা। তবু বুকের ভেতর গমগম শব্দ, কিসের যেন অস্বস্তি। অ্যাশট্রে-তে সিগারেটের পাহাড়, ঘন ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি, মাথায় বেশ যন্ত্রণা।

আসলে শুভেন্দুর চিঠি আমার নিস্তরঙ্গ জীবনে বিপুল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছে। সেই বিয়ের রাতে কি তারপরও কখনও কখনও ওর সেই পাগলামি ক'রে বলা—তুই আমার সব ছিনিয়ে নিয়েছিস—কেমন এক আলোড়নে আমাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছিল। অবিকল সেই বিপর্যস্ত ভাব আমার আবার এল। তখন শুভ ছিল পাগল। এখন আমি। তখন শুভর পাগলামো নিয়ে জীবন চলতে পারে না বলে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন!

শুভেন্দু আসবে। নীতা অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবে। হেসে বলবে, কি আশ্চর্য আপনি কত পালটে গিয়েছেন। আপনাকে চেনা যায় না। কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়িয়ে অল্প ক'রে হাসবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবে, আমাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন? কেটে যাচ্ছে একরকম। অল্প থামবে। হয়ত ভাববে শুভেন্দু কেমন সুখী কেমন হাসিখুশি, কি সুন্দর স্বাস্থ্য। সব শুনে মনে করবে, আঃ কি সুনাম ওর। দেশের দশের একজন। তারপর মনের পাতায় সেই কৈশোর জেগে

উঠবে, ভাববে, আমি যদি ওর স্ত্রী হতাম। হ্যাঁ হবারই তো কথা। তবে বোধ করি একক একঘেয়ে বিরক্তিকর জীবন কাটাতে হতো না।

শুভেন্দু আসবে। আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাব। ভাবব, শুভেন্দুর সবকিছু যদি আমি ছিনিয়ে নিয়েও থাকি তবু কি পেলাম তাতে! এর চেয়ে নীতাকে বিয়ে না করলে কোন ক্ষতি ছিল না। ঠিক অমনি এক রমণী নিয়ে জীবন কেটে যেত। হয়ত অনেক সুখ অনেক শন্তি আমি পেতাম। সে আমার হৃদয়ের অনেক গভীরে যেত। আমার জীবন ফলেফুলে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠত।

শুভেন্দু আসবে। আমাদের দেখবে। ভাববে কেমন ওবা সুখী। এ সুখ আমার ছিল। হাসবে, কথা বলবে, বুকের গভীরে থাকা শোক প্রকাশ করবে না, শুধু জ্বলবে। ভাববে এই ঘর এই নীতা এই জীবন সব আমার হতো! আঃ কত সুখ!

নীতা এখন ঘুমুচ্ছে, শুভেন্দু ট্রেনে, আমি এই ঘরে। কাল সকালে আমরা তিনজনে এক হব। হাসব, কথা বলব, গল্প করব। তিনটি মুখোস আমাদের তিনজনের মুখে লাগান থাকবে।

বোধ হয় ভোর হয়ে আসছে। কেমন হিমেল হাওয়া। শরীরে অসম্ভব অবসাদ। কেমন যেন ঘুমঘুম ভাব। কিসের উপর যেন ভাসছি। আশ্চর্য, এতদিনে আমার মনে হচ্ছে সত্যিই আমি শুভেন্দুর সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছি। হায়, আমার জন্যে যা ছিল তা কেন নিলাম না। আধ-আধ তন্দ্রায় আমি এখন শুভেন্দুর জন্যে ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললাম, এসো শুভেন্দু। শুভেন্দু মুখোসখানা আঁট ক'রে ঘরে ঢুকল।

টানাপোড়েন

কেত্তন জানে, রসে বড় আঠা। বড় মারাত্মক চিট্। হুঁশ পবন থাকে না। মস্ত পৃথিবী বেমালুম উবে যায়। ক্ষুধা নেই, পার্থিব কোন টান নেই, রক্তমাংসের দেহখানা দিব্যি হালকা পাখায় পেঁজা তুলোমেঘের মত শূন্যচারী। দারাপুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার! জীবন তখন পদ্মপত্রে টলমল জল। টলটল টলটল। সংসারী মানুষের সে বড় বিভ্রম হে।

তা জানলেও মন শোনে না। মন যে বড় বেয়াড়া ছোকরা। অবুঝ, অস্থির। চোতমাসের বাতাসের মত সর্বদা দিকদিশাহারা। অজস্র ঘূর্ণনে উন্মাদ। কাদাজলে মাগুর মাছ। ছলবল করছে। ধরতে গেলে হাত পিছলে যাবে। ফোঁড়ও দিতে পারে। নিজের জিনিশ তবু যেন কত পর।

উঠোনে বসে থাকা কেত্তনের মাথায় এ সবের বুড়বুড়ি ওঠে। ভিন্ন মানুষ এখন। রসের মৌতাত মুছে দুগ্গার স্বামী। খোকনার বাপ। জুলজুল চোখে আট বছরের ঘরনীকে দেখে। মেয়ের আগপাস্তলা জানা। তবু দেখা। তবে কি, যা দেখা যায় না ওটা ধরার মতলব—মেয়ের মন। বড় কঠিন কম্ম।

উঠোন একেবারে খড়মড়। শুকনো পাতার মত। চালাঘরের ছায়াটা এসে সকালের তেজী রোদ মুছে নিজের ছবি এঁকেছে। বাতাসে শীতের ধর্ম। দিনের দেবতার প্রখর হবার এ ভ্রূকুটি। জোর গর্জাবে রোদ। প্রকৃতির যা নিয়মকানুন। গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত। চক্রবন্দী। গ্রীষ্ম হল সূর্যের প্রমত্ত যৌবন আবার। একটা কারু সমানে পেট ফুলিয়ে হল্লা বাজাচ্ছে। উঠোনের কুলগাছ এন্তার চড়ুই।

কেত্তনের লুঙ্গির ওপর কালো লোমশ পেট বুক। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, খাড়া নাক, গোলগাল মুখ। বছর বত্রিশ বয়স। মুখে বয়সের ছাপছোপ না পড়ে কিশোর কমনীয়তার দীপ্তি। আমুদে মানুষ। এখন চোর না চোরের মাসতুতো ভাই ভঙ্গিটিতে বালকপ্রতিম। দুগ্গা প্রচণ্ড আহ্লাদের সময় কিংবা প্রবল জৈবিক তাড়নায় কপাল, গাল, নাক, ঠোঁট, চিবুকে কাঁপা হাত রেখে উত্তপ্ত মোমের মত গলতে গলতে বলে, কচি ছেলে!

কচি ছেলে বৈ কি! নইলে অত ডর কিসের। দুগ্গা বাঘ না ভালুক! কাল নবগ্রামে পঞ্চরসের আসর বসেছিল, শুনতে গিয়েছিল। পাড়ার বৃন্দাবন, বিভূতি, শশাঙ্কও সঙ্গী হয়েছিল। রাতে ফেরার পর থেকেই দুগ্গার মুখে কুলুপ।

বাঁশের শূন্য ডালা দু'হাতে করে উঠোনে এনে রাখল দুগ্গা। আধময়লা লাল ছাপাশাড়ি, গোলাপী ব্লাউস। আঁটসাট কাপড় বসে আছে দেহরেখায়। মাথার চুল খোলা। দীঘল কালো চুলের রাশি। গায়ের বর্ণটিও ফরসার দিকে। ছোটখাট

মেয়েমানুষের গড়নপিটনে শক্ত ভাব। উবু হয়ে ডালার সামনে বসতে ব্লাউসের আবরণ পেরিয়ে স্তনের উদ্ভাস, পিছল কোমর, ভারী নিতম্ব কেত্তনের চোখে সাতসকালে মৃদু ঝিলিমিলি তুলে যায়। সময় সময় চেনা মেয়ে অচেনা হয়ে যায়। দেহমুদ্রায় সৌন্দর্যের অচেনা কারুকাজ ফুটে ওঠে। সামান্য রূপ অপরূপ হয়। রক্তে নাচন জাগে। ওই তো মোহিনী মায়া পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্ম জাল। তাতে তুমি মীন হে।

তা মোহিনী লক্ষ্মীও বটে। স্পর্শে বদলে গিয়েছে সংসারের হালহদ্দ। জীবনযাপনের ধারা। বাপুতি সামান্য জমি, এখানে ওখানে খাটালি। অন্নপূর্ণার মুখ সর্বদা গোমড়া। থিতু হতে চান না। পালিয়ে যাবার জন্যে আলতারাঙা পা'খানা বাড়িয়ে আছেন। দুগ্গা সংসারে এসে সে পায়ের বন্দনা করে পিঁড়ি বাড়িয়ে বলেছে, এস মা বস মা। কৃতার্থ কেত্তন।

দুগ্গা বাঁশের ডালা নাড়াচাড়া করে গোঁজাগুজি করে যাচ্ছে। বুনুনি সরেছে নির্ঘাত। তবে কর্মটি তো তার। রাগে কর্মের ভাগও সংসারে উল্টেপাল্টে যায়।

ডালাটা হল পোকার বাসস্থান। পলুপোকার। রেশমকীট। গাঁ জুড়ে পোকা চাষের রমরমা। বহরমপুরকে কেন্দ্র করে ঘরে ঘরে পলুকীট লালনপালন। সূতো কাটা। পলুপোকা সুষুপ্তিকালীন সুরক্ষার জন্য মুখ নিঃসৃত লালা থেকে সূত্র সৃষ্টি করে। নিজের চারপাশে নির্মিত হয় আবরণ। রেশম সূত্রের ডেলা। তা পলুর শ্রেণী রয়েছে। তুঁতপলু, মুগাপলু, তসরপলু। মুগাপলুর সিল্ক স্বর্ণাভ। মূল্যও খুব। মুর্শিদাবাদ ইস্তক তুঁতপলুর চাষ। তুঁতপাতা খেয়ে থাকে। তার জন্যে চাষ ব্যবস্থাও এন্তার। ভারী যত্ন চায় পলু। ঘরে বাঁশের মাচা তৈরী করে প্রথমে ডালায় বসে। তারপর যায় চন্দ্রকীতে এরা বলে তালইয়া। বাঁশ বেকারিতে তৈরী চরকি। পলকে পলকে পলু গুটি প্রস্তুত করে। অভ্যন্তরে থাকে সুপ্ত পলু। পতঙ্গ বেরিয়ে আসার আগেই তাপ প্রয়োগ। তারপর গরম জলে সেদ্ধ করে আঠা সরিয়ে ফাঁস বের করে কাটানদার রেশম সূতো কাটে। জেলা জুড়ে কম্ম। ছোটচাষী বা বসানি বিস্তর। যেমন কিনা দুগ্গা। রাজ্য সেরিকালচার বিভাগ ডিম দেন। বহরমপুর থেকে আনা যেতে পারে। গবেষণাগারও রয়েছে। তবে ডিম উৎপাদনেও হাত লাগায় অনেকে। তার জন্যে কলাকৌশল জানা দরকার। দুগ্গার শিক্ষা আছে। বাপের ঘরে করত কিনা!

তা এমন একটা পোকার ঘর নিয়ে কিনা উজ্জ্বল মসৃণ সূতো। পিছলে যায়, আলো ছড়ায়, চোখ ঝলমলায়। হাত দিলে শিহরণ। তার থেকে অমন চমকদার শাড়ি। লাল নীল সবুজ হলুদ চিত্তিবিচিত্তির ফুল ফল লতাপাতা পাখি ময়ূর ঢালাও ছাপছোপে বাহারী নক্শা। আহা চোখ জুড়োয়। মেয়েমানুষের অঙ্গে ঢলে ঢলে পড়ে। জরির গয়নায় চকমকায়। রূপবতী হয় কন্যেরা। আবরণ নয় অলঙ্কার। চল্লিশ দিনের জীবনে অমন পোকা দেয় কিনা অমন উপাদান।

গল্প আছে। আদ্যিকালের কথা। চীনের সম্রাজ্ঞী সিং লিং চি-র বাগানে চা-

পানের সময় ডিম্বাকৃতি ওই রেশম গুটি চায়ের পাত্রে পড়ে। তোলা হয় গুটি। গরম জলে বাইরের আঠা ধুয়ে সোনারাঙা রূপ বের হয়। সূতো বেরিয়ে আসে। তার থেকে কাপড়। এরপর শুরু হল চাষ। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উদ্যোগ নিলেন। চীনের মানুষের কাছে সম্রাজ্ঞী সি-লিং-চি তাই গুটিপোকার দেবী।

সে যা হোক, নবাবভূমি একে লালন পালন করে যাচ্ছে সমানে। বাংলার একদা রাজধানী মুর্শিদাবাদ। যুদ্ধ, জয়-পরাজয়, অজস্র উত্থান-পতনের মধ্যেও ঐশ্বর্য আর আড়ম্বরের আলোকমালায় সেজেছে। সুন্দরী বেগমসাহেবা আর নবাবনন্দিনীদের মাখন শরীর, চাঁপারাঙা ত্বক, নিটোল বাহুলতায়, বিদ্যুৎশিখা যৌবনে আর এক পরত চমকের আঁকিবুঁকিতে কিনা তুচ্ছ একটা পোকার দান। কেত্তন আশ্চর্য হয়ে যায়। বড় অদ্ভুত এই পৃথিবী। কিসে থেকে যে কি হয়। সোনালী সূতো কাটতে কাটতে বিভোর হয়ে যায় ভাবনায়।

কেত্তন এসব ভাবে বটে। দুগ্গার ভাবনা নেই। লালনপালনে যত্ন আছে, তীক্ষ্ণ নজর আছে বোলতা পিঁপড়ে কি অন্য পোকায় আক্রান্ত হল কিনা, ঠিকঠাক আকৃতি নিচ্ছে কিনা, বর্ণের বদল ঘটল কিনা! সূতো কাটতে ব্যস্ত দু'টি হাত আছে, সূতোর দাম ওঠাপড়ার খবর রাখা আছে, তুঁতপাতা সংগ্রহে তৎপরতা আছে, হিসেবও এক এক পর্বের মস্তিষ্কে ধরা আছে—কিন্তু ওসব ভাবনা নেই। বলে, চষছি পেটের জন্যে। তোমার মত অত রসিক নই। অত তত্ত্ব জানি না।

কেত্তন রসিক শুধু নয়, কেত্তনের ভেতরে আর একটা কেত্তনও আছে। গাঁয়ে কেষ্টযাত্রায় নাম ছিল। তারাপদদা মরে গিয়ে উঠে গেল দল। বুকের ভেতরের মানুষ বেরুতে পারল কই! আগলটা কেবলই ঠেলাঠেলি। দু'দাদাই কয়লাখাদে। ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। অন্ধ মাকে নিয়ে ঘরে থাকা। মায়ের যষ্ঠি, চলন, চোখ। মায়ের কেবলই, অ বাপ কেত্তন, অ বাপ কোথা গেলিরে—তারই ফাঁকফোঁকরে যেটুকু ঘোরাঘুরি। বার দরজায় উঁকিঝুঁকি। অন্দরে যাওয়া হল না। স্নান হল না গানের সমুদ্রে।

চিত্ত বাউরীর আলকাপ দল ছিল। তা ঝুমুর লেটো আলকাপ তো উধাও। তবে হ্যাঁ, এসেছে তারপর। পঞ্চরস। পরিশ্রুত আলকাপ। কেত্তনের এখন পঞ্চরস দলে ঘোরাঘুরি। সাজঘরে, শিল্পীর পিছনে, দলকর্তার কাছ বরাবর জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকা। আসরে বসে ও রসে হাবুডুবু খাওয়া। তবে ওই পর্যন্ত। মায়ের টান মস্ত। খাটতে খুটতে হয়। ভুবনকাকা বলে, মাকে দেখ হে। গানে মজলে চলবে! কাল সারারাত মা হাঁক পাড়ছিল। তুমি ত বসে গিয়েছিলে!

মা খেপল বিয়ের জন্যে। দুগ্গা এল সংসারে। পঞ্চরসের গন্ধ ওতেও। কিশোরী পঞ্চরস অপেরার শিল্পী রমানাথের ছোটবোন। সম্বন্ধটা ওরই পাতা। সাজঘরে গানে অনুরাগ দেখে আলাপ। দুগ্গার পঞ্চরসের নামে ভ্রু-তে মস্ত পাহাড় কিংবা ক্ষ্যাপা নদী। বলল, 'দাদা মা মরার সময় ঘরে ছিল না। গানে নিজে মরেছে। সংসার মেরেছে। আবার তুমি!'

বাধা। বাধা। অথচ পঞ্চরস! শুনলেই শিহরণ। বুকের রক্ত ছলাৎ করে। ওস্তাদ ঝাঁকসু। আলকাপশিল্পী। প্রণাম করতে হয়। দিনবদলে নতুন ধারা আনলেন। আসল নাম ধনঞ্জয় সরকার। জন্ম জঙ্গীপুর মহকুমার ধনপতনগর।

'জন্ম যদিও অভাজন চাঁই কুলে
মাতৃভাষা খোট্টাই বুলে
পেশা নগন্য সবজি চাষ
মা জাহ্নবী কূলে মোর বাস।'

ওস্তাদ ঝাঁকসুর নামে শুকনো খেজুরের গা চিরে রস গড়ায়। গান বাঁধা, সুর, সুরের জালে বেঁধে ফেললেন তাবৎ গ্রামীণজন। আলকাপে নতুন রঙ, নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন কথা। ছোকরার মায়াবী ভূমগুলে লুটোপুটি। সামাজিক, পৌরাণিক, বর্তমান পালা গানে, কথায়, হৃদয়আপ্লুত কাহিনীতে নিবেদিত। সুবল কানা, সুবেদ আলি, গোপাল দাস, ফিরোজ আলি, লাল মহম্মদ, মদন, প্রকাশ, রবি, মঙ্গল, তারাপদ ছাত্রশিষ্য। তারা ভিন্ন ভিন্ন দল গড়ল। ছড়িয়ে পড়ল। মুর্শিদাবাদ তোলপাড়। বীরভূম, মালদহ, বর্ধমানের গাঁগঞ্জের কালোকুলো চাষীবাসী রসিক মানুষ ভাসতে থাকল ঢেউয়ে।

'শুন গো ও মাধবী
তুমি কি আমার হবে
আমি যি রিক্সাওলা
তুমি জমিদারের মেয়ে।'

রাখালবালক, ঘোমটা ঢাকা ঘাটের পথে বৌ, কোদাল পাড়া জোয়ান, চঞ্চলা কিশোরীর গলায় গলায় ফিরতে থাকল। মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে খড়ো চালায়, জঙ্গলে যেন সুরলহরীর কলকলানি ছলছলানি। মেলায় মেলায় আসর মাত!

নবগ্রামে গতরাতের আসর দারুণ জমেছিল। ইলেকট্রিকের আলোতে ঝলমলে, মাইকের গর্জনে তুলকালাম, ভিড়ের ঠ্যালায় টইটম্বুর। আসর সুরুর আগে লাল মহম্মদের সঙ্গে দেখা। ওমনি গেয়ে উঠল—

'সেদিন কেন আমাকে কাঁদাইলে
পরদেশীর সঙ্গে যেমন ভালবাসা
সোনার সঙ্গে মেলে না পেতল কাঁসা
তমাল ডালে ময়ূরের বাসা
আশা দিয়ে পাখি ফাঁকি দিলে।'

তখন কেণ্ডনের ভেতরে আছাড়িপাছাড়ি। হৃৎপিণ্ড নিঙরে নিচ্ছিল শব্দের চাপ। অশ্রুরেখা আঁকার জন্য বুকের তুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। লাল মহম্মদ বলেছিল, 'এসেছ হে দুগ্গাঠাকরুণের গুটি। তবে হ্যাঁ, গুটিরও ঢেক কেরামতি হে। আহা পোকা অমন রূপ পেলে কি হবে ঠাকরুণদের অঙ্গে যখন ঝলমলায়, লাল নীল সবুজ হলুদ রেশমী শাড়ি। কেতাখ! কে কেতাখ হে!'

বড় জটিল প্রশ্ন। আগাপাস্তলা পাওয়া দুষ্কর বটে। কে কেতাখ। তা কে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে, অমন ঘর বানাও। নিজেও বন্দী হও। প্রকৃতির নিয়ম! কোন মোহিনী মায়া পলুপোকাকে করায় এমন কর্মটি! এসব তত্ত্ব কথা, ভারী রসের ভিয়েন দিয়ে আউলবাউল তো শুধু নয়, পঞ্চরসের শিল্পীরাও বলতে তুখোড়। এ কি মাটির ধর্ম! গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়ান চর্চিত জীবনের উৎসরণ। নাকি শিল্পীরক্তের স্বাভাবিকতা। কেত্তনের ক্লাস এইটের বিদ্যে আর শোনা ইস্তক দুনিয়া সম্পর্কে অমন কথা ফসফস বেরিয়ে আসে!

গানের আসরে ভাবনার মধ্যে টুক করে ইশারা বাজাল চম্পা! নর্তকী, অভিনেত্রী। স্বামী পরিত্যক্তা। বুড়ো বাপকে নিয়ে থাকে। বয়স ত্রিশের মত। ছিপছিপে গড়ন। মুখের ডৌলে শরীরের রেখায় ছটা আছে। কৃত্রিম অলঙ্কারে ঝলমলে। কপালে টিপ, কানে ঝুমকো, গলায় মস্ত হার, হাতভর্তি চুড়ি, সিঁথি থেকে টিকলি এসেছে, রূপোলী জরি বসান সিন্থেটিক টুকটুকে লালপাড়ি কোমর পাক দিয়ে আছে রূপোলী বিছে। পায়ে নূপুর। গালে লালের ছোপ এবং শিখরী স্তনে, দেহরেখার ঢলা যৌবন যেন চাবুক খেয়ে ঝাঁকিয়ে উঠেছে।

'যেতে বলেছি, গেলে না। কি গো তুমি, খবরও নিলে না!'

তা খবরের জন্যে আঁকুপাঁকু ছিল। সহসা ও-কথায় ছলকে উঠেছিল! তবু বলেছিল, 'আছ কেমন?'

'হায় আমার খবরের কথা বলি নাই গো।'

'তাহালে কার খবর!'

'ঢঙ করো না। কাজলরানী ভেন্ন কার খবর রাখ। তা দলে আমাদের নাই। কিন্তু খবর রাখি নাগর!' চোখের ঘূর্ণনে কৌতুক রহস্য ঝটিতি মুছে বলেছিল, 'ওর ভাতারের বাড়াবাড়ি। তোমার একবার যাওয়া কর্তব্য বটে।'

কর্তব্য! কেন! ভাবনা আসেনি, প্রশ্ন জাগেনি। উদ্বিগ্নতা তখনই শিখা হয়। আদতে সম্পর্কটা কি! কে হয় তার!

পঞ্চরসের এক নায়িকা। গোপীকত্তার দলে রয়েছে কাজলরানী। পঙ্গু স্বামীর বৌ। লরি চাপা পড়ে দু'পা গিয়েছে। কুলি ছিল লরির। কাজলরানী পঞ্চরসের দলে এসে সংসারের হাল রেখেছে। ছেলেপুলে নেই। পাঁচগ্রামে প্রথম আলাপ। পরপর দু'রাত আসর। ভরদুপুরে ওরা যখন বিশ্রামে তখনই গোপীকত্তার কথায় তার গলা গুনগুনিয়ে উঠেছিল। তা কি ওই কাজলরানীর জন্যে।

'দেখেই মরেছি সখি তোমারে
নিদ নাহি আনে আঁখি
সারারাত জেগে থাকি
চরণ ধ্বনি বুঝি দিয়ে যায় ফাঁকি।

কাজলরানীর চোখে তখনই বিদ্যুত। বলেছিল, 'তোমার গান কোথাও শুনেছি গো! এত চেনা গলা!' কথা নয়, হৃৎপিণ্ডে মোচড়। অক্ষিবাণে তখন টালমাটাল

পৃথিবী কেত্তনের। গতরাতের গান বিলোল কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গি, যুবতীর তখন দু'চোখের তারায় হাজারো হয়ে ফিরছে। সুন্দরী! সুন্দরী কাকে বলে। তা চোখের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। কেত্তনের চোখ তো দেখেছিল, তার স্বপ্নমুগ্ধকরা সৌন্দর্যকণা কুড়িয়ে যেন দীঘল যুবতীর নয়নবিদ্যুতে জন্মান্তরের গূঢ় কথা জানার ইঙ্গিত করে গেল। কাজলরানী পরে বলেছে, 'বিশ্বাস কর এ জন্মে না হোক অন্য কোন জন্মে তোমাকে দেখেছি গো। তোমার গান শুনেছি!'

এই দেখাকেই যেন পুনরায় তারা ঝাড়পোঁছ করেছে আরও কয়েকটা আসরে। পরস্পরের বৃত্তান্তও জেনেছে। পা নেই, মুরোদ নেই, চেঁচানি আছে, ক্ষুধা আছে ঘরের মানুষের। বড় জ্বালা। তবু স্বামী বলে কথা! ক্ষমতা যখন ছিল ওই মানুষই দুনিয়া তার পায়ের তলায় এনে দিতে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারত! নাচি গান করি লোকে বলে, বেবুশ্যে। মানুষটাও বলে।

পরস্পরের বৃত্তান্ত জেনেও একটা বৃত্ত। চাউনি, সংবাদ নেওয়া, টুকরো কথার ঝিলিকে দু'জনেই স্নাত হয়ে টের পায় স্বাদ! এটা কেমন সম্পর্ক! প্রেম! কামনা। দেহক্ষুধা! কেত্তন জানে না। কাজলরানী বলে না। চম্পা, গোপিনী, শাকিলা, আলতারা বলে, পীরিত। কিন্তু এ কোন পীরিত।

গতরাতে কাজলরানীর ভাবনা আসর ভুলিয়ে দিয়েছিল। রাতে ঘুম। সকালে ভাববে কি! ঘুম ভাঙতেই তো কুয়াশার মেঘে সব কিছু অন্ধকার। দুগ্গা রাগে জ্বলছে, কথা বলছে না।

রোদ ক্রমশঃ ঘনত্ব এবং উত্তাপ কুক্ষিগত করে। জ্বলন্ত দেবতা আকৃতি বদলায়। চোখ রাখতে দেয় না কিরণমালায়। কাকটা উড়ে যায়। বাইরে রাস্তায় সাইকেল ছুটে যায়। তারপরই 'পাউরুটি' 'বিস্কুট' হাঁক দেয় মাথায় ঝুড়ি ফেরিওয়ালা ছোঁড়াটা। কেত্তনের ক্ষুধা তখনই উঠে আসে। বলে, 'দুগ্গা খিদে লেগেছে।' মেয়েমানুষকে বিচলিত করার এটা একটা পথ বটে। তার গলার স্বরে যথেষ্ট কাতরতা। ক্ষুধা সে সইতে পারে না। খাওয়ানতে দুগ্গার ভারী অনুরাগ।

ডালা ছেড়ে দুগ্গা ঘরে ঢোকে। একবারও তার মুখ দেখে না। কেত্তন তখনই তিড়িংলাফে একেবারে ঘরে। চমকিত দুগ্গাকে সে সুযোগ দেয় না। বুকের মধ্যে টেনে আনে। উড়ন্ত কবুতরী হঠাৎই জালে পড়ার পর যেমন অসহায় ডানা ঝাপটায় শরীরে মোচড় দেয়, দুগ্গা অস্ফুট এক ধ্বনি সহযোগে অবিকল তাই। কিন্তু জালে জড়ানর মত সে কেত্তনের বন্ধনে আরও জড়িয়ে পড়ে। শরীর পুরুষ পাগলামির শিকার হয়ে যায়। থরথর করে কাঁপে। দেহ দাবানলে কালবৈশাখীর মেঘের ডাক ফেরে। ঢলা খোঁপা ছড়িয়ে যায়। আঁচল লোটে। আশ্রয়ী লতা হয়ে যায়।

'সকালবেলাতে কি হচ্ছে! ছেলেট চলে আসবে। ছাড়। আমি তোমার কে বটি।' শব্দগুলো যেন কষ্টের ঘন শ্বাস মাখে।

'তুই আমার হৃদয়, আমার মন।'

'ছাই। ছাই।'

'তোর মুখে মেঘ দেখলে বুক টনটন করে। দেখ-দেখ।'

কেত্তন কপালে গালে ঠোঁটে ঠোঁট বুলায়। চোখের উপর ঠোঁট রেখে টের পায় অশ্রুর নোনতা স্বাদ।

'তুই কাঁদছিস।'

মুহূর্তে দুগ্গার শরীর যেন ঝুলে পড়ে। আঁকড়ে ধরে পুরুষকে সে দু'হাতে। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কেত্তনের তখন মনে হয় চোখের জলে তৈরী হচ্ছে সূক্ষ্ম জাল। ঘেরা পড়ছে সে। বেরুনর পথ নেই। মস্ত পৃথিবী নেই। শুধুমাত্র একটি রমণীর মুখ, দু'টি আয়ত চোখ, টিকালো নাক, চিবুক।

দুগ্গা মুড়ি আর ছোলা ভিজে খেতে দেয়। বলে, 'আমি চান করে আসি।'

কেত্তনের খড়ো চাল ঘর। নিচু আর একটা চালা। সামনে দাওয়া। চিলতে উঠোনের একধারে বেড়া দেওয়া সব্জিবাগান। ঘর উঠোন তকতকে। গোবর নিকোন, ঝাড়পোঁচে রূপবান। ঘরের বউ ওতেই নিবিষ্ট। হাঁড়ি, কলসি থালা, বাসন, রান্না করে খেতে দেওয়া, ব্যাপৃতা যুবতীর মধ্যে দুঃখের ছিটেফোঁটা নেই। কেবলই হর্ষ। কেত্তনকে তার ভাগ দেবার জন্য পরম আগ্রহী। পড়শীরা বলে, ভাগ্যগুণে বৌ পেয়েছিস। দুগ্গা বলে, ওমা বৌ বটি, ঘর সংসার করতে জন্ম। এসব করব না তো কি নেচেকুঁদে বেড়াব! রাগ রোষ সহজে ভোলে। ঘরে যেন ছড়িয়ে রেখেছে অদৃশ্য সূক্ষ্ম জাল। আটকে যেতে হয়। দুগ্গা বলে, তুমি ছাড়া আবার ঘর কী!

চার দেওয়ালের উষ্ণ আবেষ্টনীর টান কেত্তনের মধ্যে। জীবনে সংসার সুখের যে মস্ত উপাদান এ অনুভূতিরও প্রচন্ড ক্রীড়াশীলতা! বৌদিরা বলে, দুগ্গা নয় গো—কালী। তোমার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুগ্গা শুনে বলেছে, অমন ভোলা ক্যাবলা শিবঠাকুর হলে কালী না সেজে উপায় কি!

ছেলে খোকনা পড়ে এল। দাওয়ার উপর বই ছড়িয়ে ফেলে বলল, 'ও বাবা আমার গাড়ি!'

কেত্তন সস্নেহ চোখে তাকায়। মাথায় কোঁকড়া চুল, শ্যামলা গড়ন। দুগ্গার মত মিষ্টি মুখ। বলল, 'দেব। দেব। পড়া করেছিস? স্কুল আছে ত।'

ভেজা কাপড়ে দুগ্গাও দাঁড়ায়। বলে, 'বাবাকে জ্বালাস না।'

খোলা চুলের সিক্তবসনা রমণী। যেন অন্য এক বিচ্ছুরণ। শরীরের রেখায় স্পষ্ট। স্নাত মুখমন্ডল, বুক, গলা, পেট, কোমর, হাতের কাজ থামিয়ে দেয়। দুগ্গার রহস্য অপরিমিত। এক একটা দরজা খোলে আর চমক দেয়!

তবু কাজলরাণী বুকের কোথায় যেন থাকে। যেন ভিন্ন এক পৃথিবী। তখন ভিন্ন কেত্তন। বুকের ভেতর থেকে চুপিসাড়ে যে বেরিয়ে আসে। দুগ্গা নেই,

খোকা নেই, ঘর নেই, দুয়ার নেই। মাথার উপর মস্ত আকাশ, ধূ ধূ প্রান্তর, অরণ্যের শ্যামলিমা, নদীর বহতা, পাহাড়, দিগন্তহীন জগৎ। সুরলহরী বায়ুতরঙ্গে খেলে বেড়ায়। কাজলরাণী বলে, তুমি গানে আস না কেন গো, মস্ত নাম হত। অমন গলা। গোপীকত্তা বলে, তুমি বাঁধা পড়ে আছ! কিসের বাঁধা গো। তখন শক্ত দড়ির চাপ সর্বাঙ্গে। তখন খাঁচার বন্দী বিহঙ্গ। উড়তে গিয়ে ডানায় আঘাত। ঠোঁট শিকলি কাটতে ব্যথায় ব্যথায় ভরে যায়।

এই যন্ত্রণাই কাজলরানীর ঘর বরাবর টেনে আনে কেত্তনকে সেদিনই দুপুর গড়াতেই। কর্তব্য বটে বৈ কি! গুড়ায় বাসে চাপে। নেমে খানিকটা হাঁটা। খুঁজতে হয় না। কাজলরাণী একগাল হেসে বলে, ওমা তুমি।

খড়ো চাল ঘর। উঠোনে আমড়াগাছ। কাঠা দুয়েক জায়গা। পশ্চিমমুখো ঘরে বিকেলের লাল রোদ শুয়ে আছে। দহন ক্লান্ত পৃথিবী, গাছাগাছালি নিঃসাড়। রোদের লালিমায় এখনও তাপের খামতি নেই। একটা ছাগল খুঁটিতে বাঁধা। উঠোনের ওদিকে ক্ষুদে ঘর আরও কয়েকটি। বাঁশের ঝাড়, নিম আর বাবলারা ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চরসের নর্তকী এখন রূপহীনা, খোলস ছাড়া। চোখ টাটায় না। ওই দেহরেখাটির মধ্যেই না রূপ। ওই চোখ, ভ্রু, মাথার চুল, ঠোঁট, চিবুক ঘিরেই না মুগ্ধতা। বুক টান টান। ধুলো মাখুক আর রঙ মাখুক। ভেতরের বস্তুটি তো রয়েই যায়। এখন রুখু চুল, আধময়লা নীলচে ছাপা শাড়ি—এ সব নয়—দু'টি চোখে ডুবে যায় কেত্তন। ওদিকে ঘরের ভেতরে শুয়ে আছে কাজলরানীর পুরুষ। মুখ অন্যদিকে। হাড়ের কঙ্কাল। মরা কি বাঁচা বোঝা কঠিন। ঘরে একজন এসেছে তা ঘুরে দেখারও সামর্থ নেই।

চিলতে দাওয়ার চট বিছিয়ে দেয় কাজলা, 'তা এপাশে!'

মিথ্যে বলতে হয়, 'কাজে এসেছি। ভাবলাম ঘুরে যাই। ঘরের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা কেমন আছে কত্তা?'

ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ বাজে, 'ভাল নাই।'

'ওষুধ। ডাকতার।'

'টাকা কোথা। হাসপাতাল থেকে এনেছি! গানে যেতে পারি না। গোপীকত্তা একশ টাকা দিয়েছিল। ক'দিন! থাক্ দুখের পাঁচালি। তোমার কথা বল!'

কেত্তনের ধুতির উপর পাঞ্জাবি। কামানো গোঁফ। পরিপাটি চুল।

'কি খেতে দি বল তো তোমাকে!'

'কিছু লাগবে না। তা তুমি বড় বিভ্রাটে পড়েছ! কি যে করি আমি!'

মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক ওঠে, 'ওমা তুমি কি করবে!'

'আহা তোমার কত্তার অসুখ। আমি দেখব না! ভাল তো করতে হবে। শুন কাল আমি আসছি। বসব না।'

আকাশে নক্ষত্র জেগেছে। অন্ধকার পরতে পরতে নেমে আসছে মাটির পৃথিবীতে। মোটরে জল তোলার শব্দ হচ্ছিল ওদিকে। এখন গাছগাছালি সাড়া

দিচ্ছে। বড় নরম আদুরে মেয়েলী হাতের স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে। মোরাম বিছানো পথ ধরে হাঁটে কেত্তন। চাটুজ্জেদের বাড়ি পেরিয়ে পুকুর, তারপর আমবাগান।

কেত্তন ভাবে, টাকা কি দুগ্গার কাছে চাইবে! কিন্তু দুগ্গা গন্ধ পাবে না। গন্ধ তো শুধু শরীর থেকে ওঠে না! মনের গন্ধও ভুরভুরায়। ভ্রমর যেমন গুনগুনায় মনে। বড় ঝামেলা! এখন কেত্তনের নিজেকে ভারী অসহায় মনে হয়। সংসার, উপার্জনের অঙ্ক, খরচাপতি, জমান টাকা সবই দুগ্গার হাতে। বড় স্বস্তির ব্যাপ'র, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন—।

তবে রাত্রিবেলায় দুগ্গা যখন বুকের মধ্যে প্রগাঢ় কামনায় পুড়ছে, কেত্তনের সকল চাওয়ার কাছে নিবেদিত দেহমন, তখন বিপাকে পড়েছে বন্ধু কিছু টাকা ধার দিলে হত বলতেই অনায়াসে বলল, 'নেবে এখন। তা ধার দিও বন্ধু বটে বলছ। শোধ দেবে তো!' কেত্তনও ব্যস্ত গলায় বলল, 'দেবে বৈকি।'

পরদিন কাজলরানী হাত বড়িয়ে টাকা নেয়। বলে, 'কেন দিছ গো!'

'মানুষটা ভাল হোক!'

'তাতে লাভ!' শুকনো ঠোঁটে যেন অনীহার অবসন্নতা!

'তোমার সুখ হবে।'

'আমার সুখ।' একবার নাড়া খায় মেয়ে। তারপর আবার নিঃস্পন্দ।

গোপীকত্তা একদিন কাজলরানীর ঘরে এসে তাকে দেখে অবাক। বলল, 'এ কি হে! তুমি এখানে।' গোপীকত্তার ঘাড় বরাবর চুল। গোঁফহীন নরম নরম মুখ। ঢলঢলে ভাব। ফরসা রঙ! যেন হাতে পেয়েছে সুরেলা পাখি এমন আহ্লাদ লাগে তাতে।

কেত্তন বলে, 'চলে এলাম। তা ভাল আছেন।

'হুঁ তাহলে এসো আমার দলে। ও কাজলা! তুমি থাকতে ভাইটি আমার দলে আসবে না। তা ভাদ্র থেকেই তো আবার ডাক পড়বে। আসর পিছু ত্রিশ টাকা করে দেব। তোমার গুণ আছে হে। তা আগামও দিতে পারি।'

'আমিও সে কথা বলি। এমন গলা।'

'ঘরের বাঁধ ভেঙ্গে ফেল ভাইটি। নতুন পালা করছি যুগধর্ম মেনে। বেকার স্বামীর চাকরে বৌ। নাম যুৎসই পেয়ে যাব পালার। রেহার্সেলের তারিখ করে খবর পাঠাব। তোমাকেই নায়ক করব হে। ভেবে দেখ। ও কাজলা, রাজী করাও। তা কত্তা কেমন।'

'একই রকম। চিকিচ্ছে করছি। ভাল নাই।'

গোপীকত্তা চলে যায়। উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে কাজলরানী। ওর মধ্যেও কি ওই কথা। চল এস হে। গানে গানে রাত মাতাই। তা আর এক কেত্তন তো তার জন্যই ছুটে আসছে। অগ্নিমুখী পতঙ্গের মত, সমুদ্রমুখী নদীর মত— পুড়তে, ডুবতে।

কাজলরানীর কত্তা একদিন মরে বসে। কান্নায় কেত্তনও যোগ দেয়। মেয়েমানুষ

তখনই জানায় তার ঘরের স্বপ্নের কথা। পঙ্গু মানুষটার অস্তিত্বের বিশালতার কথা! পুরুষ ছিল, হোক পঙ্গু। তবু তো রক্ষাকবচ। যুবতী মেয়ের বড় যন্ত্রণা। ঘোষদের মেজকত্তা তো মুখ বাড়িয়ে আছে। রাখনি রাখবে। রক্ষিতা। টাকা। গয়না। তারপর ঝরঝর করে কাঁদে, 'তুমি রয়েছ। আমার ভয় কিসের। বল, ভয় কিসের গো!'

গোপীকত্তা এ সময়ই রিহার্সেলের খবর দেয়। কাজলরানী বলে, 'তাহলে দু'জনে আমরা এক সাথে যাব।'

'কোথা!'

'ওমা গানে। গোপীকত্তার ঠাঁই। ও কি হল তোমার। মুখ চোখ অমন করছ। বাঁধনে টান পড়ল নাকি গো!' ছলকে ওঠে কাজলরানীর ঠোঁটে হাসি।

কেত্তনের কি যে হয়! বোকা বোকা চাউনি ফেলে রাখে।

'তুমি গানে আসর মাত করবে বল আমি পাশে থাকলে। হায় কপাল!' এলোচুলের মাথা নাড়া দেয় কাজলরানী।

কেত্তন ভিন্ন গলায় বলে, 'যাব। নিশ্চয়ই যাব।'

'সে তোমার গলা দেখেই বুঝছি। হায় গো, কপাল। তোমার বৌকে হিংসে হয় গো। মিছে নয়। আমি সব বুঝি। তুমি ছিটকে ছিটকে আসবে। একদম বেরুতে পারবে না। তোমার মধ্যে আর একটা মানুষ আছে!'

'কাজল আমি আসব। ঠিক আসব!'

আসার তারিখের আগেই গোপীকত্তা হন্তদন্ত হয়ে আসে। পুকুরপাড়ে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অস্তসূর্যের আলোয় স্বচ্ছ আঁচল জড়াতে এগিয়ে আসছে সন্ধ্যা। সামনে তেঁতুলগাছের ডালপালায় পঙ্গপালের মতো টিয়ার ঝাঁক নেমে শব্দ করছে।

গোপীকত্তা আসে। খবর দেয় কাজলরানীর। বলে, 'এই যে ভাইটি, তোমার কাছে এলাম। কি কান্ড। তোমার কাজলরানী ওই গাঁয়ের ঘোষকত্তার বাঁধা হয়ে থাকবে। গান বাজনা করবে না। তা তুমি থাকতে এমনটি হবে। যাও, বুঝিয়ে বল। দলে এসে কাজলরানীকে নিয়ে থাক। তুমি গেলে মান ভাঙবে।'

কেত্তন পাথর হয়ে বলে, 'কালই যাব।'

সন্ধ্যা জ্যোৎস্নাময় হয়ে ফোটে। আকাশে অসংখ্য রূপোর টিপ। পূবের আকাশে রূপোর থালা! থালা উপচে আসে গলা রূপো। দিনের গুমোট ফুরিয়ে বাতাস নাড়া দেয় গাছগাছালি। কেত্তনের বুক উড়ু উড়ু করে। কাল সকালেই সে ছুটবে। রক্তমাংসের দেহ জুড়ে যেন পাগল হাওয়ার ছোটাছুটি।

কেত্তন যায়। কথা হয়। গানে মজবে। বাঁচবে না কাজলরানীকে ছেড়ে।

কাজলরানী হাসে। বলে, 'ঘর ছাড়তে পারবে।'

'খুব পারব। কিন্তু তুমি গান ছেড়ে কি সব্বনাশ করছিলে বল তো।'

'গোপীকত্তা আমাদের থাকার ঠাঁই দেবে। ঘর দেবে।'

'সেখানে দুজনে থাকব।'

গোপীকত্তা বলেছে, 'পরশু বেরুতে হবে।'

'পরশু ভোররাতে তোমার ঘরে আসব। তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো।'

কাজলরানী বলল, 'আমি তোমার জন্যে বসে থাকব গো।'

কেত্তন ঘরে ফেরে।

সেদিন রাতের বিছানায় রাতচরা পাখির মত নৈঃশব্দকে দু'ফালি করে পাশে শয়ান দুগ্গা একসময় বলে ওঠে, 'তুমি গানের দলে যাবে। কাজলরাণী—তুমি!'

আর এক কেত্তনের পৃথিবীতে বুঝি আচমকা প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টিপাত নেমে আসে। লুপ্ত চরাচর। বাসুকীর ফণার উপর দোলায়িত ভূমন্ডল। ভীষণ শব্দ ভাঙচুরের, প্লাবনের। গাঢ় অমায় আকাশ মাটি ঢাকা পড়ে। দুগ্গা যেন এক দুরন্ত বিস্ময়।

দুগ্গা ছলকে হাসে, 'ঠিক বলি নাই! দাদা আগেই খবর দিয়েছিল!' নরম দু'টি বাহুলতা নয়, যেন শীতল সাপের স্পর্শ! বিচলিত কেত্তনকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'থাক। কিছু আর বলতে হবে না! আমি জানি। কিন্তু তোমার ঘর, ছেলে আমি! তুমি আমাকে ভালবাস। ছেড়ে যেতে মন চায় তোমার। তুমি কি গো!'

তাপ এসে লাগে। গুটির আবেষ্টনীতে বেরিয়ে আসতে ব্যগ্র পোকা পাক বন্ধ করে। থমকে সে টের পেতে চায়। তাপ ক্রমশঃ বাড়ছে। দুগ্গার শরীর থেকে উঠে আসছে গন্ধ। খোকা ছুটছে। সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করছে দুগ্গার। শরীর ভেঙে হাসছে! নরম পেলবতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকছে। শব্দের বাজনা বাজছে রক্তে। বড় মধুর শিহরণ। সে রমণীর নরম স্তনের মধ্যে শিশুর মত মুখ গুঁজে দেয়। তাপের চাপ বাড়ে।

'তবে আমি জানি তুমি যেতে পারবে না। দাদাকে বলেছি। মানুষটাকে আমি চিনি দাদা। গানের নেশা আছে বটে। তবে বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরবে না। আমার ঘরে ওর মায়া আছে। তা টানাপোড়েনে ভোগে। দাদা বললে, আহা, টানাপোড়েনেই তো জীবনের বুনুনি। এই, তুমি বল তুমি যাবে না, বল।'

কেত্তন তাপের গাঢ়তায় নিঝুম হয়ে যায়। গুটির মধ্যে পোকা ঝিম মেরে থাকে। তাপ বাড়ে।

'এই আমাকে তোমার মায়া হয় না। আমাদের সংসারে তোমার মায়া নাই!'

কাজলরাণী অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুল খোলা, বুকের উপর রঙিন শাড়ির আঁচল। অধরে হাসি। কেত্তন ছুটতে পারছে না। বাজনা বাজছে। হারমনিয়াম, ফুলট, ডুগিতবলা, ঝুনঝুনি, খঞ্জনি। আলোকিত আসর। হাজারো শ্রোতা, গানের ঝর্ণাধারায় আকাশবাতাস মথিত করা সুর।

দুগ্গার অঙ্গে রঙিন ফুলবাহার রেশমী শাড়ি। কেত্তন দেখে, মাঝ উঠোনে দাঁড়িয়ে দুগ্গা হাসছে। আঁচল উড়ছে শাড়ির।

প্রেস বিল ও সুদেব

বিহার প্রেস বিলের বিরুদ্ধে সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রকর্মী ধর্মঘট সুদেবকে এক চমৎকার সকাল উপহার দেয়। সে ঘুম ভাঙার পর ভারি আরাম বোধ করে। সাইকেল নিয়ে হাওড়া স্টেশন যেতে হবে না কাগজ আনতে। বিছানায় চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে। তার মনে হয় না এই ছুটি একদিনের উপার্জনের একটা অংশ থাবা বসিয়ে সরিয়ে নিল। প্রাপ্য কমিশন ছাঁটাই হয়ে গেল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক অর্থময়তা তার বোধে বড়ই অস্বচ্ছ। তবু সে টের পায় শব্দটির মধ্যে ভয়ঙ্করতা আছে।

মাঝরাতে তুমুল বৃষ্টি হয়ে যায়। ভোরের বাতাসে শীতের একটা পাতলা আচ্ছাদন রয়েছে। বাইরে হয়ত মেঘ ওড়াওড়ি করছে। বিলম্বিত দুর্বল বর্ষা এবারের। খরায় জ্বলছে গাঁ বাংলা। শহরেও গ্রীষ্মদিন আষাঢ়ে চেপে বসেছিল।

নন্দা খুটখাট আওয়াজ তুলে ঘর পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। ঘরগেরস্থলির ধারাবাহিকতায় ছুটি বলে কোন বস্তু ওর নেই। দুঃখ হয় সুদেবের। কিন্তু দুঃখ থাক আর একটু ঘুমিয়ে নেবে সে। চোখ বন্ধ করে তার চেষ্টা চালায়। আরামটা তারিয়ে তারিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিছানা বড়ই বিরূপ। তাকে দীর্ঘসময় আস্বাদন করতে দিতে চায় না। একটা অস্বস্তির ক্রীড়া সে টের পায়।

চোখ খুলে সে দেখে একটা আধফরসা ভাব ঘরের মধ্যে প্রদোষের মত ছড়িয়ে আছে। মেয়েরা ঘুমোচ্ছে। বারান্দার লাগোয়া বস্তিঘরে শোরগোল উঠছে। সকালের এ ঘরের ছবিটা তার অপরিচিত। অনভ্যাসও বটে। ভোরেই সে কাগজ আনতে বেরিয়ে যায়। ফলে কলের সামনে লাইন, ধোঁয়ার ঘেরাটোপ, শিশুর কান্না, পড়ুয়াদের তারস্বর, মুখধোয়া কুলকুচির ফুৎকার, মেয়েলি বচসা তার কানে বড়ই বাজে। তারমধ্যে হঠাৎই তার মনে হয় খবরের কাগজ বন্ধ এবং ধর্মঘট সংক্রান্ত কথাবার্তায় নন্দা জিজ্ঞাসা করেছিল, কাগজের স্বাধীনতা ব্যাপারটা কী! সুদেবের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যাতে ব্যাপারটা খুবই কুয়াশাচ্ছন্ন। কোন আলোকসম্পাত নেই, কখনই সে বুঝবে না। স্বাধীনতা মানে ফিফটিন আগস্ট, বলে নিজের কাছেই কেমন জটিল করে ফেলে। পরমুহূর্তে রোগা ক্ষুধার্ত বাঘ এবং হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের কথামালার সেই গল্পটা মনে পড়ে যায়। কুকুরের গলায় শেকলের দাগ দেখে সে অরণ্যে ফিরে যায়। স্বাধীনতা বিসর্জন করেনি। তো স্বাধীনতা এমনই ব্যাপার। অনিল বিয়ে পাস। সকালে খবরের কাগজ বিক্রি করে। বলেছে, স্বাধীনতা হরণ মানে যা খুশি ছাপতে না পারা। কিন্তু কথাটা সুদেবের কাছে বড়ই জটিল। নন্দাকে ওই অনিলের শব্দগুলো

দিলেও মেয়েমানুষ ফের প্রশ্ন রেখেছিল, যা খুশি মানে! আমি বলছি স্বাধীনতাটা কী! সুদেব বিরক্ত হয় এতে। স্বরে তারই ঝাঁজ ফুটিয়ে বলেছে, তুমি বুঝবে না।

নন্দা স্বামীর রাগ বিরক্তিতে শামুক হয়ে যেতে অভ্যস্ত। শীর্ণা মেয়েমানুষের চুল ওঠা ছোট মাথা, ভীরু চোখ জোড়ায় বিয়ের সাতবছরেও যেন অপরিচিতের একটা ভয় আছে। রাগ, চেঁচামেচির একটা বাঁধা পরিধি আছে তার। সন্তান উৎপাদন, তার পুরুষকে খুশি করা, রেশনের চাল বাছা, পাশের ফ্ল্যাট বাড়িটায় টি ভি তে হিন্দি বাংলা ফিল্ম দেখতে যাওয়া, ছেঁড়া শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে খেয়ে না খেয়ে বস্তির জীবনেও এক অদ্ভুত স্বাভাবিকতা নিয়ে বেঁচে আছে। স্বাধীনতা বিষয়ক আর কোন প্রশ্নই তোলে নি। দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালবেলাকার বিছানায় সুদেবের মনে প্রশ্নটা ঘাড় লম্বা করে। তার অদ্ভুত একটা ইচ্ছা জাগে। ভোরে ওঠা, হাওড়া স্টেশনে কাগজ তোলা, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে ফেরার পথে বাজার তারপর নাকে মুখে গুঁজে পৌনে দশটায় মণ্ডল বস্ত্রালয়ে সেলসম্যানের চাকরিতে যাওয়া, সন্ধ্যে সাতটার পর বাড়ি ফেরা, জীবনের অদ্ভুত ইচ্ছে জাগার মুহূর্ত আসে না। সংসারের হা মুখে প্রতিনিয়ত তাকে ছুঁড়ে মারতে হয় কিছু না কিছু বস্তু। যেগুলি আহরণের জন্যে উপার্জনের অঙ্কটা বাড়ান ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষাই অবশিষ্ট থাকে না। নন্দার মধ্যে একধরণের আত্মতৃপ্ত ভঙ্গি আছে। সর্বদাই সে চাহিদার ব্যাপারটা এমন করে বলে যাতে না হলেও ইতরবিশেষ হবে না। কিন্তু সুদেব চাহিদার কথা শোনা মাত্র উত্তেজিত এবং দ্রুত তা সংগ্রহের ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনটি কন্যার মধ্যে মেজটি স্থায়ী রোগে আক্রান্ত। ওষুধ কিছুটা খাড়া করতে না করতে শুইয়ে দেয়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে উৎখাত ভিন্ন অন্য বাসনার সম্পর্ক নেই। তারপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কুঠারাঘাত সর্বাঙ্গে পড়ছে।

রাতের বিছানায় ক্লান্ত দেহে তার ঘুম নামে। তারমধ্যে স্বপ্ন আছে। নরেশকাকা তার জন্য একটা পিয়নের চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। আবেদন পত্রও জমা দেওয়া হয়েছে। সে আশা রাখে একদিন বস্তিবাড়ির কড়া নাড়া দিয়ে একটা খাম এসে পড়বে। সুদেব এছাড়া বাজারের সামনে একটা পত্রিকা স্টল করার কথাও ভাবে। গোপীনাথ লোহার কারবারে বিস্ময়জনক উন্নতি করেছে ক-বছরে। সে কখনও কখনও এই কারখানার শহর হাওড়ার শীর্ণ গলিতে জং-ধরা টিনের শেডে ছোট কারখানারও স্বপ্ন দেখে থাকে। কিন্তু কিছুই হয় না। অদ্ভুত ইচ্ছে জাগার প্রবৃত্তির উৎসমুখে পাথর চাপা পড়ে।

আজ সুদেবের অদ্ভুত ইচ্ছেটা বাজারে গিয়ে একবার ভেজা ডানা ঝেড়ে নেয়। ইচ্ছেটা কোন স্বপ্ন নয়। স্বাধীনতা মানে যা খুসী করতে পারা। স্বাধীনতা মানে অপরের বন্ধন থেকে মুক্তি। স্বাধীনতা মানে অধিকারের একটা নীল আকাশ। কোন পরিকল্পনা সচেতনভাবে তাকে কাঙ্ক্ষিত কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যাবার

জন্যে তৈরি হয় নি। সে যেন এক জলপ্রপাতে দুর্ধর্ষ তোড়ের মধ্যে পড়ে।

বাজারে ভিড়, কেনাবেচার মিশ্রিত সোরগোল, রাস্তার উপর পণ্য নিয়ে বসায় বাস, রিক্‌শ, টেম্পোভ্যানের যাতায়াতের অসুবিধার জন্যে বিরক্তির ঝাঁঝালো হর্নের বকুনি বয়ে যাচ্ছে। মাছের বাজারে আগে যাবে সুদেব। কুমড়োর ফালি কিনতে ব্যস্ত লাহিড়ী স্যারকে তার চোখে পড়ে যায়। মাস্টারমশায় ভদ্রলোক। ইংরেজী কাগজ নেন। আদ্দির পাঞ্জাবি ধুতি শ্যামোজ্জ্বল চেহারায় বড়পানা টাকের নিচেই চওড়া কালো ফ্রেমের চশমা। সুদেবকে চোখে পড়তেই এক চিলতে হাসি আসে। বলেন, 'আজ ত স্ট্রাইকের জন্য কাগজ বের হয় নি।' ঘাড় নেড়ে সায় দেয় সুদেব। তারপরই প্রশ্ন রাখে, 'মাস্টারমশায় স্বাধীনতাহরণ বলতে কি বোঝায়?' লাহিড়ী স্যার কুমড়োর ফালি কেনার পর এমন একটা প্রশ্নের আঘাতে স্পষ্টতই বিব্রত বোধ করেন। তাঁর মুখাবয়বে শিক্ষকসুলভ প্রসন্নতার সঙ্গে ভারিক্কিভাব ফুটে ওঠে। বলেন, 'স্বাধীনতা হরণের অর্থ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। বন্ধনের মধ্যে ফেলা। তুমি তোমার ইচ্ছেমত কিছু করতে পার না। তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে অন্য কেউ।' তারপরই বলেন, 'বুঝলে না, খবরের কাগজে রিপোর্টাররা সত্য ঘটনাও ছাপতে পারবে না। এ যদি হয় তাহলে সেটা ত খুবই অন্যায়! প্রেস বিল ঐ সংক্রান্ত।'

সুদেব বোঝে। ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। সত্য উচ্চারণ করতে না দেওয়া। কণ্ঠরোধ করা। ইচ্ছেমত কিছু করতে না পারা! ভাবনার সঙ্গে অদ্ভুত ইচ্ছেটা তার ডানা নাড়ে। ভেজা ডানায় এখন বারিবিন্দুগুলি বাষ্প হয়ে যায়। হালকা স্বচ্ছন্দ মনে হয় নিজেকে।

সুদেব প্রথমে মাছওয়ালার কাছে তার ইচ্ছেটা প্রয়োগ করে। দু-শ গ্রামের একটা চারাপোনা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে সন্দেহ হয়। মাছের বাজারে ওজনে কম দেওয়া নিয়ে তার দীর্ঘকালের একটা ধারণা আছে। কতবারই এ নিয়ে বলতে ইচ্ছে করেছে। মাছের সামনে ঠেলাঠেলি, ওজন হচ্ছে, ব্যাগে পড়ছে, দাম কষা হচ্ছে, গলা বাড়িয়ে দাম জেনে সরে পড়ছে কেউ কেউ। মাছ হাতে ধরে সুদেব মাছওয়ালাকে দেখে। ঘেমো কালো মুখ। নীল লুঙ্গির উপর হাফসার্টের বুক খোলা। মেদবহুল দেহ। সুদেব বলে, 'ওজন আপনার ঠিক আছে ত!' মাছওয়ালার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। লালচে চোখজোড়াতে স্পষ্ট রাগ। সুদেবের হাত থেকে মাছটা ছিনিয়ে নেয়। বলে, 'যান মশাই যান। ওসব কারবার আমি করি না।' অন্য খরিদ্দারকে বলে, 'কত বললেন দাদা! দুশো তো—এই নিন।' সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বর। কৃতার্থ খরিদ্দারের ব্যাগে ঢুকে যায় মাছ। ক্রেতাটি দাম দিয়ে সরে যায়। সুদেব বলে, 'বলতে পারব না তা বলে?' মাছওয়ালা ভিখারি তাড়ানর মত হাত নাড়া দেয়, 'অন্য জায়গায় দেখুন।' ক্রেতারা ঠেলাঠেলি করছে। বড়ই আকাল। উবে যাবে হয়ত মাছ। এমন ব্যস্ত সকলে। বাটখারা, ওজন-দাড়ি পরীক্ষা করলে ধরা পড়বে। কিন্তু সে একা। নিজেকে বড়ই অবাঞ্ছিত মনে

হয়। ঠেলাঠেলিতে তাকে সরে আসতে হয়। একটা সত্যকে প্রকাশ করাও দেখা যাচ্ছে অপরাধ। সুদেবের মাছওয়ালাকে স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতা হরণকারী মনে হয়।

বাজার থেকে ফিরে সুদেব মণ্ডল বস্ত্রালয়ে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার মনে হয় দুশো টাকার বিনিময়ে গাধার মত তাকে খাটায় লোকটা। সে যেন শেকলে বাঁধা জানোয়ারের মত যেতে বাধ্য হয়। এ বোধই তাকে অদৃশ্য শেকলটা অস্বীকারে উদ্দীপ্ত করে।

আচমকা কামাইয়ের নামে নন্দা অবাক হয়। পরশুই বন্ধের দিন। সুদেব ওর বিস্ময় দেখেই বলে, 'কী কামাই করতে পারি না।' নন্দা বলে, 'খুব, পার। কিন্তু ভাবছি হঠাৎ কী হল?' সুদেব ঘাড় নাচায়, 'এমনি। এমনি। আমার ইচ্ছে।'

দুটো বাড়ির পরেই বাড়িওয়ালা অনন্তবাবুর বাড়ি। ছেলে দুর্গাপুরে চাকরি করে। ঘরে স্ত্রী, দুটি অবিবাহিতা মেয়ে। নিজেও জি পি ও-তে চাকরি করেন। আট আর ছয় করে চোদ্দ ঘরের দুটি বস্তি তাঁর বাবার কেনা। হাওড়ার আমতার কাছে জমি জায়গা আছে। দোতলা বাড়িটিও তাঁর পুরান আমলের। বাইরের ঘরে বসেছিলেন। সুদেব ঢুকতেই বললেন, 'কী ব্যাপার আজ কাগজ নিয়ে বের হওনি?' সুদেব বলে, 'কাগজ আজ বন্ধ।' অনন্তবাবুর টাক মাথা, রোগা শুকিয়ে যাওয়া শরীরে গেঞ্জিটা ঝুলে আছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত। কপালের পাশে কাটা দাগ। বলেন, 'আচ্ছা! আচ্ছা!' কাগজ বন্ধ সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই। সুদেবের আকস্মিক আসার কারণ হাতড়ান। বলেন, 'কিছু বলবে?' সুদেব বলে, 'টালি পালটে দেবার কথা ছিল। কিন্তু দিলেন না। কলে ভাল জল আসছে না। তার ব্যবস্থারও ত কথা ছিল।' অনন্তবাবুর ভ্রু উঁচু হয়। বলেন, 'বলেছিলাম—হয়নি। আমি ত বলেই দিয়েছি, যার পোষাবে না সে উঠে যাবে।' সুদেব বলে, 'ঠিক কথা। কিন্তু ভাড়া ত দিচ্ছি, চাইব না যেটা দরকার।' অনন্তবাবু মুখ বিকৃত করেন, 'ভাড়া কী দিচ্ছ। বলি যা দিচ্ছ তাতে ত একটা দেওয়ালের বেশি পাওয়া যায় না। সে জায়গায় চার দেওয়াল ভোগ করছ! সকালবেলাতে আর মাথা গরম করে দিও না, হুঁ।' সুদেব বলে, 'তার মানে সারাবেন না!' অনন্তবাবু এবার চোখ পাকান, 'ভয় দেখাচ্ছ আমাকে। গলা চড়ালে আমি ভয় পাব ভাবছ!' সুদেব মাথা নাড়া দেয়, 'মোটেই না। আমি সত্য কথাটা বলতে এসেছি।' অনন্তবাবু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন, 'আরে রেখে দাও তোমার সত্য! আমি যা বলার বলে দিয়েছি। আর কোন কথা নেই, বুঝেছ!' বলতে বলতে ভেতরে যান মানুষটা। সুদেব বোকার মত ক্ষণকাল বসে থাকে। অনন্তবাবুর উপর রাগ আছে তার। কোনদিনই সেটা সে উচ্চারণ করে নি। আজ অদ্ভুত ইচ্ছেটা তাকে টেনে আনল। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়াল! কানে কানে অদ্ভুত ইচ্ছেটা সুদেবকে ফিসফিস করে বলল, এ লোকটাও তোমার স্বাধীনতা হরণকারী।

মণ্ডল বস্ত্রালয়ের মালিকের স্কুটার আরোহী ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় রাস্তায়। ব্রেক কষে বলে, 'দোকানে যান নি কেন! সুদেব মিথ্যে কথা বলবে

না।' বলে, 'এমনি।' ছেলের লম্বা জুলপি, গায়ে নীল টেরিলিন গেঞ্জি, ব্যাকব্রাশ চুল। বিস্মিত চোখে তাকাতে সুদেব বলে, 'একদিন না গেলে কী এমন ক্ষতি।' স্কুটারের উপর বিষ্ণু মণ্ডল বিরক্তি ভ্রুতে তুলে বলে, 'আপনি কী জানেন না, আজ স্টক মেলানর কথা! কাজে না গিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।' সুদেব তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার, দু-শ টাকা মাইনেতে মনে হচ্ছে বেড়ানর অধিকারটাও আপনাদের বন্ধক দিয়ে বসেছি।' ছেলেটার চোখে মুখে রক্ত ফোটে, 'মেজাজ দেখাচ্ছেন যে বড়। চাকরি হয়ে গেল নাকি কোথাও?' সুদেব বিচলিত হয় না। বলে, 'হয় নি। তবে হবে। যাক্ চলি।' বিষ্ণু মণ্ডল বলে, 'কাল বাবাকে কামাইয়ের জবাব দেবেন এখন। ভীষণ রেগে আছেন।' সুদেব হাত নাড়া দেয়, 'ভয় দেখাবেন না।' হুস করে স্কুটার বেরিয়ে যায়।

সুদেব ভাবে, কাল কাজে যাবে। কথা শোনাবে মণ্ডলমশাই। সে চুপ করে থাকবে। তবে কালকের ভাবনা কাল। আজ সে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। ভারি আরাম বোধ হয় তার। সে বুঝে উঠতে পারছে না শব্দগুলো কে যোগাচ্ছে। শুধু অদ্ভুত ইচ্ছে এবারও তার কানে কানে বলে দিল, সুদেব, মণ্ডল বস্ত্রালয় তোমার অন্যতম স্বাধীনতা-হরণকারী।

বিকেলে সুদেবের নন্দাকে নিয়ে সিনেমা যাওয়ার ইচ্ছে জাগে। এ ইচ্ছেটাও অদ্ভুত বৈকি! ক বছরেই দাম্পত্য জীবন বলে যুবক যুবতীর যে অতি মনোরম একটা দ্বীপ আছে তার অস্তিত্ব কবেই হেজেমজে গিয়েছে। আজ তাকে তোলার চেষ্টা করতে নন্দার মাথায় চিরুনি আটকে যায়। বলে, 'তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?' সুদেব বলে, 'বৌকে নিয়ে সিনেমায় যাব, তাতে মাথা খারাপ আসছে কোথায়?' নন্দা ভ্রুকুটি করে, 'বয়স বাড়ছে না কমছে?'

নন্দার বলার মধ্যেও আপত্তি মনোরমতায় ফুল্ল হয়ে থাকে। যেন সে 'চল না গো' চোখে মুখে দূরবর্তী হাতছানির অভিসারিকা হয়। তারপরই মেয়েদের কে রাখবে সিনেমা হলে কাঁদবে—সেবার খুকী—তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে—কী বিশ্রী। এক পা বাড়ান উড়ন্ত শাড়ির আঁচলে গতিময়তা নিয়ে চিত্রার্পিতা নন্দা। সে ভাবে। সিনেমা যাওয়ার সামান্য ইচ্ছেও তার অধিকারভুক্ত নয়। কিন্তু কে? কে এখানে স্বাধীনতা-হরণকারী? বয়স? ছেলেমেয়ের অস্তিত্ব? নন্দা?

দিনের ঘটনাগুলো সুদেবের মাথার মধ্যে অদ্ভুত ইচ্ছে কেমন যেন পাকিয়ে রেখে দেয় এক বাণ্ডিল কাগজের মত। খুলে কী মেলে ধরে না। ধুতির উপর শার্টটা চড়িয়ে সে বেড়াতে বের হয়। কলকারখানার এই শহরটা বস্তি ঘিঞ্জি অপরিসর রাস্তা গলিঘুঁজি নিয়ে বেড়ানর যে একেবারে অযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। পার্ক নেই। নিঃশ্বাস ফেলার টুকরো জমির বড়ই আকাল।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় বাধা পায় সুদেব। ল্যাম্পপোস্টের লালচে অপরিচ্ছন্ন আলোর পাশে এক যুবক ধরে, 'এই যে দাদা, এদিকে শুনুন। ঘুরঘুর করছেন কেন এখানে—অ্যাঁ।' সুদেব মুখ দেখে। লম্বাটে কালো মুখ, চোখজোড়া জ্বলছে।

টান টান ইস্পাতের ছুরির ফলার মত রোগা শরীর, উদ্ধত ভঙ্গি। সুদেব ভয় পায়। ঢোঁক গিলে বলে, 'মানে এমনি বেড়াচ্ছি।' সঙ্গে সঙ্গে যেন এক ঝলক আগুন ছুটে আসে, 'ন্যাকা, জানে না কিছু। আপনি খোকার পাড়াতে থাকেন না। জানেন না এটা বিল্টুদার এরিয়া!' সুদেব জানে খোকা ভার্সেস বিল্টু দু পাড়ার দু'মস্তানের সংঘর্ষে চারটে খুন হয়ে গিয়েছে। বিবাদটার উৎস তার অজ্ঞাত। সরু গলি থেকে একটা ছেলে বেরিয়ে আসে প্রশ্ন নিয়ে, 'কী হল!' সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘোরায় সেই ছেলে, 'দেখ না, ঘুরঘুর করছে।' এগিয়ে অন্যজন বলে, 'আরে এ ত খবরের কাগজওয়ালা।' ছেলেটা যেন ভীষণ ঘৃণা নিয়ে উচ্চারণ করে, 'সব শালা ইনফরমার।' বলেই হাত নাড়ায়, 'কেটে পড়ুন কেটে পড়ুন দেখি চটপট।'

সুদেব আর কথা বলে না। রক্তে সে আতঙ্ক টের পায়। তার মধ্যে ভাবে এ ছেলেটা কে সে জানে না। খোকা বিল্টুর সঙ্গেও আপাত তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে এরা যে স্বাধীনতা হরণকারী তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফেরার পথে ঝুপ করে অন্ধকার নামে। চেনা পথও অচেনা হয়ে যায়।

পাড়ার দুর্গোৎসবের মিটিং বসেছে। মোটা মোটা মোমবাতি জ্বলছে। থমথম করছে অন্ধকারে সারা পাড়া। সুদেব খোলা দরজায় উঁকি বাড়ায়। ওমনি ডাক, 'আরে সুদেবদা। আসুন। আসুন। বল না সুদেবদাকে এবার রজতজয়ন্তীতে আমাদের কী প্রোগ্রাম করা হয়েছে।' চাঁদা গতবারে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পনের টাকা দিতে হয়েছে। এবার কত ধরবে কে জানে। সে অনুভব করে এখানেও তার স্বাধীনতাহরণকারী কিছু উৎপাদিত হচ্ছে। সে বলে, 'না-না। ভেতরে যাব না। তোমরা কে কে রয়েছে দেখছি।' সে দাঁড়ায় না আর।

রাত্রিবেলায় নন্দার পাশে শুয়ে সুদেব মুখের মিছিল নিয়ে ভারি বিব্রত বোধ করে। নন্দাকে কিছুই বলে নি। তার ঘরে ফ্যান নেই। সারাদিন বৃষ্টি হয় নি। আবহাওয়ায় তাপের দুরন্তপনা তাকে ঘামায়। নন্দা কাদা হয়ে বেঁকে চুরে আছে। মেয়ে তিনটিও ঘামছে। মশারির বাইরে অসংখ্য মশা প্রবেশের জন্য তুমুল সোরগোল তুলেছে। সুদেব তার বিপন্ন স্বাধীনতার জন্য দুঃখ বোধ করে।

ভোরে সুদেবের ঘুম ভাঙে, ব্যস্ত হয়ে বিছানায় বসে, মুখ ধোয়, সাইকেল বের করে খবরের কাগজ আনতে ছোটে হাওড়া স্টেশন। অদ্ভুত ইচ্ছেগুলো বাষ্প হয়ে গিয়েছে। তার মনে পড়ে আজ দুটো সাপ্তাহিক, একটা খেলার কাগজ, একটা পাক্ষিক সিনেমা পত্রিকা বের হবার কথা। টাকা চাই। সোমনাথ ধার দেবে বলেছে। কোন নিশ্চয়তা নেই। সোমনাথও তারই মত খবরের কাগজওয়ালা, অভাবী। মেঘলা আকাশ। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তার মনে পড়ে যায়, জল থেকে কাগজগুলোকে বাঁচাতে সিলোফেনের শিটটা আনতে সে ভুলে গিয়েছে। জলে ভিজে কাগজ নষ্ট হয়ে যাবে।

অদূরে তীর্থভূমি

ভোরের তারা দেখে ঘরের বাইরে পা রেখেছিল। তখনও আঁধার। তবে আবছা। চোখের সামনে তেঁতুল গাছ, লাকপুকুরের পাড়, কাঁঠালগাছ খেজুরগাছ সবই দেখা যাচ্ছিল। আশপাশের ঘরবাড়িকেও আবছা আঁধারে ডুবে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। তারপর কিছুটা পথ হাঁটতেই সে আঁধার অনেকটা কাটল। কেমন যেন শান্ত মৌন প্রত্যুষের সুর বইয়ে দিতে দেখা গেল। ইতিমধ্যে ঝোপঝাড় ছেড়ে দু'একটা পাখিও উড়ল। একরাশ কাক ডাকতে ডাকতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ল। মুরগীগুলো এখন সবার ডাক শুনে বোকার মত নিজেরা ডেকে উঠল। ধানক্ষেতের আল বেয়ে ত্রস্তে একটা শিয়ালকে আলোর ভয়ে হাঁটতে দেখা গেল। এবং আঁধারে আকাশ নক্ষত্রের কাল পার হয়ে নীল-নীলরঙে নিজেকে ভিজিয়ে নিতে থাকল।

তবু পথ এখনও অনেক-অনেক দূর। ক'ক্রোশ! কে জানে! এই তো নদী। নদীর পর বিশাল ধানক্ষেত। সেটা পার হলে সাঁওতাল পাড়া। তারপর রুক্ষ প্রান্তর। তারপর বন। তারপর। তারপর......।

এখন নদীর সাদা বালির মধ্যে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে। কিছুটা সময় চুপচাপ শীতল বালুকারাশির উপর হাত পা ছুঁড়ে চিৎপাত হয়ে কয়েকটা তৃপ্তির শ্বাস ছুঁড়তে ইচ্ছে করে। অথচ তার উপায় নেই। এখনও সেই তীর্থভূমি পূণ্যভূমি অনেক দূরে। আলো বাড়লে আরও কষ্ট হবে; সারা শরীর রৌদ্রতাপে যন্ত্রণায় ভরে উঠবে। তখন শরীর শুধু খুঁজবে শীতল ছায়া। রোদ বাড়ার আগেই পৌঁছাতে হবে—হবেই।

ভটচাজমশাই গায়ের নামাবলিটা ভাল করে জড়িয়ে বলেছেন, বাবা বিভূ আর কত কষ্ট ভোগ করবি বাছা। যা বক্রেশ্বর। স্নান করে আয়। স্পর্শে পাপ ধুয়ে যাবে। দেহের পাপ মনের পাপ সব পাপ ধুয়ে যাবে বাছা।

গোবর কুড়ুতে কুড়ুতে রানীপিসি কোমরে ঝুড়ি নিয়ে বলেছে, তুর দুঃখু আর দেখতে পারি না বাছা। গা'ময় খোস হনছে রে। নারে, উ গুলান খোস লয়। তীখে না গেলে উগুলান ভাল হবেক না। যা বাছা বক্রেশ্বর যা। গরম জলে চান কর গা। সব ভাল হন্ যাবেক। আর কত কষ্ট করবি বাছা।

কত্তাবাবুর সেই কথাই। হুঁকো টানতে টানতে বলেছেন, হ্যাঁরে বিভু তুকে ত আর রাখা চলবে না। গা ভর্তি তুর খোস হয়েছে। বড়ো খারাপ বটে। ঘরের কাজ তুকে দিয়ে কি করে করাই বলতো। আর আমার কথা শুনবি না। খোসের জ্বালাতে ভুগছিস্ তবু অপকর্ম তুর বাদ নাই। কাল নাকি শালিখ ছা

পেড়ে বলি দিয়েছিস্। আর পাপ করিস্ না বিভু। অত কি সহ্যি হয় রে। যা পাপ করেছিস্—এখুন বক্রেশ্বরের গরম জলে গা ধুয়ে ঝেড়ে আয়গা।

বিভু নদী থেকে সড়কের উপর পড়ল। না, মানুষজনের দেখা নেই। ধূ ধূ এই প্রান্তর আর ধানক্ষেতের মধ্যে এই প্রত্যুষে সে একলা। শুধু আকাশ পথে দু'একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে। উঃ বক্রেশ্বর এখনও কত দূর। বিভু এখন চোখের পাতা টান টান করে বক্রেশ্বর দেখার চেষ্টা করল! পা যেন চলে না। পায়ের গোড়ালি বেয়ে একটা ব্যথা উরু কোমর পর্যন্ত ভরিয়ে তুলছে। বুকও টনটন করছে। তার থেকে আবার মাথায় উঠছে।

বিভু দীর্ঘ পথের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হচ্ছিল। কে জানে পৌঁছাতে পারবে কি না এ শরীর। হয়ত টানতে পারবে না সে এই শরীরকে। তাহলে কি ফিরে যাবে? বিভু পিছনের দিকে চাইল। না, নিজের গ্রাম নিজের ঘরকে সে অনেক দূরে ফেলে এসেছে। আর ফিরে যাওয়া যায় না। কিছুতেই না। তাছাড়া—আঃ বিভু ভাবতে পারে না। অহরহ ওই যন্ত্রণা তাকে পীড়িত করছে। কত্তাবাবুর কথাটা যেন বর্শার মত আমূল বিঁধে গিয়েছে পেটে। জ্বালা, ক্ষুধার সুতীব্র জ্বালা আছে। তার চেয়ে অনেক সহনীয় এই কষ্ট তীর্থভূমির পথে এই হাঁটা।

হুস্ হুস্ অ বাবা আবার কুথা থেকে পিছা লিলিরে। বিভু ঘাড় বেঁকিয়ে লেজনাড়া কালো কুকুরটাকে দেখে যেন ককিয়ে উঠল।

কুকুরটা হাঁপাচ্ছে। লম্বা লাল জিভ বের হয়ে পড়েছে। লাল ঝরছে। চেহারাটাও শীর্ণ। পথের কুকুর। বিভুর কথা শুনে লেজ নাড়া তার বেড়ে গেল। ঘাড় উঁচু করে একটা বিচিত্র স্বর ছুঁড়ে উত্তর দিল।

বিভু বলল, কুথা যাবি? তীত্থে? কেনে পাপ করেছিস্? ধুস তুদের আবার পাপ কি বটেক! হুঁ। বিভু এক মুহূর্ত চুপ করল। তারপর বিড় বিড় করল, আমার বাবা কি বলত জানিস্, উ সব অবলা জীব বটেক, উদের মারতে নাই। এই সা ঢিলা মেরেছিলাম টিকটিকিকে ধপাস করে পড়ে গেইছিল। কিন্তুক বাবা মাকে মারত। মা ত অবলা জীব ছিল নাই। নিজের কথাতে নিজেরই কুলকুলে হাসি উঠল। তারপর হাতের আঙুলে খাঁজের খোস চুলকে উঠতেই মুখ চোখ কুঁচকে চুলকাতে আরম্ভ করল।

পথ চলা কিন্তু বন্ধ হল না। সে চলতেই থাকল। পিছন পিছন লম্বা জিভ ঝুলিয়ে কুকুরটাও আসতে থাকল। সড়কের দুপাশে প্রান্তর। ধু ধু প্রান্তর। শুধু ছোট বড় সাদা কালো পাথরে ভর্তি।

সহসা বিভুর একটা কথা মনে পড়ল; ইস্ ইস্ কি ভুল সে করছে। এখনও ঢিল ছুঁড়ছে না। কুকুরটার কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে না। আহা এই তো ঢিল। তুলে ফেল। ছুঁড়ে মার। কোঁ কোঁ করে লাল রক্তের রেখা টানতে টানতে বেটা পালাবার পথ পাবে না।

বিভুর হাত নিসপিস করতে থাকল। খোস চুলকানর কথা ভুলে গেল। সারা

শরীর জুড়ে উষ্ণ রক্তের টগবগানি অনুভব করল। আর দ্রুত গিয়ে বিভু একটা পাথরের টুকরো হাতে নিল।

এই তার রোগ। যেন সেই জন্মের পর থেকে তার রক্তের ধর্ম এই, তার পিপাসা এই। আর বিভু ভেবেও পায় না, কেন এমন হয়। কেন এমন ভাবে হাত পাগুলো নিসপিস করে । রক্ত উষ্ণ হয়। উত্তেজনা বাড়ে। ছোট্ট সাদা ছাগল ছা'টা তো চুপচাপ ঘাস খাচ্ছিল। কি দরকার ছিল ওকে তুলে ধরে আদর করার। কেননা আদর করতে গিয়ে দাঁতের উপর দাঁত বসে গেল। আর দু'হাতে তুলে আছাড় মারল ছাগল ছা'কে। গলগল করে কিছুটা রক্ত বের হল। ব্যস্, বিভু পায়ে পায়ে ঘরের পথ ধরল।

ধরা পড়তেই বিভু ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, ধেৎ তেরি নিকুচি করেছেক, তুর ছাগল ছা দেখলাম্ নাই, মারব কুথা?

তুই মেরেছিস্। কানুদের হাঁসটর গলা ছিঁড়ে টেনে মারিস্ নাই? তার লেগে জরিমানা দিস্ নাই?

হাঁসটর কথা আসছেক কেনে? তুর ছাগল ছা মরেছেক, ছাগলছার কথা বল। আমি বলছি মারি নাই, মারি নাই।

খুনেরা কুথাকার। শালা চোখে দেখতে পেলে তুকেই একদিন মারব। হারামজাদা, ছুটুলুক। যেছি কত্তাবাবুর কাছে। দাম আদায় করব, তেবে ছাড়ব।

যা। পেমান নাই, নিজে দেখে নাই, আবার কথা। আমার দুষ দিলেই হল।

তারপর বিভু কাজ করে। পাতনাতে গরুর জন্য খড় কাটে ঘসঘস করে। পুকুর থেকে জল এনে খইল আর ধানের কুড়োর সঙ্গে মেশায়। তারপর হাতে লাঠি বেরিয়ে পড়ে। গরু চরছে মাঠে। মাঠে গিয়ে সারা দুপুর কাটাতে হবে। ঘাস দেখে গরুর পাল নিয়ে যেতে হবে। বেলা গড়ালে তারপর বাড়ি ফেরে।

তবে মাঠে দুপুর সুন্দর কাটে বিভুর। শিয়ালের বাচ্চা কি পাখির বাচ্চা ধরা থাকে। সেটাকে কাটা হয়। আহা, দুগ্‌গা পূজোর সময় পাঁঠাবলি হয়। মা মা গো বলেই কেমন কোপ পড়ে পাঁঠার ঘাড়ে। বিভূও ঠিক তেমনি করে কোপ দেয়। কপালে রক্তের টিপ নেয়। নাহ রোজ হয় না। কিন্তু প্রায় মজুত থাকে একটা না একটা। আর জোগাড় করতেই বা কতক্ষণ, বিভু গাছে ওঠে। পাখির বাসা থেকে চিঁ চিঁ করা বাচ্চাকে মুঠোর মধ্যে ধরে আবার তর তর করে নেমে আসে। কোন গাছে বাচ্চা আছে সে তার মুখস্ত। আর এই পাখির বাচ্চা কি সাপ কি শেয়ালের বাচ্চা কি ফাঁদে ফেলা পায়রার গলায় কোপ দিতে কোন ঝামেলা নেই, কোন প্রতিবাদ নেই, মালিকের রক্ত চক্ষু নেই, জরিমানা নেই।

এমন করেই দিন চলছিল। কিন্তু আচমকা যেন চোখের সামনে জগৎটা বদলে গেল। সারা শরীর ভরে উঠল খোসে। অসহ্য জ্বালা আর চুলকানি। হাসপাতালের ওষুধ নিল, টোটকা করল। কিন্তু কমল না। আর তখনই সবাই একস্বরে বলে উঠল, পাপ। পাপ। বক্রেশ্বর যা। মাটির তলা থেকে ভগবানের

জল—গরম জল বেরুছেক। ওই জলে গা ধুয়ে পাপ ধুয়ে আয়।

বিভু শুনল শুধু। গ্রাহ্য করল না। পাপ! নিকুচি করেছে পাপের। বিভু ঠোঁট ওল্টাল। বে নেই, ছেলেমেয়ে নেই, মা নেই, বাবা নেই, তার আবার সংসার, তার আবার পাপপুণ্য। আর পাপটা কিসের রে বাপু। বিভু কিছুতেই ভেবে পেল না। কি অন্যায় সে করেছে। না কোন অন্যায় সে করে নি। ভাল লাগে বলে সে পাখির ছানা মেরেছে, হাঁস মেরেছে, কুকুর মেরেছে, সাপ মেরেছে, ছাগল মেরেছে, মুরগী মেরেছে, শেয়াল মেরেছে। তার মধ্যে আবার পাপ কি! অন্য মানুষে মারে না?

তবে মাঝে মাঝে যে বিভুর কষ্ট হয় না, তা নয়-হয়। বড় কষ্ট হয় তার। খোস চুলকাতে থাকলে ব্রহ্মতালু অবধি জ্বালা করে। তখনই ইচ্ছে করে সব পাপ ধুয়ে আসতে। তবে তা মুহূর্তের। আবার কখনও মৃত মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেমন করুণ অথচ ভয়ঙ্কর সেই মুখ। তবে তা মুহূর্তের। আবার সব গ্লানি সব দুঃখ সব বেদনা মুছে যায়।

পরশু কর্তাবাবু পরিষ্কার বলে দিলেন, ওরে কাল থেকে তুর আসার দরকার নাই। তুর খোস শেষে আমাদের ঘরের লুককে ধরবে—গরুগুলাকে ধরবে।

তাই এই যাত্রা—এই তীর্থযাত্রা।

হেই, হেই। বিভুর গলায় শব্দ বাজল। পাথরটা তুলতে অবশ্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিভু বলল, হায় হায় রে, তুকে মাবর ভেবেছিস্। না-না মারব নাই। আয় আমার সাথে আয়। ইকা ইকা ভাল লাগছে নাই। চোখের তারা পিটপিটিয়ে কুকুরটাকে বিভু আদরও জানাল।

কুকুরটা কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। সামনেই সরকারী ইঁদারা। তারপর খেজুর আর আতাঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়া দিতে থাকল। বিভুর বুঝে উঠতে দেরী হল না, বেটা মুড়ির গন্ধ পেয়েছে। কাঁধের উপর পুঁটলিতে মুড়ি।

আসবি না! বিভু যেন অভিমান জানাল। তারপর কি মনে হতে সে ঢিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, ইবার হন্ছে ত—আয়। আর কুকুরটাকে এগিয়ে আসতে দেখে দয়া পরবশ হয়ে পিঠের উপর থেকে মুড়ির পুঁটলিটা খুলে এক মুঠো মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, লে খা।

কুকুরটা ছুটে এসে লম্বা লিকলিকে জিভ বের করে মুড়ি চাটতে থাকল।

অদূরে শালবন। অজস্র সবুজ গাছের ছাওয়া। মোটা একটা সবুজ রেখা যেন আকাশের কোলে এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত আঁকা হয়ে রয়েছে। ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাল আর শাল। আঃ ওখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে। আর বিশ্রাম নিয়ে কাঁধের উপর ফেলে রাখা মুড়ির পুঁটলি থেকে কয়েক মুঠো মুড়িও পেটে ফেলতে হবে। জল—হ্যাঁ একটা পুকুরও আছে ওধারে।

চলতে চলতে বিভু কুকুরটাকে দেখল। ঠিক পিছন পিছন আসছে। আয়। আয়। বিভু বিড়বিড় করল, দেখলি, তুকে খেতে দিলাম। কিন্তুক আমার মা

বলত বাবাকে, তুমার ছেলে তুমার পারা হবেক খেতে দিবেক না। তুমার পারা মারবেক। বাবা যে বাড়ি মারত মাকে। আঃ একদিন বুঝলি চেলাকাঠের এক বাড়ি মাথায়, মায়ের মাথা ফেটে কি অক্ত কি অক্ত! তা বাদে মা একদিন বুনে গেল! বুনে না ছাই বুঝলি। বিভু চাপা স্বরে বলে, গাঁয়ের একজনার সঙ্গে শহর বাগে পালিনছে। আর বাবাট তখন আমাকে মারতে লাগল। তেবে আমি মায়ের পারা মার খাই নাই। বাবা হোক, শালাকে একদিন হাতের ডাং ছুঁড়ে—। হুঁ, বাবা আমি বিভু বটি। ছেড়ে কথা বলব নাই।

বিভুর পা এবার টনটন করে উঠল। খোসগুলো চুলকে উঠল আবার কোমরের, তার সঙ্গে ঘাড়ে। হাত দিয়ে ঘষড়াতে ঘষড়াতে চোখ মুখ কুঁচকে বিভু বলল, হ্যাঁ রে তু আমার কথা শুনছিস্ ত।

বনের সীমানার কাছে দাঁড়িয়ে বিভু স্বস্তির শ্বাস ফেলল। পূবের আকাশ উজ্জ্বল হচ্ছে। পাখি উড়ে যাচ্ছে। একরাশ তিতির বনের প্রান্তে। ঝাঁক ঝাঁক টিয়া শব্দ বাজিয়ে গেল।

বিভু ভাবল, বক্রেশ্বরের উষ্ণজলের কুণ্ডুগুলো এখনও কত দূর! আহা, ঈশ্বরের কি অপার মহিমা! মাটি ফুঁড়ে গরম জল বার হয় গো। পাপ ধোয়ার জল গো—পাপ ধোয়ার জল।

বিভু কুকুরটাকে বলতে পেরে প্রফুল্ল বোধ করছিল। বলে চলল, লুকে বলে পাপ। এট আমার পাপ! পাপ কেনে করব নাই। মা গেল, বাবা গেল। আমি ইকা ঘরে কাঁদলাম। কুনু লুক ঠাই দিলেক না। জংলীকে বিয়ে করব বলল্ম। বুঝলি তা কালো হোক, কি ঝলক রে জংলীর! যৈবন যেন টলমলে, জল থৈ থৈ খাল, চোখ দুটো টানা টানা। তু ত আর দেখিস্ নাই। কিন্তুক অ মা কি মেয়ে গো! আমি যেন মানুষ লই পুরুষ লই। বললেক উর সাথে বিয়ে হলে গলায় দড়ি দুব। না হালে উর বাপের ত মত ছিল রে। আর আমি কি খারাপ লুক বটি? আঁ? জানিস্ তখন ভেবেছিলাম জংলীর গলা টিপে ধরব। কিন্তু পারলাম নাই। আর বল তুই কার না রাগ হয়। বেশ করব, পাখ মারব, জন্তু মারব। বেশ করব। বিভুর গলা কান্নায় জড়িয়ে এল, জংলী বিয়ে করেছে। সাজের কি ঘটা বটেক মেয়েমানুষটর। রাগে আমার গা জ্বলে রে। কিন্তুক পারি না গলা টিপতে। পাখ মারি, ছাগল ছা মারি, হাঁস মারি। বল্ তু কুকুর হলে কি হবেক। তু ত বুঝিস্ সব। আমার অল্যায়?

কুকুরটা যখনই বিভুকে তার দিকে মুখ ফেরাতে দেখছিল দাঁড়িয়ে পড়ছিল।

কুকুরটাকে নীরব থাকতে দেখে বিভু থমকাল, তা বাদে জানিস্, এখুন না মেরে পারি না। দেখ্ কেনে তুকেও মারব। বলেই জিভ্ কামড়াল সে, না, না তুকে মারব না। মাইরি মুখ ফসকে বেরিন গেল। তু আমার সাথে আসছিস্—আমার কথা শুনছিস্, তুকে কি মারে।

কুকুরটা যেন খুশি হয়েই একটা শব্দ ছুঁড়ে দিল। আকাশ নীল। মাঝ আকাশে

সাদা হাঁসের পালের মত মেঘ। এখন পূব আকাশের সিঁড়ি ভেঙ্গে সূর্য উঠছে। লাল আলোয় আপ্লুত চারপাশ। সামনের সবুজ বনভূমি সে লালিমায় উজ্জ্বল।

বিভু চমকে উঠল। একটা কচি গলার ডাক, টোঁহা টোঁহা কান্না যেন সামনের বন থেকে উঠে তার সারা শরীরকে ভরিয়ে দিল। ভয় এবং বিস্ময় যুগপৎ তার বিমর্ষ শরীর এবং ইন্দ্রিয়কুলকে ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে সচকিত করে দিল।

আবার কান্না। খুব কচি গলায় কান্না। পাখি? পাখির ডাক কি? সে কোন সিদ্ধান্তে যেতে পারল না। শুধু শরীরকে টেনে টেনে অনুসরণ করে চলল শব্দ।

ছোট্ট একটা ন্যাকড়ায় শুয়ে আছে সদ্যজাত শিশু। লাল হয়ে গিয়েছে হাত পা মুখ বুক পেট। হাত ছুঁড়ছে পা ছুঁড়ছে। তার সঙ্গে বিরতিহীন টোঁহা টোঁহা।

বিভু বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। অপলকে চেয়ে রইল ছোট্ট লাল হয়ে ওঠা এক তাল মাংসপিণ্ডের মত শরীরের দিকে। আশ্চর্য তার পরই তার দু'হাত নিসপিস করে উঠল। হাত তুলল। চোখের সামনে তুলে শক্ত চাটুর দিকে তাকাল। সারা হাত জুড়ে থাকা দগদগে খোস দেখল। রক্তের মধ্যে সব ভুলে সেই প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ উষ্ণতায় পুড়ে যাওয়া অনুভব করল। আঃ কতদিন—কত দিন এই হাত ছাগল ছানা, কুকুর ছানা, শিয়াল ছানা, হাঁসের ছানা, কত পাখির ছানা ধরে মেরেছে।—কিন্তু মানুষ। এই ক্ষুদে ছেলেটাকে তুলে ধরলে! না কোন প্রতিবাদ কোন ঝামেলা নেই, কোন মালিকানা নেই এই শিশুর। চরম উত্তেজক খেলার রসদ তার হাতে।

বিভূ ক্রমশঃ নীচু হয়ে থাকল। তখনই হাতের খোসগুলো চুলকে উঠল। এবং কুকুরটা ডেকে উঠল, ঘেউ ঘেউ। মুড়ির পুঁটুলিটা ততক্ষণে শিশুর গায়ে। হাত পা নাড়ায় পুঁটলিটা নিয়ে খেলা শুরু করেছে, কান্নার বেগ সামাল দিতে চাইছে। খোসের অসহ জ্বালা। বিভু চিৎকার করে উঠল, ছুঁস্ না ছুঁস্—ই খারাপ রুগ বটে। সারা গা তুর খোসে ভরে যাবেক। জ্বলে যাবেক—মরে যাবি। দ্রুত হাতে সে পুঁটলিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বুক থেকে ওঠা একটা বেদনার রঙে সারা মুখ রাঙিয়ে সে পবিত্র নিষ্পাপ শিশুটির দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ঈশ্বরের কি অপার মহিমা! আহা, শিয়ালের আহার করে ফেলে গিয়েছিল গো ওর মা কী বাপ! কিন্তু শিয়াল ছোঁয়নি। হে ভগবান, আমার ই কি করলে গো। আমি মারতে লারলাম। সুনারে, অ সুনা, তুকে লিয়ে আমি কি করব বাপ? আমার যি ঘর নাই, সংসার নাই।

কুকুরটা গলা লম্বা করে উত্তর দিল, ঘেউ ঘেউ। আর তারপরই বিভু শালের পাতা ছিঁড়ে তার খোসের ছোঁয়া বাঁচিয়ে শিশুটিকে সন্তর্পণে তুলল। দূরে অনেক দূরে সেই তীর্থভূমি, পূণ্যভূমি বক্রেশ্বর। বিভুর মনে হল, সে চোখের সামনে যেন বক্রেশ্বর মন্দিরের উজ্জ্বল চূড়াটা বড় স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে।

অহল্যে নামে ডাইনি

ভাগাড়ে শকুনি ওড়ে। অহল্যের বুকের রক্ত ছলকে ওঠে। ঘরের উঠোনে আমড়াগাছের শাদা ডালে দাঁড়কাক এসে খা খা করে। অহল্যের ভয় তরাস হৃৎপিণ্ড দাপাতে থাকে। বর্ষায় আল পথে হাঁটতে বাঁ দিকে হেলে সাপ সরসরিয়ে যায়। অহল্যের আতঙ্কে চোখের তারা ঠিকরে আসে।

অহল্যের পৃথিবীতে বুঝি কেবলই অশুভ ইঙ্গিত। অমঙ্গল হাহাকার যেন কালো ডানা মেলে নেমে আসার জন্যে বাতাসে শনশনানি তোলে। বহুদূর থেকে অস্পষ্ট হাহাকার এবং চাপাকান্নার শব্দ যেন গমকে গমকে ভেসে আসে। দুকানে আঙুল দিলে রাবণের চিতাজ্বলার শব্দ বাজে। দুচোখ বন্ধ করলে মনে হয় কে যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অহল্যে কুঁকড়ে দুমড়ে মুচড়ে যায়। চমকে চমকে ওঠে।

অহল্যের বাইশ বছরের যুবতী কাঠামোয় কোন ঘাটতি নেই। বরঞ্চ প্রাচুর্য আছে। কালো লম্বাপানা চিকন চেহারা, খাড়া নাক, বড় বড় চোখ। এক ঢাল কালো চুল। শাড়ি ব্লাউসের ঘেরাটোপেও বুকের শক্ত সমুন্নত বাঁধুনির শিখর চূড়া ঠিকরে আসে। হাঁটার মধ্যেও ছন্দিত রমণীয় মধুরিমা। পড়শীরা বলে, 'কোমরদুলুনি ঢণ্ডী।' বংশী বলে, 'হাঁটলে তুকে মুনে হয়, সুরের তালে সোনার পিতিমে নড়ে চড়ে উঠছেক।' গোপী বলত, 'অহল্যে, তুর রূপ যৌবন হাঁটলে ফিরলে যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ে।' আরও লোকে কত কি বলত! বলে! কত চোখে পুরুষ ক্ষুধা হামলে যায়। খোদ গেরস্ত পর্যন্ত ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে চকচকে চোখে বলেছে, 'বংশীটার ভাগ্য ভাল। তুর পারা মাগ পেয়েছে।'

দ্বিতীয় স্বামী বংশী। বংশীর হাতে ষোল বিঘে জমি। মিত্তিরদের জমি লাঙল, বলদ, বীজ, সার। বংশীর শ্রম। তিনভাগের এক ভাগ অধিকার। ধার নেওয়ার সোয়া সুদ উৎপাদিত ফসলের ভাগ থেকে কাটান-ছাটান। মনু মিত্তির বংশীর জন্য সর্বদাই বিগলিত। ভুঁড়ির নীচে লুঙ্গি। কালো পেটে মোষের কাঁধের মত লুঙ্গিকষার দাগ হয়ে গিয়েছে। কাঠামোর অনুপাতে মাংস মেদের বাড়াবাড়ি। মস্ত টাকওয়ালা মাথা। হিসাবপত্র খাতায় নয়, মাথায় একেবারে নিঁখুত করে লেখা থাকে। ঠাকুরুণ রোগা প্যাকাটিসার ছোটখাটো মেয়েমানুষ। তা অত বড় মানুষটা যেন তাকেই জুজু দেখে। তা দেখুক। বত্রিশ বিঘের মত সরস নীরস জমির দিকে মানুষটার বড় টান। বংশী ছাড়া আর এক কিষান বিশু টুডু। দুজনেরই উৎপাদন ক্ষমতা গাঁয়ের সেরা। চার পাঁচখানা ধানের পেল্লাই ঘর-পালোই হয় খামার বাড়িতে। নদীধারের জমিতে আখ আলু সরষে।

মনু মিত্তিরের জমিই ভরসা। দু'ছেলে কলেজে পড়ে। পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। জমি যেমন দেয়, জমিকে দিতেও তেমনি অকুণ্ঠ মনু মিত্তির। দুজোড়া বলদের সঙ্গে কিষানের জন্যে মায়া থৈ থৈ করে। বলে, 'বুঝলি বংশী, আহা, জমি কি আমার রে! জমি তো তোদের। তোরা দেখভাল না করলে ও তো পাথর। কিছু দেবে না। তা তোরা জমি দেখবি, আমি তোদের দেখব। অত কুঁই কুঁই কিসের। বল, কত টাকা লাগবে! মেয়ের শাড়ী কিনবি না পাথরচাপুড়ির মেলা নিন্ যাবি?'

এমন দয়াবান গেরস্ত বংশীর জোটা, নাকি বা জননী মাটির আঁচল উজাড় করে কোঁকড়া চুলের বেঁটেখাটো মানুষটিকে ফসল দেওয়া, কোনটা সৌভাগ্যের উৎস বংশী ভাবে না। সে মাটি চেনে, ধান চেনে। লিকলিকে ধানের গুচ্ছ দেখে বলে দিতে পারে, শস্যের খাদ্যভাণ্ডারে কতখানি সামর্থ কিংবা কোন রোগ ছায়াপাত ঘটিয়েছে। শ্রম দিতে কার্পণ্য করে না। টাটকা ফল তো হাতে উঠে আসবেই। পৃথিবী বড় সদয়া। কর্ম তোমাকে ফলদান করবেই। নিষ্ঠা তোমাকে ইজ্জত দেবেই। ভালবাসা তার প্রতিদান দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে। এ ব্যাপারে বংশীর যোল আনা বিশ্বাস। গাঁয়ের বেসিক স্কুলে সে ফোর পর্যন্ত পড়েছে।

নাড়ু মাস্টার বলে, 'বংশে যা করে মন দিয়ে করে। ছোঁড়ার বিদ্যেও হত। তা পেটটান, জাতেও বাউড়ী, গরুর লেজ আর লাঙলের বোঁটা দেখলে রইল পড়ে লেখাপড়া। চ মাঠে।'

ঋষি মণ্ডল বলেছে, 'বংশেটা মহামুখ্যু। নিজের ভাল বোঝে না হারামজাদা।'

ঋষি পঞ্চায়েতের মানুষ। বাগ্‌দী বাউড়ীপাড়ায় সংগঠন করে বেড়ায়। ভালমন্দ দুরকমের কাজ, নিজের প্রতিষ্ঠাও তার সঙ্গে করে, সে ভারসাম্যটা দিব্যি বজায় রেখে যাচ্ছে। বর্গাদার হিসেবে নাম লেখান, ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দেওয়া, মধ্যে মধ্যে মিছিল এবং বক্তৃতায় আবহাওয়া তপ্ত রাখে। বংশীকে বর্গাদারে সে নাম লেখাতে বলে।

'কি হবেক নাম লিখিন।'

'ঋণ পাবি। তাবাদে জমির উপর হক্ আসবে!'

'আমার হক্ আছে।'

'ছাই আছে। মনু মিত্তির কালই যদি তাড়িন্ দেয়।'

'অত সোজা!'

'তা ভাগ নিস্ এখনও তেভাগা। সরকার আইন করে দিয়েছে।'

'জানি। তা সরকারকে বাপের জন্মে দেখি নাই। গাঁ আসে না। জমিও নাই উর।'

'সরকারের জমি নাই কি রে। সবই তো সরকারের।' ঋষি মণ্ডলের রোগা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। পাজামার উপর সাদা টেরিকটনের পাঞ্জাবি। হাতে ঘড়ি। চল্লিশের আগেই গ্রাম্য আবহাওয়ায় মুখের রেখায় বয়সের ছাপ। কেমন

যেন কঠিন। কৌতুকের হাসিও তরঙ্গ তোলে না গালে। বলেছে, 'কি বলছিস্!'

'জমি আছে বলছ! তা দাও দেখি বিঘে কতক ওই্ লালুকে চযতে। মুনিষ খেটে মরছেক লালু। কুথাম্ জমি পেছেক না! সব ত কিষেন বাঁধা!'

ঋষি মণ্ডলের মুখে আর কথা নেই। কিষানীর জন্যে জমি সহজলভ্য নয়। জমির তুলনায় মুনিষের সংখ্যা কয়েকগুণ। ভাগ বাঁটোয়ারা করলে এক কাঠাও জুটবে না।

বাউড়ীপাড়া অভাবী দানবের চিরকালীন এক্তিয়ার। তার খাজনা মেটাতে কোমরে টেনা, ঘরের চালে বাখারি বেরুন। ঠিকঠাক একবেলা অন্নও ঘরে জোটে না। দেনার দায়ে আস্ত মানুষগুলো ভাঙচুর হয়ে যায়। জলে হাবুডুবু খাওয়ার মত অস্থির দিনযাপন করে! দারিদ্র হা হা করে হাসে শূন্য ঘরের কালি পড়া হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা এ্যালুমিনিয়ামের বাটিঘটির সংসারে! বংশী এ পাড়ার বাসিন্দা হয়েও দিব্যি সুখের গণ্ডী কেটে নিয়েছে নিজের ঘরের চারপাশে।

বংশীর নিখুঁত খড়ের চাল। হাঁড়িহাঁড়িতে চাল মজুত থাকে। পড়শীদের সে ধার দেয়। চারটে ছাগল, আটটা মুরগী। ঘরের সামনে বাবলা তেঁতুল বাঁশ বাখারি দিয়ে বেড়া করে সব্জি চাষ করে। দ্বিতীয়পক্ষ সাঙাল বৌ ওই অহল্যে, রূপ এবং ঠমক নয়, কোমর বেঁধে কাজেও যথেষ্ট দড়। তা ওই মেয়ে ও তো পোড়খাওয়া। স্বামী খেয়ে বংশীর ঘরে লক্ষ্মী হয়েছে। মরা সতীনের ছেলেমেয়ে দুটো যেন তার পেট থেকে পড়ে পৃথিবীর আলো দেখেছে। বংশী নামের ওই পুরুষটি ছাড়া দ্বিতীয়পুরুষ জীবনে দেখে নি।

বংশী বলে, 'তখুন ত সাঙার নামে না করে দিয়েছিলে!'

ছলকে হাসে অহল্যে। খুশিতে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'তখুন কি জানতুম!'

'কি?'

'তুমি এমুন ভাল। এমুন মুন টানতে পার! এমুন ভালবাসতে পার।'

'তাই নাকি?' আশপাশ চকিতে দেখে দিনদুপুরে পুরুষ বুকের মধ্যে টেনে নেয় তার যুবতী বৌকে। হর্ষে ছটফটানি তোলে যুবতী কুবতরীর মত।

অহল্যের সাঙায় মন ছিল না। ওদিকে মাগ করতে বংশীর কি আনটান! মামার কাছে কুন্দপিসিকে দিয়ে কথা পাড়ে। মামা ভাত না দিক দেখভাল মামাই করছিল। এক উঠোনে মামার ঘর। মায়ের গাঁয়েই বিয়ে। তারও। পাড়াও এক। মা মরেছে। বাপ অনেককাল আগেই গিয়েছে। বাপের ভিটে ঢিবি। আর তার স্বামীর ঘর দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে দেওরের অধিকারে!

রূপযৌবন মেয়েমানুষের যেমন শত্তুর তেমনই সম্পদ। ওরই টানে জীবনের ধারা বদলে যায়। বেঁচে থাকার একটা ভিন্নতর অর্থ উঠে আসে। অতীত অনায়াসে নিমজ্জিত হয়ে যায় কালো গহ্বরে। অহল্যের এসব হওয়ার অসুবিধে ছিল না। কিন্তু কি যে মেয়েমানুষের মন! জোয়ান স্বামী গোপীকে সাপে কাটল! আর এই মৃত্যুর পিছনে অহল্যে কি না খুঁজে পেল, তারই অদৃশ্য অস্তিত্বকে।

সেদিনই না রাগে অন্ধ হয়ে চাল না কিনে ভেতো গিলে আসায় সে বলেছিল, 'তুমি মরবে। মরবে।' তা কয়েক ঘন্টায় কি না সেটা ফলেছে।

অহল্যের তখনই মনে হয়েছে, ডাইনি মায়ের রক্ত তার মধ্যে জেগে উঠে গ্রাস করল স্বামীকে। বুকের মধ্যে আর এক অহল্যের অস্তিত্বকে তখন থেকেই তার ভয়! প্রত্যক্ষও বুঝি করেছে তার রূপ। রুক্ষ ধূসর চুলের মাথা, কালো তিন আঁঠি তালের মত বড় বড় রক্তপিপাসু চোখ, দীর্ঘ ধারাল দাঁত, শী·। কালচে লম্বা লম্বা নখের দুটি হাত, হাড়ের কঙ্কাল এক রমণী। ঝলকে ঝলকে তার দুচোখ দিয়ে উগরে পড়ছে আগুন। বদন বিস্তারকারী সর্বগ্রাসী ক্ষুধা! এলান চুলের রাশি যেন সহস্র সাপিনীর মত বিষ উদগার করছে। দুচোখ বন্ধ করে অহল্যে নিস্তার পায় না। একা থাকলে সে ভয়ঙ্করী তাকে শাসায়।

মেয়েমানুষ কেমন করে ডাইনি হয়, অহল্যে জানে না। ডাইনি মায়ের মধ্যেও সে কিছুই প্রত্যক্ষ করে নি। বাপকে নাকি মা খেয়েছে। অমাবস্যের নিশিকালে ডাইনি সাধন করতে মা নাকি ছেলেপোঁতা খালের ধারে যাচ্ছিল। বাপ তখনও বেঁচে। বিছানায় একেবারে মিশিয়ে দিয়েছে রোগ। তা অমন নিশিতে নেত্য মোড়ল ধরে ফেলে। নেত্য মোড়ল খদখদে কালো ছোটখাটো মানুষ। মাথায় মস্ত টাক। জমি জিরেত পেয়েছে অপুত্রক মামার। বাপও কিছু কম ছিল না। বৌ মরতে আর বিয়ে করে নি। ঝাড়ফুঁক. তুকতাক জানে। গরু ছাগল মোষের চিকিৎসেও করে। এখন বিছানায় পড়ে ধুঁকছে।

তা সেই অমাবস্যার নিশিতে হৈ হৈ কাণ্ড। হ্যারিকেন টর্চের আলোর ছড়াছড়ির সঙ্গে পাড়া ভেঙে মানুয। আঁচল লুটিয়ে মা হাউমাউ করে কাঁদে। লোকের পায়ে পড়ে। বলে, 'বিশ্বাস কর, আমি ডাইনি লই। অহল্যের বাপের লেগে আমি গোঁসাইয়ের কাছে পূজো দিতে যেছিলম। মোড়লই বলেছিল। পুজোর লেগেই লতুন সরা, জবা ফুল, নতুন কানি। আমার কথা শুন তুমরা! মোড়ল 'দাঁড়িন ছিল আঁধারে। আমার পিছাতে এসে তাবাদে কুকথা শুনুতে থাকে। বলে, খামার ঘরে চল। পুজো দিতে হবে না। রেতে ঘর থেকে বার করার লেগে বলেছিলাম। আমার হাত ধরে চিপে। বলে, রানী করে রাখব। তাবাদে আমি যখন রাজী হই না, চিচাঁব বলি, তখুনই বলে, তবে রে' শালী, তুর ব্যবস্থা করছি। বিশ্বেস কর, ই মোড়লের কারসাজি। আমি ডাইনি লইগো," মোড়ল চেঁচায়। প্রতিবাদ করে। পড়শীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

তবে মায়ের ইজ্জত বাঁচে বটে, কিন্তু বাপ বাঁচে না অহল্যের। কদিন পরেই আবার নেত্য মোড়লের দশবছরের ছেলেটা মারা যায়। মোড়লের অভিযোগ এর ফলে সোচ্চার হয়ে ওঠে, 'তখন তো মাগীর কথা শুনেছিল সবাই। ইবার কি হল! অ্যাঁ, আমার ছেলে খেল না। শালীকে তাড়াব গাঁ থেকে!' নেত্য মোড়লের কিছু সঙ্গীও জোটে। তবে তাড়ানো যায় নি। মামা আরও পাড়ার কয়েকজন রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু ডাইনি নামটা সারা গাঁ জুড়েই মানুষের মনে

থাকে! কারও ঘরে উঠোনে দাঁড়ালেই কচি ছেলে আড়াল করে।

অহল্যে মাকে বলে, 'অ মা, তুকে কেনে ডান বলে!'

মা আখ্যানটা শুনিয়ে বলেছিল, 'মোড়ল এমুনটি করেছে বিটি!'

'হ্যাঁ মা ডানে নাকি রক্ত শুষে খায়! দূর থেকে কেমুন করে রক্ত শুষে।'

'জানি না!'

'কেমুন করে ডান হয় মা?'

'জানি না বিটি। উ সব বলিস না। আমার ডর লাগে।'

'তুমাকে সবাই ডান ভাবে!'

'ভাবুক।'

'আমার যি রাগ হয়। ডান যি খারাপ বটে। লুকের যি সর্বনাশ করে!' ·

'আমি ডান লই বিটি। আমি তুর মা বটি।'

তবে মায়ের চেহারা হয়ে উঠেছিল ডাইনির মত। রোগ মেয়েমানুষকে মাসখানেক বিছানায় ফেলার পর যখন দাঁড় করাল, তখন প্রেতিনীর মূর্তি ধরেছে মা। মাথার সব চুল পেকে শনের মত। শুকনো, উড়ে মুখে পড়ে। লিকলিকে হাত-পা। চোপসানো বেলুনের মত স্তনদ্বয় পাঁজরা উঁচু হাড়গুলোয় চিটিয়ে লাগা। গর্তের ভিতর ড্যাবড্যাবে চোখের চাউনিতে কেমন যেন ভয় ধরান উদগার। সবকিছুতেই বিরক্তি রাগ। সারা পৃথিবী বুঝিবা মেয়েমানুষের শত্রু। অহল্যের প্রতি স্নেহহীনা। তা ওভাবেই মা মারা যায়। মায়ের ওই চেহারা, শুকনো অস্পষ্ট বিড়বিড়ানি। তীব্র জ্বালাময় চাউনি, অহল্যে অনুভব করেছিল, মায়ের মধ্যে এক ডাইনি জায়গা নিয়েছে। এবং পূর্ব স্বামী গোপীর মৃত্যুর পর সে অনায়াসে ভেবে নিয়েছিল একদিন সেও মায়ের মত হবে। ওই রূপ, ওই জ্বালা, ওই ক্ষুধা নিয়ে আর এক ডাইনি। কাউকে সে বলে নি। বলার মত মানুষ তো নেই। মাসি, মামী, ফুল, চিনি, লোটন কাউকেই সে বলার যোগ্য মনে করে নি।

রাস্তার মাঝে বংশী মুখোমুখি ধরতে বলেছিল, 'আমাকে সাঙা করার কথা ভাববে নাই। তুমার খেতি হবে যাবেক।'

'খেতি কিসের। লাভের লেগে। সাঙা করব। আমার লাভ হবেক।'

'তুমি জান না।'

'খুব জানি। না কারো না।'

বংশীর মুখে মৃদু হাসি। দুচোখে ঠিকরে পড়ছে তাকে পাবার আগ্রহ। পুরুষের সেই দৃষ্টিতে কি যে ছিল, অহল্যে না করতে পারল না। রক্তের প্রবল জোয়ার, কামনার সুতীব্র বেগ তাকে ফেলে দিল এক স্রোতস্বিনীতে। তারপর দিব্যি ভেসে যাওয়া স্রোতের দুর্মর টানে। অতীত হামলাতে পারে না। দু-ছেলেমেয়ে, তাদের বাপ, রান্না, খাওয়া, চাষের সময় ধান পুঁতুনির কাজ বংশীর আহ্লাদী বৌয়ের জীবন।

বংশীকে বাপের নামে শামুকখোল মৌজায় সরেস চার বিঘে জমি থাকার সংবাদটা দেয় তহশীলদার সত্য দাস। তহশীলদার মানে গোমস্তা। সরকারি খাজনাপত্র

আদায় করে। আগের গোমস্তা অম্বিকা সিংহ মারা যেতে সত্য দাস চাকরিটা পায়। তার ফলেই ফাঁস। নইলে কে আর দলিল দস্তাবেজ দেখতে যায় জমির অফিসে। সত্য পাশের গাঁয়ের। কালো, ঢ্যাঙা, ম্যাট্রিক পাশ। ঘরে মা, চার চারটে বোন। জমি অবশ্য কিছু আছে। বংশীকে চুপিচুপিই সে বলে, 'তুমার বাপের নাম কালীচরণ ছিল না?' বলতেই ঘাড় কাৎ করে বংশী। সত্য বলে, 'ঠিক ধরেছি, ভুবন জ্যাঠাও বললেক। ত' চাষ করত তোমার ওই ঘোষালদের জমি?'

'হ্যাঁ, তা হয়েছট কি! মরা বাপ আবার কি করলেক!'

'চুপি চুপি বলছি। গুপন কথা। আমি বলেছি, বলবে না কিন্তুক!'

'আহা কথাটা কি বটে?'

'তোমারই লাভের কথা। কিন্তু বললেও ডর। আবার না বলেও পারছি না। তোমার বাপকে বুড়ো বয়সে মেজ ঘোষাল মেরে তাড়িয়েছিল, মনে আছে।'

'শালা। আমি তখুন ছুটু। লাও খোলসা করে বল। ডরের কুছু নাই।'

'তোমার বাপের নামে শামুকখোল মৌজায় চার বিঘে জোল চাপান আছে। ঘোষালরা বেনামীতে রেখে ভোগ কবছে।'

বংশী থ হয়ে যায়। বাপের নামে জমি। ঘোষালরা অনেক জমি জিরেতের মালিক। নারায়ণ ঘোষাল মারা যাওয়ার পর জমিদার পত্তনিদার স্বত্ত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘোষালবাড়ি ভেঙে চুরে একসা। পুরনো দালানকোঠা, ইটের দেওয়াল ঘেরা খামার, অমন পেল্লাই ধানচালের গোলা, দাপট সবই। দু ঘোষাল তো বার্ণপুরে থাকে। গাঁয়ে এক ঘোষাল। পরিবারটির অবস্থাও শোচনীয়। এক ছেলে চন্দ্রনাথ ঘোষালের। লেখাপড়া শেখে নি। জমি দেখে।

'কি হল! বুঝতে পারলে আমার কথাট!'

'তা পারলাম বৈ কি!'

'খতিয়ান, দাগ নম্বর, তুমি জি. এল. আর. ও. আপিস থেকে বার কর।'

'কিন্তু বাপ কুথা জমি পাবে।'

'হাঁদা ইকেই বলে! বলছি না, ঘোষালরা বেনামীতে রেখেছিল। এখনও ভোগ করে যেছে। তুমি আপত্তি দিলে উ জমি তোমার হবে।'

বুকের মধ্যে চিনচিন করে জমির আকাঙ্ক্ষা। বলে, 'দেখি ভেবে চিন্তে।'

'পাঁচকান যেন করো না।'

অহল্যের কাছে বংশী বলে, 'ধুৎ শালা, আমি উসবে নাই। বাপের নামে জমি রইছে। তা বাপের বিটা বলে, আমার হক্ আছে ঠিকই। কিন্তুক বাপ জমির মালিক হল কেমুন করে? পেটপুরে ভাত পেতম না—তা জমি! তবে হ্যাঁ, শালারা বাপকে বুড়ো বয়সে মেরে তাড়িনছিল। তখুন যদি—।'

অহল্যে বলেছে, 'তা হক্কের ধন ছাড়বে কেনে?'

'হক্কের ধন হছে কি করে? বাপ কুথা থেকে জমি পেনছিল?'

'মানুষ যিখান থেকে পায়। বাপের বাপের ত থাকতে পারে!'

'না।'

'তুমি ত খুবি জান?' অহল্যে মুখ ঝামটা দিয়েছে, 'জমি কারও লিজের থাকে। পিথিমির মাটি যার অধিকারে, তারই ভোগে লাগে। তা বাপ কিংবা বাপের বাপের কাছে সি অধিকার ঘোষালরা কেড়ে নিন্‌ছিল কি না সিটিই জানলে কেমুন করে?'

'ধুৎ শালা, আমি উসবে নাই!'

ছলকে হেসেছিল অহল্যে, 'বল, মুরোদ নাই।'

'কি! মুরোদ নাই আমার!'

অহল্যেকে তখন কৌতুকের হাসিতে পেয়েছে। মাথার চুল খোলা, ঘোমটা খসা কপালে লাল টুকটুকে টিপ, ঝকঝকে দাঁতের সারি; অহল্যে মাথা নাড়ে, উপচে দেয় হাসির ফেনিলতা, 'মুরোদ নাই। মুরোদ নাই।'

'কি মুরোদ নাই।'

'দেখি কেমুন উ জমি লিজের করতে পার।'

'তাহলে বলে রাখছি শামুকখোলের চার বিঘে জমি আমি লুবই।'

কৌতুকটা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে অহল্যে ভাবে নি। কথাটা সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ঘোষালদের কান বরাবর চলে যায় জি. এল. আর. ও. অফিসে বংশী খোঁজাখুঁজি করতে।

চন্দ্রনাথ ঘোষাল ধবধবে ফরসা, কাঠিসার চেহারায় লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবি চড়িয়ে চোপসানো গাল, পুরু কাচের চশমা নাচিয়ে বলে যান, 'বংশে বাড়াবাড়ি করিস না। ধম্মে সইবে না। নামে জমি রেখেছিল বাবা। তা বলে কি তোর বাপের জমি হয়ে গেল। চন্দ্রসূর্য উঠছে এখনও।'

অহল্যের কানে যায়, চন্দ্রনাথের বেটা শ্রীনাথ তড়পে বেড়াচ্ছে, শালা বংশের লাশ ফেলে দুব আমি। অহল্যে মানুষটার দুকাঁধ ধরে আকুল হয়ে পড়ে, 'শুন জমিতে আমাদের কাজ নাই। তুমাকে ঠাটা করছিলুম। রহিস্যিও তুমি বুঝ না। পায়ে পড়ি তুমার—ছাড়ান দাও। উ জমিতে লুভ করো না।' বংশী কিন্তু সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসে না। অহল্যে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নিশিকালে বুকের মধ্যে জড়িয়ে থাকে লতার মত। বলে, 'তুমার কত খেমতা। বিশ্বেস কর, আমি মানি। ডরে আমার বুক কাঁপছেক। ভাল হবেক নাই। তুমি উ জমির লেগে অমন করো না।' বংশী অভয় দেয়। যেন জমি পাবার আকাঙ্ক্ষা, বাপের হক্‌, ফেরানর জেদ, ঘোষালদের আপত্তিতে অধিকারের পোক্ত কাঠামোতে কামড়ের জ্বালা, পাড়ার কিছু সমর্থক এবং অসমর্থকের মন্তব্য, ঋষি মণ্ডলের, 'আমি বাবা ওসবে নাই, তখন বর্গাদার হলি না' বিরূপতায় ক্রোধ এবং স্বীয় শক্তি, অধিকার করে দেখানর প্রবৃত্তি, তাকে শুধু বলায়, 'আহা ডরের কি আছে! কাগজে কলমে হক্‌, কুন শালা কি করবেক!'

অহল্যে বোঝাতে পারে না। বংশীকে রোগে ধরে নি, সাপেও কাটে নি, কিন্তু এটা তো ঠিক, সে ডাইনি মায়ের বিটি, স্বামীকে গ্রাস করতে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর

দিকে! তাকে অমন করে হাসানো, মজা করা, জেদ চড়িয়ে দেওয়া, সে তো অহল্যের ভেতর আর এক ডাইনি অহল্যের কীর্তি। গাঁয়ে কত কি ঘটছে। হারুর বৌ গলায় দড়ি দিল। চাঁপির বিয়ে হল। গাছ থেকে পড়ে হাসপাতালে গেল টাঙ্গি। শাশুড়ী বৌয়ের ঝগড়ায় আলামাসির ঘরে সেদিন রক্তারক্তি কাণ্ড। কিন্তু অহল্যের মনে হয়, পুকুর ঘাটে, পড়শীদের মধ্যে, মামাদের ঘরে, সর্বত্রই সর্বদাই কেবলই ওই জমির কথা। যেন গাঁয়ে ওটা ছাড়া সংবাদ নেই। শ্রীনাথ যেমন করেই হোক, বংশীর লাশ ফেলবেই। অহল্যে বুঝি সেই লাশও প্রত্যক্ষ করে।

চৈত্র বড় জ্বালাপোড়ার মাস। প্রকৃতি যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। ঝরাপাতা শুকনো খড়কুটো ধুলোবালি নিয়ে এলোমেলো বাতাসের শনশনানিতে বারবার মাথা কোটে। রোদের তাপ এবং উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে আকাশ পৃথিবীর মাটি আর জলীয় সব উপাদানের দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তার মধ্যে পশ্চিমের রাগী রুদ্র কালবৈশাখী আকাশমাটি একাকার করে দিয়ে ভাঙচুর, ওড়াপড়ায় কখনও মৃদু কখনও প্রচণ্ড বারিপাতে চৈত্রকে উপহার দেয় কোনো স্নিগ্ধ গোধুলি। অবসন্নতায়, শ্রান্তিতে বাতাসে তখন আদুরে পালক। স্বকীয় ক্ষতে দেয় স্নেহের প্রলেপ। সিক্ত মাটি থেকে উঠে আসে মিষ্টি গন্ধ। পশ্চিমে সোনার থালা থেকে গড়িয়ে পড়ে অপূর্ব বর্ণসুযমা।

অহল্যে এমনি শেষবেলায় নতুন পুকুরের দিকে যাচ্ছিল। গায়ে জড়ান নীল ডোরা শাড়ি। মাথার চুল এলো। নতুন পুকুর গাঁয়ের উত্তরে। চারপারেই লম্বা লম্বা তালগাছ। বাঁদিকে আমের বাগান। ডাইনে কিছুটা দূরেই বানপুরের শুরু। নতুন পুকুরের ঘাটে নামতে যেতেই শ্রীনাথের সঙ্গে দেখা। উঠে আসছে পুকুরঘাট থেকে। চাতাল পুকুরের মাঝখানে ধরা আছে কিছুটা জল। দল শ্যাওলা পদ্মপাতা নেই। ঘোলাটে বর্ণ জলের। ডাইনে আর একটা ঘাট। শূন্য। একটা বাছুর শুধু জলরেখার সামান্য উপরে ঘাস হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অহল্যের চমকিত দৃষ্টি এসব পড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনাথের লুঙ্গির উপর গেঞ্জি, রোগা শ্যামলা চেহারায় অবিন্যস্ত চুলের মাথা এবং খোঁচা দাড়িগোঁফের মুখখানাও পড়ে নেয়। তারপরই সে বলে, 'শুন।'

শ্রীনাথ থমকে যায়। অহল্যের গায়ের উপর জড়ান পাত্‌লা শাড়ীর আচ্ছাদনে বুকের চূড়া, এবং দেহরেখায় রমণীয় মুদ্রায় কয়েক মুহূর্ত বেভুল হয় বুঝি। অহল্যে গাঁয়ের মেয়ে। বৌও বটে। অপরিচিতা নয়।

'তুমি নাকি লাশ ফেলে দুব বলেছ!'

মুহূর্ত রূপান্তর ঘটে দৃষ্টি এবং মুখমণ্ডলের। শাণিত ইস্পাতফলক বুঝি রৌদ্ররেখায় উজ্জ্বলতা নিয়ে ঝলসে ওঠে, 'জমিতে হাত বাড়ালে—। এই জল পড়ছে, লাঙল দিতে নামলে ওই মাটিতে শুইন দুব। হাঁ বলে রাখছি। ভাতারকে তুর বলে দিবি! দাগ নম্বর দেখে সিদিন মাঠে ঘুরঘুর করছিল। তা আমি গাঁয়ে ছিলম্ না। থাকলে।' শ্রীনাথের চোখের তারা ঠিকরে আসে। আলগা শাড়ির

যুবতীর সৌন্দর্য নয়, সে দৃষ্টিতে মুখভঙ্গিতে ক্রোধ এবং শাসানি ছুঁড়ে দেয়।

অহল্যে নড়ে চড়ে। বুকের আঁচল টানে। বলে, 'আইনে কিন্তু আমাদের'।

'হ্যাঁ, তোর ভাতারের বাপের। বলি, দাঁড় করালি কেনে?'

অহল্যে হাই তোলে। বলে, 'তুমার লেগেই গো।'

শ্রীনাথ বিড়বিড় করে উষ্ণ জল পেয়ে বেরিয়ে আসা কেঁচোর মত, 'ঢঙ্। বলি ঢঙে আমাকে ভুলুতে পারবি নাই। আমি সে পাত্র লই।'

'ওমা!' অহল্যে হাসে, 'ভুলুতে ত চাই নাই। বলি, আমাকে চিন!'

শ্রীনাথ উত্তর দেয় না। বিস্ময়ের চাউনি তার।

'আমার মা ডান ছিল। মরার আগে বিদ্যেট—।'

শ্রীনাথের পলক পড়ে না। সে রূপসী যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকে। মুগ্ধতা নয়, তার মুখমণ্ডল জুড়ে নেমে আসে এক আতঙ্কের ছায়া। ঘনঘন শ্বাস পড়ে। হৃৎপিণ্ড নাচতে থাকে প্রচণ্ড বেগে। ক্রোধ দ্রুত রূপান্তরিত হয় শঙ্কায়।

'আমি বাণ মারতে পারি। মন্তর পড়ে ঘরে বসে রক্ত শুষতে পারি। ওই যি দেখছ মরা খেজুরগাছট, কেনে শুকোল জান?' অহল্যে খলখলিয়ে হাসে। পুরুষের পরিবর্তন তার শরীর ভাঙচুর করে মাথার চুল দুলিয়ে যেন সশব্দ হাসির আঁচলা ছুঁড়ে দেয়।

'আঁ।' শ্রীনাথ হতচকিত।

'আমি পরীক্ষে করে দেখলম, ওই খেজুরগাছটতে সিদিন রেতে। তার লেগে বলছিলাম! ওমা অমন করে দেখছ কি! আমার মানুষের লাশ পড়লে তুমার—।' আবার হাসি খলখলিয়ে ওঠে অহল্যের। যুবতী দেহরেখা যেন ভেঙে পড়তে চায়। মাথার চুল সাপটে সরিয়ে তারপর বড় বড় দুটি জ্বলন্ত চোখ ঠিকরে আসে, 'কি গ কথা নাই!'

শ্রীনাথ দাঁড়ায় না। বেগে বেরিয়ে যায়। অহল্যের হাসি যেন তাড়া দেয়।

ঘটনার প্রতিক্রিয়া উঠোনে সন্ধে একটু গড়াতেই টের পাওয়া গেল। আকাশের আঁধারে চাদরের গায়ে তারার ফুল ঝিকিরমিকির করছে। কালবৈশাখীর এক ঝাপটা বারিপাতে বাতাস হিমের স্বাদে টইটম্বুর। অহল্যে ছেলেমেয়ে দুটোবে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। তাদেরও খাওয়া হয়েছে। এ্যালুমিনিয়ামের এঁটো থালাবাটি জড় করে বাইরে থেকে হাত ধুয়ে সবে মাত্র ঘরে ঢুকেছে। এমন সময় কয়েকটা গলার শব্দ, 'বংশী। এই বংশী। ঘরে রইছিস্।'

শামুকখোল মৌজার চার বিঘে জোলজমির কাছে ডাইনির ভয় তুচ্ছ। শ্রীনাথের একটা মওকাও বটে। সে সঙ্গী জোগাড় করে ছুটে এসেছে। অহল্যে নিজেই স্বীকার করেছে, সে ডাইনি, তখন অমন মেয়েমানুষকে গাঁয়ে রাখা যায় না। তাকে সকলেই সমর্থন করবে। সঙ্গে সঙ্গে বংশী জব্দ। তবে কি না ভয় আছে! ডাইনি মেয়েমানুষ রক্ত শুষতে পারে। ঘরে বসে মন্ত্র আর বাণ মেরে সর্বনাশ ঘটাতে পারে। ঘরে সে মা কিংবা ছ-মাসের পুত্র সন্তানের জননী তার

যুবতী বধূটিকেও বলে নি। দরকার নেই। শুনবে এখন। তার আগেই অবশ্য গাঁ ছাড়া করা যাবে ডাইনি মাগীকে। সঙ্গে সঙ্গে বংশীকেও।

বংশী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই শ্রীনাথ বলে, 'বংশী, বৌ তোর ডান'।

বংশী দেখে নেয় শ্রীনাথের চার সঙ্গীকে। বামুনপাড়ার মুকুন্দ, স্বাধীন, অনিল আর চক্রবর্তীর ছোট বেটা পিঙ্কু। শ্রীনাথের মতই এরা স্কুলের পাঠ চুকিয়েছে। অনিল পুজো করে বেড়ায়। মুকুন্দ হাটে দোকান বসায়।

বংশী বলে, 'ডান বটে! কে বলেছে।'

'তোর বৌ নিজে বলেছে।'

'জমির হকের লেগে লাগতেই বৌ আমার ডান হয়ে গেল। বাঃ বাঃ।' বংশী বিদ্রূপের সঙ্গে বলে, 'উ সব বলে হক্ থেকে সরাতে পারবে না।'

'শুধো। তোর বৌকে শুধো।'

'শুধোব আবার কি! আমি জানব নাই! ডান হলে রেতে উঠে বাট বাইতে যাবেক। লালপেড়ে শাড়ি পরে মাথার চুল এলো করে নীচে মাথা, পায়ের তলা চেটোতে আগুন জ্বলা মালসা লিয়ে ছেলেপোঁতা খালের ধারে আমাবস্যেতে ছুটবেক। আমি জানব নাই! ডান হলে আমার ছেলেমেয়ে দুটোকে খাবেক। গাঁয়ের লুককে দিষ্টি দিবেক—দিন্ছে?'

শ্রীনাথ বলে, 'অত বকবক করিস্ না। অহল্যে নিজে কবুল করেছে। উর মা মন্তর দিন গেইছে। জোলের আলে খেজুরগাছটাতে মেয়েমানুষ পরীক্ষে করেছেক। ঘরেই ত রইছে, শুধো কেনে!'

অহল্যে বেরিয়ে আসে উঠোনে। বলে, 'হুঁ। ডান বটি। কিন্তুক লুকের ক্ষেতি আমি করি না। আমার সোয়ামীর ক্ষেতি করলে আমি ছাড়ব নাই।'

'শুনলি—। শুনলি বংশী।'

বংশী বিস্মিত গলায় আর্তনাদের মত বলে, 'কি বলছিস্!'

শ্রীনাথ চেঁচায়, 'ঠিকই বলছে। মাগীর রূপ যৌবনে তুই ভুলে আছিস। জানিস্ না গোপীকে ওই মাগী সাপের রূপ ধরে কেটেছে। উর মা উর বাপকে চুষে খায় নাই? তুর ত পেটে বাজে! কেনে বাজে? তুর ছেলেটর রুগ ভাল হছে নাই! কেনে? রুগ বটে না রক্ত শুষছেক। বল্ বল্।'

অহল্যে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই গো অমুন কতা বলো না।'

'চুপ কর মাগী।'

শ্রীনাথের দাবড়ানির প্রতিবাদ করে না বংশী।

'ঠিক আছে, কাল সকালে ব্যবস্থা হবে, কিছু বল অনিল।'

'তুমিই ত বলছ।'

'গাঁয়ের পাঁচজনাকে ডাকা হোক।'

'বংশে, মাগকে নিন্ যাবি।'

শ্রীনাথ বলে, 'আজ তুমার মাগ আমার দিকে তাকিন্ছিল্। খিলখিলিয়ে

হেসে বলেছিল, ডান বটি। তাবাদে গায়ে কি ব্যথা?'

পিঙ্কু বলে, 'চল। চল। কাল ব্যবস্থা হবে।'

বংশী কথা বলে না। ওরা চলে যায়, তবু বংশী উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকে। পড়শীরা কেউ এগিয়ে আসে নি। তবে কি না অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুনেছে। কাল সকালেই সারা গাঁ ছড়িয়ে যাবে। বংশীর সে ভাবনা নেই। একটা মুগুর যেন মাথায় মেরে থেৎলে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সারা আকাশ জুড়ে আলোর বিন্দু। মাটির পৃথিবীতে কিন্তু তাল .তাল অন্ধকার জড়িয়ে থাকে।

অহল্যে ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে, 'মিথ্যে! সব মিথ্যে। তুমাকে মেরে ফেলবে উরা। আমি জানি, গুণ্ডা আনছেক বেহার থেকে তারি লেগে মিথ্যে বলেছিলম। ডান বলে ভয় দিখাছিলম। তুমি বিশ্বাস কর।'

বংশী সাড়া করে না।

'এই—এই তুমি বিশ্বেস করছ নাই।' অহল্যের আকুলতা কান্না হয়ে নামে, 'আমি ডাইনি লই গো। বিশ্বেস কর, আমি ডাইনি লই।'

অহল্যের মা ডাইনি হয়েছিল, কিন্তু স্বামী বাঁচে নি। অহল্যের স্বামী বাঁচল। পাঁচশ টাকা নিয়ে চার বিঘে জমি বিক্রির কবলা লিখে দিল বংশী। ছেলেমেয়েদুটোকে দিয়ে এল বোনের বাড়িতে। অহল্যের মামার ঘরের পাশে পুরনো ঘরে ঠাঁই হল। পড়শীরা গাঁয়ের লোক জানল, অহল্যে ডাইনি। অহল্যেকে দেখলে কোলের ছেলে আড়াল করে সব। বুকে থুথু লাগায়।

নাড়ু মাস্টার শুধু বলেছে, 'বংশেটা এত মুখ্যু তা ত জানতাম নাই। হারামজাদা ডাইনি আবার কি রে! আঁ শ্রীনাথের প্যাঁচ বুঝলি না!'

বামুনপাড়ার সুব্রত বলেছিল, পাড়ার ছেলেদের 'কি রে বংশীকে বোঝা, ডাইনি বলে কিছু নেই। ছিঃ ছিঃ তোরা কি রে।' কলকাতা থেকে সস্ত্রীক নাড়ু মাস্টারের অধ্যাপক ছেলে এসেছিল বাবার অসুখে। কলকাতায় কাজের লোকের বড় অভাব। অহল্যেকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিতে ওর এম.এস.সি. পাশ শিক্ষিকা স্ত্রী, সদ্য জননী দীপ্তি বলল, 'না, ওসব মতলব করো না!'

শ্রীনাথ সন্ধেবেলায় অহল্যেকে কাছে টানার চেষ্টা করতে কামড় খেল!

অহল্যের শরীরে এখনও মাংস মেদ, চুলের বর্ণ কুচকুচে কালো। দেহরেখার ছন্দে অমিত লাবণ্য! যুবতী! অতি দ্রুত এ-সবের বদল ঘটবে। মাথার চুল শনের মত, চোখের তারা বিস্ফারিত, হাড়ের কঙ্কালে বীভৎস রমণী হয়ে সে ঘরের দাওয়ায় বসে থাকবে শীত গ্রীষ্ম বসন্তে। কাঁদবে চুল এলো করে। ক্ষুধায় চেঁচাবে, পেট পুড়ে গেল গ, কুছু খেতে দাও। সভয়ে এড়িয়ে চলবে পাড়ার মানুষ! তারপর একদিন মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে। অহল্যে নামে ডাইনি ছিল, এমনই একটি কিংবদন্তী হয়ে।

আতরবালা

আতরবালার মেয়ে নয়নাকুমারী কোমর দুলিয়ে যায়! আন্দোলিত বাহুতে, হাতের পুরুষ্টু আঙুলে একই মুদ্রা। ক্ষুদে আসরের চিলতে পরিসরটুকুতে সঞ্চালিত হয় দেহখানা। অতি স্বচ্ছ টেরিকটনের লালচে ফুল শাড়ির আঁচল উড়ে যেতে চায় পাখির ডানার মত।

নয়নাকুমারীর দেহখানা কিন্তু পাখির মত লঘু নয়। বরং যথেষ্ট ভারী। যুবতী রেখার টানটান সবই এখন থ্যাবড়ানো। তিন সন্তানের জননীর ভাঙচুর অবয়বটিতে আলগা স্বচ্ছ শাড়ির ঘেরাটোপ ছেঁড়া ঘুড়ির মত ঝুলে থাকে। মুখখানার বোঁচা নাকে, গালে অতিরিক্ত পাউডার ঘষার স্বাক্ষরে, বড় টিপে, কানে পেতলের বুনোফুল ঝুমকোয় আকর্ষণীয় করার ব্যর্থতাকে হ্যাজাগের জোরালো আলো যেন বিদ্রূপে খান খান করে।

নয়নাকুমারী শুধু ঘুরে ঘুরে কোমর দুলিয়ে যায়। হারমনিয়াম নিয়ে বসা মায়ের গানের কথার শেষ টানটুকু নিয়ে সুর দীর্ঘ করে—'পীরিত করা নাগররে কেনে বুকের পানে চাও। বুকের মাঝে ফুল ফুটেছে, দাম দিয়ে কিনে লাও।' একরাশ রঙীন কাঁচের চুড়িপরা হাত দুখানা ঊর্ধে ওঠে, কোমর বন্ধে নেমে আসে। নয়নাকুমারীর কোমর দুলুনি থামে না। নয়নাকুমারী জানে, রূপ না থাক, মেয়েমানুষ কোমর নাচালে পুরুষ চঞ্চলিত হয়। পড়ে থাকা শেষ সম্পদটুকুও সে অতিমাত্রায় ব্যয় করে চলে।

হ্যাজাগের আলোর নিচে ক্ষুদে আসরের দর্শককুল হুসহাস বিড়ি টানে। ছিটকে দেয় উল্লসিত রসাল শব্দ—মরি, মরি, আহা বেশ বেশ, ঘুরে ঘুরে সখী, ঘুরে ঘুরে। ইবার লাগাও দেখি সোনামুখী, বোল রাধে বোল, সঙ্গম হোগা কি নেহি। হি হি হাসিও ওঠে। দর্শকের একজন উঠে কোমর নাচাতে শুরু করে দেয়। চেপে বসায় পাশের মানুষ। হাসির শব্দে গান হেরে যায়।

আতরবালার গলা থামে না। আতরবালার পাশে তার স্বামী, গোপীনাথ। যক্ষারোগগ্রস্তের মত ক্ষীণ, শুকনো। রসহীন আখের ছিবড়ের মত খোঁচা দাড়ি গোঁফের মুখ, রুক্ষ চুলের রাশ। সরু সরু আঙুল অসম্ভব দ্রুততায় ডুগিতবলার উপর নেচে নেচে যায়।

দর্শককুল সকলেই দিনমজুর, ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদে চাষী। কালোকুলো মানুষ সব। ভদ্দরজন নয়। স্থানীয় ভাষায়, ছোটলোক। গামছা কী চাদর গায়ের ঢাকনা। কারো বা গেঞ্জি, ছেঁড়া, চেয়েচিন্তে সংগ্রহ বেমানান শার্ট। কোমরে একচিলতে করে টেনা কী লুঙ্গি। মেয়েরাও আছে। দূরে দূরে। আটচালার বাইরে অন্ধকার

পিষে মারা জায়গায় জায়গায়। ঘোমটার ফাঁক পেরিয়ে চোখ এসেছে আলোকিত পরিসরে। পরস্পরের ঠেলাঠেলি, হাসির আভাসে চমৎকার উষ্ণতা। পৌষরাতের শৈত্য পায়ের নিচে পড়ে গিয়েছে। হু হু হাওয়ার ঝাপটা ব্যর্থ আঘাত হেনে চলেছে অবিরল।

আতরবালার ভাষাতে পঞ্চরসের আসর। কিন্তু ফুলপুরের বাগ্দী বাউরীপাড়ার বাসিন্দারা বোকা নয়। ঘরের মেয়েমানুষদের আসরে আসতে নিষেধ করেছে। গানের কথাতে খারাপ বুলি থাকে। ছিঃ ছিঃ বিটিছেলেরা বসবে কী! আতরবালাকে বলেছে, রাখ তুমার পঞ্চরস। নাচ আর গান এই ত বটেক। ঝাঁকসুও লয়। লেটো আলকাপও লয়।

আতরবালার ভারী দুঃখ হয়। পঞ্চরস হল পাঁচরকম গানের সমাহার। সুরু এর আসর বন্দনায়। দেবদেবীকে বন্দনা, এস মাগো সরস্বতী কথার দেবী তুমি / আসরেতে হও অধিষ্ঠান চরণ বন্দি আমি। তারপর পদাবলী কীর্তন। তারপর শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তির গান। নজরুল অতুলপ্রসাদের গান। তারপর রসের গান। আধুনিক, হিন্দী সিনেমার। প্রত্যেক গানের সঙ্গেই নাচ। এসব বোঝে ক'জন! আসর বন্দনাও করতে দেয় না। কথা, হি হি হাসি, আর লাগাও রসের গান।

কষ্ট হয়। ভারী কষ্ট হয়। হু হু করে ওঠে বুকের মধ্যে চৈতি রুক্ষ হাওয়া। অতীত যেন সহস্র ডানায় এসে তাকে আবৃত করে দেয়। ভারী মনোরম সেই আবরণ। পালকের মত হাল্কা হয়ে যায় তখন এই শরীর। শ্লথ মাংসপেশী, বলি রেখায়িত মুখ, অশক্ত হাত পা, শ্রমে ক্লান্ত রক্তমাংসের এই প্রৌঢ় অস্তিত্বটা।

কবে সেই কোন বালিকা বয়সে সে চলে এসেছে গানের জগতে। বাহাউদ্দিন খাঁয়ের 'মুরশিদ' দলে হাতেখড়ি নর্তকী হিসেবে। তারপর সে দল থেকে একের পর এক ঝুমুর দলে। মাথায় কলসি নিয়ে নাচ তার সঙ্গে সুরেলা সঙ্গীত তাকে সম্রাজ্ঞী করেছে। দেহে যৌবনের জোয়ার আকর্ষণ করেছে পুরুষপতঙ্গদের। আতরবালার নামে তখন ফেটে পড়ে গাঁয়ের আসর। তখন বাবা নেই। বাবা থাকার সময় তিনিও তো ঘুরতেন তার সঙ্গে আসরে আসরে। এ গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে। বাবা ছিলেন জাতে ব্রাহ্মণ। মা ঝুমুরদলের নর্তকী, জাতে বাগ্দী। বাবার নামডাকও ছিল বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে। নাড়ু ঠাকুর বলতে চিনত সকলে। পাঁড়মাতাল মানুষটির ঠোঁটে বাঁশি কিন্তু আসরে স্বর্গীয় ঝর্ণাধারা এনে দিত। গানের শিক্ষা বাবার কাছে। তা বাবার মৃত্যুর পর তো একা। কিন্তু কতটুকু একা তাকে থাকতে দিয়েছে। গান, আসর, যৌবন মিলেমিশে এক প্রবলতম বন্যায় ভেসে যাওয়া সে তখন এক ফুল। পুরুষ পতঙ্গের কেবলই লালসা। অর্থ। দেহ। ভালবাসাহীনতার সেই পঙ্কিল আবর্ত থেকে তুলে ধরল এই মানুষটা! নাকি ভালবাসা।

রোগা লম্বাটে মুখের এই পুরুষের যৌবনে হয়ত কিছুটা সৌন্দর্য ছিল, কিন্তু যুবতী মনে রেখা কাটবার মত ধারাল কিছুই ছিল না! হারমনিয়াম বাজাত

ভাল। জুলজুল চোখে চেয়ে থাকত অনুগ্রহ প্রার্থীর মত। কিছু করে দিতে পারলে যেন কৃতার্থ হয়ে যেত। আতরবালার ঘুরঘুর করাটা যেমন বিরক্ত করত, তেমনি ভালও লাগত। কিন্তু ঘটনা মোচড় নিয়ে বসল গোপালগঞ্জে! গোপালগঞ্জে জমিদার বাড়ির ছোটবাবুর ডাকে সে সন্ধ্যার আবছায়ায় যখন যাচ্ছে তখন এই মানুষটা আটকাল, যেও না, উখানে যমুনা গেইছে। যমুনা ঝুমুর দলেরই নর্তকী। সুন্দরী। দলের মধ্যে ওকেই ঈর্ষা করত সবচেয়ে বেশী আতর। শুনে রক্ত তার আগুন হয়ে গিয়েছিল। দ্রুত ঘুরে বলেছিল, তাহলে কী তুমার কাছে থাকব? মানুষটা ভয় পাওয়া গলায় বলেছিল, না খাঁদু, উখানে গেলে তুমার অপমান হবেক। তুমি সইতে পারবে না। আমি শুনেছি যমুনার সামনে ছোটবাবু তুমাকে বলবে, যমুনা আছে, তুমি যাও। শুনে আতরবালার পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল। বাবার ডাকা সেই খাঁদু নামটাও মানুষটার মুখে অমৃতের স্বাদ এনে দিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল আতরবালা সবকিছু। গোলাপগঞ্জের রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে মাথায় নক্ষত্র নিয়ে তার শুধু মনে হয়েছিল, এ কে! এ পুরুষ তাকে ভালবাসে! তার যৌবন বিক্রি করতে গিয়ে অপমানিত হবার ঘটনা থেকে এর কোন প্রবৃত্তি রক্ষাকর্তা হয়েছে! আতরবালা ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শুধু বলেছিল, তুমি কী? তুমি কে বট? কে বট গো? ওখান থেকে ফিরে সে গান করেছিল। হারমনিয়াম বাজিয়েছিল এই মানুষটা। আসর ছিল না সেদিন! কোন শ্রোতা না। তবু জীবনে সেই প্রথম এবং শেষ আসর আতরবালার, যেখানে সে পরম পরিতৃপ্তির সুরধারায় স্নাত হয়েছিল। যে আসরের উপহার তার রক্তধারায় অসহ্য পুলক এনে দিয়েছিল।

জন্ম নিল নয়না। কিন্তু গান রয়েই গেল। পট পরিবর্তিত হল। ঝুমুর লুপ্ত হল। মেয়ে বড় হল। বিয়ে হল। তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে জামাই দয়াল তারপর বছরখানেক থেকে বেপাত্তা। বাঁশি বাজাত দলে। বাবা মা কেউ ছিল না। দলে ভিড়েই পীরিতে মজেছিল নয়নার। তখন তারা গান গেয়ে বেড়ায় হারুর দলে। হারু মরতে দল লোপাট হয়ে গেল। ঘরে এল তাদের জামাই। পেট চলবে কেমন করে? তবে আতরবালা নিজের পরিবারকে নিয়ে পুরোন হারমনিয়াম জোগাড় করে বানিয়ে ফেলল দল। নয়না নর্তকী। দয়াল গেল, যাক। কী যায় আসে তাতে! নিরাপত্তা ভবিষ্যৎ তো জীবনে মস্ত কিছু নয়। দারিদ্র্যই সাথী। যৌবনে অর্থ সঞ্চিত হয়নি। সঞ্চিত হয়েছিল পুরুষ সম্পর্কিত ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতা। তার মূল্যই বা কী! ঘর গেল। দল নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা তারপর থেকে। পেট খোরাকি আর আট টাকা আসর পিছু রেট। গানে কেউ খুশী হলে দু'একটাকা উপহার দেয়। বাড়তি ওইটুকু। বিরক্তিকর অসীম ক্লান্তিভরা দিনের পর দিন এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে যাযাবরী জীবনের সঙ্গে এল্যুমনিয়ামের কালিপড়া হাঁড়ি, ছেঁড়া চাটাই, কাঁথা, কৌটো, থালা, বাটি, তিনটি ছেলেমেয়ে। পরিপূর্ণ চলমান সংসার।

আতর বাবাকে বলত—বাবা আমাদের ঘর নাই? কুন গাঁয়ে ঘর, বাবা?

বাবা বলত—আছে গো! আমি গোবিন্দ চক্রবর্তীর নাতি বটি। চল্লিশ বিঘে জমি আছে। ঘর দুয়োর গরু বাছুর!

আতরবালা বলত—চল কেনে!

—দাঁড়া যাব।

সময় হত না। নয়নাও বলত। ওর ছেলেরাও বলে। বড় হতে আতরবালা বুঝেছে। ওর মেয়ে নয়না বুঝেছে। ওরা বোঝে না। বুঝবে।

কষ্টের মধ্যেও আতরবালার মনের কোণে থাকে সঙ্গীত রসধারার এক অনাবিল মধুরিমা। সে চর্চা করে, রেডিওর গান পথে ঘাটে কান পেতে শোনে। কথাগুলো নিয়ে রেওয়াজ করে। সুর নকল করতে চায়। মনে হয় যৌবনে তার এমনই গলা ছিল। হায়, কেউ ধরে রাখতে চায়নি। মূল্য দেয় নি কেউ; এখন সামান্য মূল্য এই গানের সুবাদে পেলে সে বড় বিহ্বল হয়ে পড়ে।

ভূপেন মণ্ডল নিশাতপুরের বাউরীপাড়ায় বায়না দিয়ে বলল,—ভারী মিষ্টি গলা গো তুমার। টাকমাথা দুলিয়ে গেয়েও দিল বিগত রজনীর গান—আহা, দিদি আর কী আমার গোলাপগাছে ফুটবে গোলাপফুল। ঠিকই বটে। গুলাপ ফুটে না। তা গানে তুমার গুলাপ ফুটেছে।

শুনে শিরশির করে উঠেছিল শরীর। বলেছিল,—ফুলপুরের লুক তুমি। ফুলগাছের কথা তুমিই বুঝবে।

মাথা নাচিয়ে ভূপেন মণ্ডল বলেছিল, মুনে আছে তাজা ফুলটি হয়ে একদিন তুমি গেইছিলে ফুলপুর। সেই আতরবালাই তো বট তুমি!

ফুলপুর। মনে পড়েনি। কত গাঁয়ের কত আসরই তো চল্লিশ বছরের হাজারো রাতে সে মাতিয়েছে। কত ঘটনাই তো আছে। আসরে টাকা ছুঁড়ে মারা, ধরতে আসার চেষ্টা, সর্বস্ব পায়ে দেবার কথা বলা, আসর থেকে নৃত্যরতা অবস্থায় তুলে নিয়ে সুখ ভোগ করতে চাওয়ার কামুক উন্মাদও কম ছিল না।

আতরবালা ভূপেন মণ্ডলের মস্ত টাকখানার দিকে তাকিয়েছিল। বয়স হয়েছে। মোটা ঠোঁট। চাউনিতে ধূর্তামি। তবু কী না তার গানের গুণমুগ্ধ তো বটে।

—মশাইয়ের গানে ঝোঁক বরাবরই তাহলে! রসিক মানুষ বটেন।

—ওতেই তো সব গেল গো। ছেলেরা মানে না। বলে সব উড়িয়ে দিলাম। বলি তাতে তাদের কী! বাপের জমি বিচেছি। সবই তো লয়। এখুনও যে একুশ বিঘে রইছে, দেখ পরচাতে কার নাম।

—তাহালে মশাইয়ের জন্যেই গাঁয়ে আমোদ আহ্লাদ হয় এখুন।

—হেঃ হেঃ আমি তো নিমিত্ত গো। জুগাড়যন্ত করি।

—তাহালে বায়না দিচ্ছেন! টানতে পারবেন, না এক আসরেই ফুটুস্।

আতরবালা ভ্রু উঁচুতে তুলে আঙুলে টুসকি বাজিয়েছিল।

—বল, কিগো। এখন পৌষ মাস। মা লক্ষ্মী চারিদিকে ছড়ান। চাঁদা পড়বেক

ঢের। শীতের সাঁঝবিলাতে তুমার গান তাপ দিবেক। মিছে কথা লয়। বিবাক লুকের ছেঁড়া কানি। ঠকঠক করে জাড়ে।

আতরবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল—বড় দুখী সব গো। দেখে নিজের দুখ গায়ে বাজে না।

ভূপেন মণ্ডলের নিমন্ত্রিত এই সেই আসর। আতরবালার হারমনিয়াম সুর ছড়ায়। প্রাণমন ঢেলে দেয় সে গানে। এ আসর মাত করতে পারলে আগামী দিনগুলিতে আরও পাবে। অন্য গ্রামের নিমন্ত্রণও জুটতে পারে। না, পঞ্চরসের গানে আসর বন্দনার পরই সুরু করতে হয়েছে রসের গান। হিন্দী গানের আরজি আসছে। দুঃখ নেই সে জন্যে। হারমনিয়ামের রিড থেকে ঘাড় তুলে সে একবার মেয়েকে দেখে। ছুঁড়ি তিনটে ছেলে বিইয়েই বুড়িয়ে গেল। শরীরের চটক হারাল। সোয়ামী! ভালবাসা! ছাই! ছাই। মেয়েমানুষের শরীর যেমন সম্পদ তেমনিই শত্রু। বোঝে না। আতরবালা নিজে কী বুঝেছিল। আজ বোঝে। কিন্তু কেবলই তো হাহাকার—দিদি আর কী আমার গোলাপগাছে ফুটবে গোলাপফুল।

শীতের রাত ঘন হয়। অন্ধকার দুলিয়ে আসে হু হু হাওয়া। ঠান্ডার সুক্ষ্ম হাজারো তীর বিদ্ধ করে যায়। আসরের পাশে খড়কুটো জ্বালিয়ে কে যেন আগুন পোহানোর আয়োজন করে। লোক জোটে। ঘাড় কিন্তু ঘোরানো। চোখ কান আসরে। মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলে। সারা গাঁ ওদিকে সুষুপ্ত।

নয়নাকুমারীর শরীর যেন ভেঙে পড়তে চায়। সে মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছে সুর, গান। যন্ত্রের মত বাহু ওঠে নামে। আন্দোলিত হয় কোমর। শরীর ভাঙার টান টান করা বুকের আঁটুনি ছাপিয়ে মাংসল স্তনতরঙ্গ আর নাড়াবার চেষ্টা থাকে না। সায়ার ঘের ঘূর্ণিত বৃত্ত হয় না। তার মধ্যেই চোখে পড়ে ভূপেন মণ্ডলের চোখ তার শরীরে বুলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত টানের কোন তুলির মত। প্রথম নয়, বায়নার সময় থেকেই সে দেখেছে। মা বুঝছে না। কিন্তু সে বুঝেছে প্রৌঢ় মানুষটার মূল আকর্ষণ সে। ফুলপুরে আসার পর পরিচর্চার কামাই নেই। প্রস্তাব দেয়নি—দেবে। কিন্তু নয়নাকুমারীর মেয়েমানুষের শরীর যে কী ভীষণ অনাগ্রহী। কেবলই এক ব্যথাতুর অনুভূতি মূল স্নায়ুকেন্দ্রকে ঢেকে রাখে। তবু সে এগিয়ে যাবে। টাকা পাবে। কতদিন ভাল কিছু খাওয়া হয়নি। মানুষটা কতদিন তাকে ছেড়ে গিয়েছে।

নয়নাকুমারীর চোখে পড়ে আসরে কালিপড়া হাঁড়ির পাশে ছেঁড়া কাঁথায় ছোট মেয়েটা উঠে বসেছে। কান্নাও সুরু করেছে। নাচ বন্ধ করে বিবশ শরীর নিয়ে ঢপ করে সে বসে পড়ে। তারপরই শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত হাতে বোতাম খোলে ব্লাউসের। স্তন্যপান করাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয়। মজা নেই। সহসা নায়িকা কামনার উদ্রেক করতে করতে জননী হয়ে পড়ল, এতে দর্শককুল বিরক্ত হয় না। কেমন যেন স্তব্ধতা নেমে আসে। আতরবালার হারমনিয়াম, গান একযোগে বন্ধ হয়ে যায়। ডুগিতবলার বোল

থামিয়ে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে শীর্ণ মানুষটা।

আতরবালা ভূপেন মণ্ডলকে কাছে ডাকে। ফিসফিস করে বলে—আর দুটোর বেশি গান হবে না।

—আহা আর চারটে। তুমার গলা শুনে বুক ভরে যেছে। থেমেছ ত খাঁ খাঁ। ওই হাম তুম এক কামরামে বন্ধ হ্যায়, উ ট জান। আবার বোল রাধা বোল লাগাও। জব্বর তুলেছ তুমি মাইরি। মুনে হচ্ছে রেডিও শুনছি।

আতরবালার ক্লান্ত মুখেও হাসি ফোটে।

পরের দিন চাল ডাল আলু মশলা দিয়ে যায় ভূপেন মণ্ডল। আটচালার নিচে ইট পেতে উনুন হয়। বাগ্দীপাড়ার ছেলেমেয়েগুলো খেলা করে। স্বামী মানুষটা উবু হয়ে বসে বিড়ি ফোঁকে। আলাপ করতে আসে আশেপাশের দু'একটি পরিবার। শীতমোড়া সকাল পেরিয়ে নরম রোদের দিন নামে। চারিদিকে ধানের রোঁয়া ভরা বাতাস। পৌষের নিবিড় গন্ধ।

আতরবালা ভাবে, আজও আসর বসবে। কিন্তু কাল! কই উচ্ছসিত হয়ে কেউ তো আসে না। ভিন গাঁয়ের কেউ কী আসেনি? এখান থেকে যাবে কোথায়! ভূপেন মণ্ডল অন্য গাঁয়েও আছে। তা দেখবে শুনবে তবে তো ডাক দেবে। স্বামীর দিকে তাকায়। বড় নির্বিকার। বেঁচে আছে কী না নিজেও বুঝি জানে না। ডুগি তবলার সামনে বসলেই কেবলমাত্র প্রাণের যেটুকু সাড়া জাগে। তবু আতরবালা ফিসফিস করে ওই মানুষটার কাছেই বলে, হ্যাঁ গ ই গাঁয়ে আসর ক'দিন হবে!

—কে জানছেক।

—কাল জমেছিল ত ভালই।

—হুঁ। দশটা পয়সা দাও দেখি, বিড়ি আনব!

আতরবালা মুখ ঝামটা দেয়, মুয়ে আগুন লিয়ে খালি বসে থাকা।

শেষ দুপুরে আতরবালা পুকুর থেকে ফিরে এলে শুনতে পায় আঁকড় ঝোপের ওপাশে নয়নাকুমারীর হি হি হাসি। ভূপেন মণ্ডলের ফ্যাসফ্যাসে কথা। চমকায়। না তাকে দেখতে পায়নি।

—আহা কেক বটে, খাও কেনে। মাইরি বলছি, গাঁয়ে আর কিছু পেলাম না। লাও ধর।

—না-আমি খাব নাই।

—রাগ করব কিন্তুক। হুঁ। রেতে তোমার নাচ দেখতে আসব নাই।

—ইস, আমার নাচ যেন দেখতে আস!

—বুড়ীর গান শুনতে আসি নাকি?

ভূপেন মণ্ডল বিদ্রূপের হাসি হাসে। নয়নাকুমারী যোগ দেয় সে হাসিতে।

—জান, মা ভাবে উর গানের টানে বায়না হয়!

—মরে যাই। বুড়ীর গলায় রসের গান। গাধা বলে সুর সাধছি।

আতরবালা ধৈর্য রাখতে পারে না। চিৎকার করে—নয়না! এই নয়না!

কিন্তু ডাকের পরও ঈর্ষার জ্বালা যায় না। শীতের শেষ দুপুর যেন অজস্র অগ্নিশিখা চারপাশে নাচিয়ে বেড়ায়। ঢুকে যায় দেহের মধ্যে সে শিখারা। বড় জ্বালা। আতরবালা বোঝে সুর মাধুরীর আকর্ষণের চেয়ে যৌবন কামনার বেগ অনেক তীব্র। কিন্তু মন মানে না। উত্তেজনা স্নায়ুকেন্দ্রে ঝনঝন বাজে। মেয়েকে এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে হয়। সে বুড়ী! সে বুড়ী!

রাতের আসরে নয়নাকুমারীর নাচে আতরবালার গলায় আর্তি ফেটে পড়ে 'ভালবেসে চলে গেলে ও কালো সোনা!' শীতের বাতাসে ঘুরে বেড়ায় বেদনার সুর। হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে পড়ে আতরবালার। সারা আসর কী এক বেদনায় কাতর হয়! তার চোখে গড়িয়ে পড়া বিন্দুরা কী আচ্ছন্ন করে নিবিড় বাষ্পে! আতরবালা টের পায় সে বড় একাকিনী।

রাত ঘন হবার পর আসর ভাঙলে আতরবালা দেখে নয়না নেই। বোঝে সে। নিশ্চিতই কোন নির্জনতায় গিয়েছে অভিসারে মেয়ে। আগামী আসরের বায়নারও কারণ গান নয়। ভূপেন মণ্ডলের সঙ্গে নয়নাকুমারীর আর এক রজনী নিভৃতে মিলনের বায়না। ছটফট করে সে। রক্তের কোষে কোষে তীব্র দাহ। ফুলপুরের বাতাস যেন বিষে আচ্ছন্ন। স্বামী মানুষটাকে অকারণে বকে, চেঁচায়। ছেলেগুলোকে মারে। মেয়ে আসতেই চিৎকারে ফেটে পড়ে—বলি ভেবেছিস কী! তিনটে বিইয়েও শখ মিটল নাই।

নয়নাকুমারীর ভ্রুতে একটা বিদ্রূপ রেখা কেবল শাণিত হয়ে ওঠে, আমার সুখ সহ্যি হচ্ছে নাই।

আতরবালা মধ্যযাম কাঁপিয়ে দেয় সরোষে, সুখ, ইর নাম সুখ!

হুঁ, তাই। শরীর ঘুরিয়ে বলে, ধর গা কেনে মোড়লকে। ছেড়ে দিছি।

আতরবালা থরথর করে কাঁপে। নয়নাকুমারী টান হয়ে শুয়ে পড়ে।

মা মেয়ের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা থেকেই যায়। আতরবালার জ্বালা নয়নাকুমারীর সুখ। খুঁচিয়ে দেয় নয়নাকুমারী। দেখে মায়ের নির্বীর্য আস্ফালন। চোখের কোণে তাকায় ভূপেন মণ্ডলের দিকে। বুকের আঁচল খসিয়ে রাখে। মুচকি হাসি ফুটিয়ে তোলে মুখে। মায়ের কাছেই বলে ভূপেন মণ্ডলকে, গাঁয়ে মিষ্টি না থাক, চানাচুর ত আছে! তাই নিয়ে এস। আর বলি কথাটা, ভাত খেছি ডাল আর আলুতে। কেনে গাঁয়ে মুরগী নাই!

ভূপেন মণ্ডল উবু হয়ে বিড়ি ফোঁকে, রেতে মুরগী খাওয়াব গো।

—শাড়ির কি হল। সেই একটা ছাপা শাড়ি পরে লাচি।

—দুব। শাড়ি কিনে দুব। ভূপেন মণ্ডল আতরবালার দিকে তাকায়—আজ লতুন দু'চারটে গান লাগাবে।

আতরবালা সাড়া দেয় না। জ্বলে কেবল। রাতের আসর বসে। আগ্রহী শ্রোতাদের ভিড় কমে। হ্যাসাগের আলো জ্বলে কেবল। সকলেই বুঝে ফেলেছে

এ ভূপেন মণ্ডলের আসর। মানুষটার প্রমত্তপনাও বাড়ে। এর মধ্যে ভূপেন মণ্ডলের ছেলেরা এসে শাসিয়ে যায় আতরবালাকে—মা বিটি এবার সরে পড় দেখি। ঢের করেছ! সুযোগ পায় আতরবালা। কিন্তু ভূপেন মণ্ডল ছাড়বে না।

—আমি আছি, বুঝলে উরা কী করবে!

—উসবে আমরা নাই মোড়ল। আমরা চলে যাব।

—যাও, নয়না থাকুক। হুঁ ছেলে মেয়ে ক'টাও থাকুক। কী বল নয়না!

নয়না ভূপেন মণ্ডলের দেওয়া লাল শাড়ি লাল ব্লাউসে ঘেরা। হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি। সলজ্জ হাসি নিয়ে বলে, তুমি যা বল!

—বাগ্দী পাড়াতে আমার ঘর রইছে। নয়না উখানেই থাকবে।

আতরবালার মাথায় যেন বাজ পড়ে। সে কাঁদতে পারে না। চিৎকার করে অভিশাপ দিতে পারে না।

আতরবালার জন্যে বিধাতা পুরুষ তখন আর একটি দৃশ্যের আয়োজন করেছেন। দয়াল এসে হাজির। জ্বালা নিরসনের চমৎকার পথ। হঠাৎ আলোর ঝলকানির বিহ্বলতা কাটতে আতরবালার মস্তিষ্কে চকিতে এসে গেল বুদ্ধিটা। সে ফিরে পেয়েছে, পাবে এবার আগেকার নিজেকে। ফুলপুর, নয়না, ভূপেন মণ্ডল যে নাগরদোলার দ্রুত ওঠানামায় তাকে দিশেহারা করে দিয়েছিল তা থেমে যাবে। গাঁয়ে গাঁয়ে আবার ঘুরবে। আসর পাবে। পেট খোরাকি। আট টাকা! বড় জ্বালা। পায়ে পায়ে দুখের কাঁকর জড়িয়ে থাকে। তবু আতরবালার মনে হল তার মধ্যেও সুখ। এ ঘটনা না ঘটলে সে টেরই তো পেত না! দয়ালের উপর রাগ নয়, সংসার ফেলে পালানর অনুযোগ নয়। সলজ্জ ঘোমটা টানল জামাইয়ের কাছে।

—ছিলে কোথা? খপর পেলে কোথা?

দয়ালের গায়ে শার্ট, নতুন চকচকে সবুজ হলুদ সোয়েটার, পাজামা, হাওয়াই চপ্পল। রোগা কালো মানুষটার দেহে চেকনাই। ঠোঁটে সিগারেট।

—কবে থেকে ঘুরছি, খপরই পাই না। ই পাশে ছুটিও ত নাই। কাজ পেয়েছি দুগ্গাপুরে। তা শুনতে পেলম নিশাতপুরের এক মানুষের কাছে। শুনেই এলম। উখান থেকেই ফুলপুরের খবর মিলল।

—ও বাবা, কাজ পেয়েছ! কত টাকা মাইনে বটে!

—চারশ। বুক ফোলাল দয়াল।

এত টাকা! আতরবালা শুধু নয়, নির্বিকার মানুষটার মুখও হাঁ!

আতরবালা বলল, তাইত বলতম বাবা, চেষ্টা কর। তা তুমি বলতে বাঁশি বাজাব। দেখ কেনে আর বায়না নাই। তাও ইখানে বায়না গানের লয়। গলা খাটো করে বলল, সব বলব।

বলার পরের দৃশ্য ভয়ঙ্কর। দয়ালের স্বামী সত্তা যেন প্রবল করে দিল তার রক্তের বেগকে। কোন কথা নয়। কিছু আগেও যে নয়নার সঙ্গে মিষ্টি করে

কথা বলেছে, স্বপ্ন দেখিয়েছে, খবর নিয়েছে শরীরের, না আসতে পারার জন্যে দুঃখ করেছে, দিনের আলোতেও হাতের পাতা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে ফিসফিস করে চলেছে, তুমার লেগে মন কাঁদত; সেই মানুষটা ঘাড় ধরে নয়নার। তারপর অঝোরে চালাতে থাকল চড়চাপড়, ঘুষি। তার সঙ্গে ক্ষিপ্তের মত এক কথা, নষ্টামি করা হচ্ছে। নয়নার চিৎকার নেই, আত্মরক্ষার চেষ্টা নেই, শুধু বেদনার চাপাধ্বনি। ছেলেমেয়েরা হাউমাউ কান্না জুড়ে দিয়েছে।

ছুটে এল আতরবালা। তৃপ্তগলায় বলল,—আহা ছেড়ে দাও।

ভূপেন মণ্ডল এগিয়ে এল,—আহা হছেট কী! আঁ। ছাড়।

কিন্তু দয়াল স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই। হাঁকড়াতে থাকল,—মশাই, নিজের বউকে মারব। কার কী বলার আছে! বেয়াড়া হয়েছে, শাসন করব না? শালী ইখানে বেশ্যাগিরি করছে।

হি হি করে হাসল ভূপেন মণ্ডল,—তা মাগকে লাচতে দিয়েছেন কেনে? বলি ছিলেন কুথা?

—আপনি কে মশাই, দালালি করছেন!

—আমি ফুলপুরের মৌমাছি বটি। মধু দিতে যেমন জানি—হুল ফুটুতেও।

দয়াল ঘোষণা করল,—কালই ইদের নিন্‌ যাব।

শীতভোরের ঠাণ্ডা স্রোতে মোটপুঁটলি তিন জড়সড় ছেলেমেয়ে নিয়ে দয়াল নয়নাকুমারী হাঁটা সুরু করল। আতরবালা স্তব্দ হয়ে দেখতে থাকল শুধু! জ্বালা। ফুলপুরে কেবলই জ্বালা। আতরবালার চেঁচাতে ইচ্ছে করে। স্বামী মানুষটির দিকে একবার তাকায়। সামনে ধূলিধূসর পথ। আতরবালা কী যেন খোঁজে। পায় না। শুধু টের পায় এক জ্বালা বুকের মধ্যে। তাপের জন্যে বড় কাতর হয় সে। বেঁচে থাকতে যা প্রয়োজন। ঈর্ষা জ্বালা যার কাছে বড়ই তুচ্ছ। কিন্তু কোথায় উপাদান। বারুদ নিঃশেষিত হওয়া বাজির মত তার শরীরে অবিরল শীত হাওয়া বয়। তারপর আটচালার একপাশে ডুকরে ডুকরে কাঁদে আতরবালা।

—কাঁদতে নাই। মেয়ে সোয়ামীর ঘর যেছে! তুমি মা লও!

আতরবালা কেমন করে বোঝায় সে মেয়ের জন্যে কাঁদছে না। কাঁদছে তার নর্তকীটির জন্যে। আর খুঁজে পাচ্ছে না, নয়নাকুমারী যে শক্তিতে তাকে অগ্রাহ্য করে ভূপেন মণ্ডলের কাছে যাচ্ছিল সেই শক্তি স্বামীর কাছে কেন প্রয়োগ করতে পারল না। চলে যাওয়ার মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে! কেমন করে বোঝায় সে, পঞ্চরসের শেষ আসরের পর এই জ্বালাময় প্রথম প্রত্যুষে আমৃত্যু শূন্য আসরে ঘুরবে হাহাকার, দিদি আর কী আমার গোলাপগাছে ফুটবে গোলাপ ফুল। শুনতে পাচ্ছে আতরবালা শুনতে পাচ্ছে। অসহ্য! অসহ্য। দু'হাতের কানে আঙ্গুল গুঁজে দেয় সে। তবু শব্দটাকে আটকান যায় না।

কন্দর্প

পরশা এসেছিল চাঁদু ঘোষের বালতিবন্দী চার কেজি ছানা পৌঁছে দিতে বক্রেশ্বরে। বালতি খালাস করে মোড়ের মাথায় বিড়ি ফুঁকছে। তা জুটে গেল আহার অর্থ। রোগা হাড়ের উপর চিকনদার পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামা, ঘাড় বরাবর বালিকার মত চুলের গুচ্ছ, চিবুক ছোঁয়া লম্বা চুলের জুলপি, ফ্যাকাশে ফরসা রঙের এক ছোকরা একদিনের কাজের মানুষ চাইল কিনা তারই কাছে। বিকেল পর্যন্ত এটা সেটা করতে হবে। বাবুরা সব বনভোজন করবেন বক্রেশ্বর নদীর ধারে। কে জানত হে, বাবা বক্কমুনির এতেক দয়া।

পুরো সপ্তাহটা মজুরি জোটেনি। কাতকে ধানে রঙ ধরেছে হরিদ্রাভ। কাতকে চাষ সব চাষীরই সামান্য। নিজেরাই ঘরে তোলে। মুনিষের দরকার হয় না। বড়ান বা আমন ধান পাকলে তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্। পরশা তখন ছানাও আনবে না, বাবুদের দু'টাকা আর পেটভাতার লোভে বালতি হাতে ভালমানুষটির মত দাঁড়াবে না। তা অঘ্রেণ বড় দেরি করে গ।

বাপ জমি চষত পরের। তা এ অঞ্চলে বর্ষা জোর না হলে শুকিয়ে মরে ধান। ভাগেই বা কতটা পায়। ঘরে নিত্য হা অন্ন। চার ভাইবোন। এদিকে মা পিছনে লেগেছে। ওদিকে আলতা! মা বলে আমাদের আবার সুখের দিন। বয়েস হছে বৌ আসুক ঘরে। কিন্তু বৌ এসে তো মুখ দেখে পেট ভরাবে না। আলতা অবশ্য বলেছে ঢলঢলে মুখে, মাইরি বলছি, কালীর দিব্যি, তুমার মুখ দেখেই আমার পেট ভরবেক। পরশার কাজের জন্য দু'টি হাত ব্যগ্র হয়ে আছে। শহরে নাকি কাজ পাওয়া যায়। তা যাবার সাহস কোথা! ভুবন আসানসোলে থাকে। নিয়ে গিয়েছে সেনবাবুরা। পাঞ্জাবি পাজামা চড়িয়ে গাঁয়ে এসে কী বাত। চক্চকে নোট ঘচঘচ বের করছিল।

ছোকরার ডাকে এগিয়ে গিয়ে শহুরে বাবু বিবিদের মুখ দেখা নয়, পরশা ভাবছিল, এ'রা কেউ নিয়ে যাবেন না তাকে! পিচ রাস্তার ধারে লালধুলোয় দাঁড়িয়েছিল ওরা। রঙিন বিভিন্ন সাইজের পেটমোটা ব্যাগ সামনে ফেলা। একজন পাঞ্জাবি, বাকি সব প্যান্ট, সার্ট। বর্ণাঢ্য শাড়িও রয়েছে। এক দুই তিন চার-!

'এই দীপেনদা একে নিয়ে এলাম।'

'ঘর কুথা বটে গ!' দীপেন বীরভূমের গ্রাম্য ঢঙে জিজ্ঞাসার পর সঙ্গীদের দেখল। রামপুরহাটে বাড়ি। এখন দুর্গাপুর সেকেন্ডারির কোয়ার্টারে বাস।

'কুমড়ে'। পরশা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। চোখ তুলতেই দেখল রঙিন শাড়িঘেরা এক যুবতীর এক জোড়া উজ্জ্বল চোখ তার শরীরের উপর স্থির হয়ে আছে

বল্লমের মত। আরও কুঁকড়ে গেল সে। পাটাল বুক, শালপ্রাংশু বাহু, ঝাঁকড়া কালো চুল তামাটে অবয়বে কিসের যেন স্রোত বয়ে গেল।

'গাঁয়ের নাম কুমড়ে অর্থাৎ কুমড়ো। আলু পটল বেগুনও তো নাম হয় তাহলে।' শঙ্খ হাসে।

'গাঁয়ের নাম মূলাও হয়।' দীপেন পন্ডিতি ফলানর সুযোগটা ছাড়ল না। বেঁটেখাটো গড়নের সঙ্গে মানানসই গোলমুখ, কিঞ্চিৎ টাক, এ সব ভারিক্কি মেজাজের কথায় চমৎকার মানায়।

বক্রেশ্বরে পিকনিক স্পটটা সেইই ঠিক করেছে। যদিও প্রথম আসছে তবু বিজ্ঞাপনদাতার মত গোছালো রম্য আকর্ষণীয় করেই সে এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনিয়েছে। বক্রমুনির আখ্যান, নদী, ক্ষেত গাছগাছালির মধ্যে মন্দির, উষ্ণ প্রস্রবণ টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছে। তার কথামত পিকনিক স্পষ্ট নির্বাচিত হোক এটাই সে চেয়েছিল। এবং এখন দলের মধ্যে নেতার ভূমিকাও সে নেয়। লোক জোগাড়ের ব্যাপারে শঙ্খ এগিয়ে গেল। ভেতরে একটা চাপা অসন্তোষ খাড়া হয়েছিল দীপেনের। ভেবেছিল শঙ্খটা হতাশ হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু যেতে না যেতে লোক! কে জানত হা-পিত্যেশ করে আছে তীর্থের কাকের মত এমন সুস্বাস্থ্যের যুবক। মেদিনীপুরের ছেলে শঙ্খ। তার ডিপার্টমেন্টেই ছিল। প্রমোশন পেয়েছে সদ্য। অবশ্যই পরীক্ষা দিয়ে। নিজেও পরীক্ষায় বসেছিল। বিফল হয়েছে। লোকটাকে নাকচ করতে পারলে অন্ততঃ জয়ার কাজে প্রেসটিজ থাকে। জয়া তার স্ত্রী। শঙ্খের গুণগুলো বড় বেশি করে দেখতে পায়। তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুর এনেছে জয়া।

আত্রেয়ী সামান্য ঝুঁকল গোপার দিকে, চাপা গলায় বলল, 'অভিশপ্ত কন্দর্প।'

গোপা ঘাড় ফেরাল, হাসল, 'জমে গেলি নাকি?'

'ধেৎ।' লাল হয় আত্রেয়ী। ফরসা কানের লতিতে সামান্য জ্বালাবোধ হল। ডিমালো মুখের কপালের উপর লাল টিপ, লাল শাড়ি, ব্লাউজ। লকলকে আগুন। সে আগুনে আছে উষ্ণতার একটা মধুরিমা। নিজের যৌবন সৌন্দর্য সম্পর্কে চূড়ান্ত সচেতন সে। জানে উনিশের মেয়ের যাদুর পূর্ণতা আছে। এখানে আসার মধ্যে অভিমানের কষ্ট ক্রিয়া করছিল বুকের ভেতর। দাদা কখনো তাকে আনত না। গোপার জন্যই এনেছে। জানে সে এলে গোপা আসবে। সামান্য সুখ তা হল শঙ্খ! ভাল ছেলে। উন্নতির শিখরে উঠবে। কিন্তু মোটেই আকর্ষণ করে না শঙ্খর পুরুষশরীর তাকে। আত্রেয়ী তাই শুধু ছুঁয়ে থাকে। এখন এই গ্রাম্য অসংস্কৃত যুবকটি কিন্তু স্বচ্ছন্দে আত্রেয়ীকে ক্ষীণ বহতা জলধারার স্রোতস্বিনী করে দিল। সমগ্র শিরা-উপশিরা যেন এক একটি শাখা নদী। রক্ত বইছে। সমুদ্রমুখী টান, আত্রেয়ী বুঝে উঠতে পারছে না কেন এত তীব্র অনুভূতি। কোন দূর জন্মের তার পরিচিত? দেখা হয়েছিল কোথায় কোন সুদূর অতীতে? কোন গহীন অরণ্যে, পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোন শতাব্দীতে!

চোখ তুলে তাকাতে তার ভয় করছিল। উন্মোচনের ভয়!

ক্ষুদে ট্রানজিসটার কানে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল পার্থ। খবর শুনছে নিবিষ্ট মনে, এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীত। তখন ভল্যুমটা বাড়াতে হবে। গোপা পছন্দ করে। টাউনশিপে রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়িকা হিসাবে খ্যাতিও আছে , তার চঞ্চল চোখ ঘুরে ফিরে গোপার উপরই পড়ছিল। পার্থর কোঁকড়ান চুল, ভারি স্বাস্থ্য। হলুদ গেঞ্জি চাপ হয়ে বসে আছে গায়ে। দু'টি বলিষ্ঠ বাহুর একটি ঝোলান। ভাল ফুটবল খেলে। আত্রেয়ীর দাদা বলে চিনতে ভুল হয় না।

অপরা চ্যাটার্জি হাতের ব্যাগটা নাড়াচ্ছিল। শীর্ণা শ্যামলা যুবতী। আসত না অপরা। এসব এড়িয়ে চলে। প্রভু রাজি হল তাই আসা। অথচ দেখ প্রভু কেমন চলে গেল মায়ের চিঠি পেয়ে। না, না সে না এলে ভারি বিশ্রী হত! প্রমাণ হয়ে যেত প্রভুর জন্যই সে নারাজ হয়েছে। তার ডিপার্টমেন্টেই রয়েছে প্রভু। ও অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, অপরা টাইপিস্ট। প্রেমটা গোপনীয় নয়।

স্বরে কিঞ্চিৎ বিরক্তি এনে অপরা বলল, 'কী এখানে বসে থাকবেন? লোক ত পাওয়া গিয়েছে।'

'ঠিক বলেছেন! সব কটা গেঁতো। দাঁড়ালে নড়তে জানে না।' সুব্রত বলল।

সুব্রত লেখক। নিঁখুত করে বক্রেশ্বর দেখছিল। গাছগাছালি, পিচরাস্তা, ঝোপের মধ্যে মন্দিরের উঁকিবাড়ান অংশ, মানুষ, অদূরে বক্রেশ্বর নদীর ব্রীজ, দিগন্তরেখায় মেশামেশি ক্ষেত ছাপিয়ে একটা গ্রামের চিহ্ন। ভাবছিল এই পটভূমিকায় একখানা ছোটগল্প হতে পারে না? দীপা কিছুতেই এল না। ছেলেপিলে নিয়ে, পুরো গিন্নি বনে গিয়েছে। অথচ বলে, আমাদের নিয়ে একটা গল্প লেখো না গো! এবার বলেছিল, চল বক্রেশ্বর, ফিরে এসে গল্প লিখব। দীপা বলেছে, মনে করো আমিও গিয়েছি। এই না হলে লেখকের স্ত্রী! .

দীপেন বলল, 'আহা লোক ঠিক করতে দাও।'

'এই তো লোক।' জয়া আঁচল সামলে আঙুল বাড়াল পরশার দিকে।

দীপেন চুপ। জয়া ওর স্ত্রী। শঙ্খের কাছে পরাজয়টা তার নিয়তি যেন।

নদীর দিকে একটা জায়গা খুঁজে নেওয়াটাই স্থির হল। পরশা শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাগগুলো ছড়িয়ে প্রায় ঢাকা। মানুষ নয়; যেন রঙীন ব্যাগের একটা জীবন্ত স্তূপ হাঁটছে। সামনে পিছনে ওরা। কথা হচ্ছে রান্না বিষয়ক। মেনু পূর্বনির্দিষ্ট। মাংস মানে মুরগী। পরশাকে জোগাড় করতে হবে।

নদীর স্বল্প জল ডিঙিয়ে জায়গা ঠিক করতেও কিছু সময় ব্যয় হল। পাড় ঘেঁষা একটা ভূখন্ডই স্থির হল। বাবলাগাছেও রয়েছে ক'টা। পরিচ্ছন্ন জায়গা। ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা। ডানদিকে পড়ে রইল ব্রীজে ওঠা কালো সাপের মত পিচরাস্তা। বক্রেশ্বর সামান্য পথ। ওদিকে গোয়ালপাড়া, তাঁতিপাড়া। ঢলঢলে ক্ষেত দুলছে বাতাসে। কার্তিকের ক্ষেত। উদার আকাশ। স্টোভ জ্বলল। চা টোস্ট হল। সকলেই বসেছে ঘাসের উপর। সতরঞ্চি পাতল জয়া। তদারকিতে

সে কোমর বেঁধে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে। বেঁটেখাটে শরীর। ফরসা, গোলগাল। সকলের সঙ্গে কথা বলাতেও আদরের সুর। অপরা আত্রেয়ী গোপা তিনজনেই যেন অন্যমনস্ক। দীপেন সিগারেট খাচ্ছে।

শঙ্খ বলল, 'মুরগীর জন্যে তাহলে আমি যাই।'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ, একেবারে কেটে কুটে আনবে।'

পরশাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল শঙ্খ। মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলল।

পরশা দলটাকে ছেড়ে আসাতে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করল। বাপরে, একটা কথা সে বলে নি। তা ওনারা নিজেদের কথাতেই ব্যস্ত। পরশা ঠিকমত বুঝতে পারে না। ধুতি পাঞ্জাবিবাবু আবার চিবিয়ে কথা বলেন। যাইহোক পাউরুটি শক্ত করে কী মাখিয়ে দিল আর চায়ে গোলাপপাতার গন্ধ! আঃ কী সোয়াদ! জন্ম থেকে এমন স্বাদ পায় নি সে! বাবুরা কত কায়দা করে খান গো! সব কিছুতেই তেনাদের সৌগন্ধ! কিন্তু মুরগী জুটবে তো। বুক ফুলিয়ে তো নিয়ে যাচ্ছে! তবে জোটাতে হবেই। তবে না বাবুরা খুশি হবেন। সে শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলবে। তখন আলতাও হয়ে উঠবে ওই মেয়েগুলোর মত।

দু'পাশে ধানের ক্ষেত, মধ্যিখানে আল। ভাঙছে আর ভাবছে পরশা! বাড়িতে কে কী ভাববে কে জানে! চাঁদুদা ফিরে এসে খোঁজ নেবে। ছোঁড়া গেল কোথা! ছানা সাঁটিয়ে বালতি বেচে হাওয়া। খিক খিক। হুঁ, ছোঁড়া এখন কলকাতার বাবুদের কাছে হে! কলকাতা যাবেক। হুঁ। মুরগীর ঝুল ভাত হবেক। গলা অব্দি টানবেক। রাতে কুছু চাই না। কাল সকালে কুছু না! তা' বাদে দু'টাকা। হুঁ, দু' টাকা থেকে আলতার জন্যে মিষ্টি নিয়ে গেলে হয়! রসগোল্লা খেতে বড় ভালবাসে। বলে, 'এই দু' জনাতে টাকা হলে একদিন দু'কানে বসে খালি গুল্লা খাব।' তা সাত টাকা কেজি গোল্লা! সোজা দাম! এক কেজি করে দু'কেজি দু'জনে খেয়ে ফেললেই হয়ে গেল। চৌদ্দ টাকাতে ক' দিনের যেন ভাত হয়!

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এমনই হয়। তাঁতিপাড়া থেকে পাতায় মোড়া দু'কেজির কাছাকাছি মুরগীর মাংস নিয়ে ফিরতে সময় লাগল একঘন্টার মত। বাবু আবার পরশাকে তিনটে সিগারেটও খাওয়ালেন। রোদটা চড়েছে। উঁচু মাঠের মাথা ছাপিয়ে চাকতিটা উজ্জ্বলতার সঙ্গে তপ্তও। বাবুদের রোদে কষ্ট হয়গো! আহা, ঘামবেন ওনারা। পরশার নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হতে থাকল।

বাবলার ছায়া ছাড়াও গাছের ডালে শাড়ি টাঙিয়ে সামান্য ছায়া করা হয়েছে। তবে ঘুরছেন সব। যেন রোদ ছুঁচ্ছে না ওনাদের। গান বাজছে ছোট্ট রেডিওতে। স্টোভটা সাপের মত হুসহাস করে জল ফোটাচ্ছে। না, বাবলার ছায়াটা নেহাত খারাপ নয়। পরপর ক'টাই বাবলা।

বালতিটা কাজে লাগল। ওনারা এনেছেন লাল প্লাসটিকের বালতি। জল আনতে ছুটল পরশা। জলের ব্যাপারে সকলেই মুহূর্তের জন্যে চকিত। নদীর বালি সরিয়ে 'ভাও' খুঁড়ে জল আনে পরশা। জলটার গুণগান এবং শুদ্ধতা

সম্পর্কে মৃদু তর্কও হয়ে গেল। দেখার জন্যে পরশার সঙ্গী হল পার্থ, গোপা, আত্রেয়ী। অপরা বসে আছে। সুব্রত মোঁপাসার একটা গল্প শোনাচ্ছে ওকে। শঙ্খ যেন ঢের পরিশ্রান্ত এমনভাবে সতরঞ্চিতে শুয়ে পড়েছে। দীপেন জয়াকে খুশী করতে ব্যস্ত। আদেশ পেলেই সে যেন কাজে লাগবে!

কার্তিকের শীর্ণ নদী বালুময়। ওধারে নদীস্রোতে ঘাত প্রতিঘাত খাওয়া ছোটবড় ছড়ান ছিটান পাথর। একটা ক্ষীণধারা কেবল বয়ে যাচ্ছে। বেঁকে গিয়েছে নদীটা সামান্য এগিয়ে। নিচু পাড়। বুকে বালির অসম্ভব ভার। একটু গরু ধারা থেকে জল টানছে। কাক উড়ছে।

হাতের আঁচলায় বালি সরিয়ে পরশা দ্রুত হাতে ভর্তি করে ফেলল। মুহূর্তে ক্ষুদে গর্তটা সিরসির করে বালুর গা থেকে জল নামাচ্ছে। কিছুক্ষণে পূর্ণ। দু'হাতের আঁচলায় ফেলে দিল পরশা জলটা। আবার পূর্ণ হয়ে গেল ভাওয়ের গর্ত। কাকচক্ষু জল টলমল করতে থাকল।

ওদের তিনজনের চোখই আটকে আছে। আত্রেয়ী যেন অলৌকিক কোন দৃশ্য দেখছে এমনই মুগ্ধতা!

বালতি ভর্তি করে পরশা বলল, 'তাহলে রেখে আসি।'

'চল! আমারও যাব।' পার্থ ব্যস্ততা দেখায়।

আত্রেয়ী বলে, 'জলটা দেখতে হবে। পাখিটাখি মুখ দিতে পারে।'

গোপা বলল, 'তুই দেখ!'

পার্থ সায় দিল। গোপাকে নিয়ে ক্ষেতের আলপথে খানিকটা ঘুরবে এই সুযোগে। সোজা যাবে না। আলের গোলমাল হচ্ছে জানলে বিশ্বাস করবে ওরা। গোপাকে কাছে না পেলে কিসের পিকনিক! কিন্তু ধানক্ষতের আলে সাপ শুয়ে থাকে না তো!

ওরা চলে যাবার পর আত্রেয়ী দাঁড়িয়ে রইল। এই শীর্ণ নদীর বালুময় বুকে ছোট-বড় কালো শ্যাওলা জমা পাথরের বাঁকচুর ক্ষীণ ধারার পাশে দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছিল সে যেন একটা আশ্চর্য জগৎ পেয়েছে। কোন দৃশ্য না, প্রকৃতি ঘিরে মুগ্ধতা না, নিচু পাড় এই নদী আবেষ্টনী তাকে ভিন্ন একটা সত্তা দিয়েছে। পরশা মানে ওর নাম পরেশই আর কী! নামে কী যায় আসে। যে যাই বলুক আত্রেয়ী তো তাকে দেবব্রত নামও দিতে পারে! হুঁ দিল। কিন্তু কে এই গ্রাম্য যুবক? কেন তার তন্ত্রী জুড়ে এত বাদ্যের ঝঙ্কার! কেন কোষে কোষে এত উত্তাপের সঞ্চার হচ্ছে! এই পিকনিক পার্টি, দুর্গাপুরের কোয়াটারস, তার কলেজ, বান্ধবীমহল, আত্মীয় পরিজন, টিপটাপ জীবনের ধারাবাহিকতা, অভিজাত শহুরে সভ্যতা কেন অতীত হচ্ছে! আত্রেয়ীর কী মাথার গন্ডগোল আছে? মোটেই না। আত্রেয়ী সংযমী, ভাল স্টুডেন্ট। কথায় থাকে বুদ্ধির প্রাচুর্য। এটা পরিচিতজনেরা সকলেই জানে। ব্যানার্জিদের বাড়ির কাকীমার অমন সুস্বাস্থ্যের ভাইপো রুদ্রকে সে স্পষ্টগলায় বলতে পেরেছিল, ভালবাসার কথা এখন ভাবতে পারছি না।

ক্ষমা করবেন! আর এখন তার সব অস্তিত্ব এমন নতজানু হয়ে চাইছে কেন? কামকেন্দ্রে এত অগ্ন্যুৎপাত। শিরায় অগ্নি প্রবাহ। এই গ্রাম্য যুবকটি সম্মোহন জানে? চতুর রমণীশিকারী!

পরশা আবার দুহাতের আঁচলায় জল ছিঁচল। আত্রেয়ীর দিকে নজর নেই।

'শুনছ!'

ঘাড় তুলল। বুঝতে কষ্ট হয় নি এ মেয়ের নজরে বিদ্যুৎ আছে। শিরায় বাজে ঝনাৎ ঝনাৎ। আলতার কথা ওই চোখে মনে পড়ে যায়।

'কী কর তুমি।'

প্রশ্নটা বড়ই কঠিন। পরশা বলল, 'মুনিষ বটি।'

আত্রেয়ী শেষ করতে দিল না, 'বাড়িতে কে কে আছে?'

'মা বাবা ভাই বুন।'

'বিয়ে করনি?'

'না।'

ব্রীজের উপর হর্ণ বাজিয়ে একটা বাস ছুটে গেল শরীরের বাদ্যি নিয়ে।

আত্রেয়ী হাতের আচঁলায় রোদ আটকাল। বলল, 'বড্ড রোদ!'

'বাবলাতলায় যান কেনে! ছিয়া আছে!'

জল ভরে হেঁটে গেল পরশা।

আত্রেয়ী একা একা ফিরে এল বেশ কিছু পরে। গোপা গান ধরেছে, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।' সে দেখল জয়াবৌদি একাই একশ। কিছুই করার নেই তার। গোপার সঙ্গে বেড়াবে তারও জো নেই। বাবলার ছায়ায় বসে ভাবল, অপরাদি কী এমন কথা বলেছেন সুব্রতবাবুর সঙ্গে? নিশ্চয়ই সাহিত্য। প্রভুদার সঙ্গে প্রেম তার অজ্ঞাত নয়। লক্ষ্য করল শঙ্খর গোপন অভীপ্সার চোখ তার উপর পড়ছে। হাসির পাতলা পাপড়ি তুলে ধরলেই এগিয়ে আসবে! থাক! গোপার সুরটা বড় মায়াবী। আত্রেয়ী টের পেতে পেতে কখন যেন আবিষ্ট হয়ে গেল।

রোদের রঙ ক্রমশ চড়ছে। আর এক প্রস্থ চা হল। তার মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করে এল ওরা। পরশাকে সঙ্গী করার ইচ্ছে ছিল আত্রেয়ীর। কিন্তু মিষ্টি কিনতে নিয়ে গেল! প্রেসারকুকারে মাংস চড়াল জয়া।

শঙ্খর ভাল লাগছিল না। একটা চাপা দম বন্ধ করা হাওয়া যেন তাদের মধ্যে। আত্রেয়ী বড় অহঙ্কারী। রূপসী ভাবে নিজেকে। তবু যদি নাকটা একটু শার্প হত। না, প্রভু না আসাই কাল হয়েছে। ঠিকই বলেছিল সে। প্রভুহীন রাজ্য অচল। তা দীপেন এই ঠাট্টাটা কী না সিরিয়াসে নিয়ে গেল। পলিটিকস চলে এল। প্রভু নাটক করে। চমৎকার নকল করতে পারে অপরের কণ্ঠস্বর। হুল্লোড়ে ছেলে। মাতিয়ে দিত এতক্ষণ এখানকার হাওয়া। কিংবা ও না এসে দীপক এলেও কম মজা হত না। শঙ্খ মনে মনে বলল, আমরা সবাই পাংশুমুখে

থাকতে ভালবাসি! জীবন যন্ত্রণা! লেখকটিকে দেখ না। বেটা প্লট খুঁজছে। খুঁজে হাতি পাবি। জ্ঞানপীঠ পাবে না বাবা। খালি বিগবিগ টক। কলকাতার কাগজের সম্পাদককে খিস্তি। নিকুচি করেছে তোর টকের। অপরা চ্যাটার্জিকে শিক্ষা দিতে যেও না। মেঘদূত শোনাতে পার। আর পার্থ, হোয়াট ইজ দিস। গোপা অপ্সরা নয়। দুর্গাপুরে ঢালাও সময় রয়েছে।

মনে মনে এসব আওড়ে শঙ্খ চেঁচিয়ে উঠল, 'দীপেনদা জয়া বৌদি তোমার, আমরা জানি! অত আগলে রাখার দরকার কী?'

সিগারেটের ছাই ফেলে বাঁকা চোখে তাকাল দীপেন।

জয়া আঁচলে মুখ মুছে বলল, 'নিজের জিনিস আগলে রাখবে না। আপনার নেই, বুঝবেন কী!'

জয়ার কথায় হাসির শব্দ উঠল একটা।

গোপা বলল, 'শঙ্খদা কায়দা কানুন শিখে নিন।'

'আমি ঝাড়া হাত পা! কী দরকার!' বাঁকা চোখে তাকাল আত্রেয়ীর দিকে। বলল, 'শেখা আপনারই উচিত! প্রয়োজনবোধ করছেন না এখন।'

গোপা লজ্জা পেল। শঙ্খ ভেবেছিল হাওয়াটা ঘুরল। কিন্তু না আবার নীরবতা। কী হল যে এবার। দীঘায় কত স্ফূর্তি। টোস্ট ডিমের ওমলেট কাড়াকাড়ি। শুধু প্রভু, দীপক, সঞ্জয়, সুচেতাদের অনুপস্থিতিই এর কারণ?

শঙ্খ এবার সুব্রতর দিকে তাকাল, 'লেখকমশাই নিশ্চয়ই এবার মিস চ্যাটার্জিকে গল্পের প্লট শোনাচ্ছেন। তা অত চাপা স্বর কেন? মিস চ্যাটার্জি, গল্পের নাম নিশ্চয়, বক্রেশ্বরের বাবলাতলায়!'

আত্রেয়ী মৃদু হাসল।

পার্থ বলল, 'আচ্ছা কী ব্যাপার বলুন তো। সুব্রতর গল্পের নায়িকারা নায়ককে ল্যাং মারে কেবল! বাট হোয়াই?'

শঙ্খ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'জানেন না, ওর যে সব গল্পেই আত্মজীবনের ছায়া পড়ে।'

এতক্ষণে হাসির ঝড় উঠল। সুব্রত কী যেন প্রতিবাদ করতে গেল। শঙ্খ চিৎকার করছে, 'শুনব না। শুনব না।' পার্থ রেডিওটা পুরো ভল্যুমে দিল।

পরশা এদের হাসির কারণ বুঝতে পারছিল না। বাবুদের সবই আলাদা। শুধু এটাই তার ভাল লাগছিল, যাক এনারা মজা করতে জানেন। কিন্তু কী করে সে বলে, বাবুরা আমাকে নিন চলুন কেনে, যা কাজ দিবেন পারব। তা ওনারা বললে এক ছুটে সে কুমড়ে গিয়ে ঘরে খবরটা দিয়ে আসবে। চাঁদু ঘোষের বালতিও পৌঁছে দেবে। ঠোঁটের গোড়ায় কথাটা যেন পরশার চুলকাতে থাকল। দারুণ অস্বস্তি লাগছে। সাহস হচ্ছে না।

গান হল। হাসি ঠাট্টা হল কত বাবুদের। পরশা কিছু বুঝল। কিছু বুঝল না। রোদের রঙ চড়ল। তাকে নিয়ে গল্প করলেন বাবুরা। পেট চিরে সব কথা বের

করতে থাকলেন। কলকাতা গেলে নাকি সে সিনেমা করতে পারবে। তারপর তারা হাসলেন। সুন্দরী দিদিমনিটি কিন্তু গুম হয়ে ছিলেন। তেনাদের কথাতে রাগ হচ্ছিল বোধ হয়। খাওয়া হল হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে! আহা কী স্বাদ! এত মাংস এত ভাতে আবার মিষ্টি! কার মুখ দেখে যে এসেছিল পরশা। বকমুনি একদিনের জন্য তাকে রাজার খাদ্য খাওয়াল। শুধু মনে পড়ছিল ঘরের কথা। চাল আছে। ভাত আছে। কিন্তু সে ত গিলবে সবাই লঙ্কা নুন দিয়ে। আট আনা পয়সা নিয়ে হাজির হলে পোস্ত কিনত। তা হল না। তবু বাবুরা যদি বলতেন, যাও হে নিজের খাদ্যি নিয়ে ঘর যাও, তাহলে পরশা ওদের খাওয়াতো। সেই এক বছর আগে দত্তকত্তার শ্রাদ্ধে শেষ ভালমন্দ খাওয়া হয়েছে! কিন্তু তুল্যে এর স্বাদ! জিভে যেন জড়িয়ে যাচ্ছে।

আত্রেয়ী আবার সঙ্গী হল নদীতে বাসনপত্র পরশা ধুয়ে নিয়ে আসার জন্য যেতে। সতরঞ্চিতে বাবলার ছায়ায় বসেছে ওরা। তাস খেলছে। লম্বা হয়ে পড়ছে পার্থ। অপরা ট্রানজিস্টার ঘোরাচ্ছে। তপ্ত বালুর উপর হাঁটতে আত্রেয়ীর মোটেই কষ্ট হয় নি। রোদও ফুঁড়ছিল না তার চামড়া। সে যেন এক স্বপ্নের ঘোরে আবিষ্ট হয়েছিল। সরে যাচ্ছিল তার মন থেকে স্বাভাবিক সব ঘেরাটোপ। মধ্যাহ্নের এই শীর্ণ নদীর বুকে তার সম্পূর্ণই ভিন্ন অস্তিত্ব। এতক্ষণে আত্রেয়ী যেন পরেশকে চিনতে পারছিল! কোন এক বিগত জন্মের স্মৃতি নয়, সেই মৃত্তিকায় যেন পায়ের পাতা পড়ছিল। দুরন্ত সেই পুরুষটির লগ্না হতে চাওয়া লতাব মত অনুভূতি তার রক্তের মধ্যে হিল্লোল তুলছিল। পাথরগুলোর দিকে একবার তাকাল সে। উঁচু একটা পাথর আড়াল করে রেখেছে ওদিকটা।

আত্রেয়ী স্বপ্নের স্বরে যেন কথা বলল, 'শোন পাথরটার ওপাশে চল না। মনে হচ্ছে নিচু ডোবার জল। অনেকটা জল আছে।'

'তা গেলে হয়। কিন্তুক খারাপ জল বটে। নদীতে ভাও ছাড়া বিবাক খারাপ জল।'

এগিয়ে গিয়ে পাথরের উপর দাঁড়াল আত্রেয়ী। ওদিকে দেখা যাচ্ছে! না সকলেই মগ্ন! নির্জন নদীর বালুময় বক্ষপট। অদূরবর্তী ব্রীজে মানুষ হাঁটছে। পিচরাস্তায় গরুর গাড়ি। পরশা নিচু হয়ে বাসন ধুচ্ছে। তাকাল আত্রেয়ী। শির শির করে উঠল শরীর। বুকের মধ্যে ঘামে নড়ে চড়ে গেল একটা পোকা। নদীগর্ভে তার একেবারে সামনে পরশা। একজন অর্ধনগ্ন পুরুষ। যার পেশীতে আদিম আমন্ত্রণ। আত্রেয়ী কী পাগল হয়ে যাবে। শরীরের এত তীব্র উত্তেজনা কোথায় লুকিয়েছিল। বিস্ফোরণমুখী কামনার এত আলোড়ন। মাথার উপর চমক খাইয়ে টিয়ার ঝাঁক উড়ে গেল। পাথর থেকে নেমে এল আত্রেয়ী। পরশা দাঁড়িয়ে পড়ছে। শরীরের রেখায় ঋজু দৃপ্ততা। আত্রেয়ী চিনতে পারছে। কিন্তু ওর চোখে কেন এত শৈত্য! বিস্ময়ের এমন বিহ্বল স্থৈর্য! ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে—চিনতে পারছ না? আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?

দেহরেখায় অস্থিরতার ঝিল্লি নিয়ে আত্রেয়ী নিজের ভারসাম্য রাখতে পারছে না। আঁচল বাতাসে উড়ছে। কপালে দুলছে শীর্ণ চুলের রুক্ষ রেখা।

একপা সমানে বাড়ান। স্ফুরিত ঠোঁটে কামনার ধিকধিক বহ্নি। আত্রেয়ী বলল, 'তুমি কি চাও!'

পরশা মুহূর্তে বিহ্বল। তারপর সুযোগ ছাড়ল না। বলল, 'আমাকে নিয়ে চলুন কেনে?'

'যাবে? তুমি যাবে?' আত্রেয়ীর যেন চমৎকার খেলায় জয়ের সূচনা। শরীর ভাঙল সে স্বৈরিণীর মত। বলল, 'যাবেই তো! এখন তুমি কী চাও? তোমাকে কিছু দেব, বুঝেছ!'

শুভ্র বুকে সরু উজ্জ্বল হারছড়ার দিকে নজর গেল পরশার। আলতার গলায় হারটা কী সুন্দর যে দেখাবে। চাইবে হারটা? যদি সোনার হয়?

'হারটা দেখছ! নাও না হারটা। নাও খুলে নাও। ছোঁও। আমাকে ছোঁও না।' লাল ব্লাউজের উপর নগ্ন ফরসা গলায় বুকের ঢেউয়ে সোনালী রেখাটি সে তুলে ধরল। কাতর যুবতী শরীর বাড়িয়ে দিল ব্যগ্রতায়। ওষ্ঠে মৃদু হাসি, 'ছোঁও! ভয় করছে। আমি! চিনতে পারছ না? কী করবে হার?'

'আলতাকে দুব।' পরশা লজ্জায় মাথা নামাল। বলল, 'উকে বিয়ে করতে পারছি না। অভাবের লেগে।'

একটা তীক্ষ্ণ ধারাল বর্শা যেন এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেল আত্রেয়ীকে। তারপর কেবলই রক্তপাত। ফোয়ারার মত রক্তধারা মুহূর্তে তাকে স্নান করিয়ে দিল। দু'হাতে মুখ ঢাকল। তারপর পাগলিনীর মত সে ছুটতে থাকল নদীর বালি পেরিয়ে ঘাস ভুঁই ক্ষেতের আল পেরিয়ে।

আত্রেয়ী দুই হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে। তার বলতে একটুও কষ্ট হয় নি—পরশা নদীতে একলা পেয়ে তার হারটা ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল। দু'হাঁটুর ফাঁকে মুখ রেখে সে আটকে রাখতে চাইছে শরীরের কাঁপুনি। ওঠানামা করছে তার রক্তিম পিঠ। একটা ঝড় এখনও তাকে আকুলিত করছে। বুকের গভীরে পরাজয়ের গ্লানি তাকে এক পৈশাচিক উল্লাস এনে দিচ্ছে মিথ্যে অভিযোগ তুলে। দু'হাতের নখরে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তাক্ত করে তুলতে ইচ্ছে করছে ওর পাটাল বুক। আত্রেয়ী না পারুক, ওর পারবে।

জয়া অপরা গোপা জড়সড়। শঙ্খ, দীপেন, সুব্রত উত্তেজনায় বিহ্বলতায় ফেটে পড়ছে। মত্ত বাঘের মত এগিয়ে গেল পার্থ, 'বেটা তুমি হার ছিনতাই করতে গিয়েছিলে! এত সাহস।'

দীপেন টেনে নিল পার্থকে, 'মারামারি নয়। এটা ওদের এলাকা। হাওয়া ঘোলটে হয়ে যাবে।' তারপরই সে বিস্মিত পরশার দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল, 'ভাগো!'

'আমার কাছে খুচরা নাই।'

'দরকার নেই। পাঁচ টাকা দিচ্ছি।'

'কেনে? দু'টাকা দিবেন বলেছেন। দু'টাকাই লুব। পাঁচ টাকা কেনে?'

সুব্রত দু'টাকার নোট দিল। নিল পরশা। দীর্ঘ বলিষ্ঠ অনমনীয় অবয়বটি এগিয়ে গেল। শীতল হয়ে গেল হাওয়া। রৌদ্র রঙে বোধকরি বিষণ্ণতা নামছে।

শঙ্খ ভাবল, আত্রেয়ী কী সত্যি কথা বলেছে। দীপেনের মনে হল, পরশা দরিদ্র কিন্তু চোর নয়। পাঁচ টাকার নোটটা পকেটের ভেতর পাখির ছানার মত নড়ছে। গোপার থমথমে মুখে কয়েকটা রেখা নামাওঠা করল, আত্রেয়ীর কোন হুঁশ নেই। ছিঃ ছিঃ। একটা গেঁয়ো মানুষ তোকে পাগলী করে দিয়েছিল। কী রুচি। সব দেখেছি বাবা। নির্জন নদীতে নিশ্চয়ই কোন প্রস্তাব দিয়েছিলিস! সুব্রতর মনে হল, প্লটটা মন্দ নয়। দরিদ্র গ্রাম্য যুবক চুরি করতে গিয়েছিল নির্জতার সুযোগে। কিন্তু ভিড়ে সে লোভকে জয় করে। নির্জনতা বড় ভয়ঙ্কর। জয়ার মনে হচ্ছিল, আত্রেয়ী কী মজা করতে এমন করল। পরশার দিকে চাউনি কিন্তু বড্ড খারাপ ছিল মেয়ে তোমার। অপরা চ্যাটার্জি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল।

আর আত্রেয়ী মুখ তুলতে পারছিল না! অভিশাপটা কিসের সে অনুভব করতে পারছে। দারিদ্র্যের। এখনও যেন হচ্ছে কেবল মজার খেলা সে খেলল। সে আগের আত্রেয়ী হয়ে উঠতে পারছিল না।

আর আত্রেয়ীর ভাবনার অভিশপ্ত কন্দর্পটি বিষণ্ন অবেলার রোদে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, বাবুবিবিদের বুঝা ঢেক কষ্ট গ। ঢেক কষ্ট।

স্বত্ব

ভোটের স্বত্ব আর মিনিকিট পাওয়ার স্বত্ব এক নয়। ব্যাঙ্ক ঋণ, অনুদান লাভের স্বত্বও ভিন্ন। ধনুক বাগ্দী স্বত্ব বিষয়ক ভাবনায় অতি সহজে এ রকম স্থিরতায় আসে। সে সরষে, গম ধান, মুসুরি কোন কিছুরই মিনিকিট পায় না। ব্যাঙ্ক ঋণ, অনুদান না। কিন্তু কেন?

আগে এসব কিছুই ছিল না। তুমি চাষী, ব্যস। তারজন্যে ছাপছোপ দেওয়া কাগজ কী বীজ দান কী ঋণ দান, কিছু না। তবে গাঁয়ের মাটিতে বর্ষাধারার মত না হোক যদি অল্পসল্পও নামে এসব পঞ্চায়েত মাধ্যমে তা যদি রাম শ্যাম যদু মধুদের মত সে না পায়, তখন প্রশ্নটা ওঠেই। রাগও হয়। ঘিলুতে বুদ্ধির উৎপাদন যে কম তা জানে ধনুক। আসলে সরল রেখাকে সরলরেখা এবং বক্রকে বক্র ভাবতে তার ঝাঁকড়া চুলের হেঁড়ে মাথা অভ্যস্ত। সরলের বক্রতা এবং বক্রের সরলতার ঘোর প্যাঁচ জটিলতা তার থ্যাবড়ানো মুখের অনুপাতে ক্ষুদে চোখজোড়ায় কিছুতেই ধরা পড়ে না। তা কী করে ধনুক! তবে ভোটের স্বত্ব তার দিব্যি রয়েছে। জ্যৈষ্ঠের অগ্নিঝরা দিনে গাঁয়ের মাটিতে ভোটের চরম উত্তেজক আবহাওয়ার ছ্যাঁকা নিতে নিতে সে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে, স্বত্বদ্বয় ভিন্ন। তবে হুঁশিয়ার ধনুক, ভোটের স্বত্বটা যেন বেমক্কা খসিয়ে বসো না।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হরিধন ঘোষের পাঁচ বছর আগের এবং আজকের চেহারার মধ্যে ফারাকটা প্রত্যক্ষ করে বোঝে বস্তুটি অসীম গুণশালী। নিজের এবং স্ত্রীর দুটি ভোটকে উনিশ'শ তিরাশির মে মাসে টের পায় বড় মূল্যবান। তার পাঁচ এবং সাত বছরের ছেলেমেয়ে দুটির ভোটাধিকার নেই বলেও সে কম দুঃখিত নয়। গোরাদের ঘরে এগারটা ভোট। উনিশটা পাঁচুদের। স্যাঙাত মদনারই ভাইভাজ নিয়ে সাত সাতখানা। কম অহঙ্কারের কথা।

এতকাল ছাপমারার মধ্যে এ বোধ তার ছিল না। জোড়া বলদ, কাস্তে হাতুড়ি তারা, ধানের শীষ, ময়ূর, হাতি, সিংহ, তুলাদন্ড, ঘোড়া, মাছ, বটগাছ, হাত ইত্যাদিতে ছাপ মেরে মেরে সে আদপেই টের পায় নি এর স্বরূপ! যে মানুষটির উদ্দেশ্যে তার ছাপদান অর্থাৎ এম এল এ, তাকে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য হয় নি। অবশ্য এজন্য ধনুকের কোন অনুযোগ নেই। দেশের কাজের ব্যস্ততায় তাঁর অবসর কোথায়! তারপর পিচরাস্তা হল আড়াই ক্রোশ দূরে। এবড়ো খেবড়ো মাটির সড়ক। মাঝে আবার একটা হাত ত্রিশেক খাল। এদিকে গাঁয়ের হাসপাতালে দু'বছর ডাক্তার নেই। এসে হঠাৎ অসুখে পড়লে কে সামাল দেবে। ওষুধপত্রও ছাই মেলে না। যাইহোক তিনি কী ছিলেন কী

হয়েছেন ধনুকদের তা অজ্ঞাত। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন তার উদাহরণ খাড়া করে দিল। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, ভোটকা খেল্।

হরিধনের ঘরে তিনটে লোক খাটে। মোটর সাইকেল কিনেছে। দালান হল। রোগা মানুষটা ব্যাঙের মত ফুলল, চেকনাই বাড়ল, ভূঁড়ি জাগল। এ সবেরই তো আঙুলে কালো দাগ নিয়ে মানুষটার উপর ছাপ দিয়ে আসার থেকে জন্ম। আসলে ছাপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব কায়দা। ভেঙেচুরে ধনুকের পক্ষে বোঝান দুষ্কর। অত বুদ্ধি নেই ধনুকের। তার বুদ্ধিমান স্যাঙাত মদনারই কী আছে! বড়াই তো খুব বুদ্ধির। বলেছে, 'বুঝলি গমমেট টাকা দিলেক ধর, তা পুখোর কাট, মাটি কাট, কে দেখবেক, বাবু। হিসেব কে দিবেক, বাবু'—ঋণ, অনুদান না পাওয়ার কারণও বলেছে, 'তুই শালা বগ্‌গাদার লস্।'

ধনুকের নিজের জমি দেড় বিঘে। তাও সরস নয়। বাকী সাত বিঘে চষে বিন্দাঠাকরুনের। অনেকেই বর্গাদারে নাম লেখাল, সে নাম তুলল না। বাপ চষত, সে চষে। বেটাও চষবে। বিন্দাঠাকরুন বলেছে, 'অ ধনুক, তু বর্গাদার হবি নাকি রে! দেখিস বাপ! বেধবার জমি। লিস্ না।' লিতে বয়ে গিয়েছে ধনুকের। বর্গাদার সে হল না। ব্যস তার অর্থ কিছু পাবে না।

'কেন?'

'এটাই কানুন। বর্গাদার হলে ওসব পাওনা।'

'লেখাই নাই, কিন্তু আমিই তো বর্গাদার।'

'সার্টিফিকেট কই? লিখালিখি কই?'

'তা অবশ্যি নাই। কিন্তু লিখালিখির চেয়ে বিশ্বাস বড় লয়।'

'হে হে, লিখালিখিই পেমানে হে। কুছু পাবে না—মর!'

মরা অত সহজ নাকি? ধনুকের বউ বলল, 'বিশ্বেস বড়।' ধনুকের মন বলল, 'বিশ্বেস বড়।' ধনুকের বউ বলল, 'খাটব খুটব বেঁচে থাকব।' মন বলল, 'ঠিক। ঠিক। ভগমান দেহি দিয়েছে কেনে? হাত দু'খান দিয়েছে কেনে? দান লিবার লেগে লয় হে—খাটার লেগে।'

এখন তুখোড় রোদে বলাইবাবুদের মিছিলে হাঁটছে ধনুক। শ্লোগানও দিচ্ছে। মিছিল চারটে গাঁ ঘুরবে। দু'টো ঘোরা হল। এখনও দুটো বাকী। শ'দেড়েকের মত মেয়ে পুরুষ হয়েছে। বাতাস নেই। পায়ের তলায় মাটি ধনুককে গরম জিভে ছ্যাঁকা দিয়ে যাচ্ছে। উদোম লোমশ গা। কোমরে আধখানা লুঙ্গি, মুখে খোঁচা দাড়ি গোঁফ, আজ মোটেই তার আসার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বলাইবাবুদের দল মিছিল অন্তে খিচুড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। হাতা মাপা নয় পেট পুরে। ধনুকের খিচুড়ি বড় প্রিয়। তাছাড়া একদিনের আহার বেঁচে যাবে। অভাবের শুরু এক ফসলী এলাকায় বৈশাখেই। বৃষ্টির দেখা নেই। আগামী চাষের বিষয়ে সংশয় রয়েছে। ধানবানেরা চিরাচরিত প্রথায় ধানচালের ঘরে চাবি এঁটে দাম বৃদ্ধির মওকা খুঁজছে। গাঁয়ের দরিদ্র পরিবারগুলো ঠা ঠা উপোস শুরু করে

দিয়েছে। এ সময় খিচুড়ি পেলে কে না মিছিলে লগ্ন হতে চায়।

গাঁয়ের দরজায় মানুষের ভিড়। মেয়েরাও ঘাড় বাড়াচ্ছে। ঘোমটার আড়ালে চোখে উৎসাহ। এটা চাষীদের সম্পন্ন গ্রাম। সকলেই মণ্ডল। সিকিভাগ বাগ্দী বাউরী। কিন্তু আর কত ঘুরবে মিছিল। একপেট খিচুড়ি দেবে, খাটাবে না! ধনুক ভাবে। বিরক্ত হয়। পরশু সে রাখাল সাহাদের দলের মিছিলেও ঘুরেছে। মাথা পিছু এক টাকা দিয়েছে।

ধনুক বউকে বলেছে, 'সবাইকে বলবি ভোট দুব। কিন্তু—'

'কাকে দুব? হ্যাঁ গ চারজনাকে নাকি দিতে পাব!'

'হুঁ। পঞ্চাত ভুট বটে যে। গাঁয়ে, সমিতিতে আর জিলাতে—বুঝলি। ভুটের কিন্তু ঢেক দাম?'

'ক' টাকা।'

একেই বলে মুখ্য মেয়েমানুষ! ধনুক বলেছে, 'ঢেক টাকা, দেখছিস না কেমুন বিবাক লুক চাইছেক।'

'সেনবাবুদের বড়গিন্নি বলছিল, কাকে ভুট দিবে খুকার মা? আমি বলেছি, দুব—পেকাশ করে নাকি? তাবাদে ওই যে ঘোষদের ছুটুগেরস্ত বললেক, খুকার মা, আমাদের কথা ভুলেও যেও না। তা হ্যাঁ গ দুব আমরা কাকে?'

'দাঁড়া ভেবে দেখি।'

'মানকের মা বলছিল, উরা রাখাল গেরস্তদিকে দিবেক।'

শ্লোগানে ধনুক গলা মেলায় না। একবার পিছন ফেরে। ঘরের মেয়েমানুষকে দেখতে পায় না। তার পায়ে জড়তা আসে। ক্ষুধার চেয়ে এ সময় সে তৃষ্ণায় কাহিল। ইঁদারা কী টিপকল দেখতে পেলে মিছিল ছেড়ে যাবে। রোদের তাপ-তেজ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এ সময় গাঁ সুনসান হয়ে যাওয়ার কথা। নেহাতই সামনে ভোট তাই যেন মেলা।

পেছন থেকে বেহাই তাড়া দেয়, 'দাঁড়ালে কেনে, চল।'

ধনুক শরীর সামনে ঠেলে পেছনে প্রশ্ন রাখে, 'জল তিষে লেগেছে।'

'মিছিলে ছেড় যেও না। বাবুরা রাগ করবেক। তুমি আবার উদের মিছিলেও গেইছিলে!'

আমাদের আর উদের। তার অর্থ বেহাই বলাইবাবুকে ভোট দেবে। ঘরে চারটে ভোট। দু'বেটা, মাগ ভাতার। বড় বেটার বৌ বাপের ঘর। মিল হচ্ছে না। কাটান ছাটান হবে। বেহাই সরষে মিনিকিট পেয়েছে।

'কানাই গেরস্ত আমাকে লিজে মিছিলে আসতে বলেছে।' ধনুক দর্পের সঙ্গে বলে।

বেহাই আর সাড়া করে না।

মোড়লগাঁ পেরিয়ে ডাঙা, বাবলার শ্রেণী, দত্তপুকুর। মাটির রাস্তা এখানে বারবার কোমর ভেঙে বাঁকচুর। তারপরই বাঁশঝাড় নিয়ে মুচিপড়া। ঢোকার

মুখে সরকারী ইঁদারা। কপিকলে দড়ি লাগিয়ে একটা মেয়ে থমকে মিছিল দেখছে। ধনুক মিছিল ছেড়ে এগিয়ে যায়। তারপরই তাড়া দেয়, 'দাও দিকিনি একডুং জল।' ব্যগ্র হাতে জল তোলে মেয়ে। আদুল শ্যামলা গায়ে ময়লা পড়া সবুজ ছাপ ছোপ শাড়ি। মাথার চুল খোলা। মোটাসোটা চেহারা, ভারী মুখ।

জলের কাছে হাত পাতার আগে এসে পড়ে পাকু। পাকু হাড়ী। মুখে খোঁচা দাড়ি, কোমরে নীলচে লুঙ্গি। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, ভারী স্বাস্থ্য। চাষ করে লখু গেরস্থর জমি। পাঁড়মাতাল। তবে নায্য কথা বলতে পারে।

জল খাওয়ার পর মিছিললগ্ন হবার আগে লখু বলে, 'খুব ত বলছিলে সিদিন আমাদের ভুটের দাম, জান ছোটবাবু বলছিল, হাড়ীপাড়া ভোট না দিলেক তা কী হল! আমাদের পিছাতে জনগণ আছে।'

'জনগণ। উ'ট আবার কে?'

'জিতুকে শুধোলাম। উ বলবেক জনগণ মানে পাবলিক।'

'পাবলিক মানে?'

'পাবলিক মানে দেশের লুক, গাঁয়ের লুক।'

'হাড়ীপাড়া কী দেশ লয়—গাঁ লয়! লুকগলা কী লুক লয়।'

'অত জানি না। তেবে বুঝলাম পাবলিক পিছাতে থাকলে তুমার আমার ভুটের দাম নাই;'

'অথ!'

'তুমিই বুঝ।' পাকু মিছিলে ঢুকে গেল।

পিছনে ধনুকও ঢুকল। একপেট জল খাওয়ার স্বস্তিটা পাকুর কথায় নিমেষে যেন মুছে গেল। কে জানত, এর মধ্যে আবার পাবলিক মাথা ফুঁড়ে দাঁড়াবে। ছোটবাবু মানে কানাইবাবু। হাড়ীপাড়া কেন ভোট দেবে না। তাহলে ওরা কী রাখাল গেরস্তদের দেবে। কিন্তু কানাইবাবুদের দিকে পাবলিক থাকলে!

ধনুকের মাথায় তালগোল পাকিয়ে যায়। আকাশ অবিরাম রৌদ্র প্রহার চালিয়ে যাচ্ছে। বাতাস যেন রৌদ্রভয়ে পিঠটান দিয়েছে। ঘামছে সকলে। মিছিলে গোড়ায় সেই শ্লোগানের তেজ রোদ অনেকখানি মেরে দিয়েছে। ধনুক শুধু ঠোঁট নাড়ছে। ভোটের স্বত্ব এবং মূল্যমান নিয়ে তার বড় অহঙ্কার পাবলিক নামের শব্দের আঘাত বুঝি কুঁকড়ে দিয়েছে। ভোট না দিলেও পাবলিক জিতিয়ে দেবে। শালা, পাবলিক।

মিছিল একসময় থামে। রোদের মধ্যে বেলা পড়ার কোন চিহ্ন নেই। এটা একটা আমবাগান। মানুষের মেলা বসেছে বাগানে। গাছের ছায়ায় সব জটলা। এখানেই খিচুড়ি দেওয়া হবে। পাশেই বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাদা একতলা বাড়ি। বাউন্ডাড়ির মধ্যে গাছগাছালি। রান্না হচ্ছে ওখানে। ভুরভুর গন্ধ আসছে। কয়েকটা চেয়ার পেতে গেরস্তদের ছেলেরা বসেছে। বলাইবাবুও বসে রয়েছেন। ধবধবে পাঞ্জাবি, পাতলা ধুতি ভারী ফরসা মুখে আঁটসাঁট চশমা। হাতে একটা

তালপাতার পাখা।

ধনুক খুকার মাকে মেয়েদের ভিড়ে ইশারা করে ডাকে। পেটের মধ্যে পাবলিক নামের তার ভোটের স্বত্ব বিনষ্টকারী অস্তিত্বের সংবাদ ঘরের বৌকে দেবার জন্যে যেন ছটফট করছে। মেয়েকে নিয়ে কাছে এলে বলে, 'খুকা কুথা? গেল কুথা ছেলেট—হ্যাঁ গ।'

'উ ছেলেদের সাথে আছে। শুন, আমরা ভুট না দিলেও ক্ষতি নাই, যদি পাবলিক থাকে। বুঝলে পাকু বলছিল—।'

মেয়েমানুষের কালো দোহারা শরীর। ভারী মুখ। এক ঢাল কালো চুল। গায়ের রঙ কালো হোক স্বাস্থ্যশ্রী এবং নারীত্বের গরিমা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সে স্বামীর কথার মধ্যেই বলে ওঠে, 'পাবলিক আবার কে?'

'ওই যি কী বললেক! জন—জন—।'

'পাবলিক না ছাই। বুঝলে ডর দিখাচ্ছে। তা পাবলিক থাকলে আমাদের ভুট দাও, ভুট দাও বলছে কেনে? খিচুড়ি দিছেক কেনে? অ রে—অত বুকা যেন আমরা বটি।'

মেয়েমানুষের কথাকে ফেলে দেওয়া যায় না। ধনুক মাথা চুলকায়। পাবলিক সব হলে ভোট দাও হে, করে? ঘন ঘন গেরস্তরা পাড়াতে আসে?

'তাহলে তু বলছিস্;'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও ছেলেটকে দেখ গা।'

ধনুক বাগানে ভিড়ের মধ্যে হাঁটে। খিচুড়ি বোধ হয় এখনও নামেনি। তবে গন্ধে মাত হয়ে আছে। এতক্ষণে তার আবার খিদে পায়। কিন্তু পাবলিক—। ধনুক বড় বিপন্ন বোধ করে। পাবলিক তার ভোটের স্বত্ব বা অধিকারকে বিনষ্ট করছে।

পাজামা পরা গোপী সেনের ছেলে আসছে। ফরসা রঙ। মুখে দাড়ি রেখেছে। কী চমৎকার মুখখানা। ভাসা ভাসা চোখ। তা বাপ মা সুন্দর, ছেলে সুন্দর হবে না!

সামনে গিয়ে ধনুক সরাসরি প্রশ্ন রখে, 'হ্যাঁ গ পাবলিক কি!'

'জনগণ।'

'শুনছি আমরা ভোট না দিলেও উ সব করতে পারে।'

হাসল গোপী সেনের ছেলে। বলল, 'জনগণই তো সব। তুমিও তো জনগণ।'

অবিশ্বাসের গলায় ধনুক বলল, 'তা কেমুন করে হয়। আচ্ছা পাবলিক কী করে?'

'পাবলিকই তো সব। পাবলিক ইচ্ছে করলে সব ওলোট পালট করে দিতে পারে। দেশ তো চালাচ্ছে পাবলিকই। আর তো ইংরেজ নেই, জমিদারও নেই। পাবলিকই সব দলের শক্তি। পাবলিক যাকে চাইবে সেই শাসনে আসবে।'

তাহলে! ধনুক টের পায় পাবলিক নামের অধিকার হরণকারী তার প্রতিপক্ষটি

অমিত শক্তিধর। লেখাপড়া জানা ছেলে, তার মত মুখ্যু নয়। সে আরও প্রশ্ন রাখতে চায়। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে চলে যায় গোপী সেনের ছেলে।

এত উজ্জ্বল রোদের শেষ মধ্যাহ্নও তার কাছে ধূসর মনে হয়। আমের ছায়ায় সে ঘামে। কয়েকশ মানুষের জটলায় জোর শব্দ বাজছে। ঘোরাঘুরি, হাঁক ডাক, ঘরের কথা, খিচুড়ি নামল কী না তার খবর, তারসঙ্গে হঠাৎ বেজে ওঠা শ্লোগান মিলেমিশে এই যে অবিশ্রাম ব্যস্ততা, তা ধনুককে স্পর্শ করে না।

খিচুড়ি খাওয়ার পর বৌ ছেলের সঙ্গে ধনুক হাঁটে। পাশ দিয়ে গাঁয়ের মানুষ চলেছে। রোদে এখন ঢল নেমেছে। দিনের তাপে কিন্তু পুরোমাত্রায় পুড়ে যাচ্ছেন আকাশের দেবতা।

ভরপেট খিচুড়ি খাওয়ার ঝিমুনি বুঝি নামে তার। পা জোড়া ক্লান্তিতে আড়ষ্ট হয়ে আসে। কেমন যেন অবশ হয়ে ওঠে স্নায়ুকোষ। গোপী সেনের ছেলের কথায় মন ভরেনি। সে অনুভব করে পাবলিক তার ভোটের স্বত্বকে সত্যিই মূল্যহীন করে দিচ্ছে। স্থূল মস্তিষ্কে ওই ভাবনাই ঘোলা বেনো জলের মত পাক খায়। সে ভয়ঙ্কর শক্তিমান প্রতিপক্ষের কাছে হাত জোড় করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ খুঁজে পায় না। বিড়বিড় করে, 'হেই বাপ পাবলিক, তুমি এমুন করে আমার স্বত্ব লিয়ে লিও না। যারা মানুষের ভাল চায় না, যারা—যারা—হেই বাপ পাবলিক তুমি তাদের দিকে যেও না। হেই বাপ কথা শুন আমার। তোমার ভালো হবেক বাপ!'

ধনুক বাগ্‌দীর স্বত্বহারা আকুলতা শেষবেলার রোদ্দুরে মাখামাখি হয়।

সোনার চামচ

শ্রাবণ সংক্রান্তির আকাশ নীলের অজস্রতায় মেঘশূন্যে সারথি কুনুইকে ইঙ্গিত দেয় রাতের আসর শ্রোতায় শ্রোতায় টলটলে বর্ষার দিঘি হয়ে উপচে যাবে। ইঙ্গিতটা সারথি কুনুইয়ের কাছে কথাও হয়ে যায়। আকাশও তো কথা কইতে পারে। আকাশ বলে দেয়, নীলকে আরো ঘন করে আঁকলে অগণন নক্ষত্র আলোর চুমকি বসিয়ে নেবে, কদিন পরই পূর্ণিমা ফলে প্রায় আস্ত একটা চাঁদকে কপালে টাঙিয়ে রাখবে গোল টিকলির মতো, বর্ষাদগ্ধ স্থির গুমোটকে মৃদুমন্দ সুবাতাসে ভিজিয়ে অস্থির নাড়া দেবে গাছের ডালে পাতায় পাতায়, তাহলে তো যতিলাল রজকের ঘরে মনসা-গানের আসরে মানুষের ঢল নামবে, সারথি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। সারথির ভাবনা তো আচমকা মেঘ এসে জোর বর্ষণ কী আঁইড়ে লাগা কাঁদুনে শিশুটির মতো অবিচ্ছিন্ন ঘুনঘুনাতিতে কাদা প্যাচপ্যাচে করে দিতেই পারে আসরের মেঝে জমি, শাওনে আকাশের এটাই দস্তুর, সে গৃহবন্দী করে মানুষকে, গানের আমোদ কী দেবী আখ্যান শোনার ভক্তিপরিবেশ নষ্ট করে, শরীরের কষ্ট নিয়ে তো আহ্লাদ কুড়োনো যায় না, আর শ্রোতা বিহনে আসর সুরহীন, ভাঙা—না, না সেটা হচ্ছে না।

যতিলাল মনসা-ঘরের সামনেকার জমিতে খুঁটি বসিয়ে চৌকো চাল দিয়েছে খড় ছিটিয়ে, উঠোনকে লালমাটি তার উপর গোবর পোঁচ নিকোনিতে তকতকে করেছে, চালের খুঁটিকে নিমপাতার ঝাড়ে, ছাঁচানিতে আমের শাখা, লাল নীল কাগজের ফুলে, ওই রঙিন কাগজেরই শিকল বেষ্টনীতে এবং সাদা ফুলবসানো লাল শালুর চাঁদোয়ায় মুড়ে শোভন করেছে—আকাশ তাতে আটকায় না।

সারথি কী করে নিশ্চিত হয়। আকাশ কথা দিয়েও কথা না রাখতে পারে। তার দোষ নেই। আকাশ বেচারা তো ভালোমানুষ। নীল নীল চোখ, নাক, কান, গাল চিবুক, ঠোঁট কপাল নিয়ে নীল নীল মন করে থাকে। তার উপর সূর্য প্রতাপ দেখান, মেঘ ঝড় বজ্র হামলাবাজি করে যায়, তোয়াক্কা করে নাকি ওকে। এই তো গত বছর রাতের আসর বসলই না। তুখোড় বৃষ্টি দাঁড়াতে দিচ্ছিল না কাউকে ঘর-বাইরে, পরদিন দুপুরে আসর। দিনের আসরকে মানুষের ঘরের টান কাজের টান জমতে দেয় না, সূর্যদেব আকাশ সাঁতরানিতে সকলকেই হাত-পা ছোঁড়া করান, দিনমানে থিতু হয়ে থাকতে কষ্ট হয় মানুষের, তো তেমনটি যদি হয়ে যায়!

যতিলালের ঘরে মা মনসা। সে রজক—জাতবৃত্তি উপার্জন। সন্তান নেই। এখন সোডা ছাপিয়ে অজস্র সাবান, তারপর আবার গুঁড়ো সাবান, কত কোম্পানির,

রংচংয়ে প্যাকেটে গাঁয়ের দোকানে ঝুলছে। ইস্ত্রিও অনেক ঘরে করে নিচ্ছে। ফলে ধোপা ঘরে ফেলে দেওয়ার স্বভাবটা এই মাচানপুরে বদলে গিয়েছে। নিত্য 'ভাটি' অর্থাৎ কাপড় সেদ্ধ করতে হয় না যতিলালকে। তার স্ত্রী তরু খাটো ফরশা বর্ণের দোহারা চেহারার গোলমুখে পরিশ্রমী মেয়েমানুষ। স্বামীর কাজের সহযোগিনী। অপরের পোশাক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে নিজেকে অমন ধবধবে করে রাখাতেও সজাগ। কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়। বিঘে পাঁচেক জমি, তাও দুবিঘে হদ্দ ডাঙা, তেষ্টায় ধানের গলা শুকোয়, 'চিট' হয়ে যায়। আর যতিলাল সেই ধোবার কাজই করবে। জাতবৃত্তি তো ছাড়তে পারে না। লখু পাল মাটির হাঁড়ি কলসি গড়া ছেড়ে পিঠে করাত নিয়ে করাতির দল করে লোকের গাছ কী তালের কাঁড়ি ফাড়তে যায়—সে লখু পাল হতে যাবে কেন! তার মতো পরিষ্কার করতে অমন ইস্ত্রি করতে পারে কে! চেকনাই দেখে ইস্ত্রির, মুখ হাঁ করতে হয় সবাইকে।

যতিলালের উঠোনে এসে সারথি দাঁড়িয়েছে। মনসাপূজোয় তাব আসর এবং মা-মনসার 'বারি' আনায় অংশ নেওয়ার জন্যে দক্ষিণা বাড়ানোর মতলবে। রাতের খাওয়া আর একত্রিশ টাকা নগদ কত কাল চলবে। তার আগে মনসাথানে দাঁড়িয়ে সে দেখছে আর ভাবছে। 'বারি' আসবে সন্ধেবেলায়। বাঁধ নামের মস্ত দিঘি থেকে কলসিতে জল, তাতে আমের শাখা, যতিলাল স্নান সেরে শুদ্ধবস্ত্রে মাথায় বসিয়ে দুহাতে ধরে ধীরপায়ে আসবে। ঢোল বাজবে, কাঁসি বাজবে, ধূপধুনো গুগ্গুলের ধোঁয়া দেওয়া হবে, সারথি গান ধরবে। কোঁচা ঝোলানো ধুতির উপর পাঞ্জাবি, গলার দুপাশে ঝুলে থাকবে সিল্কের চাদর। রুপোর বাঁট বাঁধানো চামর থাকবে হাতে, সেটা নাড়িয়ে তার গান। সহযোগী মকর দাস খোল বাজাবে, খঞ্জনি বাজাবে আশু। গলা মিলিয়ে দোঁহারিও করবে।

মা এলেন ঘরে
আমি ভয় কারে করি গো
মা এলেন ঘরে
নাগনাগিনী সাপসাপিনী
সামনে পিছে নাচে গো
মা-মনসার বরে
মা এলেন ঘরে
মায়ের দয়া হলে সবই
উথলে ওঠে সুখে গো
মা এলেন ঘরে
চাঁদ বেনের গর্ব চূর্ণ
পূজা নিলেন মা গো
মা এলেন ঘরে।

'মা এলেন ঘরে' প্রতিটি বাক্যে দ্রুতলয়ে গাওনার সঙ্গে মনসা মহিমা বর্ণন চলতেই থাকবে। আবার দাঁড়িয়ে পড়বেন মা। কী—না—আটক। মাকে আটকেছে। যতিলালের মাথায় 'বারি।' পা চলে না। যেন গেঁথে গিয়েছে মাটিতে। চোখ আধবোজা। ধূপধুনো গুগ্গুল গমকে গমকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে ফেলেছে, গানের সুর চড়া হয়েছে, অত্যন্ত দ্রুত হয়ে পড়ছে, ঢোলের শব্দ গানকে বাঁচিয়ে গলা খাটো করেছিল কাঁসির সঙ্গে, সেও চেঁচাতে শুরু করেছে। কিন্তু পা নড়ে না। তা কে আটকায় মাকে? কার এত বড় সাহস। আটকেছে চক্কত্তিমশাই।

ঈশ্বর চক্রবর্তীর অসাধারণ আকৃতি, যেমন দীর্ঘ চেহারা, তেমনি তাঁর স্বাস্থ্যের সুঠামতা। ফরসা বর্ণটি বীরভূমের তপ্ত এবং পাথুরে পরিমণ্ডলে তামাটে হয়ে গিয়েছে। রূপবানও ছিলেন একদা। বয়স সত্তর অতিক্রান্ত। ধবধবে সাদা চুল, গোঁফ, লম্বা দাড়ি। কোমরে থাকে রক্ত গৈরিক আধা ধুতি কাপড়, গায়ে ওই রঙা পাঞ্জাবি। লোকে বলে, চক্কত্তিমশাই। ঝাড়ফুঁক, কবচ তাবিজ দানাদত্যি নিয়ে মশাইয়ের কারবার। ছেলে কাঁদছে থেকে গরুর বাঁটে দুধ নেই ইস্তক অসুখ-বিসুখে অদ্ভুত কাণ্ড কারখানায় তাঁকে প্রয়োজন সবার। চাহিদা বলতে কিছু নেই। তন্ত্রগুরুর আদেশ, পরের উপকার করবি, যেদিনই লোভ করবি পীড়িতের টাকা কী দ্রব্যের উপর, সেদিনই তোর সাধন ফল বিনষ্ট হবে। চক্কত্তিমশাই কথাটা প্রায়ই বলে থাকেন। কিন্তু লোকে না দিয়েও তো পারে না। অভাব নেই তাঁর। তিনখানা হাল, অর্থাৎ কম বেশি চল্লিশ বিঘের মতো ধানী জমি ডাঙা মিলিয়ে, ঘরে গাই মোষ বলদ ভেড়া ছাগল। সংসারী মানুষ, স্ত্রী নেই, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সম্বন্ধ রাখে না ছেলে রাহুল। মাদ্রাজে ইঞ্জিনিয়ার। বিয়ে করেছে মাদ্রাজি মেয়ে। বউ নিয়ে এসেছিল দুবার। চক্কোত্তিমশাইয়ের হিসেবি মদ্যপান স্বভাব। তাও দেশী ভেতো। আর দীর্ঘকাল পুষ্প বাউরীকে রক্ষিতা রেখেছে। পুষ্পর যৌবন নিঃশেষিত। তবু মানুষটা যায়। বাবার এই দোষ কী রাহুলকে দূরবর্তী করেছে না বীরভূম থেকে মাদ্রাজ বরাবর কয়েকশো মাইলের দূরত্বই কারণ কে জানে। চক্কোত্তিমশাই বলেন, 'থাক। থাক। যে যেখানে সুখে থাকে থাকতে দাও।' তো এই মা-মনসা আটকে চক্কোত্তিমশাই গোঁফের ফাঁকে ভারি রহস্যময় হাসি আলগা করার নাচানাচি নিয়ে বলেন, 'আটক বলো না হে—বলো খেলা। মা যে খেলতে চান। আমি আটকাব তার সাধ্য কী। এবার ছাড়ান দিক কে ওঝা আছে, গুনিন আছে, ডান-ডাকিন নিয়ে কাজ কারবার করি—আমি তো ইকা লই—এ তল্লাটে আছে বইকী। আরো লুকজন। অন্য গাঁ থেকে কেউ এসে থাকলে তাকেও বলি।' কিন্তু না, কেউ না। সেবার পরান লড়তে গেল। না পেরে পায়ে পড়ল,' 'আপনার মস্তকের কাছে হার মানছি চক্কোত্তিমশাই।'

'ও চক্কোত্তিমশাই ছাড়ান দেন।'

'নিজের আটক নিয়ে কাটতে আনন্দ নাই।'

'দিলেন কেনে তাহলে?'

'আহা মা ঘরে আসছে। দাঁড়িয়ে আঁচল টানব না, ও মা ওমা করে।'

'খুব হয়েছে। রাত হচ্ছে। পুজোয় বসতে হবে।'

'লে তাহালে চলুক মা।'

কিছুটা যেতে না যেতে আবার আটক। আবার, 'ও চক্কোত্তিমশাই।' রাগ রোষ নয়, এও এক আমোদ। মায়ের 'বারি' ঘর ঢোকাতে হান্তসান্ত ঢুলি থেকে গায়েন সারথি পর্যন্ত। সঙ্গে জনতার মিছিল বড়বউয়ের কোলে ছ-মাসের নাতি রঘু থেকে শুরু করে ঘোষদাদু লাঠি হাতে, ভালো শাড়ি ব্লাউজে কপালে টিপে মেয়ে বউয়েরা, উলুধ্বনি দিতে হবে না, শাঁখ বাজাতে হবে না।

কিন্তু চক্কোত্তিমশাইয়ের কথা সারথি ভেবে বসল কী করে! তিনি তো মদে বিষক্রিয়ায় মারা গেলেন। রাহুল এল। ষোড়শ শ্রাদ্ধ হল। পঞ্চগ্রাম নেমন্তন্ন খেয়ে গেল। তারপর সব জমি বিক্রি করে চলে গেল। পরিত্যক্ত দালান বাড়িটা হাঁ হাঁ করে। দরজা জানলা নেই। ইঁটও খসে পড়ছে। কবছরেরই-বা ঘটনা।

চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে 'আটক'ও গিয়েছে। সেই গানে 'বারি' আনার আমোদ নেই, বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা নেই। তবু মকর বলে কীনা, 'বারি আসবে টিকি টিকি করে, তারপর রেতে গান, খাটনি নাই।' আগেকার তুলনায় কী আর খাটনি। গান গেয়ে ঘাম ছোটে না। রাতের আসরে পরিশ্রম আছে। কিন্তু কোথায় সেই শ্রমের কষ্ট। উল্টে স্ফূর্তি, সমস্ত শরীর জুড়ে আনন্দের প্রবাহ। মা-মনসা আপন মহিমা কীর্তন শুনতে ভালোবাসেন, লোককথা। সারথির কথায় সুরে সেই মহিমার শব্দ গাঁয়ের মানুষদেরও কম প্রিয় নয়। সারথি প্রত্যক্ষ করে জমাটি আসরের অদ্ভুত স্তব্ধতায়, কান পেতে রাখার ভঙ্গিতে। শব্দে সুরে সে গড়ে তোলে চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা লখিন্দরের আখ্যান। অতি পরিচিত বহুশ্রুত হলেও শ্রোতারা বারবার ভাসেন।

নম মাতা নম মাতা নম নারায়ণী
শিব কন্যা বট মাতা বিজয়া ব্রাহ্মণী
প্রথমে বন্দিএ্যা গাইব ধর্ম নিরাকার
যাহার সৃজনে হৈল জগৎ সংসার

বন্দনার পরই চতুর্ভুজ মনসামূর্তির বর্ণনা—

চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর
নানা আভরণ সর্প অঙ্গের উপর
কালনাগিনী দেবীর শিরে কেশভার
সৌঁতিতে লাগিল দেবীর আগুণ্য চিএ্যার
সিন্দরিয়া নাগদেবীর সিন্দুর উজ্জ্বল
পএ্যাচিএ্য নাগদেবীর মএ্যানে কাজল
যুএ্যনাগে দেবীর যুগল হইল ওষ্ঠ

পাতুণ্ডা নাগে দেবীর হইল জিহ্বা গোট
দশাঞ নাগদেবীর দশন হইল
দন্তমধ্যে ভ্রমর যেন গুঞ্জরিতে নাগিল
গোয়ানি মুক্তলিঞ করিঞা সাজনি
মাথায় ধরিল ছত্র অহিরাজ ফণী।

তারপর চাঁদের তাচ্ছিল্যভরা মনসাপূজা অগ্রাহ্য করার সুর—

চাঁদ বলে, কানি তোর লাজ নাই চিতে
কোন মুখে আইলি তুই মোর পূজা খাইতে
যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কানি!

লখিন্দর বেহুলার বিয়ে। বাসর শয্যা। কালনাগিনীর দংশন।

ওঠ ওঠ প্রাণেশ্বরী কত নিদ্রা যাও।
মোকে খাইল কাল নাগে চক্ষু মেলি চাও।

এই সব মিলে যে সুরবৃত্ত তাতে বন্দী শ্রোতাকুল যেন অদৃশ্য এক জালে তাকেও আবদ্ধ করে। সে জালের বড় মোহ। সারথি কেমন করে ভুলতে পারে যুবতীর বাহু শৃঙ্খলের মতো ঘন বুননির সেই জালের মধ্যেকার আনন্দ পুরুষটিকে—তার ভিতর যার বাস।

মকর কদিন থেকেই তাকে ব্যস্ত করে তুলছে, 'আরে যাও-যাও। বলো গা। আমিই বলতাম যতিকে। তা মূল গায়েন তুমি। আমি বললে বলবে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। চালের কেজি ছয় সাড়ে ছয়, তেল বত্রিশ, ডালের দাম পনেরো ষোলো, চিনি চোদ্দ, একটা গামছার দামই এগারো—মনসাগানের দাম কী একজায়গায় দাঁড়িন থাকবে?'

মকর বেঁটেখাটো ছোটমাথার মানুষটি। অজস্র চাপে যেন বাড়বড়ন্ত হয়নি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের।' নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে লড়াইয়ের সে যে হেরে যাচ্ছে তা ওর হাঁটার ভঙ্গিতেই ধরা যায়। বড় কষ্টের বুঝি পদক্ষেপ। সংসার করেনি নিজে। সংসারের বাড়া তার ভাইপো বিশুর সংসার। বিশু তিনটে শিশুসন্তান রেখে মরে বসল। খেজুর গাছে রস টাঙাতে গিয়ে পচা 'খোঙা' খসিয়ে পাথরে পড়ল মাথা। বউ নন্দা একুশ বছর বয়েসেই তিন সন্তানের জন্ম দিয়ে ফেলল। স্বাস্থ্যবতী, বাঁশি নাকা, টানা চোখ এবং যৌবন হিল্লোলিতা তৃতীয়টির জন্মের মাস চার পরই বাপের ঘরের গাঁয়ের একজনের সঙ্গে সরে পড়ল। গাঁয়ের মানুষ গালে হাত দিল, 'ওমা, যাব কুথা, কান্ড দেখ, ছি ছি, মা তো লয়, ডাইনি বটে!' মকর বলল, 'কুকুরের মা।' তবে কুকুর ছানার মত নয় মানুষের ছানার মতোই সে প্রতিপালনে লেগে পড়ল। বড়টি মেয়ে, ছোট দুটি ছেলে। সব ক'টি স্কুলে পড়ে এখন। মকর রান্না, বাটনাবাটা থেকে বাসনমাজা, মেয়ের চুল বেঁধে দেওয়া, সেলাই-ফোড়াই সবেই একধারে নারী পুরুষ স্বভাবী। মা-বাপের এক

দেহ যেন। দাদু নয়। মুদির দোকান দিয়েছে। পুঁজিপাটা মাত্র কয়েকশ টাকার। একটা আনতে আর একটা ফুরায়।

সারথি বলেছে, 'কিন্তু যতিলালের একবার অবস্থার কথাটা ভাবো!'

খিঁচিয়ে ওঠা মুখ মকরের, 'ছাড়ো অবস্থা। কার ভালো। তা বলে একত্রিশকে একান্ন টাকা করতে পারবে না। যেঁয়ে ত বলো গা।'

সারথির বলা হয় না। যতিলালের কোথায় সংগতি। পূজার আয়োজন করতে কম ব্যয় নয়। আতপ থেকে গামছা অবধি ফলমাকড় নিয়ে মস্ত ফর্দ, তারপর ঢুলির টাকা। ঠোঁটে শাদা সুতোর বিড়ি শেষ করে উঠোনে সে দাঁড়িয়ে থাকে। খাটো ধুতির উপর শাদা গেঞ্জি, মাথায় ঘাড় বরাবর কালো ফাঁপানো চুল, লম্বাটে ধরণের মুখ গোঁফবিহীনতায় কেমন মেয়েলিপনার ঢলানি রেখেছে, উজ্জ্বল বড় বড় একজোড়া চোখ। চেহারায় শিল্পীভাব এবং কথার নম্রতাকে সে বীরভূমের এমন রুখুশুকু তপ্ত ভুঁইয়ে দিব্যি বজায় রাখতে পেরেছে।

গান আর পুতুল গড়ার নেশা সারথির জ্যাঠা ভুবনের কাছে মুখের বোল ফোটার বয়সকাল থেকেই। জ্যাঠা বিয়ে করেনি। গানের দল করেছিল। রামায়ণ গান, মনসার গানের সঙ্গে আলকাপ লেটোর মাতুনি নিয়ে কাটাত। নিজে গান লিখতেও পারত। একখানা যাত্রাপালাও লিখেছিল, 'বীর কর্ণ'। সারথির জ্যাঠাই পড়াশুনাটা ক্লাস এইটেই শেষ করিয়ে দেয়। জ্যাঠার আসরের দায় তাকে নিতে হয়। হাঁপের টানে জ্যাঠা সুর তুলতে পারত না। আসরে বসে হাঁপাত। নেহাত নামেই ডাক। মারা যেতে দল সারথি রাখতে পারেনি। তখন কী আর বয়স। মাও চলে গেল পরের বছরই। বড়বোন সরযূর বিয়েতে বারো বিঘে জমির চার বিঘে গেল। বাবার সঙ্গে হাত মেলাতে হল উপার্জনে। লেটো আলকাপের তখন পশ্চিমদিগন্ত ছোঁয়া সূর্যের কাল—অস্তে চলে যায়। তবু আসরের কথা শুনলেই সে ছুটত। কবিগানের আসরে যেত। মুর্শিদাবাদের কবিয়াল শেখ হারুর সঙ্গে ভাব-সাব হয়ে গেল বেলেড়ার আসরে। ওর দলে সারথির আমন্ত্রণও ছিল। গান আর শব্দ দিয়ে দ্রুত কবিগান বানানোর কেরামতি দেখিয়ে দেওয়ার পর। তখন কবিয়াল হওয়ার বাসনা মাথা কুটে মরছিল। স্বপ্নে দেখত, কোঁচা ঝোলানো ধূতি আর পাঞ্জাবি পরে গলায় চাদর নিয়ে কবিয়াল হয়েছে।

বউ হয়ে ঘরে এল শ্যামা। কে ভেবেছিল পশ্চিম পাড়ার শ্যামা তার বউ হবে। ছেলেবেলা থেকে দেখা। রোগা কালো মেয়ে, মাথায় সামান্য চুল, কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে পারে সবার সঙ্গে। তাকে কী ঝাড়ই-না দিয়েছিল। চাটুজ্জেদের পুকুরের দক্ষিণপাড়ের আমড়াগাছটার নীচে বসে সে গান ধরেছিল, 'ভালোবেসে চলে গেলে ও কালোসোনা / মনপাখি যে কাঁদে ওগো শোনে না কো মানা।' সামনেই বলদজোড়া চরছিল। ওদের চরাতে এনেই নেহাতই সময়পাতের সুরসাধনা। কিন্তু কে জানত সামনের ঘাস চেরা সাপবেঁকা রাস্তা দিয়ে আসছে শ্যামা। গান শুনেছে। তার উদ্দেশেই বলে ধরে নিয়েছে। সারথি দেখেছিল

চৈতিঘূর্ণি হয়ে, উঁহু কালবৈশাখী হয়ে ফ্রক পরা শ্যামা, যথার্থই শ্যামা, হাতে খড়্গ নেই, গলায় মুণ্ডমালা নেই এই যা—'আমাকে দেখে গান। আমি কালো তো তোর বাপের কী! ভালোবেসে চলে গেল। মুখে তোর আগুন গুঁজে দুব, গায়েনগিরি ঘুচিয়ে দেব—জানিস না আমি কার বিটি বটি।' ঘূর্ণি আর কালবৈশাখী বেরিয়ে যাওয়ার পরও সারথি ঠকঠক করে কেঁপেছিল। একটা শব্দও সে বের করতে পারেনি। কালোসোনা মানে শ্রীকৃষ্ণ পরেও বলা হয়নি। সেই শ্যামা বউ হয়ে আসাতে ফুলশয্যার রাতে যেন ফুলেরই একটা সবুজ ডালপাতায় মোড়া রংবাহারে গুচ্ছ। কালো রং হলেও সতেরো বছরের শ্যামার দেহরেখার যে তীক্ষ্নতা, চাউনিতে যে আবেশ, কৌতুক হাসিতে যে বিকিরণ তার মুগ্ধতায় পুরুষ পাখির অস্থির কামনার পক্ষ সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছিল। সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। শ্যামা বলেছিল, 'ওমা, ঘুরে দেখবে তো। আর তো গাঁয়ের মেয়ে লই—এখন তোমার বউ। ঘুরে দেখতেই হবে সংসার করতে গেলে।' স্বল্প নীরবতার পরই বলেছিল, 'বিয়ের কথা পাকাপাকি হতে, ভাবলাম, ঘুরে দেখবে—যাব কোথা! তিন, উঁহু, পাঁচবার দেখা হয়েছে এ সপ্তাহে, তুমি—।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সারথি বলেছিল, 'না মানে—।' শ্যামার ঠোঁটে হাসি, স্বরে নমনীয়তা, 'যাক বাবা রাগ নাই। ঠাকমা বলেছে, সারথি খুব ভালো ছেলে, কী সুন্দর রামায়ণ গায়, ওর সঙ্গে ঝগড়া করবি না। কেনে ঝগড়া করব! বলো। ভালোবেসে চলে গেলে ও কালোসোনা / মনপাখি যে কাঁদে ওগো শোনে না কো মানা। এখন তুমি গাইতে পারো।' বলে ঢলে ঢলে হাসে শ্যামা। সারথি বলে, 'তুমি সেই থেকে গানটা মনে রেখেছ!' শ্যামা চোখ কপালে তোলে, 'সেই থেকে! আমার বয়ে গিয়েছে! বিয়ে পাকা হতে সাবিত্রীকে বললাম, 'ভালাবাসে কালোসোনা গানটা তোমার কাছ থেকে লিখে আনতে।' সারথি বলে, 'তাই তো বলি—।' বিছানায় সে উৎসাহে পাশে বসে। হাঁটু ঝুলিয়ে বসে পা দুলিয়ে হাসে শ্যামা, 'তুমি বুঝতে পারো নাই—বলো।' মুখে তখন পূর্ণিমা।

শ্যামার দাপট তো কম ছিল না রাতের অমন নরম পেলব সৌগন্ধময় গানের মতই বাক্যক্ষরা নারী যে দিনের বাঘিনী তার সত্য সারথি টের পেয়েছে বারে বারে। শ্যামা গর্ভের সন্তানকে খালাশ দিয়ে পনের দিনের ভেতর মারা গেল। ছেলেকে সাবিত্রীর হাতে দিয়ে বলল, 'সাবি তুই আমার ছেলেকে দেখবি।' সাবিত্রীর বিয়ে হয় নি। সারথির কাছে যা রহস্য! না রহস্যের একটা তকমা আঁটা শুধু। অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েই মনের মধ্যে কারণটা জানা। সারথিকে যে কারণ বড় আনন্দ দেয়, যে কারণ বড় বিষাদ দেয়। কোনটাই গোটাগুটি নয় খণ্ড খণ্ড ভাঙা ভাঙা। সাবিত্রী তিন ভাইয়ের মতোই ভেন্ন থাকে। জমি ভিটের ভাগ হয়েছে। সাবিত্রী এখন চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, সারথি চুয়ান্ন, ছেলে সুবীর ছাব্বিশ বছরের। বারাসতে সুবীর একটা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছে।

সারথি দেখে, যতিলালের উঠোনের কী পরিপাট্য, কী পরিচ্ছন্নতা, পুজোর

গন্ধে বাতাসে কী ভুরভরানি! পাড়ার মেয়েগুলো ওখানে এক্কাদোক্কা খেলছে, বাঁশি বাজাচ্ছে ভরতের কোলে বসে ওর নাতি, লাল কাপড়ের টুকরো মোড়া ঢোলটা নিয়ে বসে আছে কুমড়ের সাদা ডোম, ফুলচরকি হাতে নিয়ে এপাশ-ওপাশ দৌড়ে বাতাস সংগ্রহে ঘোরানোর খেলা খেলছে নতুন প্যান্ট গেঞ্জিপরা রায়দের ছেলেদুটো। দরজার মুখে বসে আছে রাজনগরের হাবাকালা, শোলার কাজ করিয়ে পেহ্লাদ, আঙুলের ইশারায় দাম বোঝায়, সামনে পাতা রংবেঙের চাঁদমালা, মাটিতে পোতা একটা খড়ের মোড়ক লাঠি, খড়ে গোঁজা ফুলচরকি। উবু হয়ে বসে চাঁদমালার বাহারপনা দেখছে গণেশের বিটি, কুঁড়োর ছেলেটা, ওদিক থেকে লালপেড়ে শাড়ি লাল ব্লাউজ মাথার চুল খোলা পানু মোড়লের বউ যেন দুর্গাপ্রতিমা, হাতের পাতার উপর পুজো উপাচারের থালা, মনসাথানে দেবে, খড়ের চালে চারটে শালিখ।

যতিলাল সামনে আসে, 'কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে। বার বার ঘুরে ঘুরে আমাকে দেখছ।'

সারথি এটাই চেয়েছিল, অস্বস্তির হাসি নিয়ে বলে, 'ওই দক্ষিণার কথা।'

ব্যস্ত যতিলাল বলে, 'বাড়াতে বলবে তো। একচল্লিশ দুব।'

সারথি যেন বেঁচে যায়। শরৎ আকাশে একটুকরো মেঘ থিতু হতে না পেরে যেন ভেসে যায়, বলে, 'ঠিক আছে। সাজান ইবার ভালো হয়েছে।'

'ওই ভাগনে এসেছে। ওই করলেক। পাড়ার ছেলেরাও লেগেলুগে দিলেক। বিড়ি খাবে?'

'এই খেলম।'

কিন্তু মকর শুনেই অখুশি গলায় বলে উঠল, 'তোমাকে একষট্টি বলতে হয়, তাহলে একান্ন হত। কী যে করো।'

মকর দাস দোকান খুলে বসে আছে টাটের উপর। সামনে দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা। পিছনে দেওয়ালে পাটা দিয়ে তাকের উপর কৌটো, জার, দেশালাই সিগারেটের বাক্স, সাবান, ডিটারজেন্টের থলে, আয়না, সব মনিহারী সামগ্রী। তার দুপাশে কাঠের খুদে চৌকো বাক্স—তাতে ডাল নুন সরষে তেল। ওদিকে চারটে বস্তা মাল নিয়ে মুখ মুড়ে আছে। উত্তর দিকে দেওয়ালে একটা দরজা। ঘরের ভেতরে যাওয়া যাবে দোকান বন্ধ করে।

দোকানে সিগারেট কিনতে এসে সদানন্দ কথাগুলো সব শোনে। সে চাকরি করে ডিশেরগড়ে। কোল ইন্ডিয়ায় চাকরি। অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। সপ্তাহে সপ্তাহে গাঁয়ে আসে। ফরশা মোটাসোটা চেহারা, চোখে চশমা, লুঙ্গির উপর হাফ চাইনিজ শার্ট, হাত ঘড়ি। বলল, 'দরাদরি বেশি করতে যেও না। এরপর দেখবে টেপরেকর্ডারে ক্যাসেট প্লেয়ারে মনসার গান বাজবে। কেন ফালতু আসর বসিয়ে টাকা গুনতে যাবে। মা-মনসা সারাদিন শুনুন কেন নিজের মহিমা!'

সারথি বলল, 'বলো কী! মনসার গান বেরিয়েছে ক্যাসেটে!'

'তা কী আর বের হয়নি।'

গাঁয়ে চারটে টেপরেকর্ডার। গোপাল নিধুজ্যাঠা বংশী আর সদানন্দর। অবিশ্বাস করা যায় কী করে।

নটে রাস্তার উপর থমকে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। বলে উঠল, 'সারথিকার গানও বাজবে ক্যাসেটে রেডিওতে। সেদিন রেতের বেলা সব সুমসাম হতে সুবীরের বন্ধু গান তুলে নিয়ে গেল না। বাবা আমি সব খবর রাখি।'

'তাই নাকি? ক্যাসেট হচ্ছে সারথিকা?' সদানন্দ জিজ্ঞাসা করে।

'ছাড় তো নটের কথা।'

'নটে ঠিক কথাই বলে। গাঁয়ের একটি বেঠিক খবর দেয় না। ট্যাঁক ঠনঠনে তাই কথার দাম দেয় না গাঁয়ের লুক। এক বর্ণ মিথ্যে কবে বলেছি। বলি নাই, অজিত বউ নিয়ে কোয়াটারে যাবে, মা-বাপ থাকবে পড়ে। ফলল কিনা।'

সদানন্দ বলল, 'তোর তো আড়ি পেতে লোকের ঘরের কথা শোনা অভ্যাস। আর কী কাজ।'

নটে প্রতিবাদ করল না। সে মিথ্যে বলে না বটে, তবে জীবনটাকে এমনভাবে বইয়ে দিচ্ছে যাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। বছর চল্লিশ বয়স। হাড়ের কাঠামোয় যতটা পাতলা মাংস দেওয়া সম্ভব বিধাতা দিয়েছেন। গলা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ছোটখাটো মুখমণ্ডল, কাঁচাপাকা চুলে টেরির বাহার আছে। সব সময় ফিটফাট, যেন কোথাও বেরুবে। ধবধবে সাদা পাজামার উপর ইস্ত্রি করা নিভাঁজ পাঞ্জাবি, পায়ে চটি, বুক পকেটে পেন, হাতে রুমাল আর নস্যির ডিবে ধরা। দুভাই-ই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। বুধু রায়ের ঘরে রান্না বান্না, দেখভাল করে বেশ কিছুদিন কাটাল। অকৃতদার মানুষটির সঙ্গে বনিবনা হল না। শক্তিনাথের দোকানে ওজনদারি করাও পোষাল না, আবার চক্রবর্তীদের জমির চাষবাস দেখাশোনা করাতেও ইস্তফা দিল, কিছুদিন রামপুরহাটে কোন হোটেলে কাটিয়ে এল, এখন এর-ওর কাজ করে দেয়, কাউকে কোথাও পৌঁছে দিতে হবে, কোনো খবর আনতে হবে এই সব ছুটকো-ছাটকা। পেট তাতে চলে না। ফলে সে কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দূরের অচেনা গাঁয়েগঞ্জে গিয়ে আড়ালে পোশাক বদলে ছেঁড়া পাজামা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে চুল এলো করে ভিখারি সেজে বসে। থলেতে থাকে পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ। আবার গাঁয়ে আসার সময় দিব্যি বাবুটি হয়ে যায়।

সদানন্দ বলল, 'তা তোমার গান ক্যাসেট করার মতো বটে সারথিকা। রাতে আজ শুনব।'

সারথি বলল, 'শুনবে বইকী। তবে যন্ত্রের গান আর মানুষের গলার গানে ঢের তফাত।'

মকরের দোকান ছেড়ে রাস্তায় হাঁটার সময় সারথির মন বড় খারাপ লাগে। লোকে আসর ডাকবে না, শুনতে আসবে না, সব যন্ত্রের সামনে বসে থাকবে—

তাই হয় নাকি! সাবিত্রীর ঘরে গিয়ে চা খাবার ইচ্ছে চাগাড় দেয়। সাবিত্রীকে কথাটা বলা দরকার।

সাবিত্রী মনসাপুজো দেওয়ার আয়োজন করছিল স্নান সেরে। একটা থালায় সিধে, অন্যটায় আতপ, সুপারি, সিঁদুর, তেল, কলা সাজিয়েছে। চওড়া লালপেড়ে ঘি রঙা শাড়ি, লাল ব্লাউজ। গায়ের রং শ্যামোজ্জ্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে যেমন সৌষ্ঠবতা তেমনি চোখেমুখে চিবুকের ডৌলে, ত্বকের উজ্জ্বলতায় যৌবনের রঙের তুলি স্পর্শের গন্ধ লেগে আছে। উঠোনে পড়ে থাকা কাঠের টুলটায় বসে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সাবিত্রী বলল, 'কোথা গিয়েছিলে!'

সারথির যেন মনে পড়ে গেল, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'সাবিত্রী, মানুষ সব যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।'

'বুঝলাম না।'

সবুজ শাড়ি সায়া ব্লাউজ মেলা তারের উপর একটা কাক বসতে গিয়েও বসল না, নাড়িয়ে গেল। পুবমুখো ঘরে রোদ এসে পড়েছে উঠোনজুড়ে। তীব্র তাপের সকাল গুমোটকে আবাহন করছে। কালো গাইটা ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে মাঝারি মাপের জাম গাছের তলায় খড় চিবুচ্ছে।

'জানো, মনসা গানের আসর নাকি বসবে না এরপর। ক্যাসেট বাজবে।'

'সে তো ভালো কথা।'

'লোকে ওই যন্ত্রের গান শুনবে, চোখে দেখবে না।'

'টিভি-তে চোখে দেখবে!'

সারথি মাথা নাড়িয়ে যেন কথা হাতড়াল, 'তা হলে আসর।'

'ক্ষতি কী! তোমার গানও সুবীরের বন্ধু নিয়ে গিয়েছে। সে গান ভাল লেগেছে। তোমারও ক্যাসেট হবে।'

সারথি জিজ্ঞেস করল, 'কে বলল?'

'কাল। ওর চিঠি পয়েছি।'

অভিমানী সারথি বলে, 'ওর সবকিছুই তোমাকে আগে জানানো চাই। পরীক্ষার রেজাল্ট, তাও আগে তোমাকে। মাসীকে আগে বলব, তারপর তুমি শুনবে। ছেলেদের বাবার চেয়ে মায়ের দিকে টান থাকে বেশি। যাক গে, এক কাপ চা করো দেখি।'

সাবিত্রী বলল, 'এখন বোসো। ঘর খোলা রইল। পুজো দিয়ে আসি।'

'আজ তোমার উপোস নিশ্চয়! তুমি আবার কার মঙ্গলের জন্য মনসা উপোস করছ। নিজের মঙ্গল তো কোনদিনই চাইলে না।'

সাবিত্রী বলল, 'আমার ছেলের মঙ্গলের জন্যে, আমার সুবীরের জন্যে।'

সাবিত্রীর পুজো দিতে যাওয়া এবং আসার পুরো সময়টা ধরে সারথি ভাবল, তার ক্যাসেট হওয়ার কথা। সুবীর চিঠি দেবে কিংবা আসবে তাহলে। কিন্তু

সাবিত্রী কী সত্য বলল! সুবীরের বন্ধু মানব চট্টোপাধ্যায় অবশ্য তার গান শুনে মুগ্ধ, এমন গলা দূর গাঁয়ে পড়ে থাকায় প্রতিভা বিনষ্টির জন্যে কী আফশোস, বারবার প্রশংসা করছে। মানব নিজে শিল্পী। তার গান রেডিওতে হয়। ক্যাসেটও বেরিয়েছে রজনীকান্তের গান নিয়ে। তাকে বৃহত্তর শ্রোতামহলে পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করবে, জানিয়েও গিয়েছে। তবে তাতে সারথির মন স্বপ্নপ্লুত হয়েও অস্থায়ী। ওদের চলে যাবার পরবর্তী দিনগুলিকে আচ্ছন্ন করেনি। যেন ওসব কথার ওড়াওড়ি তো হতেই পারে, টুকরো অমন কতই তো আছে দীর্ঘ সংগীত জীবনের হেঁটে আসা দিনগুলিতে।

এখন কাঠের টুলে উঠোনে বসে সে তার গানের আওয়াজ শুনতে পায়। যন্ত্র উপহার দিচ্ছে। তৃপ্তি আসে না। শ্রোতা দর্শন না ঘটলে আনন্দ কোথায়! কে কোথায় তার গান শুনে বিহ্বল হল কী না তার হিশাব যে জানতে ইচ্ছে করে, সেই মুখগুলি দেখতে ইচ্ছে করে, সে মুহূর্তটিকে পরখ করতে ইচ্ছে করে। যন্ত্রের হাতে সমর্পণের যন্ত্রণা পায় সারথি।

সাবিত্রী আসতেই সে বলে, 'আচ্ছা বলো, আসরে শ্রোতা না দেখলে কী আনন্দ হয় গেয়ে। সামনে একটা যন্ত্র তোমার গান শুনছে—।'

সাবিত্রী বলল, 'শুনছে না—ধরছে। তারপর তোমার হয়ে হাজার লোককে শুনিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তুমি এত ভাবছ কেন? আসর ঠিকই থাকবে। সিনেমা হয়েছে বলে কী যাত্রা থিয়েটার উঠে গিয়েছে।'

ভাগ্যিস সাবিত্রী আছে। সে ভাবেনি তো এটা। বোকা বালকের মতো সে সাবিত্রীকে দেখে।

কিছুক্ষণ পর চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে সাবিত্রী বলল, 'হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয় নি সারথিদা, চৌধুরিদের বড়বাবু এসেছেন। তোমারই তো বয়সী অবিনাশদা। নাম তো নেই। এখন সবাই বলে বড়বাবু। মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে। কিছু না করেই—। বড়বউ এসেছিল মনসার পুজো দিতে। কী সাজ! মনসাকে লাল পেড়ে কাপড় দিল। আর—।'

সারথি শুনছিল না শেষ কথাগুলো। বলল, 'সোনার চামচ।'

সাবিত্রী ভ্রু কুঁঞ্চনে বলল, 'হ্যাঁ, সোনার চামচ মুখে নিয়ে ত জন্মেছে!'

সারথি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হেসে বলল, 'আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল তোমার ওই সোনার চামচ শুনে। একটা লোক যে ভাবেই হোক দেবতার দেখা পেয়েছিল। দেবতারা বর দিতে ওস্তাদ। বললেন, বর প্রার্থনা কর বৎস। তবে মাত্র একটাই বর পাবে। লোকটা ভেবেছিল প্রচুর ধন চাইবে, দীর্ঘ আয়ু চাইবে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে জব্বর বর চেয়ে বসল, বর দিন আমি যেন নাতির নাতিকে সোনার চামচে দুধভাত খেতে দেখি।'

'যা তুমি ঠিক বললে না সারথিদা। সোনার চামচ নয়, সোনার বাটিতে দুধভাত খাওয়া দেখতে চেয়েছিল।' সাবিত্রী বলল, 'সোনার চামচ মুখে নিয়ে

আসা মানে বড়লোকের ঘরে জন্ম, বড় ভাগ্য নিয়ে আসা।' হেসে বলল, 'তোমারও সোনার চামচ হচ্ছে। গানের ক্যাসেট বেরুবে, নাম হবে, রেডিওতে ডাকবে, লোকের মুখে মুখে ফিরবে, তখন তুমি যা চাইবে পাবে।'

সারথি সাবিত্রীর স্বপ্নময় স্বরপাতে পেঁজা তুলোর মত ভারহীন হয়ে মাটি ছড়িয়ে, বলতে চাইল, সাবিত্রী তোমাকে চাইলে, পাব! বলা হল না।

মনসা গানের রাতের আসরে থইথই শ্রোতা। গাঁ ভেঙে এসেছে সব। নীরবে বসে আছে জোড়া হ্যাজেগের আলোকিত চত্বরে। মুগ্ধতার আবেশে কান তাদের পাতা। সারথির গলায় যেন নতুন সুর প্রতিষ্ঠা, শব্দেরও নতুন সজ্জা। যৌবনের ভালোবাসাময়তা অস্তিত্বহারা তার ভেতর থেকে আনন্দ শরীরে বেরিয়ে এসেছে। অঙ্গ সঞ্চালনে, চামর দুলুনিতে, সুরের ছন্দে, নৃত্য বিভঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে মনসামঙ্গল কাহিনীর প্রাণময়তা। মকর দাসের খোল মোহিত করা বোল ফোটাচ্ছে, তারকের হাতে খঞ্জনির নতুন মাত্রা।

ভালোই কল্লাম সুবেশ কল্লাম এসেছিলাম জলে
জলে এসে ভালোই কল্লাম স্বামী পেলাম কোলে
গৌরীপূজা করেছিলাম জন্ম-জন্মান্তরে
মৃতপতি পাইলাম মা মনসার বরে
বিষহরি হয়েছিলেন কোলের দণ্ডধর
আদি নিদয় বিধি সদয় হৈলা নৌকার পর।

শুধু বেহুলা নয়, বিধি সদয় তোমার উপরও বটে হে সারথি কুনুই। তোমার সোনার চামচ হাতে আসবে। যা চাইবে তাই পাবে।

ভাদ্রের মাঝামাঝি সুবীর এসে বাবাকে কলকাতায় নিয়ে গেল। মানব কাজ করেছে। সারথির গানের ক্যাসেট প্রস্তুত হল। দু-পিঠে ছ'খানা করে গান। একটা মনসার গান। বাকি পল্লীগীতি। গীতরচনা সুরারোপ সারথির। 'দেশের সুখ চিলের পারা' ক্যাসেটে তার রঙিন ছবিও মুদ্রিত হয়। 'দেশের সুখ চিলের পারা উড়ে গেল বাতাসে, ভাতের লেগে চাষি কাঁদে দেশ ভরেছে দুঃখের বিষে' প্রথম গান। সবই সাম্প্রতিক গ্রামীণ অবস্থা নিয়ে। সে মাত্র তিনশো টাকা পেল। তবে ক্যাসেট বিক্রি হলে রয়েলটি পাবে।

ঘটনায় সারথি সারা গাঁয়ের চোখে শিল্পীপুরুষ। সবাই সম্ভ্রম করে। মকর দাস বলে, নামডাক হলে আমাদিকে ভুলো না, খোল বাজাতে ডেকো। সাবিত্রীর মধ্যে খুশির ব্যাপ্তিতে সে পুলকিত। লেখালেখি হয় না, গানের কথা ভাবে না এমনিতে, সারথি কলকাতা থেকে ফিরে একটা পুরো খাতাই ভর্তি করে দেয়। আর দুর্গাপুজো আসতে তো গাঁয়ের আসরে অষ্টমীর রাতের জলসায় হাততালির উচ্ছ্বাসে অভিনন্দিত হয়। যেন এতদিন জানা ছিল না গাঁয়ে মস্ত এক গায়ক আছে। ওদিকে পুজোর পর 'রাজার পুকুর যাস না লো / রাজার বিটি ডুবে মরেছে' গান হিট করে। শহর কলকাতা শহরতলি ছাপিয়ে গাঁয়ে পর্যন্ত এসে

পড়ে। নতুন ক্যাসেটের জন্যে ব্যস্ত হয় কলকাতা। সেই তরঙ্গাঘাত এসে লাগে সারথির শিল্পীসত্তায়। সে আরো প্রাপ্তির কাঙ্ক্ষায় রেসের দুরন্ত ঘোড়ার বেগে দৌড় দেয়। নতুন গান লেখে, শব্দ খুঁজে বেড়ায়, সুর ধরতে চায় গাঁয়ের প্রকৃতিতে, গাছের দোলনে, জলের তরঙ্গে, বাতাসের বিচিত্র স্বননে। মকর দাস ডুগি-তবলা বাজায়, সে হারমনিয়াম ধরে। চর্চাই তো ছিল না। কাঠের বাক্সে বন্দী ছিল হারমনিয়াম, তানপুরারও ওই হাল, বাঁশি যে কতকাল ঠোঁটে ঠেকায় নি। এখন সব কিছুই সে ধরতে চেষ্টা করে। গলায় একটা ব্যথা সে টের পাচ্ছে অনেকদিন থেকে। সেই ব্যথাটা এত শ্রমে, কণ্ঠের এমন অবিরাম ব্যবহারে যেন বাড়ছে। না, সে কাউকে বলে না। যেন সামনে আনন্দ শরীর ফিসফিস করে বলে, আমি রয়েছি তোমার, কোথায় কষ্ট!

সাবিত্রী বলল, 'তুমি যে গান পাগল হলে! শুধু ওই কথা। ছেলেটাকে দেখ। বিয়ে দেবে না?'

'মেয়ে দেখ তুমি। হ্যাঁ বউ না হলে ঘর মানায় না। কতকাল রেঁধে খাব।'

সাবিত্রী মাথাটা দোলায় হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে 'ছেলের খবর রাখো না। টুটুকে ও ভালবাসে।'

'টুটু। সে আবার কে?'

'অনন্তদার মেয়ে। এবার মাধ্যমিক পাশ করেছে সেকেন্ড ডিভিসনে। খুব ভাল মেয়ে। সুবীরের মতো আমাকে মাসী বলে। দেখতেও সুন্দর। গাঁয়ের মেয়ে—তুমি দেখোনি?'

ব্যস্ততার সঙ্গে না ভেবেই সারথি বলে, 'তাহলে ওকেই বিয়ে করুক।'

'ওরা রাজি হবে না! অনন্তদা আর কী!'

পৃথিবীর সকলই সহজলভ্য এমন ভঙ্গিতে সারথি বলে, 'আমার কথাতে রাজি হবে। বুঝলে ওর মেয়েকে বউ করতে চাইলে ও ভাগ্যি বলে মানবে। আজই কথা বলে আসছি।'

অনন্ত অ্যাপায়ন করে বসায়। ত্রিশ-বত্রিশ বিঘে জমির মালিক। নিজে লাঙলের বোঁটা ধরে। ঘরে লক্ষ্মীর পা আঁকড়ে আছে মাটি। তিন ভাইয়ের একান্নবর্তী পরিবার। মেজ চাকরি করে বোলপুর হাসপাতালে, ছোট এল আই সি ইত্যাদি করে বেড়ায় মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে। অনন্ত গোছানো সংসারী পুরুষ।

'চা খাবে তো সারথি?'

'না। না। বুঝলে আমি এসেছি সুবীরের সঙ্গে টুটুর বিয়ের কথা বলতে।'

অনন্ত একমুহূর্ত থমকে গেল। তারপর বলল, 'এ তো ভালো কথা। প্রস্তাব আমিই দিতাম। মেয়ের বাপ বটি। পিছিয়ে আছি অন্য একটা ব্যাপারে। যা দাবি করবে দেব। তবে কথা কী জানো ওই সাবিত্রীকে শাশুড়ীগিরি ফলাতে আমি দেব না, বিয়েতেও কোনো ব্যাপারে যেন না থাকে।'

সারথি বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'সে কী কথা! ও সুবীরকে মানুষ করেছে।'

'মানুষ করেছে তো কী।' অনন্ত তাচ্ছিল্যের দাঁত বের করে সহজ হয়েই চোখ টিপে বলল, 'বুঝলে গাঁয়ে মায়ে সমান। তুমি বন্ধু না হতে পারো, নিজের লোক হতে যাচ্ছ, এবার ওকে ছাড়ো।'

'তা সম্ভব নয়।'

অনন্তের কালো মুখখানা থমথম করতে থাকল। তারপরই যেন গর্জে উঠল বজ্র মেঘ ধারালো বারিপাতে, 'বিটিকে বিষ দিয়ে মারব, তবু ওঘরে পাঠাব না। সাফ কথা।'

সারথি ফিরে এল। মুখে রক্ত ফুটিয়ে, চোখ লাল করে, মস্তিষ্কে যন্ত্রণার সূচিফোঁড় বোঝা নিয়ে অস্থির পদক্ষেপে। সাবিত্রীর ঘরে সে গেল না। সুবীরের পুজোর ছুটির আরো কটা দিন বাকি আছে। এখন সাবিত্রীর ঘরেই খাওয়া দাওয়া হয়। ঘরে দেখল, সুবীর নেই। সন্ধের পর ফেরাতে বলল, 'আমার রুটি-তরকারি নিয়ে আসবি, খেতে যাব না আর।'

কার্তিক পড়েছে। বাতাসে হিম। সন্ধ্যার হাত যেন শীতলতার আলতো স্পর্শ দেয় সবকিছুতে। খাওয়া-শোয়ার মধ্যে সে সুবীরকে কিছু বুঝতে দিল না। কম কথা বলে, আজ তো কথাই বলল না।

ঘুম আসে না সারথির। ভাবনায় অনন্তর কথাগুলো ঘরময় ছড়ানো অজস্র সাপের মতো ঘুরপাক খেয়ে কেউ ফণা তুলে, কেউ কুণ্ডুলি পাকিয়ে, কেউ দড়ির মতো ঝুলে তাকে বিব্রত করছে না। বারবার কানে বিদ্ধ করছে না কটু কথাগুলো। সে জানে গ্রামীণ আবহাওয়ায় এ ধারণাটা অত্যন্ত পুরোনো, অতীব বাসি, ব্যবহার অযোগ্য। কুৎসা রটনার মধ্যে যে মোহ থাকে এ কাহিনীতে সে মোহও খসে গিয়েছে। সে কোনোদিন সাবিত্রীকে প্রেম নিবেদন করেনি, স্পর্শ করেনি, কোনো লঘু মুহূর্তে স্খলন প্রপাত নির্মাণ করেনি। সাবিত্রী তার কাছে এক আশ্চর্য আলোঘেরা বলয়ে, সুবীর কেন্দ্রিকতায় সম্পর্কের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণ অসম্ভব, তার কাছে নগ্ন হয়েও রহস্যের জালবিধৃতির কুয়াশাচ্ছন্নতা। যার কোনো অস্তিত্ব নেই, এমন কিছুর কিংবা যা সারথির অজানিত সৃজন, তার উপর অসম্ভব এক ক্রোধ তাকে উন্মাদ করে দেয়। সুবীরের সঙ্গে টুটুর বিয়ে হবে না, সাবিত্রীকে সে ছাড়তে পারবে না, সে যা চায়, তা পাবে না। কিন্তু সোনার চামচ, তোমারই তো কথা আমি যা চাইব পাব। সাবিত্রী তুমি বলেছ, আমি যা চাইব পাব। আমার আরো গানের ক্যাসেট হবে, রেডিও ডাকবে, টাকা আসবে মুঠো মুঠো, সম্মানের মালা আসবে, প্রশংসার শব্দ বাজবে গ্রামে প্রান্তরে। সোনার চামচ আনছে সব, তাহলে বাধা কিসের! সোনার চামচ তুমি সাবিত্রীকে পাইয়ে দিতে পার না। সাবিত্রীকে—

সাবিত্রী দরজা খুলে অবাক, 'তুমি! এত রাতে! কী হয়েছে?'

'অনন্ত ওর মেয়ের সঙ্গে সুবীরের বিয়ে দেবে না। যদি তুমি থাক। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে।'

'আমার সঙ্গে সম্পর্কের কী দরকার। সুবীর সুখী হোক।'

'সাবিত্রী তোমাকে আমি ছাড়তে পারি না।'

'কী বকছ পাগলের মতো। অত চেঁচিও না।'

'লোকভয় করছ? কেউ শুনতে পাবে না।'

'না, তোমার পাগলামিতে ভয় পাচ্ছি।'

'সাবিত্রী তুমি আমার হও। আমি তোমাকে বিয়ে করব।'

সাবিত্রী আঁখি বিস্ফারে অদ্ভুত বিকৃত শব্দে হাঁ মুখ জোড় দিতে পারে না।

'আমার হাতে সোনার চামচ। গান আমাকে সব দেবে। তুমিই বলেছ! এখন না করছ কেন! অনেকদিন—অনেকদিন থেকেই আমি তোমাকে কামনা করে এসেছি। তোমার ঠোঁট, চিবুক, ওই বুক সাবিত্রী আমাকে গ্রহণ করতে দাও। কামনা পূর্ণ করো।'

সাবিত্রীর গায়ে এলোমেলো কাপড়। আচমকা ঘুম থেকে ওঠা চোখেমুখে পড়ে আছে আলুলায়িত কেশরাশি। সে শরীর নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

'সাবিত্রী আমার বড় তৃষ্ণা।'

'মরীচিকায় তৃষ্ণা মরে না, আরো বাড়ে।'

'তুমি মরীচিকা নও—তুমি এক শান্ত সরোবর।'

'তোমার কাম তাড়নার এটা ভ্রম।'

'আমার ভালোবাসা তো ভ্রম নয়।'

'ভালোবাসা এখন তোমার ভেতর নেই সারথিদা!'

'তুমি বড় নিষ্ঠুর।'

'আমি যে তোমাকে ভালোবাসি। নিষ্ঠুর না হতে পারলে আমার ভালোবাসা মরে যাবে।'

'শরীর সম্পর্কে ভালোবাসা মরে না—বাঁচায়—জীবন দেয়।'

'না সম্পর্কেও তো আমাদের ভালোবাসা বেঁচে রয়েছে। চলে যাও তুমি। আমি দরজা বন্ধ করব—যাও বলছি। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

বেরিয়ে আসে সারথি। ঘর যায় না। পূর্ণিমার পর জ্যোৎস্না শাদা ধোঁয়ার হিমপাত করে আসছে। ধোঁয়াময় দূরের দৃশ্য। গাছ, ঘর, মাঠ, দিঘিপাড় সব একাকার। মাথার উপর চাঁদকে নক্ষত্র জোনাকিরা বুঝি আরতি করছে। বাতাসের আদর তার ক্রোধ, তার না পাওয়ার বেদনা তার সাবিত্রী সুবীর টুটু, তার এই মনুষ্য জন্মকে তুচ্ছ করে দিয়ে ছোট্ট হাতের ছোট্ট ঢেউয়ে জিজ্ঞাসা করছে, কে গো তুমি! তোমার কী কেউ নেই। তিমির ধোঁয়া মায়াজ্যোৎস্নার নির্জনতায় তার কণ্ঠ তখনই পরিচয় দিয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু বড় ব্যথা গলায়। বড় ব্যথা। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে। গাঁ বাইরে শূন্য ডাঙায় সে জ্যোৎস্না শিশিরে ভিজতে থাকে।

'তোমার কোথায় কষ্ট সারথিদা!'

'সাবিত্রী তুমি এসেছ! আমি কে সাবিত্রী! বাতাস জিজ্ঞাসা করছে।'

'উত্তর দাও।'

'আমার গলায় বড় ব্যথা।'

'আহারে।'

'সাবিত্রী আমি এখানে শুয়ে থাকব।'

'শুয়ে পড়ো। শিশিরে ভেজা মাটি আমার কোলের মতো নরম।'

সারথির সেই ঘুম ভাঙে ঘরের বিছানায় প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যে। মাথার কাছে সাবিত্রী। কপালে হাত রাখে, 'জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুবীর তোর বাবাকে কলকাতা নিয়ে চল।'

'সাবিত্রী, গলায় আমার বড় ব্যথা হয়। তোমাদের বলিনি এতদিন। সুবীর টুটু—।'

সুবীর বলে, 'ওই নিয়ে ভেবে সারারাত মাঠে পড়ে রইলে জ্ঞান হারিয়ে। বাবা মত না দিলে কী হবে টুটু সামনের বছরই অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছে। মাসীর কাছে তো আসে। আমার মতো মাসী বলে।'

'তাহলে তোর বউ হবে!'

সুবীর ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'হ্যাঁ। কিন্তু গলায় কিসের ব্যথা।'

সারথি বলল, 'হয়তো কোনো ক্ষত কোনো ঘা।'

'রক্ত পড়ে?'

'না।'

সাবিত্রী কাতর গলায় বলে, 'সুবীর আজই নিয়ে চল বাবা কলকাতা।'

সারথি ভাবে, তাহলে টুটু বউ হয়ে আসছে। উত্তেজনায় অনুভব করে সোনার চামচ দিয়েছে, সে যা চেয়েছিল। পরমুহূর্তে আরো চমক। উত্তেজনাবশে সাবিত্রীর হাতটা ধরতেই অন্য হাত রাখে তার হাতের উপর, হাসে! সে হাত এই পৃথিবীর কোনো নারীর নয়, এই স্পর্শ কামময় করে না, আনন্দ শরীরকে ঝরনা হয়ে স্নান করায়। সারথি এখন জ্যোৎস্না শিশিরের নিশিবায়ুকে তার পরিচয় দিতে পারে। সে ফিসফিস করে, 'সোনার চামচ, আমাকে সাদা জল দাও।'

স্রোতের নৌকাগুলি

মার্চে সুখময়ের সঙ্গে শেষ দেখা, তাও লুপ লাইনের এমন একটা বিদঘুটে স্টেশনে যার পাশ দিয়ে বহুবার যাওয়া সত্ত্বেও অস্তিত্বটা টের পাইনি কোনদিন। এবারও পেতাম না। সুখময়ের সঙ্গে দেখাও হতো না। কিন্তু গাড়ির যান্ত্রিক গোলযোগ দীর্ঘদিন পর আকস্মিকভাবে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল।

খুবই ছোট্ট স্টেশন। দূরপাল্লার প্যাসেঞ্জার গাড়িও দাঁড়ায় না। সবুজ ঘাসের নিচু প্লাটফর্ম। বলাবাহুল্য কোন শেড নেই। ঝকঝক করছে রোদ। একটাও চায়ের স্টল নেই। খয়েরি-সাদার বর্ডার টানা স্টেশনঘরখানা একচিলতে বারান্দা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনেই সারি সারি ক'খানা রেলওয়ে কোয়ার্টার। তাছাড়া ধূ ধূ মাঠ, ফাল্গুনের শূন্যক্ষেত দু'পাশে। কোনো গ্রাম কী শহরের চিহ্ন নেই। একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে চালের উপর ভেজা একটা নীলশাড়ির পতাকা উড়িয়ে। গুটিকয় গাছ ইঁটের গোল ঘর থেকে সবে মাথা চাগাচ্ছে।

আমাদের গাড়িখানা, প্যাসেঞ্জার গাড়ি অবশ্য, তবু দাঁড়ানর কথা নয়। কিন্তু দাঁড়াল। সিঙ্গেল লাইন। ওদিক থেকে একখানা এক্সপ্রেসগাড়ি আসছে। এখানে পাস করবে। মিনিট দশেক দাঁড়ানর পর এক্সপ্রেস গাড়ি পেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়িও বাঁশি বাজাল। কিন্তু এগুলো না। তারপর শোনা গেল ইঞ্জিন খারাপ হয়েছে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টা। সারান গেল না। মানুষ নামতে শুরু করল সবুজ ঘাসের প্লাটফর্মের উপর। তারসঙ্গে মন্তব্য নানারকমের, চাকা পাংচার হয়েছে দাদা ট্রেনের...ঠেলে দিলেই স্টার্ট নেবে...বর্ধমানে বলতে পারনি ড্রাইভারসাব দম ফুরিয়েছে তোমার গাড়ির, ইত্যাদি।

কিছুক্ষণের ভেতরই কম্পার্টমেন্টগুলো খালি হয়ে গেল প্রায়। পিল পিল করে মানুষ নেমে, তার সঙ্গে হকারদের চিৎকার যেন প্লাটফর্মের উপর মেলা বসিয়ে দিল। কিছু ক্ষুব্ধ যাত্রী স্টেশনমাস্টারের ঘরে গিয়ে তর্কাতর্কি চালাতে থাকল। ড্রাইভারকে ঘিরে ধরেও নানান মন্তব্য। তবে তেমন উত্তেজনা নয়। ওদিকে কোয়ার্টারগুলোর বারান্দায় শাড়ি, উৎসুক মুখ, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ান ছেলেমেয়েদের দেখা গেল। শোনা গেল বর্ধমান থেকে ইঞ্জিন আসবে তবে চলবে গাড়ি। বর্ধমানে ফোনও করা হয়েছে। ওরা যত দ্রুত সম্ভব একটা ইঞ্জিন পাঠাচ্ছে। তার মানে দেড় দুই ঘন্টা এই বিদঘুটে স্টেশনে তিক্ত অপেক্ষা।

অবশ্য এখন আর স্টেশনটা ধূ ধূ রুক্ষ বৃক্ষহীন মাঠের মধ্যে ভুতুড়ে অস্তিত্ব নিয়ে খাড়া নয়। গমগম করছে অজস্র মানুষের পদচারণায়, শব্দে। রোদের মধ্যে চমৎকার মেলা বসে গিয়েছে।

সেই ভিড়ে আমি সুখময়কে দেখতে পেলাম। ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি, পরিচ্ছন্ন গোলগাল ফরশা মুখ, মাথার শুকনো চুল উড়ছে। চেহারার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। আসলে দেহের গঠন এবং মুখচোখ ওর এমনই যাতে করে ঠিকঠাক বয়স ধরা যায় না। তবে আমি জানি ওর বয়স চল্লিশের ওপর। বছর চার সাড়ে চার আগে ও আমাদের অফিস ছেড়েছে। তখনই ওর বয়স চল্লিশ ছুঁয়েছে।

অফিসে একদিন বয়সের প্রসঙ্গ এসে পড়তে সুখময় বলেছিল, আমাকে দেখে কত মনে হয়? বলেছিলাম, বত্রিশ তেত্রিশ। সুখময় শব্দ করে হেসে উঠেছিল, চল্লিশ। কতগুলো বছর লুকিয়ে রেখেছি দেখ!

শুধু কী কতকগুলো বছর! সুখময় আরও কিছু লুকিয়ে রেখেছিল। যেটা অনেক পরে বুঝেছি।

মার্চ মাস। তবু শীতটা এখনও কাটেনি পুরোপুরি। সওয়া দশটা এখন। সকাল সাতটায় ট্রেন ছেড়েছে। সূর্য তখন পূবে মোড়া, শীত শীত বাতাস। কম্পার্টমেন্টের ভিতরে এখনও যেন সকালটা ধরা আছে। সুতরাং প্লাটফর্মে মিষ্টি রোদের স্বাদ গায়ের চামড়ায় জ্বালা নয়, মৃদু সুখবৃষ্টি করছে।

আমি সুখময়কে দেখে উৎসাহে ছুটে গেলাম না। তবে পরিষ্কার বুঝলাম যে ভঙ্গিমায় ও হাঁটছে তাতে করে আমাকে দেখতে পাবে না। আমি একধারে রূপালী ছোপধরা প্লাটফর্মের স্লান রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। ও গাড়ির গা ঘেঁষে অলসপায়ে হাঁটছে। কিন্তু কেন জানি না ওর মুখোমুখি হলাম না।

সন্দেহ নেই সুধাময়কে দেখে আমি বিস্মিত। এই চেহারায় ওকে দেখা যাবে তা ওর পরিচিত সকলেরই কাছে আমার মতই বিস্ময়ের সঞ্চার করবে। যে মানুষটা তিনদিন ছুটি নেওয়ার পর দুম করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বসে, তারপর শোনা যায় কলকাতার ফুটপাথে টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্তের মত, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, মাথায় তেলহীন অস্নাত রুক্ষ চুলের রাশ, লাল চাউনি, তারপর আরও শোনা যায় ঘরের জিনিসপত্র খাট বিছানা আলমারি বিক্রি করে দিচ্ছে, ব্যাঙ্কের টাকাগুলোও দুহাতে ওড়াচ্ছে, ভাড়া-করা ঘর ছেড়ে একটা মেসে উঠেছে, তাও সময় মত খাওয়া দাওয়া করে না, তারপর একদম বেপাত্তা, সে মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় মাথার চুলে জট পাকিয়ে পাগলেটে চাউনি নিয়ে কোথাও আবর্জনায় বসে বিড় বিড় করবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

অথচ ভদ্র এবং সুস্থ চেহারায় প্লাটফর্মের উপর অলস-পায়ে হাঁটছে। এ কী আমার দৃষ্টিবিভ্রম। পৃথিবীতে অবিকল এক চেহারার মানুষ ঢের আছে!

অফিসে বহুদিন আগেই সুখময় আলোচনার বস্তু থেকে সরে গিয়েছে। চাকরি দুম করে ছেড়ে দিতে অফিসময় ওর কথা। এমন কিছু বিশেষ গুণ ওর ছিল না যার ফলে ও নতুন চাকরি মানে ভাল চাকরি পেতে পারে। বি এ পাশ। টাইপ জানে। শর্টহ্যান্ড নাকি শিখেছিল। অফিসে এমনিতে চুপচাপ থাকত।

চাকরি ছাড়ার পর বরঞ্চ অফিসে ওর পরিচয়ের সীমা বেড়েছিল। অন্য ডিপার্টমেন্টের অনেকেই তো জিজ্ঞাসা করেছে, সুখময়বাবু তো সেই ভদ্রলোক, ফর্সা গোলগাল মুখ, সব সময় গুম্ হয়ে থাকতেন!

অনুকুলবাবু একদিন বললেন, জানেন সুখময়বাবুকে দেখলাম কাল হাজরার মোড়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। রাস্তার লোক তো হাঁ হাঁ করে উঠেছে। মাথার চুল এলোমেলো, একমুখ দাড়ি গোঁফ, ময়লা জামা, চেনা দুষ্কর!

সবিতা রায় শিয়ালদহ লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার। অফিসে টাইপ করেন। তিনি বললেন, জানেন, আমার সঙ্গেও তো শিয়ালদহের প্লাটফর্মে দেখা। দাঁড়িয়ে ঘাড় লম্বা করে সিগারেট টানছিলেন। আমি সামনে গিয়ে বললাম, এই যে সুখময়বাবু। তা বড় বড় লাল চোখে আমার দিকে এমন করে তাকালেন, আমি ভয়ে হিম হয়ে গেছি। আর দাঁড়াই!

প্রিয়নাথবাবু বললেন, আমারও সেদিন বাস থেকে চোখে পড়ল বিবেকানন্দ রোডে হনহন করে হাঁটছে!

দিব্যেন্দুবাবু বললেন, ওরকম অবস্থায় পড়লে অন্য মানুষ আত্মহত্যা করত!

দিব্যেন্দুর সঙ্গে সুখময়ের ঘনিষ্টতা ছিল। পাশাপাশি টেবিল বলে নয়, ওরা একসঙ্গে অফিস থেকে বেরুত, কোন কোন দিন একসঙ্গে ঢুকত। সুতরাং সাগ্রহে আমার বলতাম, কী ব্যাপার? আপনি সব জানেন মনে হচ্ছে!

দিব্যেন্দু বললেন, কিছুটা জানি বৈ কী! একটু থেমে খানিকটা ঝাঁজ নিয়েই বললেন, আশ্চর্যের ব্যাপার, চেনাজানা এত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, অথচ আমার সঙ্গেই হয় না!

আমরা আরো ঝুঁকে বললাম, ব্যাপারটা কী?

দিব্যেন্দুর চোখ নীচের দিকে ছিল। আমাদের দিকে চোখ তুলে নীরবে তিনি সিগারেট ধরিয়েছিলেন।

অফিসে সুধাময়ের দাদা এসেছিলেন একদিন। বড়বাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেছিলেন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে কথা। তখন ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মেস ছেড়ে কোথায় যেন উধাও। তবে দিব্যেন্দুবাবুর কাছে শোনা কাহিনী ভদ্রলোকের কাছে তোলা হয় নি। দুঃখপ্রকাশই করা গিয়েছে মাত্র।

ভদ্রলোক চলে যেতে প্রিয়নাথবাবু বলেছিলেন, সুখময়ের স্ত্রী বাসন্তী দেবী কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করলে হত!

দিব্যেন্দু তার উত্তরে রাগ-করা গলায় বলেছিলেন, পরস্ত্রী সম্পর্কে আগ্রহ থাকা ভাল নয় প্রিয়নাথবাবু!

রোদের তাপটা এবার গায়ে বিঁধছে। মেলাটা অল্পক্ষণেই কেমন যেন উৎসাহহীন হয়ে পড়ল। চিৎকার, রেল কোম্পানীর গাফিলতিতে রাগ ক্ষোভ বিরক্তির সব রকমের উত্তেজনার প্রকাশ যেন প্রশমিত। এখন স্থানে স্থানে সবুজ

ঘাসে বসা নির্বাক মানুষের মুখে শুধু অসহায়ত্ব, কারও কারও ভ্রুতে বিরক্তিও আঁকা। স্কুল কলেজের কিছু নিত্যযাত্রী ছেলেমেয়ে ব্যাপারটায় খুশি, তাদের হুল্লোড় বাড়ছে এবং অনেকেরই দৃষ্টি তাদের উপর। একেবারে ওধারে গিয়ে কয়েকজন ডিসট্যান্ট সিগন্যালের দিকে হা-পিত্যেশ চোখে তাকিয়ে আছে বর্ধমান থেকে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখার অপেক্ষায়। হকারদের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না। কোয়ার্টারের সামনে একটা ক্ষুদে শিরীষ গাছ, তারপাশে টিউবওয়েল, সেখানে বেশ ভিড় লেগেছে জলের জন্যে।

সুখময় আমাকে দেখতে পেল। পলকহীন চোখের দৃষ্টি ওর বেশ কিছুটা সময় আমার উপর পড়ে থাকল। তারপর সামনে এসে দাঁড়াল পায়ে পায়ে। বলল, ভাল আছ?

বললাম, ভাল! তুমি?

ও আমার কথার উত্তর দিল না। বলল, খুব অবাক হয়ে গিয়েছ, না?

অফিসে সুখময় প্রথম দিন আপনি বলেছিল আমাকে। তারপর তুমি! আমিও ওকে তুমি বলতাম। বয়সের পার্থক্য আমাদের বেশি নয়। বললাম, অবাক হওয়াটা আশ্চর্যের নয়।

সুখময় ঠোঁটে মৃদু হাসি এঁকে রাখল। পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই বের করল। তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, নাও ধরাও। এমন একটা জায়গায় দাঁড়াল যে চা পাবার পর্যন্ত উপায় নেই!

সিগারেট তুলে বললাম, কতদূর চলেছ?

বোলপুর! ওখানেই চাকরি করছি এখন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভ্রু কুঁচকে সুখময় বলল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। চল ওই ঘাসে বসি!

বিস্ময়টা কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠতে আমার সময় লাগছে বৈ কী! কিন্তু কী আশ্চর্য, সুখময় কত সহজ! বেশ কয়েক বছরের তো দেখা আমার ওকে, ঘরের মধ্যে কাজের ভিড় থাকলেও সারাটা দিন ধরে, কিন্তু তখন তো এত সহজ এত মিশুকে এবং এমন কথা বলা চোখে পড়েনি। কাজ ছাড়া অফিসে কোন ব্যাপারে অংশ নিত না, টেবিলের কোন আলোচনায়ও না। সুখময় সম্পর্কে আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্টে ধারণা গড়ে উঠেছিল, মানুষটা অহঙ্কারী, নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকে। এমনকী ওর পাগলামিটাও যে চাপা স্বভাবেরই বিস্ফোরণ, সে সম্পর্কেও আমরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম।

অথচ এখন সুখময় তার দুঃখজনক ব্যাপারের সাক্ষী, নিশ্চিন্ত করে ও অনুমান করেছে অফিসময় কথাটা ছড়িয়েছে, আমিও শুনেছি, সুতরাং দেখে সরে যাবে, না চেনার ভান করবে, এটাই তো স্বাভাবিক, তা নয় কেমন এগিয়ে এল নিজেই। অবশ্য আমি নিশ্চিত করেই ওর অতীতের গলিত শবকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করতে পারব না। সুখময়ের স্ত্রী বাসন্তী সম্পর্কে কোন কৌতূহল আমার নেই। তবে ও প্রসঙ্গ আমাকে টানতে হল না। টানল সুখময় নিজেই।

ঘাসের উপর বসে সেই সুরু করল, অফিস নিশ্চয় আমার কথা ভুলে গিয়েছে!

বললাম, সেটাই তো স্বাভাবিক!

সুখময় ম্লান হাসল। দীর্ঘশ্বাসও পড়ল তার। বলল, চাকরিটা ছেড়ে ভুল করেছি কমল। এখন আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি ব্যাপারটা! ধানকলে চাকরি। অল্প মাইনে। সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

আমার মুখ ফসকে প্রায় বেরিয়ে গেল, সংসার!

সুখময় আমার দিকে তাকাল না। মাথা নিচু করে অল্প হাসল। রহস্যময় হাসি নয়। আমার মনে হল অহঙ্কার যেন ওর ঠোঁটের উপর পাতার মত দোল খেয়ে ফিরল। বলল, কমল তোমাকে দেখে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। কতকাল পরে যেন আমি আমার পুরোন দিনের একজনকে ফিরে পেয়েছি। বড় একলা আমি এখন। ধানকলে কুলিকামিন নিয়ে কাজ। ঘরে ফিরে ছেলেদুটোকে পড়াশুনা দেখান। তুমি নিশ্চয় দিব্যেন্দুর কাছে অনেকখানি শুনেছ, তবে সবটা নয় নিশ্চয়ই। তোমার সবটা শোনা দরকার। সুখময় সিগারেট ধরাল। তারপর ধোঁয়া টেনে বলল, জীবনের একটা মস্ত বড় ট্র্যাজেডি কী জান, আমরা যেমন ভাবে হাঁটতে চাই তেমন ভাবে হাঁটতে পারি না। এ যেন এক দুরন্ত নদী, প্রচন্ড বেগবান, যতই নিয়ন্ত্রণ করে সমুদ্রাভিমুখী কর না কেন তোমার ছক বাঁধা ব্যাপারটাকে সে গোলমাল করে দেবেই। কী যে অদ্ভুত ব্যাপার! আমরা যেন কোন অদৃশ্যশক্তির ইচ্ছার পুতুল। আমার এতদিনকাব ধ্যান ধারণা সব চুরমার হয়ে গিয়েছে! তোমার কাছে চাপা রাখার সুখ নয়—এখন বলার উদ্যোগ করতে ভেতরে আমার সুখের রসক্ষরণ ঘটছে!

আমি কোন উত্তর দিলাম না। সুখময়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এ সময় আমার কাছে এ বেয়াড়া স্টেশনটার অস্তিত্ব, মানুষের উৎসাহহীন মেলা, কাকের শব্দ, একটা হাসির প্লাবন সব মুছে গিয়েছে!

সুখময় বলল, ছেলেবেলা থেকেই আমি ধীর স্থির শান্ত। প্রতিটি পদক্ষেপই আমার সংযত। বলতে পার এটা জন্মসূত্রে পাওয়া। আমার বাবা গাঁয়ের স্কুলের মাস্টারমশায় ছিলেন। সাধারণ মানুষ। অসাধারণত্ব বুঝি তাঁর একটাই ছিল—সেটা হল তাঁর কোন শত্রু ছিল না। কোনো ঝামেলায় তিনি থাকতেন না, কাউকে কটু কথা বলতেন না, জীবনে কোন ঝুঁকি নেননি। পাড়ার কারুর সঙ্গে তেমন কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। স্কুল আর সংসার ছাড়া কিছুই জানতেন না। আমার ছেলেবেলা গাঁয়ে কেটেছে। কারু বাড়িতে পেয়ারা চুরি কী কারও ক্ষেতে তরমুজ ছেঁড়া কিংবা ফড়িং ধরে তার লেজে খেজুরপাতা গুঁজে ফুর ফুর করে ওড়ান, কৈশোরের অমন দামালপনায় আমার কোন উৎসাহ ছিল না। বন্ধুরা আমার নাম রেখেছিল, পণ্ডিত! একটু বড় হতে বলত, ভাবুক! তার একটাই কারণ আমি অন্তত এখন অনুভব করি—সেই বয়সে বোধকরি বাবাকে নকল করার প্রবণতা আমার মধ্যে কাজ করত। ঠাকুমা বলতেন, আমি নাকি অবিকল

বাবার মত, ঠাকুমা তাই কখনও কখনও বাবার নাম ধরে আমাকে ডাকতেন! যাই হোক অফিসেও তোমরা লক্ষ্য করেছ কমল, তোমাদের কোন অভিনেত্রী বিষয়ক আলোচনা অথবা বড়বাবুর কেচ্ছা কী রাজনীতি কোনটাতেই আমি যোগ দিইনি। আসলে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ বোধ করতাম না ওতে। আমি বুঝতাম অফিস মানে কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাছাড়া ধর, বড়বাবু এলেই তোমরা চুপ হয়ে যেতে, কেমন যেন অপরাধীর মত মুখ হত তোমাদের, খুব খারাপ লাগত। আমি তোমাদের দিকে, রাগ করো না কমল, কেমন করুণার চোখে তাকাতাম। এই অহঙ্কার আমাকে আরো স্থির করেছে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, সুখময়, আমরাও তখন তোমাকে করুণা করতাম।

সুখময় আমার কথা বোধ করি শুনল না। বলল, অহঙ্কার কেন জান, তোমরা পূর্বাপর ভেবে কাজ কর না বলে এমন অবস্থায় পড়, অথচ আমি ঠিক একজায়গায় থাকতে পারি। জান, কমল, আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করেছি। ফাঁকি দিইনি কোনদিন। স্কুল শিক্ষক হবার একটা বাসনা আমার মনে বরাবরই কাজ করেছে। কলেজে পড়তে এসেও আমি শহরের স্রোতের উদ্দাম যৌবনের ঢেউয়ে গা ভাসাইনি। লুকিয়ে সিনেমা, ক্লাশ ফাঁকি, এসব ছিল না। দেশের বাড়িতে ছোট দুই ভাই বোন বাবা মা থাকতেন। কলকাতায় দাদার বাসায় বৌদি দাদা আমি আর ভাইপো। বেশ গড়িয়ে যাচ্ছিল ছকবাঁধা জীবন। ঠিক একটার পর একটা উঠে আসছিল আমার হাতে জীবনের ফুল। কিন্তু যৌবনে আমার প্রথম পরাজয় ঘটল বাসন্তীর কাছে। বাসন্তী অপরূপা ছিল না। কিন্তু যৌবন শরীরে যে কী দেয়! বাসন্তীর দুচোখের তারায় স্বাস্থ্যের আশ্চর্য ঝলকানিতে কথায় অমিত ঐশ্বর্য আমার চতুর্দিকে মোহিনীর মায়াজাল গড়ে তুলল! পাশের বাড়ির মেয়ে, বৌদির কাছে প্রায়ই আসত। কবে যেন টের পেলাম ওর আসা, চাউনি, কথা, আমাদের ঘরে দাঁড়ান, ঘুরে ফিরে বেড়ান, হালকা হাসির কী গভীর প্রতীক্ষাই না আমি করে থাকি। তারপর স্বভাবের গুণ বলতে পার, নিজেকে সংযত করতে চাইলাম পূর্বাপর ভেবে। জাতিগত পার্থক্য শুধু নয় আমার বাবা মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা মত ওঁরা বিয়ে দেবেন, গ্রাম হোক শহুরে হোক বেনারসীমোড়া তাঁদের মনোনীত বধূ আসবে এই তো ঠিকঠাক। তা নয় এক ঝলক দুরন্ত বাতাস সব এলোমেলো করে দিল। বাসন্তীর শরীর কখন আমার পুরুষশরীর গ্রাস করে ফেলল।

একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখময় বলল, আমি বিয়ে করে বসলাম ওকে। ব্যাপারটা আমার স্বভাববহির্ভূত। অথচ এত ঝটিতি ঘটে গেল যে আমার কাছে তা বিস্ময়কর। বোধ করি তার প্রকাশ আমাদের দাম্পত্যজীবনে ঘনছায়া ফেলে রাখল। বাসন্তীকে নিয়ে তখন আমার আলাদা বাসা। বাড়ির লোক ব্যাপারটা মেনে নেয় নি। বৌদি পর্যন্ত না। তবে এমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম যার ফলে কোন দুঃখবোধ আমাকে পীড়া দেয় নি। যুবতীর ভালবাসার সৌরভ বড়

মাদকতাময়। মদের নেশা কাটার পর যে অবসাদ তা কী ভীষণ তিক্ত। আমি কতদিন ছেলেমানুষের কত কেঁদেছি। এ আমি কে? ক্রমশ ব্যর্থ একটা অক্রোশে শক্ত খোলসের ভিতর আমি পাথর হয়ে গিয়েছি।

ওদিকে চোখ ঘোরাতে হয়। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শিরীষগাছের নীচে টিউবওয়েলের সামনে ভিড়। বোধকরি জল নিয়ে হাঙ্গামা। তবে নজর ওদিকে রাখা যায় না। সুখময়কে দেখতে হয়। হাতের সিগারেট ওর ক্ষীণ খোঁয়ার রেখা তুলছে শূন্যে।

সুখময় বলল, দিন তার মধ্যেই পেরিয়ে যাচ্ছিল। বাসন্তীর দৃষ্টির মধ্যে স্নিগ্ধতার বদলে জ্বালা, কথায় অসহিষ্ণুতা, আমার উপর রাগ ক্ষোভের যেন অন্ত নেই। না কোন ঝগড়া বিবাদ নয়, কথার তুবড়ি ওড়ান নয় ওর ভঙ্গিমা চাউনিই আমাকে পরিষ্কার বোঝাত। মুখে আমাদের কথা সংসার সংক্রান্ত—শুধু চাল ডাল আলু নুন। কিন্তু অন্তরালে যে বিক্ষুব্ধ ফল্গু তার আগুনের স্রোতের ভয়ঙ্কর শব্দ প্রতিনিয়ত। অথচ আমরা কেউ মুখোমুখি হচ্ছিলাম না। বরাবরই আমি স্বল্পবাক। বাসন্তী এ ব্যাপারেও আমাকে হারাল। কখনও কখনও আমার মনে হত বাসন্তীকে বলি, চল না বাসু আমরা বাবা মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই। তাঁরা ক্ষমা করলে আমরা সুখী হব। কখনও কখনও মনে হত দুহাতে নিবিড় বন্ধনে ওর নরম শরীর বুকে নিয়ে কপালে ঠোঁটে রেখে বলি, বাসু চল না আমরা কোথাও বেড়াতে যাই। কিন্তু বলা হয় নি কোনদিন। তারমধ্যে আবার এলো বিকাশ। স্মার্ট ইয়ংম্যান, ঝকমকে জামাকাপড়, ঠোঁটে হাসি, বাসন্তীর মামার বাড়ির সম্পর্কের কেমন যেন দাদা। অনুমান তুমি নিশ্চয় করতে পারছ কমল, সেই বস্তাপচা ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনীর শুরুটা। অবশ্য এ ব্যাপারে আমার কোন ভূমিকা নেই। আমি তর্ক তুলিনি, ঝগড়া করিনি। বাসন্তীর আবার প্রজাপতি হয়ে উঠা, ঝলমলে মুখ চোখ, চোখের তারায় খুশির বিজুরি, শ্যামোজ্জ্বল মুখে নতুন লাবণ্য, শরীরের ভঙ্গিমায় বর্ষার নদীর তরঙ্গ, আমি শুধু শামুকের মত গুটিয়ে গিয়েছি খোলসে। ওরা সিনেমা যেত, ঘরে বসে তর্ক করত, বেড়াতে বেরুত, আমি অবিকল এক। বাসন্তী না বললে আমি জানতেও পারতাম না যে বিকাশ বিবাহিত। তার দুটি সন্তান আছে। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসেনি। আমরা একঘরে এক শয্যায় পাশাপাশি তবু তো দুস্তর ব্যবধান। পরস্পরকে স্পর্শ করা যায় না। পরস্পরের কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না।

সুখময় থামতে ওর মুখের দিকে তাকালাম শুধু আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখময় বলল, একদিন রাত্রিবেলায় অবশ্য বাসন্তী মুখ খুলল। কণ্ঠস্বর তার খুবই সহজ, তবে চাপা একটা দর্প যে গভীরে তা ধরতে আমার দেরী হল না। বলল, বিকাশের সঙ্গে তুমি কথা বল না। কী ব্যাপার বলত! এ পাড়ায় ওর বন্ধুর বাড়ি, তাই আসে আমার কাছে। কিন্তু তুমি....আমি ঘাড় না ফিরিয়েই বললাম, তুমি তো জান আমি কম কথা বলি। তা বিকাশ হোক

প্রকাশই হোক। বাসন্তী বোধকরি দাঁতে দাঁতে চেপে নিজেকে সামলাল। একটু চুপ করে থাকার পর বলল, তুমি ভাব আমি বোকা। কিন্তু জেনে রাখ আমি সব বুঝি! আমাকে বইতে খুব কষ্ট হচ্ছে, না? আমি বললাম, আঃ বাসন্তী। বাসন্তী যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। তীক্ষ্ণগলায় বলল, বিয়ে করার পর থেকেই তোমার এই অবস্থা। হিসেব করে দেখছো লোকসান হয়েছে। তাই সবেই তুমি আলগা আলগা। তুমি যেমন বাবা মা দাদা বৌদি ভাইবোনদের ছেড়েছ, আমাকেও তেমনি ছাড়তে হয়েছে! অতি ধীর এবং শান্তকণ্ঠে আমি বলেছি, বাসন্তী রাত্রি হচ্ছে ঘুমোও। ব্যস্ তারপর চুপচাপ। হ্যাঁ, সেই প্রথম বাসন্তীর বিস্ফোরণ। পরদিনই বিকাশের সঙ্গে পালাল। বিশ্বাস কর কমল, ব্যাপারটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। অফিস থেকে ফিরে চিঠির টুকরোটা পেয়ে মাথার শিরা যেন প্রচন্ড আক্রোশে কেউ পটপট করে ছিঁড়ছিল। চুরমার হয়ে গোটা পৃথিবীটাকে চুরমার করে দেওয়ায় প্রচন্ড ক্রোধ আমার রক্তকে টগবগ করে ফোটাচ্ছিল। আমি পরিষ্কার মনে করতে পারি না, তারপর কি করেছি, কোথায় গিয়েছি, কেন গিয়েছি। সারা কলকাতা টো টো করে ঘোরা, সবকিছু মুছে দেবার ভীষণ ইচ্ছায় ঘরের জিনিষপত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, মেসে আশ্রয়। ব্যাপার কী জান, সে বিভ্রান্তি কাটিয়ে দিল শিপ্রা। শিপ্রা বিকাশের স্ত্রী।

আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। থমকে গেলাম।

সুখময় বলল, শিপ্রা কী করে আমার মেসের ঠিকানা জোগাড় করেছিল জানি না। একদিন এসে হাজির হল আমার কাছে। বাসন্তীর সঙ্গে বিকাশের সম্পর্কটা সে জানত। শুধুমাত্র তাই নয়, এ নিয়ে বিকাশের সঙ্গে ঢের তর্কবিতর্ক গালিগালাজ হয়েছে। আমাকে এসে সব জানাবে বলে শাসিয়েছিল স্বামীকে। এসে বলল, আশ্রয় দিন আমাকে। আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেছিলাম। বলেছিলাম, পাগল! শিপ্রা আমাকে ছাড়ে নি। বাপের বাড়ি যাবে না। শ্বশুরবাড়িও অসম্মান নিয়ে থাকবে না। না বাসন্তীর চেয়েও ঢের সুশ্রী সুন্দরী শিপ্রা। লাবণ্যভরা মুখ, যৌবনছন্দিত সুঠাম শরীর, দু'টি সন্তানের জননী, কিন্তু স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্র কমেনি। তার দু'চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টির মধ্যে কি ছিল জানি না কিংবা কমল তুমি ভেবে নিতে পার সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় আমারও আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, যুবতীর আকর্ষণ আমি তুচ্ছ করতে পারিনি, মোহাবিষ্ট হয়ে ছিলাম। শিপ্রার অনমনীয় জেদও ছিল অবশ্য। সুখময় একমহূর্তের জন্যে থামল। তারপর বলল, চাকরি হল ধানকলে। শিপ্রাকে নিয়ে পালিয়ে এলাম আমি।

আমরা দু'জনে চুপচাপ সিগারেট টেনে যেতে থাকলাম। রোদের রঙ ক্রমশ আগুন হচ্ছে। সওয়া যাচ্ছে না। উৎসাহহীন মেলাটা যেন আরও ঝিমিয়ে পড়েছে। কিছু কিছু মানুষ এখনও প্লাটফর্মে চক্কর দিচ্ছে। ওদিকে খয়েরী স্টেশনঘরটার কাছে ভিড় বেড়েছে, তার শব্দও।

আমি বললাম, সুখময় এবার তো তুমি.....।

সুখী! সুখময় ম্লান হাসল। বলল, কমল জীবনের দুরন্ত ঘটনাপ্রবাহে আমরা প্রত্যেকে যেন একটা করে ক্ষুদে নৌকা। হাল হাতে ধরা। কিন্তু নিজের আওতার মধ্যে রাখা যায় না। ঈশ্বরের কী অপূর্ব যোগাযোগের খেলা দেখ, অন্য কেউ নয়—আমার সঙ্গে জড়াল কী না বিকাশেরই স্ত্রী। কিন্তু....।

আমি চমকে উঠে বললাম, কিন্তু.....কিন্তু কী!

সুখময় ধরাগলায় বলল, কমল, শিপ্রা ভালবাসত বিকাশকে তীব্রভাবে। গাঢ় অভিমান কিংবা ভয়ঙ্কর জেদ কিংবা আমার মত উদ্‌ভ্রান্ততা তাকে আমার কাছে টেনে এনেছিল। দিনে দিনে তা পরিষ্কার। আমার বুকের মধ্যে বাসন্তী, ওর বুকের মধ্যে বিকাশ, কিন্তু সেটা কী শুধু স্মৃতি না কী তার চেয়েও তীব্র জীবন্ত একটা থলথলে মাংসপিন্ডের সজীবতার সোচ্চার ঘোষণা! শিপ্রা বলে কী জান, বলে, ওদের ঠিকানা জোগাড় করতে পার, দেখে যাক আমরা কত সুখী! কমল, আমি চমকে উঠেছি। ওর শক্ত মুখের দৃঢ় চোয়ালে, দু'চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিহিংসার আগুন। দম নিয়ে সুখময় বলল, তবু আমাদের নৌকা ঠিকঠাক বইছে। দু'টি পাশাপাশি নৌকা জল কেটে যাচ্ছে। হাল কার হাতে ধরা আছে বলার দরকার করে না। অফিস যাই, ধানচালের হিসাব কষি, ঘরে ফিরি, ছেলে দু'টোকে পড়াই, কোন কোনদিন সিনেমায় যাই, গল্পের বই পড়ি, দরকারে কলকাতা আসি। সব ঠিকঠাক ঘটে যাচ্ছে। সব!

সুখময়ের ভারী বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর আমাকে কোন প্রশ্ন করতে দেয় না। আর ওর কথার মধ্যেই তো সব প্রশ্নের উত্তর। এই বিদঘুটে স্টেশন, ইঞ্জিনের অপেক্ষা, মানুষের এই মেলা, সামনে দাঁড়ানো খোঁড়া রেলগাড়ি বড় পীড়া দেয়। রোদ আরো চামড়া পোড়ায়। আরও সিগারেট ধোঁয়া আর ছাই হয়। ঘাসের উপর নীরবে বসে থাকি।

তারপর এক সময় ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায়। সচকিত হয়ে ওঠে যাত্রীরা। চাঞ্চল্য বাড়ে। অনেকে দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ে। যেন আবার একটা দমকা বাতাস এসে স্বস্তির রেণু রেণু বৃষ্টি ছড়ায়। আমি আমার ব্যাগখানা হাতে নিয়ে সুখময়ের বসা কম্পার্টমেন্ট এসে পাশাপাশি বসি। সব কথা যেন আমাদের শেষ। বিদঘুটে স্টেশন পিছনে ফেলে আমাদের গাড়ি সামনে চলতে সুরু করে।

সুখময় আমাকে তার ঠিকানা দেয়। আমি ওকে। তারপর সুখময় বলে, নিজের কথা তোমাকে বলতে পেরে ভারী ভাল লাগছে! ফেরার পথে এস না আমার বাড়ি। শিপ্রার সঙ্গে আলাপ করে যাবে! শিপ্রা ভারী ভাল মেয়ে।

বললাম, ছেলে দুটো?

সুখময় এতক্ষণে হাসল। কোন গ্লানি নেই সেই হাসিতে। বলল, ভয়ঙ্কর দুষ্টু। বড়টাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। ছোটটা তো বই নিতে চায় না। বইয়ের নামে দু'চোখ জলে ভাসে। এবার তো জেদ ধরেছিল কলকাতা আসবেই আমার সঙ্গে। মায়ের মত জেদ পেয়েছে একেবারে।

বোলপুর আসতে সুখময় নেমে গেল। নামার পরও জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে গেল, চিঠি দিও কমল। তোমার সঙ্গে দেখা হতে খুব আনন্দ হল। কলকাতা যাই কারও সঙ্গেই দেখা করার সাহস হয় না।

আমি বললাম, এবার গিয়ে দেখা করো। সুখময় চলে যাওয়ার পরও আমার মনের ভার কাটেনি। দু'স্টেশন পরে আমার স্টেশন।

ফেরার পথে সুখময়ের বোলপুরের বাড়িতে ওঠা আর সম্ভব হয়নি। কলকাতায় ফিরে অফিসে আমি এই সাক্ষাৎকারটা বলি। সকলেই শোনে। তবে কেন জানি না নিছক গল্পই থেকে যায় সেটা। ওরা আমি সাজিয়ে বলছি এরকম একটা অবিশ্বাস নিয়েছিল, নাকি চার সাড়ে চার বছরে আমাদের সেই সহকর্মী অফিসের বাইরের একটা সাধারণ মানুষ হয়ে উঠেছে, ঠিক বুঝতে পারিনি। মোট কথা কারুমধ্যেই উৎসাহ দেখিনি।

সুখময় কিন্তু সম্পর্কটা তারপরেও রেখে চলেছে। প্রায়ই চিঠি দেয়। কলকাতায় আমাদের এই অফিসকে সে ভুলতে পারেনি, পরিষ্কার বুঝতে পারি। শিপ্রার কথার চেয়ে চিঠিতে ছেলে দুটোর দুষ্টুমির কথাই বেশী থাকে। কে কাঁচের শিশি ভেঙ্গেছে,কার হাত মচকানর জন্য তার মন চিন্তিত ইত্যাদিতেই ভরা থাকে চিঠিগুলো। আমি কেন জানি না চিঠিগুলো সহ্য করে চলেছি। উত্তর দিই।

গতকাল আমি ওর চিঠি পেয়েছি একটা। চমকে ওঠার মত চিঠি।

বাসন্তী বাপের বাড়িতে এসেছে বিকাশকে ছেড়ে। তারপর তার ঠিকানায় চিঠি দিয়েছে। বিকাশকে ছেড়ে আসার কারণ, কোথায় এতদিন ছিল, বিকাশই-বা কোথায়, সে সব কিছু লেখেনি। চিঠিতে নাকি শুধু অভিমানের বন্যা, তার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা, আমাকে বাঁচাও, তোমার কাছে যেতে চাই, এছাড়া অন্য পথ আত্মহত্যা, তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকলাম ইত্যাদি। সুখময় লিখেছে, তুমি ত সব জান কমল, এখন আমার কী করা উচিত! চিঠির জবাব অতি দ্রুত দিও।

আমি চমকে উঠলেও ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত বা পীড়িত নই। স্রোতে ভিন্ন পসরা নিয়ে দু'টি নৌকা পাশাপাশি ঠিকঠাক যেতে পারলে, তৃতীয় নৌকাও ঠিকই তরঙ্গ ভেঙে যাবে!

গো-বধে রাখালে

বেলা বারোটা পর্যন্ত পাগা অর্থাৎ গরুর দড়ি গলায় নিয়ে হাম্বা হাম্বা ক'রে রাখালের বড় তেষ্টা পায়। জ্যৈষ্ঠের খরা পুরো এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। রৌদ্রতরঙ্গে লক্ষ অগ্নিশিখা লক্ লক্ করছে। চোঁ চোঁ নিঙড়ে নিচ্ছে প্রাণী, উদ্ভিদ, মাটির রস। চারটে গোঁ ঘোরায় রাখালের পায়ের শিরাতেও টান পড়ছে। কিন্তু বসে বিশ্রাম নেবার আগে জলের দরকার। একপেট জল।

গাঁয়ের বাইরে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে সামনেকার দিঘি সে দেখে। তেষ্টা যেন আরও বাড়ে তার। গলা শুকনো। সারা শরীর জলের টানে আছালি-পাছালি করে। পা পা করে সে এগিয়ে যায়। পদ্মপাতা আর দলে ঢাকা কালোজলের চাতাল দিঘি খরায় মাটিতে মিশে গিয়েছে। জল দেখা যায় না। দল ভেঙে খানিকটা কাদা পায়ে মেখে রাখাল মুখ নামিয়ে চোঁ চোঁ জল টেনে নেয়। বিস্বাদ নয়। আবার নামায় মুখ। বড় কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে। কোমরে টান পড়ে। উবু হয়ে বসে মুখ নামালে পাওয়া যেত। কিন্তু দল আর শুকনো জলজ উদ্ভিদের পচানি কাদায় ডাঁই। বসা যাবে না। হাতের আঁজলাও লাগানো যাবে না। সে যে এখন গো-বধা। সে যে এখন গরু-মারা। সে যে এখন গরু হয়ে পাপের দাগ মুছছে গায়ের। হাত লাগালে সে যে আর গরু থাকে না। মানুষ হয়ে যায়। পাপের আর একটা দাগ তাহলে বসে যায় যে গায়ে। পাপে বড় ডর লাগে রাখালের।

মা পই পই বলে দিয়েছে, 'আর লতুন করে পাপের দাগ গায়ে লিস না বিটা। যিটি লেগেছে সিটি মুছ। হাম্বা হাম্বা করে ভিখ্ মাগবি। গরুর পারা খাবি। গুয়ালে শুবি। এমনি করে তুর এক বছর হবেক, তখুন গায়ের তুর পাপের দাগ চলে যাবেক। আকাশ থেকেন ভগবান দেখবেক! মা ভগবতী বলবেক, দেখ, রাখালে পাচন ছুঁড়ে গরু মেরে ফেলেছিল। পাপ দেগে দিইছিলিম উর গায়ে। তা গোবধা কম্ম করলেক। আয় বাপ—আয় রাখালে, তুর গায়ে হাত বুলিন্ পাপের দাগ মুছে দি!'

দেখা যায় না। পাপের দাগ দেখা যায় না। রাখাল হাত বুক পেট পা দেখে। কোথায় পাপের দাগ! পিঠ দেখা যায় না। তবু সে জানে, পাপের দাগ পিঠের দিকে মুণ্ড ঘুরিয়ে দিলেও দেখতে পাবে না। তবে আছে। মা ভগবতীর ইচ্ছে হলে ফুটিন্ দিবেন একদিন। কুঠ হবেক। না হলেও নরক। মরার পরও রেহাই নাই। সে যখন সগ্‌গ যেতে চাইবে, তখনই ধরবে তাকে সগ্‌গের পেয়াদা। ওদেরও দেবতার মতই দিব্য চোখ। বলবে, এ কি হে রাখালে, তুমার গায়ে যি

পাপের দাগ রইছেক। যাও—যাও। লরকে যাও। তেলের কড়াইয়ে ফুট গা। সাপখুপের মাঝে পড়ে থাক গা। ছুবল মারবেক তুমাকে। ইটিই লিয়ম হে। ভগবানের রাজত্বে ছাড়ান নাই।

জল খেয়ে যেন বল আসে কিছুটা। আইটাই করা প্রাণটা শান্ত হয়। তেঁতুলের গুঁড়ির সামনে ঘাসের উপর বসে থাকে রাখাল। লম্বা গড়নের বিশ বছরের রোগা কালো চেহারা। লম্বাপানা মুখ। বড় বড় চোখ দুটিতে গভীর সারল্য। একগজ মার্কিনের লালচে টেনা কোমরে। টেনাতেই সে মুখ মুছে নেয়। সামনের খরাজর্জর ক্ষেতগুলোয় ঘন রোদ ঝক্‌ঝক্‌ করা দেখে। না, হাঁটবে না ওর মধ্যে। জিরেন নিয়ে সে ঘরে যাবে। ভাবে, কে জানছে মা ভগবতী তাকে দেখছেন কি না! হুঁ, দেখবেন বৈকি! তাঁর যি হাজার চোখ বটেক! তা বাদে চক্কবত্তীমশায় পায়শ্চিত্ত করিন্‌ দিলেই মা টেরটি পাবেন, রাখালে ঠিক ঠিক পেলেছে!

রাখাল গলার দড়িটা নাড়াচাড়া করে আপন মনে। এটিতেই বাঁধা হ'ত লাল বকনাটাকে। দীর্ঘশ্বাস পড়ে ওর। প্রথম প্রথম ভারী কষ্ট হত। এখন হয় না। ক'মাসে আশ্চর্য সয়ে গিয়েছে গলায় দড়িটা; যেন আজন্মই তার গলাতেই ছিল। হাম্বা হাম্বা ডাক দেওয়াটাও এখন যন্ত্রণা নয়। বাক্‌রুদ্ধ দিনরাত্রিও দিব্যি পেরিয়ে যাচ্ছে। পার করতেই হবে। নিয়মভঙ্গ মা ভগবতীর হাজার চোখের একটাতে না একটাতে ধরা পড়বেই। তাই তো রাখাল গরু হবার এই সাধনায় পাপ মোচনের ক্রিয়াকর্ম ভারী নিষ্ঠার সঙ্গে করে। বিন্দুমাত্রও গলদ রাখতে চায় না। পাপ বড় ডরের জিনিষ। বিড়বিড় করে রাখাল প্রায়ই। ধমকায় সে নিজেকে, হেই রাখালে, অমুন করিস না। ভগবানের পিথিমিতে মানুষ হয়ে এসেছিস্‌। খাটবি—খাবি। মিছে বলবি নাই। কারু ক্ষেতি করবি নাই। কারু সব্বনাশ ডাকবি নাই। লুকের চোখের জল ফেলবি নাই। দেখ, একটুস ভুলে কেমুন পাপ দেগে গেল তুর শরীলে।

একটু ভুল বৈকি! রাখাল পাপ করতে চায়নি। মা বলে, 'তু না চাইলে কি হবে! পাপ যি মানুষকে ছুঁবার লেগে ছুটে ছুটে বেড়ায়। রাগ চণ্ডাল। রাগ হল, ওমনি পাপ এসে ছুঁয়ে দিলেক তুকে।' রাখাল বলতে পারত, 'মাগো, সাধনবাবু খুন করালেক জটির লেগে নিবারণকে, মাকে ভাত দেয় না চণ্ডী, সুদ লেয় কষা লিঙরে চন্দবাবু, ভাইয়ের বেধবা বৌকে ভাগ দেয় নাই গোপাল, চুরি করে পদ—ঢেক ঢেক পাপ করছেক পিথিমির মানুষে! উদিকে পাপ ছুঁয় না, মা!' কিন্তু এসব কথা মা যখন তুলেছে, তখন সে হয়ে গিয়েছে গো-বধা। তাই শুধু শব্দ করেছে, হাম্বা!

রাখাল বকনাটাকে মারতে চায়নি। বারবার নামছিল ক্ষেতে। বিরক্ত হয়ে ছুঁড়েছিল পাচন অর্থাৎ হাতের খেটে লাঠিখানা। কোথা যে লাগল কে জানে! হুমড়ি খেয়ে পড়ল বকনাটা! নাকে মুখে রক্ত বেরিয়ে ছটফট করতে থাকল।

হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সে ভানু দত্তর কাছে গিয়েছিল। গরু বাগাল সে ওর। ভানুও ছুটে এসেছিল। মা এসেছিল। পরান কাকা এসেছিল। আরও কারা কারা এসেছিল। তারপর সে গো-বধা হয়ে গেল। চক্কবত্তী বিধান দিল, গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা পাপ। ই পাপে অনন্ত নরক বাস। রা কাড়তে পাবি নাই। ভিখ্ মেগে খেতে হবেক। এক বছর বাদে পায়শ্চিত্ত। গুয়ালে থাকতে হবেক। গলাতে গরুটর দড়ি লিতে হবেক!

ভানু দত্ত বলল, 'বকনটার দাম হবে দেড়শ টাকা। তুকে টাকা দিতে হবেক!'

মা বলল, 'কুথা পাব আমরা গিরস্ত!'

ভানু দত্ত মাকে গাল দিল, 'তার আমি কি জানি মাগী, দেড়শ টাকা আমাকে দিতে হবেক! না দিতে পারলে ভিটে লিখে দে।'

দেড়শ কততে হয়! রাখাল ভাবতে পারেনি। গোপাল স্যাঙাত। থ্রি পর্যন্ত পড়েছে। বলেছে, 'এক কুড়ি দু'কুড়ি করে সাত কুড়ি। তাবাদে দশ।' রাশিটা রাখাল বাষ্প চোখে দেখেছে। ছোটখাট টাকার পাহাড়ের সামিল। পাহাড়টা বানানো সহজ নয়। বাপ নাই। দাদা বৌদি ভিন্ন। মা কাজ করে ভটচাজ ঘরে। এমনিতেই অন্ন জোটে না। সেখানে দেড়শোয় পৌছানো!

গোহত্যা পাপ! চক্কবত্তীর বিধান! ভানু দত্তর দেড়শো টাকার পরোয়ানা। রাখাল হাম্বা হাম্বা করে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে দরজায় ভিখ্ মেগে ফোঁড়গুলো নিয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলে, 'দিব্যি ছিলি রাখালে, ই কি অপকাণ্ড করলি বল দেখিনি! লিজের গায়ে পাপ দেগে লিলি!'

ভিক্ষায় নিতান্ত মন্দ জোটে না। গো-বধা হয়ে টের পায়, দিনান্তের আহার তার জুটবেই। ভানু দত্ত আসে টাকার তাগাদাতে। মাকে বলে, 'না পার ভিটেটই আমার নামে লিখে দাও। দিতে ত বলেইছি। বুঝলে, ঋণও মহাপাপ বটেক। যাই কর, আমাকে টাকা না দিলে বিটার পাপ খণ্ডাবে নাই।'

মা বলে, 'আমার যি মাথা গুঁজার ঠাঁই থাকবেক নাই, গেরস্ত!'

'তার আমি কি জানি!' খিঁচিয়ে ওঠে ভানু দত্ত।

রাখালের সারা শরীর জ্বলে। তীব্র অস্থিরতায় সে গলার দড়ি নাড়িয়ে চেঁচায়, 'হাম্বা! হাম্বা।'

গাঁয়ের লোক তার নাম দিয়েছে, 'হাম্বা রাখালে।' কেউ কেউ বলে, 'শালা মানুষ খুন করলে পাপ লাগে না এখুন। টাকাতেই সব। বড়লুকরা দেবতার পারা। উঁ, যত কুছু দুষ গরীব মানুষদের!' বলে, 'কলিকাল বটে। যত করবে পাপ, তত হবে টাকার পাহাড়। মাগ ছেলে নিয়ে নেচে কুঁদে ভালমন্দ খেয়ে থাকবে! ওরে রাখালে, ভেক ছাড়।' অচেনা গাঁয়ের লোকেরা বলে, 'ভিখ মাগার লেগে এই সজ্জে। বেশ ত তরতাজা জুয়ান বট হে। খেটে খেতে পার না।' মাতাল মদনা একদিন চেপে ধরেছিল, 'এই শালা রাখালে, খুল গলার পাগা। বুঝলি, তোর ভানু দত্ত দুধ দুইতে বাঁট ছিঁড়ে দেয়। বকনা ট বেঁচে গেল!

তোর পুণ্যি হয়েছে। বকনা ট যেয়ে বলেছে গা তুর লেগে। শালা, তোর ভাবনা কি। ড্যাং ড্যাং করে সগ্‌গে যাবি। উব্বশী কোমর বেঁকিন্ দাঁড়িন্ থাকবে তুর লেগে। বল শালা, কথা বল।' রাখাল হাম্বা হাম্বা করেছিল। মদনা পাছায় একটা ঘুষি মেরে বলেছিল, 'শালা পুরো গরু একট। দে শালার দুধ দুয়ে। ধর—ধর শালাকে।' রাখালে ছুটে বেঁচেছিল।

মাতাল মদনা, গাঁয়ের লোক, যে যাই বলুক ওরা তো তার মতোই মানুষ। পাপের দাগ দেখতে পায় না। কিন্তু থাকে যে গো! মা বলেছে! রাখাল মাকে বড় বিশ্বাস করে। রোগা কালো শুকনো চুলের মায়ের বলি-রেখায়িত মুখ, শ্লথ বাহু, ঈষৎ কুঁজো ছেঁড়া শাড়িতে ঢাকা দেহখানার দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় এই মা তাকে পিথিমির আলো দেখিয়েছে। এই মা তার মঙ্গল ডাকে। মায়ের বাড়া কেউ নাই! যেমন শিবগড়ের শিব, আকাশে ভগবান, কালীমন্দিরে কালী, দুগ্‌গাতলাতে মা দুগ্‌গা—তেমন মা বটেক। উরা সবার দেবতা! মা তার ইকার। তাহলে দাম কার বেশী রাখালের কাছে?

তেঁতুলের ছায়ায় বসে রাখাল বলে, মায়ের দাম। তাহলে মায়ের দাম বেশী লয়! মাথা নাচায়। চোখ বন্ধ করে। পিপাসার তৃপ্তির পর সে ক্ষুধা টের পায়। ভিক্ষে ক'রে পাইটেক অর্থাৎ আধ সের চাল হয়েছে। পয়সা হয়েছে বাহাত্তর। বিকেলে আর ভিখ মাগতে বেরুবে না। আব ক'দিন—হয়ে এল! বছর ঘুরতে চলেছে! পাপের দাগ তার ধুয়ে দেবার জন্যে ভগবতী পদ্মহাত বাড়িয়ে দেবেন! কিন্তু তারপর কি করবে সে! ভানু দত্ত তাকে বাগাল রাখবে। পেনোকে ছাড়িয়ে দেবে নির্ঘাত। দেড়শো টাকা শোধ দিতে তাকে সারাজীবন পড়ে থাকতে হবে। সারাজীবনে কি দেড়শো টাকা শোধ হবে!

'বুঝলে, টাকা ত দিছ নাই। গো-বধা কাটতে তখুন যেন আবার রাখালকে কুথাও লাগিন্ দিও না। তোমাদিকে বিশ্বেস নাই। দেনা শোধ না করলে পাপ যাবেক নাই।' ভানু দত্ত বিড়ি টানে। হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে চুলকে নেয়। তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'বুঝলি রাখালে!'

রাখাল শব্দ করে, 'হাম্বা!'

'হেই শালা গরু।' ভানু দত্ত হাসে। বলে, 'হ্যাঁরে পায়শ্চিত্তর পর ত মানুষ হবি আবার! নাকি গরু থেকে যাবি। একবছর কথা না বলে দেখিস্ বাপ, যেন মানুষের ভাষা ভুলে যাস্ না!'

রাখাল মাথা দোলায়, 'হাম্বা!'

'তাহলে মহাবেপত্তি। তা মানুষের পারা খাটতে খুটতে পারবি। আমার দেড়শো টাকা উশুল দিতেই হবে! হাম্বা হাম্বা সব মুনিষ মান্দেরে যদি করত ঢেক ভাল হত। সব শালার খাঁই। দাও—দাও।'

রাখাল আবার শব্দ তোলে, 'হাম্বা!'

ভানু দত্ত চলে যাওয়ার পর রাখাল নিজের সঙ্গে কথা বলে। রাগ গুর গুর

করে বুকের মধ্যে! গরুর শিং থাকে। তারও যদি থাকত! সে নির্ঘাত পেট ফুঁড়ে দিত মানুষটার! তিন বছর গরু-বাগালি করছে ও-ঘরে। মহা কঞ্জুষ মানুষ। শাঁসেজলে দেহখানা লোকটার থলথলে। ভুঁড়িও বেশ আছে। জমি জিরেত আছে বিঘে উনিশ। ঘরের গরুগুলো সব শীর্ণকায়। বকনাটার দুর্বলতার কারণও ছিল, মাকে অতি দোহান! নাহলে পাচন ছোঁড়ামাত্র লটকে যায়!

রোদের তেজ কমে না। বাতাসের ঝাপটা যেন বিশাল চুল্লির গা থেকে উঠে এসে ছেঁকা দেয়। তেঁতুলতলায় অবসন্ন দেহখানা তুলতে ইচ্ছে করে না। শুয়ে পড়ে একসময় রাখাল। মুক্তির দিন যত এগিয়ে আসছে সে টের পাচ্ছে, একটা ভয় তাকে ঘিরে ধরছে।

ভিখ নিয়ে গেলে মা উজ্জ্বল চোখ ক'রে থলিতে মুখ বাড়ায়।

'বুঝলি রাখালে, ভিগ না মাগলে পুড়ার পেটে দানা পড়ত নাই। দেখ্, মা ভগবতীর কত দয়া।'

রাখাল হাত নেড়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বুঝিয়েছে বছর পুরতে চলল। দড়ি খুলতে হবে। তারপর? পেট কপাল ইঙ্গিত করেছে!

'ভাবনা কিসের বেটা! শরীল রইছে। খেমতা আছেক তুর!'

রাখাল বুঝিয়েছে, যে সে ভানু দত্তর খুঁটিতে বাঁধা! ক্ষমতা সব দেড়শো টাকায় বিক্রি হয়ে আছে।

গাঁ ঢোকার মুখে রাখাল দেখে, বাবলা গাছগুলোর পাশে কোমরে ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আদু। আদুরী। কৃশাঙ্গী শ্যামলী যুবতীকে দেখামাত্র রক্ত চিনচিন করে। ফ্যাকাশে হলুদ রঙচটা শাড়ি, হাতা-ছেঁড়া ব্লাউজে শরীরের অঢেল প্রাণবন্ততা যেন ধবে রাখতে পারে না। উছলে পড়ে। ঢলঢলে মুখখানার কথা ভাবলে রাখাল বেঁচে থাকার প্রবলতম আকাঙ্ক্ষাটা টের পায়। আদুকে সে বিয়ে করবে। হয়ত সময় লাগবে। কিন্তু ওই যুবতীকে পাওয়াটা পাপমুক্তির পর তার অন্যতম গভীর কামনা।

গো-বধে হওয়ায় আদরী কেঁদেছিল। বুকের সঙ্গে মিশে সন্ধ্যের অন্ধকারে বাগদী পাড়ার ইঁদারাটার পাশে কি কান্না। রাখালের বাক্‌রুদ্ধ মুখের উপর গড়িয়ে পড়েছিল চোখের জল। আকাশের তারা আর আঁধারে ডোবা বাঁশঝাড় আতাঝোপ সাক্ষী হয়েছিল। তারপরও কতদিন মায়ের মতো আড়ালে তাকে খাইয়ে দিয়েছে। তরকারি, মিষ্টি, ভাজা মাছ। বলেছে, পাপ কিসের! যেই বলুক, তুমার গায়ে পাপের দাগ নাই! আমি তুমার সবই দেখতে পাই। ঘাড় কাত্ করে রাখাল অবশ্য বুঝিয়েছে, 'আছে', বলতে চেয়েছে, আদুরী তুই আমার মেয়েমানুষ। আমার পাপ তুরও গায়ে বাজবেক।

আদুরী বলল, 'অ মা, মুখ শুকিন্ গেইছে! খুবি হেঁটেছ!'

মাথা নাড়া দিল রাখাল। অর্থাৎ, না।

'না বললেই হল!' আদুরীর দু'চোখে আদরে ভৎর্সনা আঁকা হয়ে থমকে

রইল। তারপর বলল, 'শরীল কী হইছে! লিজে ত দেখতে পাও না! অ মা, মুখ দেখি, হ্যাঁ গ বছর পুরতে আর দেরি নাই, বল!'

মাথা নাচায় রাখাল।

'তুমি কথা বলতে পাও না, আমার পেট ফুলে! হুঁ, বলে রাখছি এক বছরের আদর পাওনা আছে তুমার কাছে, গায়ে ত হাত দাও না!' ঢলঢলে মুখখানায় এখন লজ্জা মাখা-মাখা হয় আদুরীর, 'ছিয়াতে এসো।'

মাথা নাড়া দিয়ে ইঙ্গিতে রাখাল জানালো, সে এখানেই দাঁড়াবে।

মাথা নিচু করে পা ঘষে আদুরী, 'বাবা বলছেক, না করিস না। কুশগাঁর ছেলে। নিজের একটুস জমিও আছে। অয় দেখ, তুমার মুখ ট অতটুকুন হয়ে গেল। না গো না! আদুরী একজনারই।' ভারী অহঙ্কারের হাসি হাসে মেয়ে।

দেখে চোখ জুড়োয় রাখালের। ক্লান্তি মুছে যায়। মনে হয় আদুরীর মত অপরূপ পৃথিবীর কোনো মেয়ে হতে পারে না। রক্ত শিরশির করে তার, আবার শান্ত হয়ে আসে। সে না গো-বধা। সে না মানুষ নয়! তার যে কামনা জাগতে নাই। শুধু এই সময়—এই সময়ই রাখালের কান্না পায়। সারা দেহ জুড়ে সাগ্রহ পিপাসা তাকে আকুল করে।

ভয়ঙ্কর সেই মুক্তির দিন এগিয়ে আসে। প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন সহজ নয়। চক্রবর্তী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, কমপক্ষে বিশ টাকা দরকার। মা-বেটাতে উবু হয়ে বসে। মা মাথার কপালে হাত রেখে বলে, 'কুথা পাব বিটা পায়শ্চিত্তর টাকা! তুর তাহালে যি গলার দড়ি নামবেক নাই। রা কাড়তে পাবি নাই!'

হাতের তালু দেখিয়ে থামতে বলে রাখাল। হিসাব ক'রে সে দেখেছে, কালই পূর্ণ হবে বৎসর। গলার দড়ি নামানোর ইচ্ছে তার নেই। হাম্বা আর দড়িই তার অস্ত্র। মা পরে বুঝবে। মায়ের সঙ্গে কালই কথা বলবে।

মা বলে, 'চুপ না হয় করছি, বেটা। কিন্তুক তুর মুক্তি হবেক কেমুন করে?'

রাখাল হাসে। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় সে গলার দড়ি নামায়। একবছরের রুদ্ধ স্বর বের করতে সময় নেয়। জিভ আড়ষ্ট। গলা সুড় সুড় করে। চোখে জল আসে। সে কথা বলার কষ্ট টের পায়। গোড়ায় কথাবন্ধের মতোই।

'মা ভগবতী দেখলেন মা, আমি সব মেনেছি!'

'তা বটেক। কিন্তু চকরবতীকে খবর না পাঠালে ত তেনার জানার কথা লয়। তারি লেগেই পায়শ্চিত্ত।'

রাখাল ফিসফিস করে, 'তার যি হাজার চোখ, মা। ঠিকই দেখেছেন।'

'তা বটে।' মা চিন্তায় পড়ে, 'তু কি ভাবছিস?'

'লুক-দেখানি দড়ি রাখব, মা। হাম্বাও করব।'

চক্রবর্তীর টনক নড়েছে। খড়ম পায়ে লালপেড়ে দেনো খাটো ধূতির একাংশ গায়ে জড়িয়ে হাজির হন।

'রাখালে! অ রাখালে!'

ঘরের ভেতর থেকে রাখাল সাড়া দেয়, 'হাম্বা!'

'ওরে হারামজাদা, তোর তো সময় হয়ে গেল প্রায়শ্চিত্তের।'

মাথা নাড়া দেয় রাখাল। দুই হাতের সব ক'টি আঙ্গুল মেলে ধরে, বোঝায় এখনও দশদিন বাকী।

'দূর হতভাগা! অত কি ভুল হয়! যাগগে দশদিনই না হয় বাকী। বলি, টাকার ব্যবস্থা করছিস তো!'

রাখাল বলে, 'হাম্বা!'

মা বলে, 'করছি ঠাকুরমশাই! আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন!'

ভানু দত্ত হাসতে হাসতে আছে, 'আর নাকি দশদিন বাকী! তারপর যাবি, বুঝলি রাখাল। যতই প্রায়শ্চিত্ত কর, দেনা না শুধলে তোর পাপ মুছবে না!'

রাখাল শব্দ করল, 'হাম্বা!'

সস্নেহে ভানু দত্ত বলল 'বেটা গরু!'

দিনে গরু রাতে মানুষ রাখাল টের পায় এটাই পথ নয়। দশদিনের আর কতটুকুইবা। সে দেখতে পায় ভানু দত্ত, চক্রবর্ত্তী কেবল নয়—ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের পর অনাহারের দিন দরজায় হানা দেবে। বুকের পাঁজরায় সেই শব্দ বাজে তার।

তিন দিন পর মাঝরাতে আদুরী আর মাকে নিয়ে হাঁটা দেয় রাখাল। তিনজনের তিনটে পুঁটলি। অন্ধকারেই এ তল্লাট ছেড়ে যাবে। বাসে ক'রে তারপর আসানসোল। ছেলেবেলার স্যাঙাত সাধু বিয়ে থা ক'রে আছে ওখানে, কয়লাখাদে চাকরি করে। এছাড়া রাখালের পথ ছিল না। আদুরীর বাপকে সে কখনোই তিনকুড়ি টাকা দিতে পারত না। আদুরী তার হ'ত না। দেড়শো টাকা শোধ, পায়শ্চিত্ত—এ জন্মে হত না। আসানসোলে তো কুলির কাজ করতে পারবে! সাধু ক'দিনেব জন্যে আশ্রয়ও দেবে।

শেষরাতের অন্ধকার বড় দুর্বল। ভয় লাগে না। আকাশের নক্ষত্রবাতি নিভে আসে। পূবের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে শুকতারা। গাঁ, গাছ-গাছালি আলোয় ভেজার আকুলতা নিয়ে পড়ে আছে। তিনজোড়া পা আগে-পিছে চলে আঁকা বাঁকা আল পথে।

মা বলে, 'অ বাপ রাখাল, শেষে ভিটে ছাড়তে হল!'

'থাকবেক, মা। মাটি কেউ লিতে লারবেক। আবার আসব আমরা!'

আদুরী বলে, 'উঃ কি জুরে হাঁটছ! মা লারছে। আস্তে চলতে পার না।'

ঘাড় ঘুরিয়ে রাখাল শব্দ করে, 'হাম্বা।'

একগাল হেসে আদুরী বলে, 'ঢঙ্!'

আকাল

'কে বট হে?'

'আকাল!'

'নামে কি আসে যায়। সাঁঝ বিলাতে জল হছেক। বলি ই সময় দুয়োর ঠেলাঠেলি কেনে?'

'খুল একটুস, ঢুকব। ভিজে গেলম মাইরি জলে। হি হি করে কাঁপছি।'

'বুঝলে কিনা বাপেরা, লুকটর একটুস সন্দ হন্‌ছিল।'

বলে অন্ধকারে বুড়ো জবুথবু হয়ে বসে থাকা শ্রোতাদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, ঝমঝমিন্ জল হছে। অতিথি বটেক। লুকট তখুন বললেক, তা বাবুপাড়াতে দালান কোঠা থাকতে বাগ্দী বাউরী পাড়া কেনে হে!'

'বিবাক দুয়োর বন্ধ। ঢুকতে লারি। মাইরি শীতে হি হি করছি। দুয়োর খুল। মরে যাব।'

'তা লুকটর দয়া হল। দুয়োর খুলতেই বুঝলে কিনা বাপধনেরা, হুড়মুড় করে ঢুকল খদখদে কালো এক ট জিনিষ। লম্প ট থরথর করে কেঁপে গেল। এক ঝটকান বাতাসের সঙ্গে জলের ছিঁচ মারল ঘরের মেঝেতে ছোবল। তা জিনিষ ট মানুষের পারাই বটেক। হাঁড়ার পারা মাথা, কোমর অব্দি চুল। চোখ দু'খান যেন অন্ধকার মশাল বটে। হুঁ, মুখ ট এক ট ডোবার পারা। টকটকে জিভ। তা হি হি করে কাঁপবে কুথা। দিব্যি মিটিরমিটির হাসি। গা থেকে বুঝলে কিনা একটা ঘ্যেন বেরুছেক। পচা, গরু মোষ পচার পারা ঘ্যান।'

'দাও দেখিনি গামছা এক ট।'

'এই যে—। বলে লুকট ঘরে দড়িতে টানান ছিল গামছ ট দেখে নাই! বুঝলে তখুন খিকখিক করে হাসল উ ট। লুক ট বুঝলেক, ই মানুষ লয়।'

'চাট্টি ভাত দিবে হে।'

'অতিথ। না বলতে নাই। লুকট বললেক, হুঁ দুব। তা বাদে হাঁড়ির কাছে যেঁয়ে তাজ্জব। একহাঁড়ি ভাত ছিল। ই যি শূন্যি! তখুন লুকটার সন্দ পাকা হল। রাগে গসগস করতে থাকল লাগল কয়লার পারা। ঢিলার পারা চোখ করে মেজাজে বললেক, তুমি কে বট হে? আমার ঘরে ঢুকতেই সব বিবাক লুপাট হন্ গেল? কে বট হে?'

'শুনে বুঝলে কিনা বাপধনেরা, উর কি হাসি। ঘর ট যেন ঠকঠক করে কাঁপতে থাকল হাসিতে। হুড়হুড় করে যেন ভেঙে যাবেক। বাইরে তখুন আকাশে চড় চড় করে বাজ পড়ল। আর উ ইয়া লম্বা হন্ গেল। মোষের পারা মোটা।

তাবাদে গুটা ঘর পচা গন্ধে ভরে গেল। লুক ট নাক চাপা দিলেক। ভাবলেক, শালাকে তেড়ে দুব ঘর থেকে। কিন্তুক পলকে উ নাই। খালি হাসি ট ঘরে ঘুরে বিড়াছে। উকে দিখা যেছে না। লুক ট ইপাশ খুঁজে, উপাশ খুঁজে। ইপাশ খুঁজে—বুঝলে বাপধনেরা সেই থেকে বাগ্দী বাউরী হাড়ি, মুচি ঘরে আকাল ঢুকে আছেক। ই কথার বাড়া কথা নাই। যেমুন দিনের আলা, রেতের আঁধার, আগুনের তাত সত্যি, তেমুন সত্যি ই কথা।'

বলে বুড়ো দম নিতে থামে। নির্বাক মানুষগুলোকে গল্পে মুগ্ধ করার আত্মপ্রসাদ বোধকরি শ্বাসসহযোগে বের করে দেয়, 'হায় গো, বাপধনেরা, সেই থেকেই আকাল—।'

লোকটা পাক্কা গল্প-বলিয়ে। কণ্ঠস্বরের দ্রুত ওঠানামা এবং চকিত স্বর পরিবর্তন, বিস্ময়, উত্তেজনা, ভয় সকলই প্রকাশ করতে পারে। বয়সের গাছপাথর নেই। কাঁচাপাকা চুল। রক্তমাংস হাড়গোড়ের কাঠামোটা যেন পাথর কুঁদে বানানো। টপটপ খসে গিয়েছে সঙ্গীসাথী ও অনুজবৃন্দ। ও দিব্যি টিকে আছে। নাতিপুতি নিয়ে বিরাট সংসার। ছেলেরাই সব। খায় দায় ঘুরে বেড়ায় বুড়ো। লোক ডেকে পাশে বসায়। বলে, 'শুন হে, যেছ কুথা? কাজে? দু'দণ্ড বস কেনে বুড়োটর কাছে।' বলে জমিয়ে দেয়। জমিদার আমল, গাঁয়ের পুরোনো বিবাদ, ডাকাতের সঙ্গে লড়াই, ডাইনি, ভূত, পেত্নী, রাজরাজড়া, দিঘি, মন্দির, বাগান, সব বিষয় নিয়েই হাজারো কেচ্ছা লোকটা পেটে পুরে রেখেছে। বিষয় থেকে দ্রুত বিষয়ান্তরে নিয়ে যায়।

আজকের আসরটা বুড়ো বিড়ি কিনতে এসে পেয়েছে। এই মাত্র সন্ধ্যে গড়ালো। মেঘলার জন্য অন্ধকার ভারী জমাটি হয়ে বসে গিয়েছে।

ঝিরঝির করে কাঁদুনে আকাশও ঝরে যাচ্ছে। ভাদুরে দিন। এ সময়টাই মারাত্মক। দারিদ্র—হা অন্ন, কর্মহীনতা! দাস মশাইয়ের মুদির দোকানের এক চিলতে বারান্দা। সেখানে বসেছিল হরিপদ, কালু, জ্যাঠা। বুড়ো এসেই শুনেছে—কালু বলেছে, 'মাইরি, আকাল খালি বাগ্দী বাউরী ঘরে।' ব্যস, তুলে নিয়েছে বুড়ো। তারপর সুরু করেছে। দাস মশাইয়ের দোকানের দরজা গলে হ্যারিকেনের লম্বা একটা ফালি পড়েছে। কিন্তু সব মুখই অস্পষ্ট।

আকালের গল্প শোনার বিশ্বাস যাই থাক না কেন এবং 'বুড়ো আচ্ছা বানাতে পারে মাইরি' ভোঁ ভোঁ ক'রে কানের পাশে পোকার মত ঘুরলেও সকলেই নির্বাক। শুধু বংশী বলল, 'দাদু, ঘরে আছে? দেখতে যে পাই না!'

কেউ হাসল না, শব্দ পর্যন্ত না, বুড়োর গল্পটা বোধকরি এরা বিশ্বাস করেছে।

বুড়ো বলল, 'ও আমার সোনার চাঁদ। মুখে তুমার দুধের ঘ্যান। বলি, কপালের লিচে গত্ত। তার ভিতর কাঁচের পাথর। উ পাথরে যে বাইরে ট দেখা যায় বাপ। দুয়োর খুলে ভিতরে ঢুকিন্ছে আকালকে। উ চোখে ত দিখা যাবে নাই।'

বংশী ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, 'কিন্তুক অ দাদু, আকাল শুধু শুধু ঢুকে নাই! দুষ ছিল লুক টর!'

'বাপধন এতক্ষণে লেহ্য কথা বলেছ। ঠিক। ঠিক। লুকটর কথা বলি—।'

দাশু আর দাঁড়ায় না। বুড়ো যেন গল্পের মৌচাক। মৌমাছির মত খালি পাক খেতে ইচ্ছে করে। দাশুর হাতে পনের পয়সার পেঁয়াজ। আলতাকে বলে এসেছে, 'ভাঙা গমের খিচুড়ি তু নামাতে না-নামাতে আমি আসছি।' খিচুড়ি নামেই। আসলে হলুদ আর নুন ছাড়া কিছু নেই। না তেল-ফোড়ন, না মশলা, না আলু। সারাদিন ফুড ফর ওয়ার্ক-এ রাস্তার মাটি কুপিয়ে এটাও যেন অমৃত।

দাশু ভাবে, আলতা এতক্ষণে নামিয়ে বসে আছে। উনুনে যা কাঠ গুঁজছিল। গোঁজারই কথা। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। ছেলেটা দুধ টেনে পেট ভরায়। একা নয় দুজনার খাদ্যি চাই শরীরে। যত তাড়াতাড়ি নামানো যায়। নেহাৎ কাঁচা চিবানো যায় না। পেঁয়াজের কথা বলতে আলতা বলেছিল, 'কাঁচা লঙ্কা নুন রইছেক। আর বড়লোকী করতে হবেক নাই!' দাশু বলেছে, 'তুর ত কাঁচা পেঁয়াজ না হলে রুচে না।' কাঠ গুঁজতে গুঁজতে আলতা বলে, 'খুব রুচবেক।' হা হা করে হেসে উঠেছে দাশু। বলেছে, 'বুঝেছি, তুর ডর লাগবেক আমি সন্ধ্যেবিলাতে চলে যাব। তুকে যদি কেউ লিয়ে পালায়! তা আমি বাপু, ইকা পেলে ইটি লেয্য কথা, তুর কারও সাথে বিয়ে হলে, এমুন সুবিধে পেলে, লিশ্চয় লিয়ে পালাতাম।' একগাল হেসে আলতা শুধু বলেছে, 'বুড়ো বয়সে ঢঙ।' তারপরই কাঁদ কাঁদ গলায় বলেছে, 'এই, দেরী করো না।'

তবু দিব্যি কেমন বুড়োর গল্পে জুড়ে গিয়েছিল। শুধু জোড়া নয়, দাশু ভাবছে, ঘরে আকাল-ঢোকানো লোকটার দোয জানা হল না। কিন্তু আলতা একা আছে। আকাল যদি দরজা খুটখুট করে। ঢুকলেই তো লোপাট হয়ে যাবে গমসেদ্ধ হাঁড়ি!

দাশু হনহন ক'রে হাঁটে। বৃষ্টির তেমন জোর নেই। একটানা বর্ষার পোকারা ডেকে চলেছে। অন্ধকার জল-ছপছপে কাদাটে পথ। চোখ বেঁধে দিলেও সে চলে যেতে পারে। বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে তার পথটা। আলতা ঠিকই বলে, ঘরের কথা তার মনে থাকে না। উহু, মোটেই তা নয়। ঘর মানেই আলতা। আলতাকে বড় ভালবাসে। দু'বেলা অন্ন দিতে পারে না সত্যি কথা। দিতে পারে না রঙীন শাড়ি বাহারে চুড়ি। কিন্তু দু'হাতের আঁজলা উজাড় করে দেয় সে আদর ভালবাসা। আলতা বুকের কাছে এলে তার তো মনে হয় এমন নির্দয় পৃথিবীটাতে বেঁচে থাকার একটা অর্থ অন্তত আছে।

বুড়ো ঠিকই বলেছে, আকাল ঢুকে সব লোপাট করে দেয়। নইলে সে তো দুর্বল নয়। হাত পায়ের পেশী যথেষ্ট শক্তপোক্ত। পরিশ্রম করতে পারে। দিনভর মাটি চোটানো কি মুনিষের কাজ, কিছুতেই হার নেই। পাটাল বুক। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। রোগ জ্বালা নেই। বেঁচে থাকার পক্ষে এ সবই তো অস্ত্র। কিন্তু

যথাযথ প্রয়োগের জায়গা নেই। কাজ কোথা? জমি চষবে? জমি কোথা? জমি থাকলেও বলদ লাঙল বীজ সার?

দাশুর মনে হয়, সব—সবই আকাল লোপাট করেছে। হ্যাঁ, শুধু তাদেরই। সে বলে, 'আলতা, দুনিয়ার বিবাক মানুষের দুখ। দাম বাড়ছেক! লুকে করবেক কি? কিনবেক কিসে?' আলতা বলে, 'বিবাক মানুষের দুখ না ছাই। দুকানে কত কাপড়, জামা। হাটে কত চাল। কিনছেক নাই লুকে? মাছ মাংস ডিম মিষ্টি—কত। বল, দুখ আমাদের। বল, আমাদেরই নাই।'

দাশু ভেবে নেয়, আজ সে আলতাকে বলবে, তু ঠিক বলিস্ আলতা। তারপর আকালের গল্পটা শোনাবে।

হোঁচট খায় দাশু। বুড়ো আঙুলটা চিনচিন করে। অন্ধকারে ধারাবর্ষণে মাথা গা ভিজে গিয়েছে। কোমরে ছেঁড়া লুঙ্গি। এটাই সম্বল। আলতার শুকনো টেনা থাকলে পরে শুতে হবে। বলিহারি যাই দেবতাকে। দাশু মনে মনে বলে, তুমি বাপ জলের দেবতা, রেতের বেলা একটুস শুতে যেতে ত পার। রাস্তায় একটা মানুষ নেই। ওদিকে বেলগড়ে—ক্ষুদে ডোবা, অন্ধকারে সিক্ত হচ্ছে বেলগড়ের পাড়ের গাছগুলো। সব ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির জন্য সন্ধেরাত মাঝরাত হয়ে গিয়েছে। আলতা যে কি করছে!

ধর্মরাজথানের বিশাল বটগাছটা পেরুলেই ধরমডোবা। তারপরই ঘর। আর ক'পা মাত্র। দাশু দ্রুত হাঁটে। কোথাও একটু আলো নেই। ধর্মরাজথানের বটগাছটা কালো দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে।

'কে বটে?'

'অ, দাশুদা, তুমি বট। দেখ তো তুমার ঘরে কে ঢুকে গেইছে।'

অন্ধকারে চেনা যায় না, স্বর চিনিয়ে দেয়, লোকটা কুঁড়ো। একপায়ে হাঁটে। ভিখ মেগে খায়। অন্ধকারে নির্ঘাত পেটের দায়ে বেরিয়েছে!

কিন্তু তার ঘরে কে ঢুকল! কে? আকাল!

'কে রে, কে বটে?'

'তাগাদা যাও। দাঁড়িন্ থেকো না। পা নাই, খেমতা নাই তারি লেগে—যাও। যাও।'

অন্ধকারে সাড়া দিতে দিতে পাশ ঘেঁষে কুঁড়ো পেরিয়ে যায়।

ঘরের সামনে গিয়েই দাশু হাসিটা শুনতে পেল। চকিতে মনে হল, এ কার্তিক রায়। রোগা লিকলিকে, জমি জায়গা আছে। স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। তা, লোকটা তাকে বাঁচিয়েছিল। আলতার পোয়াতি অবস্থাতে রোগ ধরেছিল। ডাক্তার-ওষুধ-পত্তরের জন্য তিরিশ টাকা ধার দেয়। এই ক'মাসে অন্তত গোটা পঞ্চাশ তার দেওয়া হল। তবু নাকি শোধ হয়নি। সুদ আছে না? এখনও পনের টাকা পাবে। বলেছে, পনেররও সুদ বাড়বে। বিশ পঁচিশ হলে তখন যেন আকাশ থেকে পড়িস না। তা কাজ করছে শুনে কি হাতাতে এসেছে? চকিতে

এই মনে হওয়াটা কিন্তু দীর্ঘ হাসির তরঙ্গে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই কানের পাশে গল্প-বলিয়ে বুড়ো যেন বলে ওঠে, বুঝলি কিনা বাপধনেরা, তাবাদে ঘরের ভিতর খালি হি হি হাসি!

শীত-শীত বাদলা সন্ধ্যার ভাবটা মুহূর্তে বাষ্প হয়ে যায়। প্রবল উত্তেজনা দাশুর অভুক্ত শরীরের শিরাপথে ছুটিয়ে দেয়। মাথায় প্রবল ঝঞ্ঝা। যেন অন্ধকারে একটা কালো মোষের মত শরীর, দীর্ঘ চুলের রাশ, ডোবার মত হাঁ-মুখ মূর্তিকে দোলায়। লোপাট! লোপাট করে দেয় ঘরের সামগ্রী!

'ঘরে ঢুকলেন কেনে? পারেন ত কাল দিনের বিলা আসবেন।'

'বলি এত রাগ কিসের! আঁ, কতদিন থেকে বলছি, মানুর মাকে কাজ ছাড়িন্ তোকে রাখি। রানীর হালে থাকবি।'

'এখুনি উ আসবেক। কাণ্ড হন্ যাবেক।'

'ভয় দিখাছ? বলি উর জন্যেই বসে আছি সুন্দরী। তবে তুমি রাজী হলে দেনা শোধ। এখুনি যেছি।'

'বেরিন্ যান। আপনি বেরিন্ যান।'

হাসির শব্দটা দাশুর কানে বাজে কেবল। এই তো সুযোগ। দাশু ভুলে যায় কার্তিক রায়ের গলা, আলতা, ঘর, গমের খিচুড়ি। কোষে কোষে কেবল আকালকে পাওয়ার, তার মুখোমুখি হওয়ার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ ইচ্ছা ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। শত্রুর সামনে দাঁড়াবে। যুঝবে। এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। পেয়েছে সে শত্রুকে। আকালকে। তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, ভাইরে, আকালকে পেয়েছি। বুড়ো, আমার কপালের মাঝে চোখ বেরিন্ছে। দাশুর রক্ত টগবগ করে ফোটে। হাতের পেঁয়াজগুলো পড়ে যায়। টিনের আগল দরজাটা সরিয়ে ঢুকে পড়ে। এক মুহূর্ত সময় যে ব্যয় করে না। ঘরের কোণেই আছে তেল চুকচুকে গাঁটওয়ালা লাঠিখানা। সারা ঘর জুড়ে হাসিটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। লম্ফের ম্লান হলদেটে আলো। ওই তো কালো বিশাল মোষের মতো আকাল। লাঠি তুলে সে সটান বসিয়ে দেয়। শুধু টের পায় একটা আর্ত চিৎকার। ছুটে আকালের বেরিয়ে যাওয়া। আলতার কেঁদে ওঠা। তারপর তাকে জাপটে ধরে চিৎকার করে বলা—'ওগো তুমি ই কি করলে! কি করলে!'

'পালিন্ছে! আকাল পালিন্ছে!' দাশু হা হা করে হাসে! তারপরই মনে পড়ে যায়, 'হেই গো, শালাকে মেরে দিলাম নাই। উ যে আবার ভিনু ঘরে যেঁয়ে ঢুকবেক। দেখি গা, দেখি গা।'

'না, তুমি যাবে নাই।'

'উ কি কথা, মানুষ বটি, কার ঘরে ঢুকল গা, দেখতে হবেক নাই?'

'না। না।'

আলতা বেরুতে দিল না। মানুষটাকে জাপটে ধরে বলল, 'তুমি যাবে নাই। তুমাকে আমি যেতে দুব নাই।' তারপর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকল, 'মারলে

কেনে, তুমি উকে মারলে কেনে!'

'না মারলে যেত! উ যে আকাল।'

'আকাল! উ কার্তিক রায় বটে।'

মেয়েমানুষ কান্না ভুলে নতুন শব্দের মানে জানতে চাইল, 'আকাল! উ কি জিনিস! উর মানে কি?'

'হেঁ হেঁ!' দাশু মাথা নাচালো। মুখ্যু মেয়েমানুষ জানবে কি। বৌ বটে। জানাতে তাকে হবে। বলল, 'বুঝলি, আকাল হল, হুঁ, সব লুট করে লেয়। হুঁ বিবাক লুট করে লেয়। কার্তিক রায়ের ভেক ক'রে ওই আকাল এসেছিল। বল্, লুট করতে আসে নাই? বল্—'

আলতা বোঝে না। তার শুধু মনে হয় ঘরের মানুষটি অপরিচিত। কি যে বলবে! আবার কান্না নামে তার। দাশু বোধকরি টের পায়, মুখ্যু মেয়েমানুষের মাথায় ঢুকল না। তাই ক্ষিদে ভুলে উবু হয়ে বসে বলে, 'তাহলে শুন্—।'

পরদিন থানার ছোট দারোগা কোমরে চামড়ার খাপে রিভলবার, সঙ্গে দু'জন বন্দুকধারী কনেষ্টবল নিয়ে এলেন।

'তুই দাশু বাগ্দী? বাপ ভোলা বাগ্দী?'

'আজ্ঞে।'

'কার্তিক রায়কে খুন করতে চেষ্টা করেছিলিস্?'

'আজ্ঞে না।'

'বলিস্ কিরে বেটা! কাল লাঠিতে করে তুই মারিস্নি?'

'আজ্ঞে মেরেছিলাম আকালকে! দেখুন, লাঠিতে এখুনও রক্তের দাগ রইছে।'

'তাহলে স্বীকার করছিস।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি আকালকে মেরেছি।'

'আকাল! সে আবার কে?' দ্বিতীয়বারের 'আকাল' বুঝি ছোট দারোগার কানে যায়।

'ওই যে বাবু সবকিছু লোপাট করে দেয়। ভাত মুড়ি, ঘরের বৌ, জামা কাপড়।'

লোকটা ভয় পেয়ে আবোল-তাবোল বকছে। ছোট দারোগা হাসলেন। রুলের গুঁতো খেলে জ্ঞানচক্ষু খুলবে। বললেন, 'এই, নিয়ে চল বেটাকে।'

আলতার কান্না নয়, ধরা পড়ার ভয়-দুঃখ নয়, থানা যেতে যেতে দাশু ভাবছে, তাজ্জব ব্যাপার! আকালের এমন সঙ্গী সাথী আছে! তাড়া মেরেছে তাতেই তাকে কেমন করে নিয়ে যাচ্ছে, দেখ একবার!

এস ওয়াজেদ আলির গল্প

হেড মিস্ত্রি বটকৃষ্ণ পোড়েল বারবছরের অজাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল কোম্পানির কাছে। কোম্পানি হল সমীর দাস।

সমীরের দোহারা শ্যামলা চেহারা। ধুতি শার্ট পরে, চোখে চশমা, সরু করে রাখা গোঁফ। দুটো লেদ মেশিন। মস্ত একটা শেডের মধ্যে পার্টিশান করা একাংশে কারখানা। নিচে যন্ত্রাংশের ডাঁই। তারই একপাশে টেবিল সাইজ প্লাইউডের অফিস। কথা বলতে গেলে দরজা খুলে দাঁড়াতে হয়, এমনই কম পরিসর। যন্ত্রাংশ রেখে একদিক তার আবার ঢাকা। একটা আলমারিতে খাতা ফাইলপত্র। বাপের আমলের ব্যবসা। কোন উন্নতি নেই। সাইকেল থেকে স্কুটার, তার থেকে চারচাকার জন্য মাথা চুলকায় না, বৃন্দাবন মল্লিক লেনের একতলা বাড়িটাকে দোতলা করার স্বপ্ন দেখে না, ব্যবসার প্যাঁচপয়জার জানে না। খুঁজেছিল চাকরি বি কম পাশ করে। না জোটাতে পেরে বাবার ব্যবসা ধরা। একটা পাঁচবছরের মেয়ে আছে। নেশা বলতে তাস। প্রাইজও পেয়েছে কম্পিটিশনে।

অজার হাফপ্যান্টের উপর নীল সাদা ডোরা শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল,মাথায় চুল ছড়ান,টেরি নেই, শ্যামলা রোগা ধরনের ছেলে, কচি মুখে অপুষ্টির চিহ্ন।

অজার আপাদমস্তক দেখে বলেছিল, বয় তো আছে বটুদা। শম্ভু বাড়ি গিয়েছে। ফিরে আসবে। কাজ তো ছাড়েনি। একে আনলে কেন?

অজার কাজটার প্রয়োজন ছিল না। ছিল ওর মায়ের। খোঁড়া স্বামী হাওড়ার রাস্তার গর্তে একদিন অন্ধকারে পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে। তবে জি.টি রোডের ধারে ফিতে, প্ল্যাস্টিক, মগ, ছুরি, ছোট কাঁচি, হ্যারিকেনের কল, চোঙা এরকম সব সাত সতেরো জিনিস নিয়ে দোকান পাতে। লেংচে হাঁটলেও দোকান চালানয় অসুবিধা হয়নি। অসুখে পড়তে ঘরের বিছানায় সেই যে পড়ল, তারপর নড়তে চায় না। বউয়ের কথার ঝাঁটা খায়। নিজে দাঁত দেখিয়ে খ্যাক খ্যাক করে। বিড়ি ফোঁকে। ফলে অজার মাকে লোকের ঘরে বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ করতে হয়।

অজা ফোর থেকে ফাইভে গিয়ে পরপর দু-বছর ফেল। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে গুলি খেলে, ঘুড়ির পেছনে ছোটে, লোকের এটা সেটা কাজ করে দেয়। দু'বোন অরু আর পারু। অরুণা পারুল। অরুণা ক্লাস সেভেনে ফেল করে ঘরে বসে থাকে। আটা মাখে, উনুন ধরায় বেজার মুখে। ছোট পারু বই নিয়ে স্কুলে যায়।

তবে অজার প্রয়োজন না থাকলেও উৎসাহ ছিল। কারখানার বয়গিরি করবে।

পড়াশুনার অনেক ঝামেলা। মাস্টারদের বড়ই বকুনি। বয়গিরিতে পয়সা পাবে। 'বঙ্গবাসী' কিংবা 'কল্পনা'য় হিন্দি সিনেমা দেখবে। ঘুড়ি সুতো কিনতে পয়সার ভাবনা থাকবে না।

কারখানার এই শহরে, আবার খাস মধ্য হাওড়ায় বাস, অজার অপরিচয় ছিল না ক্ষুদে কারখানা আর লোহালক্কড়ের সঙ্গে। তার তো দেখা। লোহা, ফিতেয় ঘোরা ঘরকাঁপান লেদ, শেভিং ইত্যাকার মেশিনের চেহারা, বাবরির স্তুপ সে দেখেছে এ গলি সে গলিতে বিস্তর।

তবু সেদিন বটকেষ্টকাকার সঙ্গে কোম্পানির কাছে আসতে, বেলিলিয়াস রোডের বটগাছের পাশ ঘেঁষা সরু অন্ধ গলির মধ্যে দুধারে ছোট কারখানা, চলমান যন্ত্রের বিচিত্র শব্দ, তেলকালি মাখা হেডমিস্ত্রি, মিস্ত্রি, হাফ মিস্ত্রি, ভাঙা শেড, জং ধরা টিনের চাল, রাস্তা দখল করা লৌহ সামগ্রী, মেসিনের ঘর্ষণে আগুনের ফুৎকার যথেষ্ট অবাক করেছিল। বর্ষণ ধ্বস্ত শ্রাবণ। তবে আকাশের ধারাপাত ছিল না, ছিল গুমোট। বাবরি, লোহার টুকরো, জং ধরায় বৃষ্টিপাতের গন্ধ, রাস্তায় লালচে কাদায় যে তাপ এবং বাষ্প উঠছিল, তার কঠিন ঘ্রাণে বিশ্রি এক ধরণের কষ্ট এনে দিয়েছিল। কাজটা না হলে সে খুশিই হত।

কিন্তু কাজটা হয়ে যায়। শম্ভু না ফেরাতে পাকাপোক্ত। শক্ত তারের খাপে এলুমিনিয়াম গ্লাস ঝুলিয়ে চায়ের দোকান থেকে চা আনা, বটুকাকা আর হাফ মিস্ত্রি গোপালদার জন্যে মুড়ি চপ আনা, সিগারেট বিড়ি আনা, কোম্পানির ঘরে কিছু পৌঁছে দেওয়া, মালে রঙ করা, মেসিন পার্টস চটে মোড়া ইত্যাদিতে যে শুরু তা ক্রমে মেশিন ধরা, ফিতে ঠিক করা, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে হাফ মিস্ত্রি থেকে মিস্ত্রি এবং হেড মিস্ত্রি।

অজার জায়গায় অজাদা, অজিতদা, হেডমিস্ত্রি পরিচিত ঘটছে, ছ'টি কোম্পানিতে কাজ ধরে কাজ ছেড়েছে। বেলিলিয়াস রোড থেকে বেলিলিয়াস লেন, ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট কারখানাবহুল এলাকার নানান শেডে চক্কর দেওয়া হয়েছে। বার বছর থেকে বিয়াল্লিশ বছরে আসার মধ্যে দৈহিক এবং মানসিক ঢের পরিবর্তন ঘটছে, কিন্তু সেই এক ঘরে বাবা মারা গেল। ঠিকই আছে ছিটেবেড়া ঘর, টালির চাল। মাঝে ইঁট পাতা উঠোন, টানা বারান্দা ঘিরে রান্নাঘর। এক উঠানে ছ'ঘর ভাড়াটের বাস। কিছু ভাড়াটের আসা যাওয়া ঘটেছে। বস্তির চেহারার কোন বদল হয়নি। ঘরামি দিয়ে সরান হয় মাঝে মধ্যে। বদল যা ভাড়াটেদের। অনেক ঘটনা। ঝগড়াঝাটি, অসুখবিসুখ, জন্ম-মৃত্যু।

বাবা মারা গেল। দিদি অরুণা লোকের বাড়ি রান্না করতে গিয়ে প্রেম করল। ব্যাঙ্কের চাকুরে বড়ভাই। ঘরের রাঁধুনিকে বিয়ে করবে ছোটভাই, প্রখর ভাবেই শ্রেণীভেদের দুরন্ত ক্রিয়ায় প্রবল বাধাদান। কিন্তু ভাই কেলেঙ্কারি করে বসে আছে। দায়িত্ব এড়াতে চায়নি। পাড়ার ক্লাবের ধীরেনদা হেলপ করল।'দেখি

কোন শালা কী করে' বলে বিয়ের আসর। খবর ছিল সাত্যকি মস্তানকে দিয়ে হামলা করাবে। সে কী ভয় অজিতের। বিয়ে হল। তবে জামাই সমর তখন কলেজে পড়ছিল। নিজেদের বাড়ি। বড় ভাইয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে অংশ নিল। এটা সেটা কাজ করতে করতে তারপর একখানা ট্যাক্সি করে ফেলেছে। দিদি দু'ছেলে নিয়ে সুখেই আছে। আরও সুখ আসছে। বাড়িখানা নাকি এক প্রমোটার নিচ্ছে। ফ্ল্যাট হবে। হলে মোটা টাকা আর ফ্ল্যাট।

ছোটবোন পারুলও দু'ঘরের পরই পাড়ার যতীন বলে একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করে বসল। রিক্সা চালাত যতীন। তারপর স্টেশনারি দোকান করেছে বাজারের কাছে। ভালই চলে। একটা মাত্র মেয়ে। যতীনটা খুব বাজে ছেলে ছিল। এখন ভাল হয়ে গিয়েছে। মদ খায়। এ নিয়ে অশান্তি।

অজিত নিজে যে খায় না তা নয়। কিন্তু নেশা নেই। মাঝে মধ্যে। ওরকম লোহার কাজ করতে গেলে খেতেই হয়, এরকম কথা শোনা ছিল। এখন ভেবে দেখেছে, বাজে কথা। অনেকেই তো খায় না। বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে সে আস্বাদন করেছিল, বোকা বলেই। সান্ত্বনা নেশায় পড়েনি।

বিয়েটা অজিতকে করে ফেলতে হয় নেহাতই দায় উদ্ধার করতে। পাওনা গন্ডা তেমন জোটেনি। বালটিকুরি থেকে সন্ধেবেলায় এসে ধরল ছোটমামা। মাকে বলল, 'দিদি, তুমিই বাঁচাতে পার। আমার বন্ধু ফটিকের মেয়ের বিয়ের সব ঠিকঠাক। আজ বিয়ে। এদিকে বর পাড়ার একটা মেয়েকে নিয়ে ভেগে গিয়েছে। অজিতকে তুমি দাও।'

'সে কী রে। ও তো এখন বিয়ে করতে চায় না।'

'আরে বাবা, করতে তো হবেই একদিন। খুব ভাল মেয়ে। ফটিক তো মারা গিয়েছে। মেয়ে কাকার কাছে থাকে। বুঝতেই পারছ কী অবস্থায় আছে। আমি কী সাহায্য করতে পারি। নিজের ছেলে থাকলে তোমার কাছে আসতাম না।'

অজিত তখন কারখানায় বেরুনর জন্য প্রস্তুত।

মামা বলল, 'তোকে বেরুতে হবে না। কোম্পানিতে খবর দিয়ে দেব।'

শ্যামলীর গায়ের রঙ ফরশা। রোগা চেহারা হলেও চোখে মুখে লাবণ্য এবং যৌবনের প্রগাঢ় আকর্ষী লতা ছিল। বড়বড় চোখের চাউনিতে হাসির মিষ্টি তরঙ্গে, ওষ্ঠের বঙ্কিমতায়, হাঁটার ছন্দে, সুরেলা গলায়, লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে। কাকার বাড়িতে থাকা, মা বাবা না থাকা, কাকীমার ভার যন্ত্রণাজনিত ব্যবহার শ্যামলীকে তো যে কোন প্রাপ্তিই বরণীয় গোছের মানসিকতায় পৌঁছে দিয়েছিল। এ তো বিয়ে, নিজের সংসার পাওয়া। ফলে জলের যেমন যে কোন পাত্রের আকার নেওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য তেমনি বস্তিতে অজিতের ঘরে দিব্যি আকার নিয়ে নিয়েছিল।

শ্যামলী বলেছে, 'জান, আমার ভাগ্যটা খুব ভাল।'

'ভাল কেন?'

'বাঃ তোমার সঙ্গে বিয়ে হল। না হলে কোথায় পড়তাম কে জানে; আচ্ছা মামার উপর তোমার রাগ হয়নি?'

অজিত বলেছে, 'রাগ হবে কেন? বিয়ে বলে কথা। আনন্দই হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠে শুনি, আমার বিয়ে।'

বস্তুত, অজিত কেন যে ভাবেনি, প্রতিবাদ করেনি, কেন দিব্যি বর সেজেছিল তার ব্যাখা তার নিজের কাছেও নেই। পরবর্তীতেও মস্তিষ্ককে অযথা সে পীড়িত করেনি। এক নারী তার শরীর আর মন দিয়ে যেন আকাশের মত এক ঢাকনা হয়ে উঠেছিল।

শ্যামলীর ইদানীং কথাবার্তা বেড়েছে। বয়স হয়েছে তো। তা বলে অজিতের উপর যায় না। যেন নিজের শক্তি, নিজের পরিধি, নিজের বুদ্ধি সে জানে অজিতের চেয়ে ঢের ঢের কম। কিংবা আত্মসমর্পণের অভ্যাসে এরকম ধারণাকে সে অটল করে রেখেছে।

বেলিলিয়াস রোডের উপর চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে অজিতকে বিড়ি ধরিয়ে নিজের জীবন-পঞ্জী খুলতে হচ্ছে আজ। নইলে কে আর ভাবে। দীর্ঘ বৎসরগুলির পরতে পরতে বহু ঘটনা। কিছু বিস্মরণে কিছু স্মৃতিতে।

অজিতের মধ্যে বরাবরই এক ধরণের নির্লিপ্ততা, নির্বিকারত্ব আছে। জীবন প্রবাহে ভাসমানতায় সে বিশেষ কৃৎকৌশলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। চোখের সামনেই মিস্ত্রি থেকে লেদ কিনে একসঙ্গে কাজ করা একাধিক মানুষকে মালিক হতে দেখেছে। বড় কোম্পানিতে চলে যাওয়া দেখেছে। শ্রমিক ইউনিয়নে নিজেকে নিয়ে আখের গোছাতে দেখেছে। নিজের ব্যাপারে 'কই আর হল', 'কোথায় আর পারলাম', 'ভাগ্য নেই' গোছের সান্ত্বনা শুধু।

অজিত হাওড়ার লৌহ শিল্প, একদার শেফিল্ড, ভারতজোড়া খ্যাতি, এ ব্যবসাতেই গাড়িবাড়ি সমৃদ্ধি, শ্রমিকের অপরিবর্তনীয় অবস্থা, শিশু শ্রমিক সমস্যা, আন্দোলন, মিছিল, ইউনিয়ন, শ্রমিক স্বার্থ, শ্রমিক উন্নয়ন, ক্রমে ক্রমে বৎসর অতিক্রান্তির সঙ্গে ইতিহাসের নতুন লেখার যে ক্রমাবনতি, বস্তি ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কারখানার স্থিতি, প্রতিযোগিতার বহর, অন্যপ্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা, ছোট মালিকানার নাভিশ্বাস নানা রকম অজস্রতায় একজন শরিক তো বটে। না ভাবলেও তার তরঙ্গাঘাত এবং কিছু প্রলেপ তো ধারণ করতেই হয়েছে। এ সবকিছুর সাক্ষ্যচিহ্ন তার মধ্যে আছে।

বড় ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। ছোট নাইনে পড়ে। দুটি ছেলে, মেয়ে নেই। শ্যামলী খুবই সহনশীল। বিছানার চাদর, তেল নুন মশলা, দুধ, পুঁইশাক, চারামাছ, টক ঝাল অম্বল নিয়ে ব্যস্ত। ছেলে দুটিকে নিয়ে অহঙ্কার আছে।

অজিত নীরবে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। খাটো ধুতির উপর নীল রঙ শার্ট, মুখে খোঁচা দাড়ি গোঁফ। কামানোর কথা ছিল, কামান হয়নি। পায়ে নিউ কাট। পাকিস্থানের কার্গিল সেকটারে সীমানা অতিক্রমণে অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা না বিশ্বকাপ

ক্রিকেট, দ্বিতীয়টিতেই মনে হয় জনমানস আক্রান্ত বেশী। সৌরভ পূজা, শচীন বন্দনা, আজাহার নিপাত, রান, বোলিং, দাদা কত হল, অফিসে শূন্য চেয়ার এসব নিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে। বড় ছেলের জন্য টি ভি কিনতে হয়েছে। তাতেও সুখ নেই। কেবল লাইন নেই, রঙীনও নয়।

অজিত এ সবের কোন একটা কারণে চিন্তিত হলে কিংবা এ সব কী হচ্ছে দেশটা কী হবে গোছের জাতীয়তা বোধে ভাবনাক্রান্ত হলে কথা ছিল না। ভাবনাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। জীবনপঞ্জীর পাতা তাকে তার ফলেই উল্টে যেতে হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সাধারণ কিছু কথা হয়েছে।

'শুনছ।'

'বল। কী হয়েছে।'

'বাসনা বলছিল ওর ছেলেটার কথা।'

'বাসনা কে?'

'ওমা, চেন না? বিমল—।'

'আচ্ছা, কী বলছিল? বিমলটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কাজে যায় না। মদে বোধহয় আজকাল হচ্ছে না, হেরোয়িনও খায়।

'কী রকম চেহারা হয়েছে দেখেছ। অথচ চাকরি করত অত বড় বিস্কুট কোম্পানিতে। বন্ধ হয়ে গেল। জান বাসনাকে মারেও।'

'তাহলে তো মেয়েটার খুব কষ্ট।'

'হ্যাঁ, আমার কাছে এসে কাঁদছিল। তিন মাস ঘর ভাড়া দিতে পারে নি।'

'একটাই তো ছেলে। মেয়ে—।'

'হ্যাঁ, আবার মেয়েটা হয়েছে।'

'কোন্ বাড়িতে যেন কাজ করে!'

'ওটা আছে বলে চলে যাচ্ছে। তাতে আবার মাতালটা এসে ভাগ বসায়। চোটপাট করে। আমি দু'টো রুটি দিলাম। কিছুতেই খেতে চায় না।'

অজিত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তার পরেই মনে পড়তে বলেছে, 'কী যেন তুমি বলছিলে।'

'ওর ছেলেটার কথা। তোমাদের কোম্পানিতে তো বয় নেয়।'

'ছেলেটা ত স্কুলে পড়ে।'

'আর পড়া। খেতে পায় না। বাসনা বলছিল, চায়ের দোকানে লাগানর চেয়ে তো বৌদি কারখানায় ভাল। পরে দাদার মত মিস্ত্রি হবে।'

'আমার মত। আমার মত হতে চাইছে।'

অজিত তারপরই নীরব। অজিতের তারপরই মস্তিষ্কে ঘনঘন অদৃশ্য কোন হাতুড়ির আঘাত। অজিতের তারপরেই প্রতিবাদের মুষ্ঠি পাকান উদ্ধত হাত। সবই ভেতরে। নিরুত্তর সে যেন কুঁকড়ে গিয়েছিল।

কারখানা থেকে ফেরার পর কিছুটা বিশ্রাম। তারপর রাত্রিবেলায় শ্যামলী

রুটি, কুমড়ো আলুর তরকারি, অল্প গুড় স্টিলের থালায় এগিয়ে দেয়। টি. ভি-তে ভারত পাকিস্থান ক্রিকেট। তুমুল শব্দ, হৃৎপিণ্ড ফাটা উত্তেজনা।

'হ্যাঁগো, কোম্পানিকে বলেছিলে?'

'কি?'

'বারে বাসনার ছেলেটার জন্যে বললাম।'

'ও এখন বাচ্চা। শিশু শ্রমিক রাখা বে-আইনী।'

'কী যে বল। কত ছোট ছেলে কাজ করছে কত জায়গায়।'

'আমি জানি না।'

রাগ হয়ে যায় অজিতের। সে ভেবে পায় না রেশনের গমের দোষ, না ভাঙানর, না রুটি বানানোর কে জানে। চিমড়ে হয়ে গিয়েছে। ছিঁড়তে কষ্ট। ইস্ কুমড়োর তরকারিতে এত নুন দেয়।

'তার মানে করে দেবে না।'

'আমাদের বয় একটা আছে।'

'থাক্ না। হপ্তায় দশ টাকা দিলেই হবে। ছেলেটা ভাল গো।'

'তার জন্যে ওর সর্বনাশ চাইছ।'

অজিত গোনাগুনতি পাঁচটা রুটি খায়। দুটো পড়ে রইল।

'এ কী খেলে না। আর একটু তরকারি দেব?'

'খিদে নেই।' অজিত গুড় চেটে নিয়ে জল খেয়ে উঠে পড়ল।

বিশ্বকাপ ক্রিকেট পাওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকলেও ভারত জিতে গিয়েছে। তুমুল হট্টগোল ঘরে বাইরে। বাজি পটকা। কার্গিলে অনুপ্রবেশ, জেনিভা সম্মেলনে যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে ব্যবহারিক দিকটায় যে আন্তজার্তিক সিদ্ধান্ত, তার অমর্যাদা অগ্রাহ্য, ভারতীয় সৈনিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার যে হয়েছে, এ কী সেই প্রতিশোধের উল্লাস। প্রতিশোধ মহাপুরুষ কথিত অতি ন্যাক্কারজনক ব্যাপার। এর চরিত্র এবং কর্মপদ্ধতি বড়ই ঘোলাটে। আমার লেজ কেটেছে হাত পা বেঁধে খুঁচিয়েছে। তোমার লেজ পাইনি বলে থুথু ছিটোলাম তোমার মুখে, নাকি স্রেফ মিডিয়া উত্থিত উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া, লেজ কাটার যন্ত্রণাই নেই।

• অজিত এমনটি, ঠিক এমনই ব্যবহৃত শব্দকে মস্তিষ্কে এনে নিশ্চয়ই ভাবছিল না। তবে এ রকমটি সে এখন ভাবতেই শিখেছে।

শ্যামলী আবার ধরল পরদিন। এবার গলায় তার ক্ষোভ, 'তুমি তো বাসনার ছেলেটার ব্যবস্থা করলে না। বুঝলে করে দেবার লোকের অভাব নেই। মাঝখান থেকে আমরা ওর কাছে ছোট হয়ে গেলাম। কত বৌদি বৌদি করে।'

'ছেলেটা ঢুকে গেল কোথাও কারখানায়?'

'আজ তো বলে গেল, বউদি দাদা বোধহয় বলবে না। আমি বললাম, তুমি একবার বল তার উত্তরে বললে, তুমিই বলাতে যখন হল না, তখন আমি বললে কী হবে। আমার ভাগ্যি! জান, গোপার মা বলল, শম্ভু নাকি করে

দেবে। হলে আমাদের মুখে ঝামা ঘষা যাবে।'

'ঝামা ঘষা কেন?'

শ্যামলী রেগে যায়, 'কেন তুমি পারতে না? এতদিন মিস্ত্রিগিরি করছ। একজনের উপকার হত।'

উপকার কী না এটা অজিতের মাথায় টক্কর দেয়। উপকার এবং শ্যামলীর সম্মান, বাসনার কাছে না বলাটা কী অসঙ্গত হবে না। কিন্তু বিল্টু যে রয়েছে।

কারখানায় ঢোকার আগে পাশের সাহা এন্টারপ্রাইজের গজেন সাহা স্কুটার নিয়ে দাঁড়ায়। ওর মিস্ত্রি জগাই আর সুব্রত এখনও আসেনি। গজেন কোম্পানি। প্যান্ট-শার্ট ফোলা গাল কালো চেহারা।

'জগাইদা কিছু বলেছে?'

'আমাকে? অজিত প্রশ্নটা করেই উত্তর, 'না তো'।

'আপনি নাকি একটা বয় দিতে পারেন।'

বয়। জগাই বাসনার ছেলেটার কথা বলেছিল! মনে পড়ে না।

'হ্যাঁ। কিন্তু পানু তো রয়েছে আপনার!'

'পানু একটা মোটর গ্যারেজে লেগে গিয়েছে। কাল থেকে তো আসছে না। ছেলেটাকে আনুন তো। পারলে আজই।'

রাতে প্রচুর বৃষ্টি। সকালে বেলিলিয়াস লেন ঘোলাটে নোংরা নর্দমার কাদামাটি, হাবিজাবি আবর্জনা, কী নেই পরিত্যক্ত বস্তু—একেবারে নদী। সাইকেল কী একটা গাড়ি গেলে দিব্যি তরঙ্গ খেলে। আকাশে মেঘ, যে কোন সময় গা ঝরানি শুরু হতে পারে।

অজিতের এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে হাওয়াই চপ্পল। সঙ্গে বাসনার ছেলে। বুক খোলা শার্ট, প্যান্ট, হাতে হাওয়াই। উসকোখুসকো চুল, কচি নরম মুখ। কত বয়স! ওই এগার বার বছর হবে। নোংরা জলে হাঁটার মধ্যে ওর যেন মজার ঝিকঝিকানি চোখে মুখে।

কারখানার সামনে এসে অজিতের মনে পড়ে গেল। বলল, 'এই দেখ, তোর নামটাই যে জানা হয়নি। কি নাম তোর?'

ছেলেটা বলল, 'অজা।'

আক্রান্ত

কালো খাসিটা খুঁজতে জামপুকুরের পশ্চিমপাড়ে উঠে দশরথের চোখে পড়ে কেতু আসছে। বেঁটে খাটো কালো শক্ত চেহারা। পাজামার উপর নক্সাদার পাঞ্জাবি। জৈষ্ঠ্যের বিকেল। দীর্ঘ, তাপদগ্ধ। শনশনে রাগী বাতাসে গাছগুলো মাথা নাড়া দিচ্ছে। ঘেঁষাঘেষি নিম, খেলকদম, অর্জুন, বাঁশবন, গোটা কয় খেজুর। খৈপুর যাবার রাস্তাটা এ সব চিরে অপ্রশস্ত সরলরেখায় বেরিয়ে গিয়েছে। কেতু ওই পথ ধরে আসছে। খৈপুর গিয়েছিল নিশ্চয়। পঞ্চায়েত সদস্য বল্লভের বাড়ি। তুখোড় সদস্য বল্লভমাস্টার। কেতুর দাদা। মায়ের পেটের নয়, জাতও নয়, রাজনীতির দাদা। দাদাই ইদানীং কেতুকে সাঙ্ঘাতিক করে তুলেছে। বোমা বানাতে, ছুরি মারতে পিস্তল চালাতে হাত কাঁপে না। বিপক্ষ প্রভাকর দাসের দলও কিছু কম নয়। গুলি চালিয়েছিল সন্ধেবেলায়। পরশুই তো তাড়া করেছিল কেতুকে। ছুটে খৈপুরে মুচিঘরে ভাগ্যিস ঢুকে পড়েছিল। তিনু মুচি বল্লভমাস্টারের সমর্থক।

খৈপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রচন্ডরকমের উষ্ণ ইদানীং। দু-দুটো খুন হয়ে গিয়েছে। অস্থির অগ্নিগোলক যখন তখন দাপিয়ে বেড়ায়। স্থানীয় থানার দারোগা সাপ এবং ব্যাঙের মুখে চমৎকার চুমু খেতে পারে। অর্থ বিনিময়ে অগ্নিগোলকগুলিকে তোয়াজ এবং প্রজ্বলনের ইন্ধন দানে তার কার্পণ্য নেই।

খাসিটার ভাবনা ছেড়ে দশরথের মাথায় দ্রুত আসে কেতুর ভাবনা। ছোট থেকে তাদের বাড়িতে আসা যাওয়া। বড়ছেলে অধীরের বন্ধু। মাধ্যমিক পাস করেছে দ্বিতীয় বিভাগে। বাপের জমিজায়গা পুকুর রয়েছে। কাকা প্রাইমারী মাস্টার। ভাগাভাগি হয় নি। কোথা থেকে কী হয়ে যায়। মানবচরিত্রের তল খুঁজে পাওয়া যায় না।

কেতুর জন্য দশরথের ভাবনা হয়। সে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। ভীতু। ঝগড়া বিবাদ ঝামেলায় থাকে না। রোগা চেহারায় সাহসশক্তির পরিমাণও কম। টাকমাথা হলেও অল্পে উষ্ণ হয় না। ছোট চোখের নজর সর্বত্রই চলে, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া নেই। একটু ছোট হয়ে, সামান্য ক্ষতি স্বীকার করে সে সংসারযাত্রাকে নিরঙ্কুশ রাখতে সব সময়ই সচেষ্ট। এক ছেলে তিন মেয়ে। ছেলে বড়। দু'মেয়ের বিয়ে দিলেই হয়। বড়মেয়ে তুলসীর প্রেমিক এই কেতু। অধীরের কাছে বন্ধু হিসাবে যাতায়াতের মধ্যে প্রণয়। তুলসীর মায়ের এতে পূর্ণ সমর্থন ছিল। তার ছিল না, এমন কথা নয়। বিয়ে মানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার। কেতু উদ্ধার করলে সে বেঁচে যায়। হ্যাঁ, আগের কেতু সম্পর্কে তার এ ভাবনা। কিন্তু বর্তমানের কেতু!

অধীর বন্ধুত্ব ফিকে করেছে। কিন্তু কেতুর যাতায়াত বন্ধ হয় নি। কেতুর বর্তমান কার্যাবলিও তুলসীর মায়ের কাছে কোন গুরুত্ব পায় না। গ্রামীণ আবহাওয়ায় বোমা, পিস্তল, ছোরাছুরি, টাঙি, ভোজালি, খুনজখম, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি যেন জলভাত। গতকালই ছুটতে ছুটতে এসে ছোট মেয়ে আনু চোখ বড় বড় করে বলল, 'ওমা, বাঁশঝাড়ের মধ্যে গড়ের বেলগাছের কাছে গো, কেতুদা চারটে বোমা পুঁতে রাখলেক।' তুলসী স্নান সেরে উঠানে কাপ'ড় শুকুতে দিচ্ছিল। ধমকানির মত করে বলল, 'তুমি যেন আবার কাউকে বলতে যেও না। পেটে ত কথা থাকে না।'। অল্প পরে কেতু আসতে তুলসীর মা আপ্যায়ন জানাল, 'এস বাবা, ও তুলসী তোর কেতুদাকে এক কাপ চা করে দে।'

অধীর বন্ধুত্ব ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রেম কি ফেরান যায় না? তুলসী ফিরিয়ে নিতে পারে না।

কাল বল্লভপুরের হাট। পাঁচমাইল দূরে খাসিটাকে ধরে হাটে তুলে দিতে পারে। ভয় সেখানেই। কেজি দশেক মাংস হবে। বিক্রি করব করব করে করা হচ্ছে না। আর বাগাল ছেলেটাও হয়েছে এক ভোঁদড়। আটটা ছাগল, একজোড়া বলদ, চারটে গাই বকনা—তা সামাল দিতে পারে না।

দশরথ বিরক্ত বোধ করে। ঘুরে ঘুরে কপালে বগলে ঘাম জমে গেল। বিড় বিড় করে ঘামাচি। চোখ আঁতিপাঁতি খুঁজছে। পুকুরের ওদিকে বাগ্দীপাড়া। দেখে আসবে একবার। তার মধ্যে পাড়ের পিছকোল ঘেঁষা পথে কেতু এগিয়ে আসে। ঝুঁকে থাকা শ্যাওড়াগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বলে, 'কী করছ কাকা?'

'কালো খাসিটা পেছি না।'

'দেখ কোথাও থাকবে—যাবে কোথা। বাগালট' গেল কোথা?'

'ও হারামজাদাকেও খুঁজতে পাঠিয়েছি।'

বাগাল শুধু নয়, দু'মেয়েও বেরিয়েছে। গত সপ্তাহে একটা বকনা বেপাত্তা হয়েছে গোপী পালের। হদিস্ এখনও মেলেনি। দিন পনের আগে একটা পাঁঠা হারায় বানুজ্জেদের। হাঁস আর মুরগী তো যাচ্ছেই। মদের চাট করতে লাগে। জন্তুগুলোতো বেমালুম উড়ে যেতে পারে না। মানুষের হাতই টেনে নিয়ে যায়।

সন্ধে গড়িয়ে গেল। খাসিটার খোঁজ পাওয়া গেল না। দশরথের মত দুই মেয়ে, বাগালও ক্লান্ত হয়ে ফিরেছে। দাওয়ায় বসে আছে দশরথ। রান্নাঘরে তুলসীর মা। সবাই শোকস্তব্ধ। বিদ্যুৎ এসেছে গাঁয়ে। দশরথের ঘরেও তার আলো। তবে সন্ধ্যে থেকে ঝরে-পড়া জ্যোৎস্নায় সারা উঠোন ভরে আছে।

ওদিকে পেয়ারাগাছের কাছে তুলসী কেতুর সঙ্গে গল্প করছে। খাসি হারানোর শোক তুলসীর নেই। সে এখন প্রেমমুখর। কেতুর জন্য বড় ভাবনা তার। বারবার বলে, সাবধানে থেকো। অনেকক্ষণ থেকেই চলে যেতে বলছে। কিন্তু কথার শেষ নেই কেতুর, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না প্রেমিকাকে। তুলসীর

এতে আহ্লাদ কম নয়। কেতুকে ছাড়তে তারও শরীর মন কোনটাই রাজী নয়। রাত হচ্ছে বলে কেতু আক্রান্ত হতে পারে, এমন ভয় তার থাকলেও সে জানে, তাদের ঘরের বাইরে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে ওর সঙ্গী কালী, দাশু, ফটিক, নিখিল।

কেতু বারবার দাওয়ার দিকে তাকাচ্ছে। পেয়ারাতলার আর একটু ওপাশে গেলে এ দিককার ঘরের আড়ালে পড়ে। কেতুর ইচ্ছে তুলসী সরে এলেই সে জাপটে চুমু খাবে। মেয়ে তা জানে। আগ্রহও আছে। সময়পাত করছে। জ্যোৎস্নায় রুপোলী টিপপরা তুলসীর যুবতী মুখ ভাসছে জলের উপর পদ্মের মত। পাউডারের সুগন্ধ যুঁইয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। টকটকে লাল ছাপা শাড়ি, লাল ব্লাউজ। গলায় রূপোর হার। শরীরে যৌবনের ডাক একটু বেশি মাত্রায়। চাপা নাক, পুরু ঠোঁটের অসৌন্দর্য শরীরের গঠন এবং যৌবনের উগ্রতায় স্বচ্ছন্দে হারিয়ে গিয়েছে।

'একটু ও দিকে সরে এস।'

'না। সব সময় অসভ্যতা।'

'টেনে নিয়ে যাব।'

'মুরোদ কত!'

'দেখবে।'

কৃত্রিম আতঙ্কে ঝলমলিয়ে ওঠে তুলসী, 'না। না। কিন্তু একবার মাত্র।' বলতে বলতে সরে আসে। কেতু হামল পড়ে তুলসীর উপর। ছটফট করে তুলসী, 'ছাড়। ছাড়। এমা উঃ লাগছে, এই কেতুদা।'

ওদিক থেকে আনু ডাকে, 'ও কেতুদা একবার শুনে যাও।' তারপর কেতু দাওয়ায় কাছাকাছি আসতে বলে, 'খাসিটা পেলাম নাই, তুমি একটু দেখে দাও।'

মেজ মেয়ে করবী শাড়ি পরে। ঘরের ওদিককার জানলায় দাঁড়িয়ে সে কেতুদার সঙ্গে দিদির প্রেম দেখছিল। এখন বাইরে এসেছে। বলল, 'নিশ্চয়ই কেউ বেঁধে রেখেছে।'

কেতু বলল, 'সে তো বটেই। কিন্তু ঘরে ঘরে তো হাতড়ানো যায় না।'

দশরথ বলল, 'কাল নিশ্চয়ই হাটে পাঠাবে। কেতু তোমার অনেক লোকজন বাবা। নজর রাখলেই ধরা পড়ে যাবে।'

আনু বলল, 'ও কেতুদা তুমি একটু খাটলেই খাসিটা আমার পাব।'

কেতু বলল, 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব! গাঁয়ের যা অবস্থা, এ নিয়ে না কেলেঙ্কারি হয়।'

তুলসী ওদিক থেকে গোছগাছ হয়ে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি আবার যেন ঝামেলা পাকিয়ো না এ নিয়ে।'

কেতু উত্তর দিল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরের দিন সকাল থেকে আবার খোঁজ করা হল। কিন্তু খাসির পাত্তা মিলল না। বিকেলের মুখে মৃদু বৃষ্টির সঙ্গে কালবৈশাখী হামলা করে গেল। আবহাওয়ার

পরিবর্তন ঘটল। দিনের তাপ মুছে বাতাসে মোলায়েম ঠান্ডা ভাব। তবে দশরথের সংসারে খাসির শোক মুছল না।

দশরথ দিব্যি দিনপাত করে। গাঁয়ের উত্তেজনার মধ্যে তার জীবনযাপন খুবই শান্ত। মারামারি খুনোখুনিকে সে ভয়ও করে যথেষ্ট! কখনও কখনও তার গ্রাম প্রসঙ্গে ভাবনাও হয়। উগ্রতা সুস্থ জীবনযাপনের পরিপন্থী। সে ভেবে পায় না, মানুষ কেন মানুষকে আক্রমণ করে। ছোরাছুরির বোমাবাজির প্রয়োজনই বা কেন ঘটে। কত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই না মারামারি হয়ে যাচ্ছে গাঁয়ে। মোষ চান করাতে বড়পুকুরে নামিয়েছিল কালু ঘোষ। উঠোনে ওর বোমা পড়ল। মাঝরাতে এরই প্রতিশোধমূলক বোমাটি ফাটল হারানের উঠোনে। পুকুরকাটা নিয়ে দুই পঞ্চায়েত সদস্যের অনুগামীরা টাঙি বের করল। এ সবে দশরথের গায়ে তাপ লাগে না। বড়ছেলে অধীর কলেজ হোস্টেলে থাকে। কোন ঝামেলায় গাঁয়ে এলেও থাকে না। কিন্তু খাসি লোপাট হওয়া তাকে যে ভাবনায় ফেলে! এ কী নিছকই চুরি? না কী তার শত্রু কেউ দাঁড়াল? কেতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফল কী এটা?

সন্ধেবেলায় পুকুরের দিকে গিয়েছিল দশরথ। ফেরার পথে ইটভাটার কাছে চাঁদু ধরল। প্রভাকর দাসের একনম্বর সাগরেদ। কেতুদের বিপক্ষে। বোমাবাজিতে ইদানীং ওস্তাদ। রোগা লিকলিকে চেহারা। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান।

'কাকা খাসিটা পেলে না তো! পাবে কোথা থেকে হাটে যে চালান হয়ে গেল তোমার খাসি!'

দশরথ বলল, 'বল কী! তুমি দেখলে, ধরলে না?'

'ধরলে খুনোখুনি হয়ে যেত। তবে ওসবকে ভয় করি না। শেষকালে দেখতাম তুমিও আমার বিপক্ষে। উল্টে বাঁশ নিতে হত আমাকে। তাই দেখেও চোখ বন্ধ করতে হয়েছে।'

দশরথ আবছায়ায় দেখতে পাচ্ছিল না চাঁদুকে। লুঙ্গির উপর স্যান্ডো গেঞ্জি। বলল, 'চোর ধরে দিতে আর তোমার বিপক্ষে যেতাম। বল কী!'

'গাঁয়ে চোর যে কে তা তো জান। জান না?'

'চাঁদু তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'তোমাদের সঙ্গে ত আবার ভাবসাব। নিত্য সন্ধেবেলা ঘরে যাওয়া। কেতুর কথা বলছি। কেতু খাসিটা ধরিয়েছিল অজাকে দিয়ে। কালু শেখের কাছে হাটে বিক্রি করেছে। খবর নিলেই জানতে পারবে! বুঝলে কাকা তোমরাই দায়ী। কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না। গায়ে মেখে দিব্যি বসে থাকবে। গাঁয়ে তো অর্ধেক লোকই ওরকম। যতই খোঁচাখুঁচি করুক, রা কাড়ে না। ভেড়ারও অধম। গায়ের মাংস খাবলে নিলেও কুঁই কুঁই করবে।' চাঁদু বিদ্রূপে ঝলসে ওঠে। বলে, 'পারবে। পারবে এর প্রতিবাদ করতে?'

দশরথ আকাশ থেকে পড়ে। কেতু চরিত্র তার অজ্ঞাত নয়। তা বলে

প্রেমিকার বাপ, ভাবী শ্বশুরের জিনিষে হাত দিতে পারে। আবছায়া কেটে জ্যোৎস্না উঠেছে। মেঘ ঘোরাঘুরি করছে আকাশে। ফাঁক ফোঁকরে আলোর বিন্দু নক্ষত্র। পুকুরের ওধারে একটা টর্চ জোরালো ছটা মেরে হাঁটছে।

'কী হল, চুপ মেরে গেলে যে কাকা।'

'না, চুপ করার কী আছে। ভাবছি, কেতু এমন কাজ করতে পারল!'

'ও কী আর মানুষ আছে। মদে আর বল্লভের ট্রেনিংয়ে জন্তু।'

চাঁদু নিজেও কম জন্তু নয়। খুনের কেসে ঝুলছে। প্রভাকর দাসের ফ্রেন্ড্। কেতুর শত্রু বলে কী দোষটা ওর ঘাড়ে চাপাচ্ছে।

'তোমার বিশ্বাস না হয় কালু শেখের কাছে যেতে পার। ও পরিষ্কার বলে দেবে। ভয় করে না তোমাদের কেতুকে। যাবে নাকি! বলতো সঙ্গে যাই। অজাও বলে দেবে, কেতু ধরতে বলেছিল। কী বিশ্বাস হল!'

'না। না। তোমাকে অবিশ্বাসের কি আছে?'

'তাহলে প্রতিবাদ কর। আমরা তোমার পিছনে আছি।'

দশরথ নীরব হয়ে থাকে! তার স্বভাবজ শান্তি নাড়া খেয়েছে। সে অনুভব করে, খাসির জন্যে তার প্রতিবাদ করা দরকার। তুলসীর সঙ্গে কেতুর বিয়েতে অমতটাও এখন শক্ত হয়ে উঠতে চায়। তবে কী না চাঁদুদের সঙ্গে যোগ দেওয়াটায় তার সায় নেই।

'দেখি ভেবে চাঁদু।'

চাঁদু বিদ্রুপের হাসি হাসে, 'এর জন্য ভাবতে হবে! আমারই বলা ভুল হয়েছে, কেতু তো দু-দিন পরে তোমার ঘরের জামাই হবে।'

দশরথ দিব্যি হজম করে নেয়। ঘরের দিকে হাঁটে।

পেয়ারাতলায় কেতু তুলসী হাসাহাসি করছে। দশরথের গায়ে জ্বালা ধরে। বারান্দার আলোয় মেয়ে পড়তে বসেছে। করবী রুটি বেলছে রান্নাঘরে। ওদের মা উনুনের সামনে।

দশরথ ডাক দিল, 'কেতু, এদিকে এস ত একবার।' আসতেই বলল, 'কালো খাসিটাকে ত পেলম নাই।'

'গাঁ এমন হয়েছে কাকা—।' ঘাড় ঘুরিয়ে কেতু পেয়ারাতলা দেখে। তুলসী দাঁড়িয়ে আছে। কেতুর গায়ে লাল কালো ডোরা গেঞ্জি, পাজামা।

'তুমি আজ হাটে গেইছিলে?'

'কেনে বল দেখি!' কেতু চমক খেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'হাটে খাসিট কালু শেখের কাছে বিক্রি হয়েছে।'

কেতু বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'তাই নাকি?'

দশরথ বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলে, 'তাই নাকি বলছ কেন? তুমি সব জান। বিক্রি করে টাকাটা নিয়েছ তুমি! ছিঃ ছিঃ তুমি যে এমন করবে ভাবি নি।'

'কী বলছ কাকা?' কেতু টলমল করতে করতে এখন শক্ত মাটি যেন

আঁকড়ে ধরল। বলল, 'আমাকে তুমি সন্দেহ করছ?'

'সন্দেহ কী! এ তো সত্যি। সাক্ষী চাই?'

কেতুর মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। বলল, 'তুমি আমাকে চোর বলছ!'

তুলসী ওদিক থেকে এগিয়ে এল, 'কী হল! কী হল কেতুদা।'

রান্নাঘর থেকে ছুটে এল তুলসীর মা। মেয়েরা পাশাপাশি দাঁড়াল।

'কালু শেখের কাছে গেলেই জানা যাবে।'

'কাকা এখনও তোমাকে সম্মান দিয়ে কথা বলছি।'

'তুমি অত রেগে যাচ্ছ কেন কেতু।' দশরথ যেন জালে বেষ্টন করে ফেলেছে শিকার। বলল, 'না যদি তুমি বেচে থাক, সে তো কালুই বলে দেবে।'

'সে তো বলবেই। আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছি মানে উত্তর দিয়ে যাও।'

'তুমি কী আমাকে বেঁধে রাখবে নাকি। কোন প্রমাণ আছে?

'আছে বৈকী।'

তুলসীর মা গায়ের আঁচল সামলে কাতর গলায় বলল, 'ও বাবা কেতু, রাগ করো না। হল কী! কী বললে তুমি কেতুকে?'

'খাসিটা চুরি করে নাকি আমি বেচেছি।' কেতু চেঁচিয়ে উঠল।

আনু বলল, 'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।'

তুলসী চেঁচিয়ে উঠল, 'আনু, তোর মুখ ভেঙে দেব।'

'ওঃ কত মুরোদ!'

দশরথ বলল, 'কেতু, কত টাকাতে বিক্রি হল খাসিটা?'

কেতুর চোখের তারা ছিটকে এল। ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'কাকা, সামলে।'

'ভয় দেখিও না কেতু। বলে ফেল। আর টাকাটা দাও।'

তুলসীর মা হাউ মাউ করে উঠল, 'কোথা যাব গো। ও বাবা কেতু, ওই মানুষটার কথাতে রাগ করো না বাবা।'

'তুমি এসব কথাতে থাকছ কেন? কেতু, টাকাটা দিয়ে দাও।'

তুলসী সামনে এগিয়ে এল, 'বাবা তুমি বাড়াবাড়ি করছ।'

তুলসীর মা চেঁচাল। তার সঙ্গে কেতুর আস্ফালন। জ্যোৎস্নাময় উঠোনের মধ্যে উত্তেজিত স্বর, চেঁচানি শুনে পড়শীরা উঁকি বাড়াতে এল। সদর্পে কেতু ঘোষণা করে গেল, এর প্রতিশোধ নেবে সে। তুলসী ধরতে গেল কেতুকে। এক ধাক্কা নিয়ে বেরিয়ে গেল কেতু।

কেতু চলে গেলেও উঠোনের চেঁচামেচি কমল না। দশরথ একা। ছোট মেয়ে আনু কেবল নীরব। বাকী তার বিপক্ষে। সকলেই কেতুর প্রতিশোধ ঘোষণায় শঙ্কিত। তুলসীর রাগ সবচেয়ে বেশি।

নিজে কম উত্তেজিত নয় দশরথ। গা ঘামছে। সে কোন উত্তর দিচ্ছে না। ওদের কথার বাণ তার গায়ে লেগে টুপটাপ খসে যাচ্ছে। ঘেঁষাঘেঁষি সব বাড়ি।

কিন্তু পড়শীরা দরজার গোড়া থেকে উঁকি বাড়ান কিংবা দূর থেকে কান পেতে থাকার মধ্যেই অধিকার সীমাবদ্ধ রেখেছে। কেতু মাঝখানে। অগ্নিগোলক ঘুরতে ঘুরতে তাদের উপর আঘাত হানতে পারে।

তুলসীর মা আঁচল লুটিয়ে চেঁচিয়ে ক্লান্ত হয়ে বলল, 'তোমার লেগে ছেলেট তুলসীকে বিয়ে করবে না।'

'অমন ছেলেকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি নিয়ে মরা ভাল, বুঝেছ।'

তুলসী বলল, 'আমার সর্বনাশ ত করলে, আবার টানা হেঁচড়া কেন?'

দশরথ বলল, 'সর্বনাশ কী রে! কেতুটা চোর, খুনেরা, বোমাবাজ। বরঞ্চ ভাল হল, হারামজাদা এ ঘরে পা দেবে না।'

'তোমাকে ছেড়ে দেবে ভাবছ?' সাপিনীর মত হিস্‌হিস্‌ করল তুলসী।

'কী করবে, মারবে?'

তুলসীর মা বলল, 'তোমার কী হল! তুমি ত এরকম লোক লও।'

দশরথ নিজেও বুঝে উঠতে পারছে না। কথাগুলো যে তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে তাতে সে নিজেও তাজ্জব। জল নিয়ে প্রকাশদের সঙ্গে ঝগড়া করল। দোষ প্রকাশদেরই। তা সত্ত্বেও সে কথা শোনাতে পারল না। ভাগের পুকুরে মাছ ধরলেও সে এগিয়ে যায় না। গ্রাম্যবিবাদে সে মাথাটা শুধু গিরগিটির মত নাড়ে। শব্দ বের করে না। আন্দোলিত মাথার ভাষা বড়ই জটিল। সে কিনা একটা খাসির জন্যে অমন সাংঘাতিক ছোকরা কেতুর সঙ্গে লড়ে গেল। তবে লড়ার পর ত' স্ফূর্তি লাগছে। শঙ্কা জাগছে না। মনে হচ্ছে জন্তুটার গলা টিপতে পেরেছে। তুলসী তার বড় মেয়ে। বড় আদরের। তাহলে খাসি নয়, তুলসীকে বাঁচানোর জন্যে সে কী কেতুর উপর ঝাঁপাল?

রাত বাড়ল। জ্যোৎস্না গাঢ় হল আরও। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে। আকাশে আর নক্ষত্র মেলার ঠাঁই নেই। সন্ধের উত্তেজনা ঢের প্রশমিত।

তুলসীর মা বলল, 'কাল সকালে কেতুকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তুমি দোষ স্বীকার করে লিবে।'

'দোষ? আমার আবার কী দোষ?'

'বলবে, তুমি ভুল করেছ।'

'ভুল কোথা! কেতু যে খাসিটা ধরে বিক্রি করেছে। বুঝতে পারলে না ওর কথা শুনে। আশ্চর্য।'

'করুক।' তুলসীর মা মাথা ঝাঁকাল, 'কত দাম তুমার খাসির! মেয়েটকে বিয়ে করলে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা বাঁচবেক। মেয়ে তুমার কাঁদছেক।'

'কাঁদুক। ও বোকা। তুমি ত জান ছুট থেকে ওর মাথাতে কিছু নাই। ফোর পর্যন্ত পড়া হল না।'

'কেতুকে উ ভালবাসে।'

'ভালবাসা না ছাই।' দশরথ মুখ বেঁকাল, 'বুঝলে, তোমার লাই পেয়ে

ছোঁড়া এসে স্ফূর্তি করে যায় তোমার মেয়েকে লিয়ে—। আর বোকা মেয়ে—' দশরথ রাগে উত্তেজনায় যেন কথা শেষ করতে পারে না।

'তা কেতু যদি কিছু করে। উকে বিশ্বেস নাই।'

'এত ডর। তুমি মা লও! ডরে তুমি পেটের মেয়েকে বিচে দিছ। বুঝলে, মরার চেয়ে লড়ে মরা ঢের ভাল।'

তুলসীর মা কথা বলতে পারে না। ইস্পাতের মতো কঠিন এখন মানুষটা, তার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে না। সে ভয়ই পায়। বলে, 'যা ভাল বুঝ কর।'

রাত ঘন হয়। সারা গাঁ নিশ্চুপ। জানালা গলে নেমে আসছে জ্যোৎস্নার ধারা। ঝলকে ঝলকে বাতাস আসছে। দশরথের ঘুম আসে না। কেতু শত্রুতা করবে? করুক। কিন্তু খাসির দামটা সে আদায় করবে না? ন্যায্য পাওনা তার। কেতু সহজে দেবে না। তারপর যদি-—। হঠাৎই তার মনে পড়ে যায়, কেতু বাঁশঝাড়ের ধারে বোমা পুঁতে রেখেছে। আনু দেখেছে। আপাতত সেগুলো তুলে নিয়ে আসা দরকার। যে কোন সময় কাজে লাগতে পারে। আনু নিশ্চয়ই জায়গাটা চিনে রেখেছে।

দশরথ ওঠে। বিছানায় বসে। পাশের ঘরে আনু। ওকে জাগিয়ে এই রাতের মধ্যেই বোমাগুলো তার নিজের অধিকারে নিয়ে আসতে হবে।

দশরথ আনুকে ঘুম থেকে তুলতে যায়। বোমা ছোঁড়া কাজটা কী এমন ভয়ঙ্কর! সে পারবে।

খাদক

তুমুল বৃষ্টি আষাঢ়ে সন্ধ্যেকে বিশ্রী ভাঙচুর করে ছেড়েছে। সাঁৎ সাঁৎ করে দু'একটা গাড়ি পার হয়ে যাচ্ছে সামনের রাস্তায়। দোকানপাট অনেকই বন্ধ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অপ্রতুল আলোয় প্রায় শূন্যতা। মফস্বল সদরের বাস স্ট্যান্ড। বিঘে কয়েক জায়গা নিয়ে দোকানঘেরা পরিসর। এখান থেকে দূরের শহর এবং গাঁ-গঞ্জের দিকে বাস ছোটে। চঞ্চল ব্যস্ত শব্দমুখর থাকে সর্বদাই। মেঘ গুমরে গুমরে ফিরছে। অন্ধকার আকাশ। যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাস স্ট্যান্ড আলো আবছায়া বৃষ্টিস্নাত পরিমণ্ডলে বুড়ো মানুষের মত ঝিমিয়ে। অথচ রাত তেমন একটা হয়নি। আটটার ঘরে আটকে আছে ঘড়ির কাঁটা। সন্ধ্যের মুখে টানা বৃষ্টিপাত বেহিসেবী গভীরতায় নিয়ে গিয়েছে মফস্বল শহরের রাত্রিকে।

মেয়েটি একটা বন্ধ দোকানের হাতখানেক প্রশস্ত বাড়তি ছাউনির নিচে ঠায় দাঁড়িয়ে। আবছায়ায় বয়স, শাড়ির রঙ, রূপ কিছুই অনুমান করা যায় না। দাঁড়িয়ে থাকার আড়ষ্ট অপেক্ষমাণ ভঙ্গিটি কিন্তু স্পষ্ট প্রতীতি হয়।

দেখামাত্র ঠোঁটের বিড়িতে ঘনঘন টান নিয়ে পশু অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করে। বৃষ্টিতে মিইয়ে যাওয়া স্নায়ুরা সহসা যেন চঞ্চল হয়। উষ্ণতার স্বাদে ভরে ওঠে। ক্ষুৎকাতরতাও তার থাকে না। শিকার দেখলে শিকারী এমনিই সজাগ এবং শিকারে নিবদ্ধ হয়। সে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে।

পশুর প্যান্টের ওপর নাইলনের ঘন নীল গেঞ্জি। বছর সাতাশের রোগা শরীর। শ্যামলা রঙ। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। লম্বাটে গড়নের মুখ। কপালের পাশে কাটা দাগ। সরু করে কামান গোঁফ। চেহারার মধ্যে উদভ্রান্ততার ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। সাতাশেই যেন বয়সের কাঠিন্য এসে গিয়েছে।

পশু সহজেই অনুমান করে নেয়, মেয়েটি ফেরার বাস পাচ্ছে না। অধিকাংশ বাসই তো তুলে নেওয়া হয়েছে। কেবল পাশাপাশি দুটো বাসে যাত্রী উঠে আছে। আর তখনই মনে হয়, অপেক্ষা নয়, তার এগিয়ে যাওয়া দরকার। পুরো দিন শালা বাঁজা। কিছুই বিয়োল না। কোয়ার্টার রুটি, চা আর বিড়িতে কাটাতে হলো। সন্তোষ হোটেলের সাফ কথা, আট টাকা বাকি। ছাড়। খাও। সাত আট মাস খাচ্ছে সে। বাকি পড়লেও কী শোধ দেয়নি? তবু কথা। হোটেলের কী অভাব আছে নাকি? সন্তোষের বড় অহঙ্কার। তবে ধারে কাল খেতে দিয়েছিল, পান চিবুতে চিবুতে বলেছিল, আজকে খেতে দিচ্ছি। আট আর তিন এগার হলো। ঘাড় গোঁজ করে সে খেয়েছে। কড়কড়ে পাত্তি যদি ছুঁড়ে মারা যেত

মুখে। শালা!

আজ সাতদিন কোন ইনকাম নেই। হাবাগোবা একটা গেঁয়োকে ধরেছিল বটে, কিন্তু পকেট তার ঢু ঢু। বাসের যাত্রীরা যেন সজাগ হয়ে গিয়েছে সব। ব্যাগপত্র ঝাড়া যাচ্ছে না। বাস থেকে সিটে রেখে যাওয়া একজনের ব্যাগ যদিবা নিয়ে এল ভেতরে এক কেজি আলু আর আড়াইশো পটল। তবে সাতদিন আগে পঞ্চাশ টাকা জুটেছে। তাও কী কম মেহনত। সিমেন্টের পারমিট বার করে দেবে তাড়াতাড়ি। অফিসের সামনে লোকটাকে ধরছিল। বিশ্বাস্য করতে কম তাপ্পিতুপ্পি। ফর্মটা জমা দিয়ে অমন জম্পেশভঙ্গি এবং হাসি হাসি মুখ করে ওখানকার ক্লার্কের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল যে, লোকটা পঞ্চাশ টাকা বার করে দিল। আরও পঞ্চাশ দেবে পনেরো দিন পর। কেন যে পনের দিন টাইম দিল সে।

এই করেই অন্ন। কোর্টের আশপাশে ঘোরাফেরা করেও কিছু টাকা হয়। না, এখনও তেমন বিপদে পড়েনি পশু। সে যে ঠক তা মফস্বল সদরে এখনও জানাজানি হয়নি। ধরেছিল একজন—'এই যে দাদা সেটেলমেন্টের চার্জ অফিসে আমার কেসটা করে দেবেন বলে দশটাকা নিলেন সিদিন চায়ের দোকানে। তা বাদে অফিসে গেলেন। উর তো কিছু হলো নাই। ঘোষবাবু ত' আপনার দাদা নয়।' দশ টাকায় বেটার কত আশা। তিন বিঘে জমির গোলমাল মিটমাট হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল। কিন্তু দিব্যি সে বলে দিল—আমি! আপনার কী মাথা খারাপ মশাই! লোক চিনতে ভুল করেন কেন! চার্জ অফিসে বাপের জন্মে যাই নাই। লোকটা থ। মেয়ের বিয়ে দেবে বলে ভুয়ো পাত্রের সন্ধান দিয়ে তিনটে মানুষের কাছেও কিছু ঝেড়েছে।

পশুর বিদ্যে ক্লাশ এইট। দু'বার ফেল এইটে। এইট আসতে ফেলের সংখ্যা অন্তত গোটা ছয়েক জড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়বার এইট ফেলে তো প্রোগ্রেস রিপোর্টে পাঁচটা শূন্য। বাপ চাষী মানুষ। বলল—'জমিতে খাট। লেখাপড়া হবে না। গোঁফ গজিয়ে গিয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ দিতে চুলে পাক ধরবে।' গুম হয়ে শুনে মনে মনে পশু বলেছিল, নিকুচি করেছে জমির! নিজের মা নেই। সৎমা। সৎ ভাইবোনও পাঁচটি। দাদা রয়েছে। থাকে ধানবাদে। কোলিয়ারিতে চাকরি। বৌদিও ওখানে। কিছুদিন থেকে গেল। তা দামড়া ভাইকে কে পোষে। দাদার আবার পেটে বিদ্যে। ভাইকে ঘেন্না। আবার গাঁয়ে। বাপ ত' বসে ভাত দেবে না। লাগ জমিতে। না হলে পথ দেখ। পথই দেখল। বোলপুরে সাইকেল রিক্সা চালায় ভুবন। প্রাইমারি স্কুলের স্যাঙাত। বলল, লেগে যা। রিক্সা চালান গেল কিছুদিন। তারপর লরিতে পিষ্ট হতে গিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে বেঁচে যাওয়ায় সদাই ভয়তরাস। বোলপুর থেকে সিউড়ী। দোকানে মাল ওজন করার কাজ। সাহা খদ্দের হয়ে চড়েছিল রিক্সায়। সেই কথা দিয়ে গিয়েছিল, কাজ করতে চাও, আমার দোকানে কালই চলে এস। দু'বেলা খাওয়াপরা, মাসে হাতখরচা ত্রিশ

টাকা। সেটাও সহ্য হলো না। ততদিনে একটা পঁচিশ টাকায় ভাড়ার ঘরও জুটেছে। বন্ধু জুটেছে। সিনেমার টিকিট দোকান বন্ধের দিন ব্ল্যাক করছে। দোকানে কামাইও করছে। খোকনা বলল, ছাড় শালা দোকানের কাজ। দু'নম্বরী কর। ইদ্রিস বলল, কী যে শালা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তেল ডাল করিস! সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করব চল। কিন্তু ক'দিন। এদিকে খোকনার মামা ভাগনেকে সাঁইথের ধানকলে জুটিয়ে দিল। ইদ্রিস বাংলাদেশে। গুপে আর ভজনরা এখনও ব্ল্যাকে। আর তার তো এইভাবে। পঁচিশ টাকা ঘর ভাড়া ক'বার দিয়েছিল। এখন বন্ধ। হিসাব কষলে বছর ঘুরতে চলল। বাড়ির মালিক প্রাইমারি মাষ্টার মনতোষ দারুণ ভীতু টাইপের। চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। রোগধরা বৌ। সে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যায়। ওষুধপত্রও এনে দেয়। খাওয়া কী টিফিনও মাঝেমধ্যে জোটে। ছোট ভাই দেবতোষের সঙ্গে ঝগড়া। পশু এক্ষেত্রে মনতোষের দিকে। রোগা বৌ রোগা ছেলেমেয়ে, একটা মানুষের সাহায্য মস্ত ব্যাপার বৈকি! ভাড়া চাইবে কী! উল্টে ধার দেয়। চার টাকা পাবে মনতোষ।

হাতের বিড়িটা ফেলে দিল পশু। বাস স্ট্যান্ডের সুবিশাল চাতাল পিচের। জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে। আলোর দু'চারটে টুকরো ঠিকরে পড়েছে। কাপড় তুলে হাতব্যাগ নিয়ে একজন যাত্রী হাঁটছে। একটা বাস জোরে হর্ণ বাজাতে শুরু করল। তারপরই জোরালো হেডলাইট জ্বেলে ধবধবে আলো ছুঁড়ে মারল।

এতক্ষণে পরিষ্কার। যুবতী। শ্যামলা রঙ। ঢলঢলে মুখ। ছাপা লাল ফুল ফুল শাড়ি। কানে দুল। সোনা! মনে হতেই অমন চিবুক, টানা চোখ, ভরাট গাল, বড়সড় কপালের টিপ, অমন গলা, কাপড়ের ঘেরেও চমৎকার দুটি বুকের অমন সজাগ দৃঢ়তা, কোমর, সব নিমেষে তুচ্ছ হয়ে যায়। মেয়েমানুষে পশুর আগ্রহ কম। তবু চকিতের জন্যে ক'বছর আগে মামারবাড়ি গিয়ে পাশের বাড়ির মামাতো বোনের বন্ধু পুষ্পর চেহারাটা তার মনে এসেছিল। অবিকল এরকম। সে কয়েকটা দিন সৌরভ এবং রঙের ঝলকানিতে পড়েছিল। ও পক্ষেরও নরম চাউনিতে সাড়া ছিল। বড় দুঃখী সে মেয়ে। মা-বাপ নেই। মাসির ঘরে পড়ে আছে। মাসি দেখতে পারে না। কিন্তু কিছুই করার ছিল না তার! সেই কষ্টকর বোধ, পুষ্প নয় তো—এমন ভাবনা, সন্দেহ নিমেষে অন্তর্হিত। হাতে একটা ব্যাগ রয়েছে। কানের দুল কী সোনার! নিশ্চয়ই গাঁয়ের মেয়ে। বাস পায়নি। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। চমৎকার সুযোগ।

পশু একেবারে সামনে। বাসটা স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে গেল!

—বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে নাকি?

মেয়েটি বুঝি উদগ্রীব হয়েছিল। ব্যগ্র ভাবে নড়ে উঠল—দেখুন কেনে বাস আজকে যাবে না বলছে। কী যে করি।

পশু ঢোক গিলল। ভাবনাটা সত্যি হয়ে গিয়েছে। বলল—আহা এ তো

বিপদের কথা। করবেন কী আপনি! রাত হচ্ছে? বাড়ি কোথা?

—নগরী।

—সে তো মাইল ছয়েক রাস্তা। চোখ কপালে তুলল পশু, একলা মেয়ে দিনকাল ভালো নয়। রাত করে আসে। বিপদ হতে কতক্ষণ!

—রাতে এসেছি নাকি? সেই ত' কোন্ দুফরে। বাস পাব না। জল হবে জানব কেমন করে? মেয়ের স্বর কান্নাভেজা। বলে—ডরে কাউকে বলি নাই। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। এখানে রেতে থাকার মতন কেউ নাই। এমন বিপদে পড়ব জানলে আসতাম নাকি! কাকী বলেছিল—ঝড়জলের দিন, যাস না বিকেলে।

—ঠিক বলেছিল। পশু মাথা নাচাল, দিন দুনিয়ার হালচাল এখন অন্য রকম। এই তো কিছুদিন আগে একা মেয়েকে—শেষ করল না পশু।

—মেরে দিয়েছিল।

—শুধু মারা—। পশু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে পাশেই দাঁড়িয়েছে। আশপাশ দেখে নেয়। কোন পরিবর্তন নেই। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে। ওদিকের একটা দোকানের ঝাঁপ পড়ল। পাশেরটা হোটেল। আলো ছড়িয়ে আছে। রাতের চেহারা আরও ভারী বোধ হচ্ছে। সে বাড়িতে তোলার প্রস্তাব করবে নাকি? কিন্তু সেখানে—? উহুঁ, নিয়ে যাবে কেন? আসলে বাড়িতে নিয়ে যাবার নাম করে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাবে! বলে—তাহলে কী করবেন? না, হুজ্জোত হলো যা হোক। একলা ফেলে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

—কী করব! মাথাতে কিছু আসছে না। কথার সঙ্গে কান্না মেশে মেয়ের।

ব্যস্ত হয়ে পড়ে পশু,—কাঁদবেন না। কাঁদবেন না। লোকে শুনলে কত কী ভাববে! বিপদে পড়েছেন, দাঁড়ান কী করা যায় দেখি। এসেছিলেন কেন?

—কাপড় কিনতে। কিন্তু কেনা আর হল কোথা? নাক টানে মেয়ে।

পশুর মন নেচে ওঠে। সোনার দুল নয়, সঙ্গে টাকাও আছে।

—তাহলে কী করবেন বলুন তো?

—রাতটুকুনের লেগে ভাবনা। কাকী উদিকে কত ভাববেক।

—স্বামী নাই?

—থাকলে নিজে শাড়ি কিনতে আসি। মুখপোড়া সেই যে রেখে গেইছে, আর আসে নাই। তা রাতটুকুন কুথাও লিয়ে যেতে পারবেন না?

পশু এটারই প্রত্যাশা করেছিল। নিজ মুখে বলুক। ঢোক গিলল সে আহ্লাদে। ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাবে না। তার আগেই মাল কব্জা করে সে সরে পড়বে। কিন্তু কীভাবে। বৃষ্টির আঘাতে বিপর্যস্ত শহর অনেক ফাঁকা। দোকানপাটও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুযোগ সে পাবে। স্টেশনের ওদিকে নিয়ে যাবে। শহর থেকে সামান্য দূরে স্টেশন। মাঝের অংশটা ফাঁকা।

—আমার ঘরে যাবেন বলছেন! বিপদে পড়লে অবশ্য দেখতে হয়। তারপর আপনি মেয়ে। পশু যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে—তাহলে তাই চলুন।

—ঘরে কে আছে? মেয়ে জানতে চায়।

—কেউ না। একা। ঝাড়া হাত-পা মানুষ।

—ওমা তাহলে কোন ভাবনা নাই। ভয়কাতরতা নেই। সঙ্কোচ নেই, যেন কেউ নেই শুনে পরম নিশ্চিন্তির শ্বাসে বেরিয়ে আসে মেয়ের।

পশু ভাবে, একেবারে হদ্দ বোকা। সরল, গেঁয়ো। কস্তামাত্র এলিয়ে যাবে।

—কী হলো! তাহলে লিয়ে চলুন।

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। পশু ব্যস্ত হয়।

ভেজা রাস্তা। জোরালো আলো ফেলে দু'একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। সামনে পেট্রোল পাম্পের অত্যুজ্জ্বল আলো ছড়ান। পথে মানুষ খুবই কম। সোজা এই রাস্তা ধরে যেতে হবে। তারপর বাঁ দিকে। সামনেই পুলিশ লাইন। বিপরীতে ফাঁকা প্যারেড গ্রাউন্ড। জমাট হয়ে আছে অন্ধকার। তারপরই কবরখানা। মধ্যে মধ্যে গাছ-গাছালি কালোর আবেষ্টনীতে ভূতের মত দাঁড়িয়ে।

বর্ষার ঠান্ডা বাতাস সত্ত্বেও পশু যেন উষ্ণতার মধ্যে হাঁটে। বস্তুত এ ধরনের কেস এই তার প্রথম। লোক ঠকায়, কিন্তু মেয়ে সংক্রান্ত ঝামেলায় থাকে না। স্টেশনের ওদিকে নিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াবে। সঙ্গে একটা ছুরিও নেই। তবে ভীতু গেঁয়ো মেয়ে। না দিলে গলা টিপে খুন করে ফেলব বললেই সুড়সুড় করে নিশ্চয় বের করে দেবে। ব্যস, তারপর ফেলে দিয়ে চম্পট।

কিন্তু হঠাৎ মনে হয় পুষ্প যদি হত। পুষ্প নয় তো? হবে কেমন করে? নানুর থেকে এখানে আসবে কী করে! বিয়ে হবার কথা ছিল না একটা বুড়োর সঙ্গে। সে বলে ছিল—বুঝলে, কাজ থাকলে তোমাকে আমি বিয়ে করতাম। জিব ভেংচে পুষ্প বলেছিল—করলে তো! আমি তোমাকে বিয়েই করব না। আসার সময় ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিল। পুষ্পর জন্যেই শুধু কতদিন যেতে ইচ্ছে করেছে মামার ঘরে।

পশু আড়চোখে দেখে। বাপ খবর রাখে না। তার যেতেও ইচ্ছে করে না। জহন্নামে যাক। পুষ্প হলে এই মেয়ে, বাপ ভালো হলে! হুঁ, জমি না হয় সে চষত! এই তো সাইকেলের দোকানে কাজ করার কথা হচ্ছে। বাড়িওয়ালা মনতোষই দেখে দিচ্ছে, হলে সে তো করবে।

—ভাগ্যিস ছিলেন! পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে কৃতজ্ঞতায় উচ্চারণ করে মেয়ে। বলে, বিয়ে না হয় করেন নাই। মা-বাপ ভাই-বোন কেউ নাই?

—না। সবাই মরেছেক। গেঁয়ো সরলা এই যুবতীকে ঘিরে সামনের পরিকল্প তাকে বিচলিত করে। হৃৎপিন্ড জোর শব্দে বাজে।

একটা লরি গোঙানির শব্দে আলো ফেলে এগিয়ে আসে। বিকট শব্দ এবং কালো ধোঁয়ার ফুৎকার দিতে দিতে বেরিয়ে যায়।

—ঘরে না হয় লোক নাই পাশের ঘরে তো লোক আছে।

—তা আছে। বাড়ির মালিকই আছে।

—আমাকে নিয়ে গেলে কিছু বলবে না? যদি বলে কে বটে?

—সে যা হোক বলে দিলে হবে।

—আমাকে ঘুরে ঘুরে কী দেখছেন?

পশু নিরুত্তর। পাশে কবরখানা। আর একটু এগুলেই বাঁক নেবার মোড় পড়বে। আলো জ্বলছে মোড়টায়। ক'টা রিক্সাও দাঁড়িয়ে আছে।

আর তো মাত্র কয়েক মিনিট। বাঁক নিলেই ফাঁকা। অন্ধকারও। তবে ছিনতাই করে সে স্টেশনের ওয়েটিংরুমের দিকে যেতে আদেশ করবে। ভাবনামাত্র উত্তেজনা বাড়ে পশুর। এমন সহজলভ্য শিকার বৃষ্টির সন্ধ্যায় তাকে উপহার দিয়েছে। সন্ধ্যাকে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা করে। কত টাকা আছে? শাড়ি কিনতে এসেছে যখন—

—আমার কিন্তু খিদে লেগেছে।

—খাবেন। ঘরে তো চলুন। খিদে আমারও লেগেছে।

—কিছু কিনে নিলে হতো। ঘরে বসে খেতাম।

পশুর স্বরে বিরক্তি ফোটে। বড় বকবক করছে। বলে, হবে। হবে। তারপর ব্যস্ত গলায় পশু বলে—এদিকে চলুন।

মোড় থেকে স্টেশনের দিকে বাঁক নিতেই যেন চমক খেয়ে ওঠে মেয়ে। বলে—এ কী স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন যে! উদিকে ত ঘর নাই।

—জানেন আপনি? পশু দুর্বল বোধ করে। বলে—ওই তো ঘর।

দূর স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। এ সময় ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়। দমকা বাতাস এসে পড়ে। আর যুবতী যেন ভিন্না হয়ে ওঠে। খোলস খসে পড়ে। দাঁতের উপর দাঁত চাপে। তারপর চাপা ভয়ঙ্কর আদেশের সুরে বলে—ঘরে নিয়ে চলুন। আর সারারাত থাকলে ক'টাকা দেবেন, সেটাও ঠিক করে নেন। ওদিকে অন্ধকারে কিছু করে ফেলে দিয়ে যাবেন সেটি হচ্ছে না। বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়। ঘোমটা খসে এক জোড়া চোখ জ্বলে। মোড়ের আলো ওই চোখে, কপালের টিপে ঠিকরে পড়ছে, বৃষ্টির গুঁড়ো পড়ে মুখে মুক্তা বিন্দু ফুটে উঠেছে।

পশু বিস্ময়ে যেন পাথর। তার চারপাশে বৃষ্টির এই রাত্রি, আলোকিত পরিসর, অজস্র অন্ধকার, রিক্সা, দূরের স্টশন সহসা যেন প্রবল এক ঘূর্ণি হয়ে ওঠে। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলে—কে তুমি?

—মেয়েমানুষ। একটা খারাপ মেয়েমানুষ। খদ্দের ধরতে দাঁড়িয়েছিলাম। মাসিই বলল—। থাক মাসির কথা। একা ঘরে ত' থাকেন! দিব্যি নিয়ে যেতে পারেন, না হলে আমার ঘরেই চলুন।

পশুর সারা দেহমন বদ্ধজালে যেন বুনোপাখির মত কেবলই অসহায় ঝাপটা দেয়। সে বলে—আমার কাছে একটাও পয়সা নাই!

—ও মা সে কী! ছলকে হাসে—তাহলে ওদিক নিয়ে গিয়ে বিনি পয়সায় সুখ লোটার মতলব ছিল! অ্যাঁ।

পশুর পেটের ভিতর সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। তার ভাঙা গলা কেবল উচ্চারণ করে—না। আমিও খারাপ মানুষ। ঠক। লোক ঠকিয়ে খাই। আমার লোভ ছিল তোমার কানের দুলে! তোমার টাকাতে।

—কানের দুল সোনার লয়। মেয়ের গলায় হতাশা ফুটে বের হয়।

—কী করব, সারাদিন খাওয়া হয় নাই। পশু অসহায় গলায় আবেদন করে। সব উত্তেজনা নির্বাপিত। যেন চরম কৌতুক তাকে ভাঙা মানুষ করে দিয়েছে।

—ওমা সেকী কথা! কাউকে তাহলে ঠকাতে পার নাই? শেষকালে আমাকে! আর আমিও কিনা তোমাকে। এখন জলে ভেজা পথের ওপর দাঁড়িয়ে হাসির তোড়ে দোল খায়। শরীর ভেঙে ভেঙে পড়ে। আলো আবছায়ায় কপালে টিপ, উজ্জ্বল চোখ, অমন চিবুক, মাথার বেণী অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের দ্যোতক হয়ে ওঠে। মুখে আঁচল চাঁপা দিয়ে সামলায় নিজেকে। যেন বিষম এক কৌতুক। তারপর কালো আকাশ চিরে সহসা বিদ্যুতের চাবুকের মত ঝলসে ওঠে। সামান্য ঝুঁকে তীক্ষ্ণ গলায় বলে—আমি না হয় দায়ে পড়ে শরীর বেচি। তুমি—তুমি—এমন একটা জোয়ান মরদ—!

পশু দাঁড়াতে পারে না। আলগা বৃষ্টি ঝরছে। সে পালাতে চায়।

—চললে কোথায়? আটকায় যুবতী।

—আমার কাছে পয়সা নাই। বিশ্বাস কর!

—পয়সা না হয় নাই। কিন্তু মুরোদ। বেটাছেলের মুরোদ তাও নাই নাকি? দেখছ কী? মাগ ছেলে নাই, একা মানুষ যে বলেছ, সত্যি না মিথ্যে?

—সত্যি! কেউ নাই। বিশ্বাস কর।

—করেছি। তা আমার বিশ্বাসে কী যায় আসে।

—আচ্ছা তুমি কী পুষ্প! নানুরের কাছে—

—না পুষ্প নই। বাপের জন্মে নানুরে যাই নাই। আরে চললে কোথা?

পশু ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থমকে যায়। ছোটার ক্ষমতাও তার নাই।

—চল।

—কোথা?

—হোটেলে! আমার কাছে দশ টাকা আছে। দু'জনে ভাত খাব। ঘন শ্বাস ফেলে বলে—দশ টাকাতে দুজনের খাওয়া হবে না? খুব হবে। বল!

পশুর মনে হয়, নাম বদলে রূপ বদলে পুষ্প এসেছে।

ছাগল

ধরম বুকলেপ্টা করে ধবধবে সাদা বেড়াল বাচ্চার মতো ছানাটাকে নিয়ে ঘরে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেছিল, বাবাগো, চাঁদির বিটা হন্‌ছেক। গর্ভের সুতোকাটা আঠার মতো লালা এবং ছিটেফোঁটা রক্তবিন্দু তার কালো বুকে পেটের কিয়দংশে লেগে চকচক করছিল। ছানাটার মাতৃগর্ভ থেকে ছিনিয়ে আনা গোলাপী কিঞ্চিৎ মোটা এবং দীর্ঘ শিকড় দোলা খাচ্ছিল, ধরমের নোংরা প্যান্টের সঙ্গে একটা চিটিয়েও গিয়েছিল। ছানাটা নীরব। প্রসবক্লান্তা চাঁদি রক্ত ঝরাতে ঝরাতে অতি ক্ষীণস্বর ম্যা ম্যা ম্যা বিলম্বিত লয়ে পিছন পিছন ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিপুল আগ্রহে এগিয়ে আসছিল। তখন ভুবন চাঁদি ধরম এবং নবজাত ছানাটার উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে খেঁকিয়ে উঠেছিল, নামা। নামা। ছিঃ ছিঃ ছুঁড়া ছা ট মেরে দিলেক হে। ততক্ষণে ধরম নামিয়ে ফেলেছে। দুটো হাতের তালু ঘষছে। চটচটে আঠা, তার উজ্জ্বল আনন্দিত চোখ বিস্ময়। দশ বছরের কালো রোগাটে গালফোলা মুখে নাকের ডগায় উত্তেজনার পরিশ্রমের বিন্দু বিন্দু ঘাম। তখন থৈ থৈ বৈশাখের বিকেল বেলা। তবে জল ঝড় বজ্রাঘাত, সূর্যপ্রদীপ নিভিয়ে প্রকৃতির অমিত বিক্রমে যুদ্ধ নেই। আকাশ-বাতাস আশ্চর্য স্থির, শান্ত। যেন চাঁদির মতই অদ্ভুত ক্লান্ত। মরা রোদে সামনেকার খেলকদমের বিশাল গাছে বিকেলের টিয়াদের জটলা, ঘরের খড়ের চালে কাকের ডাক, অনেকদূরে একটা বাছুরের হাম্বা রব এবং তার সঙ্গে এধার ওধার থেকে আসা উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ ধুলোমাখা খোকাখুকি, পাড়ার উৎসাহী রমণীরা এবং ভুবনের সহধর্মিনী কাঁধে সর্বশেষ ঈশ্বরের দান রিকেটগ্রস্ত কন্যাসন্তান নিয়ে, আমি জানতাম, আজি হবেক.......ই বাবা ছা হলো নাকি গো.........পাঁঠা না পাঁঠি বটেক....... তেলকালি লাগিন দাও......শুন, ঠান্ডা জল দিস না........বট পাতা খাওয়াবি....মাগীর বিয়েন যি ঢেক খিদে লো ইত্যাদি শব্দ ভুবনের উঠোনে উৎসবের আবহাওয়া এনে দিয়েছিল। তখনই ধরম বাবাকে রক্ত এবং গর্ভের লালা মাখা শরীরে জড়িয়ে বলে উঠেছিল, বাবাগো, ইকে তুমি বিচবে নাই। ই আমার খুকা বটেক।

এখন শরৎ। চতুর্দিকে পূজোর রং। আকাশ পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে লালমাটি মাখানো এবং খড়ি দেওয়ার সোঁদা একটা গন্ধ দিনরাত ঘুরে বেড়ায়। অগণন শস্যক্ষেত্রে সবুজতায় ঈষৎ ফ্যাকাশেভাবে ধানের শীষ বুকের দুধের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ে। বর্ষার টালমাটাল জলে পুকুর ডোবা এখনও থৈ থৈ। পথের কাদা শুকিয়ে গরুর গাড়ির চাকায় বর্ষায় কুমোরের মাটির মতো যে হয়ে উঠেছিল,তা অসংখ্য নালার আকৃতি, উঁচু নিচু, পেঁজা তুলোর মতো, কঠিন শক্ত। সব গোলা

শূন্য। আগামী ফসলের জন্যে তীব্র পিপাসায় চাষী সকাল বিকাল শস্যক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায়। চালের দাম শীর্ষবিন্দুতে। হা-অন্নের ছবি এখন অধিকাংশ সরল কালো পাংশু মুখে, শুকনো ঠোঁটে, চোখে। ইতিমধ্যে সুখী—ভুবনের সহধর্মিনী, ধরমের জননী, ষষ্ঠতমা রিকেটগ্রস্ত কন্যাসন্তানকে যে স্বামী কোল থেকে ছিনিয়ে কাঁদরের ভেজা মাটির অন্ধকার গর্ভে দিয়ে এসেছে—সে শোক, ওগো ই কি হল গো বুক ফাটা কান্না, একবেলা ভাত মুখে না দেওয়া বিস্মৃত হয়ে স্বাভাবিক জৈবিক নিয়মে গর্ভের অন্ধকারে আবার একজনকে স্থান দিয়েছে। ভুবনের মুখ আরও দুখী হয়েছে। পরাণের বাপ, যে বেটার ভাত পেত না, ভিক্ষে করত, সে রাতে ঘরের চাল চাপা পড়ে মাটি হয়েছে। কুমুদু দুকানা যৌবনের বান নিয়ে বিধবা হয়ে এসে এখন পাকুড়তলায়, সন্ধ্যেবেলাতে ভবা বাগ্দীর মেজছেলের হাত ধরে খিলখিলিয়ে হাসে—ই বাবা, এঁতেক লাজ কনে গো! হায় হায় মাটির দেশে এসে খালি মাটি দেখলে, মেয়েমানুষ দেখলে নাই। কানাই বিহারে বর্ষায় ধান চালান দিয়ে সিগারেট ফোঁকে, ট্রানজিস্টারে বাজায়, ও মেরে নয়না। এবং ধরম খুকার মসৃণ পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলে, অ আমার খুকা, ধান উঠুক—তা বাদে তুকে জামা দুব।

ধরম পেটে ভিজে ভাত, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা পুরে পাঁজরার নিচেটাকে ঈষৎ ফুলিয়ে ঘর থেকে বের হল। এখন গাঢ় মধ্যাহ্ন। গ্রীষ্মের মতো দাহ। আকাশের উঠোনে সূর্য দাউ দাউ করছে কাঁচাকয়লার উনুনের মতো। বাতাস রোদপোড়া। ওদিকে একটা ডাহুক ডাকছে। ঘুঘুচ্চো ঘুঘুচ্চো করে একটা ঘুঘু সামনেকার আতাগাছে একটা কাকের সঙ্গে তর্কে মেতেছে। তার ভাইবোনগুলো, সংখ্যায় বর্তমানে যারা পাঁচ, কাদামাটি নিয়ে উঠোনে খেলছে। গোটা কয়েক ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব কটিই ভুবনের। ছাগল পালুনি নিয়ে তার সংসার স্ফীত। জন্মনিয়ন্ত্রণ নয় জন্মবৃদ্ধিই তার ব্যবসার ধর্ম। বামুনঘর থেকে—সদাবামুন, ওই যে উঁচুপাড়ায় থাকে—খালি গায়ে নামাবলি উড়িয়ে ফুলবেলপাতা ঠাকুরের মাথায় চড়িয়ে বলে, ধর্মকর্ম গেল হে দেশ থেকেন, দেবতাকে বিশ্বাস নাই, সে বলেছিল, ভুবন এই পাঁঠি ট পালুনি লাও। ছা হলে আধা ভাগ। পেথমবার আমি পরেরট তুমি। তা বাদে পাঁঠাপাঠি যা হয়। তা ভুবনের ভাগ্যে পাঁঠি হয়েছে। সেই সূত্রপাত।

এখন কালো সাদা খয়েরি রঙের অনেকগুলি ছাগছাগী ভুবনের সন্তানগুলির মত খায় দায়, মলত্যাগ করে, ম্যা ম্যা করে, কুঁই কুঁই করে। পাশাপাশি দু-খানি ঘর। এক ঘরে গাদাগাদি করে ভুবন, অন্য ঘরে গাদাগাদি করে ছাগকুল নিশিযাপন করে। এবং প্রত্যুষে উভয় ঘরই খালি হয়ে যায়। উভয় ঘরেরই একমাত্র কর্তা ভুবন। বয়স চল্লিশোত্তীর্ণ, কাঁচাপাকা চুল, ঈষৎ লম্বাটে মুখ, কণ্ঠের হাড় বের হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি শিরা উগ্র হয়ে প্রকটিত, উঁচু দাঁত, সব সময় লাল ছোপ পড়া সেই দাঁত খিঁচিয়েই থাকে। অসম্ভব রাগী। ছাগলগুলোর মতোই সন্তানদের উপর লাথিবর্ষণ করে, শালার জাত মেরে দিলেক হে। আঁ ভগবান, বুকের

তলাতে একট থলে দিন-ছে? শালার থলে কুনু কালে ভরে না। তা সত্যিই ভরে না। থলে ভরাতে ভুবন ক্লান্ত বিপন্ন এবং ক্ষয়প্রাপ্ত। দেহ মন সব যেন নিয়ত ঘষা খায়। ভুবন ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয়।

ধরম ঘরের দাওয়ার দিকে তাকাল। উনুনশালে ধোঁয়া উঠছে। তুষের ধোঁয়া. তুষগুলো না জ্বললে কেমন যেন কালো হয়ে পুড়ে যায়। ওদিকে আবার ঝোপের পাশে কুমুদপিসীর ঘরের ভেতর থেকে পুঁটিমাছ ভাজার আঁশটে নিবিড় গন্ধ ঝলক ঝলক বাতাসময়। ধরম গোঁফের কাছটায় নাকের ফুটোয় ঠেকিয়ে গন্ধটা টানল। কুমুদপিসি দিন কয়েক সন্ধ্যেবেলা আঁচল বিছিয়ে সুর করে কাঁদত। এখন পাকুরতলায় দাঁড়িয়ে হাসে। চারদিকে খড়ের চাল, মাটির ঘর, কালিপড়া হাঁড়ি, ছাইয়ের গাদা, আঁকড়ের ঝোপ, চড়াইয়ের কিচির মিচির, রোদ, ছায়া। ওদিকে বিন্দুখুড়ো গলা লম্বা করে টিনের ফাঁকে দেখছে। কানাইদার ঘর বন্ধ। এখন কানাইদা বাবুলোক। ঘরে গান বাজে। সিগারেট খায়, জামা পরে। খালি গায়ে কানাইদা জনের কাজ করত। তারপর ধান চালান দিতে থাকল বিহারে। আরে ব্বাস, সন্ধ্যেবেলাতে তখন ঘরে কি হাসি, মদের ভক ভক গন্ধ। কানাইদা বাবাকে বলত, খাও গো ভুবনদা, একটুস খাও। ভেতো লয়, সিউড়ীর মাল বটেক। পরাণদার বাপের ঘরট এখনও হুমড়ি খেয়ে আছে। মাটির দেওয়াল নুয়ে মোমবাতির মতো গলছে। বাঁশগুলো লোকে পোড়াল। খড় গরু। পরাণদা এসে গাল দিয়েছিল। ধরম একটুকরো বাঁশ কুড়িয়ে এনেছিল। কি ভয়। পরাণদা কোমরে হাত দিয়ে বলেছিল, যে হারামজাদা হারামজাদীরা নিনছেক, বাপের পারা তারা ঘরচাপা পড়বেক। ধরম ঘাড়ের উপর খড় নেওয়া অবস্থায় ঘামে জবজবে শরীরে বাঁশের টুকরোটা সন্ধ্যেবেলায় ছুঁড়ে দিয়েছিল।

ধরম ছোট ছায়া ফেলে এগিয়ে চলল। ঘরের পিছনেই ডোবা। পাড়ে তালগাছ। ডোবার ঘাটে মা এখন উবু হয়ে বসে কড়াই মাজছে। জলে কড়াইয়ের কালি ভাসছে। ওধারে একটা বক চুপচাপ বসে। মায়ের শরীর দুলছে। ঘষ ঘষ ঘষ। ওদিক থেকে মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে মুচিবৌ—অ ধরমের মা, কড়াই মাজছ বিলাতে। মা চোখ তুলে তাকাল। মুখে ঘাম। মাথায় ঘোমটা নেই। শুকনো বাদামী চুল, সিঁথিটায় সিঁদুর ছড়ানো, দু-পাশের চুল খাওয়া। কান খালি, হাতে পিতলের চুড়ি। ফোলা ফোলা চোখ মুখ হাত পা। মা এবার ফুলছে। চোখ হলদেটে, ঠোঁট ফ্যাকাশে। কুথা ধান নিন চললে মুচিবৌ—বলতে ধরমের উপর চোখ পড়ল এখন। ধরম নির্বিকার হয়ে দাঁড়িয়ে যেন। অথচ চোখ খুকাকে খুঁজছে। চারিদিকে ধানক্ষেত। সবুজ ধানের ঢেউ। বামুনঘর যাব দিদি বলে বৌ ধরমকে দেখল। মা বলল, আ বাবা ধরম, মুচিবৌয়ের সাথে একবার যাস কেনে, উ লাউশাক দিবেক। বাড়া ঝাল খেতে মুন হুছেক। মুচিবৌ হাসল, অরুচি। ধরম মা বৌ থেকে চোখ সরাল। ডোবার ঘোলা জলে একটা মাছ লাফাল। চিল বসল তালের পাতায়। খর খর শব্দ। ধরম বলল, এখুন যেতে

পারব নাই। খুকাকে খুঁজতে হবেক। মুচিবৌ বিস্মিত সপ্রশ্ন চোখে চাইতেই মা কোমর ভাঙতে উঠে দাঁড়াল। গায়ের কাপড় ভেজাহাতে নাড়ল চাড়ল না, ঢাকা দিল না, বুক পেটের ফোলা মসৃণ কালো চামড়ায় ছিটেফোঁটা জল। মুখে গর্বের হাসি নিয়ে, আর বলো না বৌ, খুকা হছেক ওই সাদা ছা ট। পাঁটা বটেক। বিটা আমার প্যাটে করে খালি নিন্ নিন্ ঘুরে। তা উরি লেগে ত খাসি হল না উ ট। তুমাদের লুক শুধুছিল। উর বাপ বললেক, ছুটুছেলে খেলছেক, খেলুক; উ ট পাঁঠাই হোক, বলে মা ধরমের দিকে তাকাল। মুচিবৌ খুব উৎসাহী হলো না। লাউশাক আনতে পাঠিন দিও—বলে চলতে শুরু করল। মা আবার বসল। খড়ের নুড়ি দিয়ে ঘষর ঘষর আওয়াজ, তার সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে নিচু মুখে—অ বাপ ধরম, ছাগলগুলোর দিকে লজর রাখিস। তা, বাপ কুথা গেল তুর? হ্যাঁ রে, লাউশাক আনতে যা কেনে তু—বলে চলল।

ততক্ষণে ধরম পাশের উঁচুপাড়ের কালোপুকুরে উঠে পড়েছে। হাঁড়িফেলায় দাঁড়িয়ে দেখছে, ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। খুকা কোথায় লুকাল? বড় চালাক। তার মুখে সুখের হাসির বিচ্ছুরণ। খুকা ধানের ক্ষেতের ভিতরে ঢুকে ইঁদুরের মতো দাঁত দিয়ে কুটুস কুটুস খায়। জাগালির চোখ পড়ে না। খুকা—বলে চিৎকার করে উঠলে সবুজ সমুদ্রের ভিতর থেকে ম্যা ম্যা করতে করতে ছুটে বেরিয়ে আসে। ধরম বুকে করে দে ছুট। লাঠি হাতে জাগালি—এই হারামজাদা, বাপের ধান খাওয়াচ্ছিস। ই তুর বাপের জমি বটেক। ধর ত বিটাকে।—বলে ধানক্ষেতের ভেজা আলের কাদা প্যাচ-প্যাচানির মধ্যে ছুটে হাঁটু অব্দি কাদা মাখামাখি করে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলা উঁচু করে খিস্তি দেয়। আর ধরম তখন ভাঙা ঘরে কি পুকুর-ডোবার গাবায় খুকাকে কোলে বসিয়ে চুমু খায়। বলে, মাঠে নামবি নাই খুকা। ধরতে পারলে উরা মারবেক। তুমাকে খুয়াড়ে ঢুকিন দিবেক। খুকা পেটের ভিতর থেকে ম্যা করে যেন অভিমানের স্বর বের করে। লাল মুখ নাড়ায়, গলা লম্বা করে। কোলের উপর সরু সরু চারপায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। অয় দেখ—ধরম বলে, আবার যাবার লেগে লাফাছেক। ই পাশে ঘরে আমি বটপাতা এনে রেখেছি।

অ রে খুকা। হাঁ বড় করে লাল ছোপপড়া দাঁত বার করে আলজিভ দেখিয়ে ধরম সামনেকার ধানক্ষেতগুলোর দিকে চিৎকার ছুঁড়ে মারল। একবার, তারপর বার কয়েক। খুকার সাড়া নেই। চতুর্দিকে রোদ জ্বলছে, বাতাসে ঢেউ। কালো পুকুরের ও-ঘাটে চান করছে একটা মেয়ে, একটা ময়না ঠোঁট ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, একটা বাছুর আবার ঘাস চিবুচ্ছে। গা এবার জ্বলছে। রোদের তাত সর্বাঙ্গে। ছেঁড়া প্যান্টের ভিতর ঘাম। একটা ঢেকুর উঠল। পেঁয়াজের গন্ধ। বাপ আজ সকালেই একটা খয়েরী খাসি বিক্রি করেছে। খুকাকে তার সঙ্গে দিল নাকি? সদা ভয়, বুক দুরু দুরু, অ আমার খুকা। ধরম কালো পুকুরের উঁচুপাড়ের শুকনো ঘাসে পা ঘষল। পিঁপড়ের সার। লাফিয়ে সরল ও। পা তুলে শরীর

বেঁকিয়ে একটা পিঁপড়ের মরণপণ চামড়া ধরাটাকে ঘষে ধুলো করে দিল। শালা। বাপকে বিশ্বাস নাই। দাঁত বার করে হাসে, লাথি ছোঁড়ে, হাটে ছাগল বিক্রি করে। ধরম যেন পাড়ের উপর থেকে একটা খড়্গোর দ্রুত নেমে আসা, লাল টকটকে রক্তস্রোত, মুণ্ডহীন দেহের ছটফটানি দেখতে পাচ্ছিল। সেই যে কালো খাসিটা, বাপ বলত সোনা, বটপাতা খাওয়াত, তাকে নিয়ে কি হাঙ্গামা। পাঁচ সের হবেক—বলে বাপ। উরা বলে, চার সেরের বেশি হবে না। তা কাটাছাঁটা হলো। ভুঁড়ি বাদ, চামড়া বাদ, মুড়ো বাদ, পাক্কা পাঁচ সের। বাপের তখন কি হাসি। উরুতে চাপড় বসিয়ে বলেছিল, আরে বাপু, কতদিন উকে কুলে নিন্‌ছি আমি। উ ট আমার পিয়ারের ছা ছিল যে। তা উর কতটো মাংস হবেক তা জানব নাই? খলখল শিয়ালের মতো হাসি। মুখে পেঁয়াজের গন্ধ, মাথায় তাত, দুচোখে অন্বেষণ—খুকা রে। এখন ধরম পাড়ের উপর দাঁড়াতে পারছিল না। পা যেন টলছিল। খুকা রে—ডাকটা আর দু'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার হয়ে এই থিকথিকে মধ্যাহ্নে ছুটে বেড়াচ্ছিল না। বুকের ভিতর গুড়গুড় গুড়গুড়।

অয় ছুঁড়া! নীল লুঙ্গি, ধবধবে সাদা গেঞ্জি, লম্বাটে মুখ, কালো রোগা চেহারা, পান খাওয়া লাল ঠোঁটে বিড়ি নিয়ে হনহনিয়ে হেঁটে এসে ভ্রু কুঁচকে বলল, তু কার বিটা বটিস? আঁ। আচমকা ডাকে ধরমের বুকের ভিতর থরথরানি। ফোলা গালে এখন ঘাম। চেনা চেনা তবু অচেনা মুখ। মুখটা ও পাড়ার পদাই কাকার মত। পদাই কাকা বামুন ঘরে চাষ করে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে তাদের ঘরে। কাকী বর্ষায় মরেছে। এখন ঘরে এক পাল ছেলেমেয়ে। ঘরে এসে বলে, সুখে আছ ভুবনদা। তুমি ঢেক সুখে আছ। ধরম মানুষটার ছায়ার দিকে চোখ রেখে বলল, ভুবনের বিটা বটি। তিড়িং করে চিংড়িমাছের মতো লাফিয়ে ওঠে মানুষটা, দেখ দেখিন চিনতে পারি নাই। তা বাপ কুথা, তুর বাপ কুথারে ছুঁড়া? জানি নাই—বলে ধরম ছায়া থেকে মুখ সরাল। জলের ভেতর থেকে একটা পানকৌড়ি উঠে ফড়ফড় করে কালো দেহ নিয়ে উড়ে গেল। ওদিকে বাছুর গাবায় ঘাস খাচ্ছে। ধানক্ষেতে বাতাসের ঢেউ। চতুর্দিকে আলোয় আলোকময়। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো ছড়াছড়ি মেঘ। ওদিকে পাখির উড়াউড়ি, একটা ঘুঘু ডাকছে, তালগাছে পাতার খরর খরর। পুকুর ঘাটে জলে দাপাচ্ছে একটা ন্যাঙটো ছেলে। পাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যায় কান্তধোপা। পিঠে বিরাট পোঁটলা। মানুষটা ছোট ছায়া ফেলে বলল, কি করছিস তু। জলের দিকে চোখ রেখে ধরম বলল, কুছু না। মুখে একটা শব্দ তুলল মানুষটা। বিড়ির টানে হুসহুস শব্দের চেয়ে জোরালো। মাথা নাচিয়ে বলল, তা রোদের বিলা? ধরম এবার মানুষটার মুখ দেখল, মুখের পাতায় হাসির ছড়াছড়ি। ফিকফিক করে বেরুচ্ছে না, স্থির হয়ে আছে। মুখে ঘাম। চেহারা পদাইকাকার মতো। তফাত—মানুষটা বাবু বাবু। ধরম বুঝল না কেন তার এত খোঁজ। খুকা কুথা

গেল? কুথা? হ্যাঁ গ, তুমি খুকাকে দেখেছ? ফোলা গালের মুখটা নেড়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে বুকের ভিতর থেকে সে ওই সব শব্দের হুড় হুড় করে আসায় শ্রান্ত বিপর্যস্ত। পেঁয়াজের গন্ধ মুখ থেকে ভকভকিয়ে বের হয়ে আসছে। বমি বমি ভাব। পেঁয়াজের মিষ্টি গন্ধও নেই এখন, দাঁতের ফাঁকে মুখের লালায় যেন পচন ধরেছে। বলল, খুশি, তাই দাঁড়িন আছি। আঁ—করে মানুষটা যেন শুনতে পায় নি এমন ভাবে তাকাল।

ধরমের মুখে শব্দ নেই, চোখ নেই। অনেকটা দূরে কে যেন কাকে হাঁক পেড়ে ডাকছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে শব্দের রেশ ছুটে আসছে। পাড়ার লাল কুকুরটা পাড়ের ওইদিকে এইমাত্র পায়চারি করতে এল। বটপাতা পাড়তে হবে। খুকার মুখ, ধবধবে সাদা চেহারা, ম্যা ম্যা ডাক ধরমের বুকের ভিতর চোখের ভিতর আবার চলাফেরা করতে থাকল। কুলপাতা খেতে খুব ভালোবাসে খুকা। বটপাতা খেয়ে অরুচি। কুথা কুলপাতা? মনুর মা বলে, এই ছুঁড়া, তু গাছ মুড়িন দিলি যে রে? নাম নাম। আঁ, ছাগলের লেগে কে কুলপাতা লেয় রে? এখন চাপতে দেয় না গাছে। বলে, নাই। দেখ কেনে পাত নাই গাছে। তা অ ধরম, বাপ আমার, ডুমোর এনে দিস কেনে বুন থেকে। ধরম বলে, পাত দাও, ডুমোর দুব। এ-গাঁয়ে ডুমুর গাছ নেই। অনেক দূরে ওই যে ধানক্ষেত, তারপর তালগাছওয়ালা পুকুর, সেটা পার হয়ে বন। ছোট শালের বন, তারমধ্যে ডুমুর গাছ আছে একটা। গাছময় বড় বড় পিঁপড়ে। কুটুস কুটুস কামড়ায়। গুঁড়িতে, পাতায় পাতায় ডুমুরের ফাঁকে, মসৃণ সবুজ গায়ে যেন রাজত্ব তাদের। ধরম খুকার জন্যে যায়। কিন্তু কোথায় খুকা? না তাত, না সামনের মানুষ, না একটানা দাঁড়িয়ে থাকা—কিছুতেই ধরম ক্লান্ত ক্ষুব্ধ নয়। খুকা রে—বুকের ভিতর একটা ডাকের আকুল আগ্রহের ছলাৎ ছলাৎ শুধু। মানুষটা বলল, তা, নাম কি বটেক তুর? ধরম বড় বড় চোখ মেলে বলল— ধরম। ওধার থেকে ন্যাঙটো ছোটভাই ছুটে এসে বলল, অ দাদা, খুকা যি ঘরে রইছেক রে। ধরমের বুকের ভিতর থেকে স্বস্তির শ্বাস পড়ল, আপুনি কে বটেন গো। মানুষটা ঘাম ভেজা মুখে শরীর দুলিয়ে বলল, চিনবি নাই রে ছুঁড়া। তুর বাপ চিনে। তারপরই ভোজবাজির মতো উধাও। ধরম রোদ, জল, ধানক্ষেত, আকাশ, বাছুর এবং ইতি উতি চেনা মানুষের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পা পা হাঁটতে থাকল।

সন্ধ্যার ঝাপসায় আবার সেই মানুষকে দেখল ঘরে। ধরম উঠোনে এক চিলতে চটের এক ছেঁড়া থলেতে চিৎপাত। চোখ আকাশে। চতুর্দিকে অজস্র শব্দ। বাঁশের ঝাড়ে পাখিদের ডানার ঝটপট, কাকের চিৎকার, চড়ুইদের কিচিমিচি। ওধারে কানাইয়ের ঘরের ট্রানজিস্টারের ঝমঝম বাজনা গান। লম্ফের আলোয় কোমরে হাত দিয়ে কুমুদপিসি শরীর দুলিয়ে ভবার মাকে হাঁ মুখ করে কি বোঝাচ্ছে, শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অশখতলার পাশ দিয়ে চড়া সুর ধরে কে যেন গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। শুধু দীর্ঘ একটা টান, কথা শোনা যাচ্ছে না। কাদের

গরু ঘরে ফেরেনি, আবছা অন্ধকারে গলা দীর্ঘ করে ভয়কাতর একটা আওয়াজ। এবং তার মধ্যে ভুবনের পাশে বসে মানুষটার শয়তানের হাসিযোগে—তা তুমার যে বেটা বটেক, তা জানব কেমুন করে হে। তা দেখে বুঝলাম। বেশ তেজী বটেক তুমার বিটা।—এখন মুখে বিড়ি গায়ে ধবধবে সাদা জামা, লুঙ্গি। দাওয়ায় পা গুটিয়ে বাবুর মতো বসে। কেমন যেন বেমানান, মা লম্ফের লালচে আলো ছড়ানো দাওয়ায়, বাবার কোমরে জড়ান এক চিলতে লাল কাপড়, রুক্ষ্ম চুল, খোঁচাখোঁচা দাড়ি-গোঁফ, ছেঁড়া কাঁথা, মাটির ভেজা দাওয়ায় ছড়িয়ে থাকা কালো রোগা দেহের সব ভাইবোনেরা মাঝে বাবুবাবু চেহারার মানুষটা। বাবার মুখেও হুসহুস বিড়ি। কালো আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র। তবু চতুর্দিকে অন্ধকার। ঐ আকাশে চাঁদ ওঠে। ধরম নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে কিছুকাল চাঁদের ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়ল। কে জানে কেন কখনও গোল, কখনও হোঁসোর মতো, কখনও কাস্তের মত চাঁদ হয়। চতুর্দিকে আলো ঝলমল করে। জ্যোৎস্না হয়। একবার চোখ ঘুরিয়ে মানুষটার মুখ দেখতে হলো। বাপ বলল, তাহলে তুমি সুখেই আছ নাকি হে। ওপাশ থেকে ওঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করা ছাগলের মধ্যে কোনটা যেন চাপ খাওয়া শব্দ করল। বাপ বলল, ওগো দেখ, ছাগল চিচাছেক কেনে! মানুষটা বলল, সুখ। ইখানে সুখ কুথা ভাই, দীর্ঘশ্বাস ফেলল জোরে। বলল, শুনিস নাই একতারা নিয়ে গুপীবাবাজী বলত নাই, হিথায় সুখ ত নাই ভাই, সুখের লেগে ছুটাছুটি জীবন চলে যায়। শব্দ করে তারপর হাসল, তা তুমার আর সুখের ভাবনা কি হে ভুবন। তুমি খারাপ কুথা আছ? ছাগল বিচছ, চাষ করছ, ভাত খেছ। কিন্তুক আমরা.......! মানুষটা থামল।

ভুবন কথা বলল না। হাঁ করে চেয়ে রইল মানুষটার দিকে। শহুরে মানুষ এখন। আসানসোল। যেন তেন শহর নয়। কয়লা, ভোঁ ভোঁ গাড়ি, ট্রেন, কারখানা, ঘটাং ঘটাং শব্দ, ভুবনের মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে। অমন মানুষ তার ঘরে ছেঁড়া চটে বসে। বুকটা যেন আপনা আপনি ফুলছে। এককালে বন্ধু ছিল, কিন্তু এখন! সে কথা যাক। এক কালে তার যৌবন ছিল, এখন? কাল চলে যায়। অন্য কাল আসে। তখন সব আলাদা। জীবন যৌবন সুখ দুঃখ সব রঙ বদলায়, চেহারা পালটায়। ভুবন অত কাল পরে যেন টের পেল যৌবন গিয়েছে, বয়স হয়েছে। সামনের বাবু চেহারা সুখী মুখ বুকের ভিতর ফিস ফিস করে বলে দিল—ওহে ভুবন তুমি সুখ কি জানলে নাই। ইপাশে তোমার যে গরুর গাড়িটো ঘর ঢুকল হে। ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমার ত খারাপ নাই। মানুষটা এবার খলখলিয়ে হাসল, শহরে এখন খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট হে। খালি পয়সা। আর কুছু নাই। ভুবন লুফে নিল কথাটা। কানের পাশে পয়সার আওয়াজ ঝনঝন করছে যেন। খালি পয়সা, খালি পয়সা। ভুবন বলল, তা আমাকে নিয়ে চল কেনে। মানুষটা বলল, তুমাকে লয়। তুমার ধরম বেটাকে নিয়ে যাব ঠিক করেছি। সুখী এতক্ষণ নীরবে শুনছিল, এখন বড় বড় বিস্ময়ের

চোখে তুলে ঘাড় লম্বা করল, ছানা নিয়ে ঘোরা মুরগীর আচমকা কোনো শব্দ পাওয়ার মতো। ধরম দ্রুত ঘাড় ফেরাল। বুক দপ দপ করছে। ভুবন যেন ইয়ার্কি এমন বলে করে উ ত ছুটু ছেলে বটেক। মানুষটা প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, ছুটু কুথা হে? বেশ ডাগর হুনছেক। মাস মাস তুমার টাকা আসবে। ভাবনা কি বটেক? তুমার ত ছেলেপিলের ভাবনা নাই। একট কাছে না থাকলে কি ক্ষতি হবেক? বুঝলে কি না তুমার বিটাকে দিখার পর ঠায় ভাবছিলাম উ কথাটো। তুমার ভাল হবেক। আমার কাছে থাকবেক, ভয়-ভাবনা কুছু নাই।

ভুবন নীরব। ধরমের বুক ঠক ঠক করছে, চোখে জ্বালা। ওদিকে অন্ধকারও ঘন। অনেক ডাক—মানুষ গরুর পাখির বাতাসের—থিতিয়ে আসছে। আকাশের নক্ষত্রেরা খোলার খইয়ের মতো একটার পর একটা হয়ে সারা আকাশময় দ্রুত বাড়ছে। ধরমের গা জ্বলছে এবার। চাপ চাপ ঘাম। বাতাস নেই। সে উপুড় হয়ে লম্ফের লালচে আলোয় বাবা মা এবং মানুষটার অন্ধকার-ডোবা মুখের এখানে ওখানে আলোর ছিটেফোঁটা পড়ার দিকে একবার তাকাল। ভুবন এ-সময় বলল, আমি ভেবেছিলম—একটুস ডাগর হলে উকে চাষে নামিন দুব। মানুষটা বলে উঠল, উতে কিছু হবেক নাই। ভুবন সাড়া দিল না। কানের পাশে পয়সা ঝনঝন করে বাজছে। কারখানা ধোঁয়া, পয়সা, ভুবন বলল, ঠিক আছেক, উকে তোমার হাতে দিলাম। মানুষটা বলল, কাল উকে নিয়ে যাব। সুখী যেন ওপার থেকে এতক্ষণে বলে উঠল, কাল! মানুষটা পকেটে হাত ভরে দুখানা দশ টাকার নোট বের করে বলল, লাও, এক মাসের আগাম টাকা।

মানুষটা চলে যাবার সময় ঘরের মধ্যে আশ্চর্য নীরবতা ঢেলে দিয়ে গেল। ভুবনের ঘামে ভেজা মুঠোর ভেতর দুখানা দশটাকার নোট। আকাশে আরো কিছু নক্ষত্র। চতুর্দিকে অদ্ভুত নীরবতা। কানাইয়ের ট্রানজিস্টার ঘরের মধ্যে এখনও কুঁই কুঁই করছে। রাশি রাশি অন্ধকার আতাঝোপে আঁকড় ঝোপে মাটির ঘরগুলোর ওপর হড়হড় করে পড়ছে। এ সময় ধরম উপুড় হয়ে ছেঁড়াচটের থলেতে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছে। ঘাম জবজব বুক ধকধক। মাঠঘাট, ধানক্ষেত, ভেজা জমি, খেজুর গাছ, কুলপাতা, বটতলার ছায়া, ভিজে ভাত, পেঁয়াজ এবং খুকারে—এখন ধরমের বুকের মধ্যে রক্তের ভিতর মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিপুল আলোড়ন তুলে গাঢ় কান্না এনে দিয়েছে। ওদিকে সুখী—আমি ছেলে দুব নাই! পুল করতে ছেলের মাথা লাগে—বলে একটু থেমে পায়ে পায়ে স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে বলছে, শুন নাই, তুমি শুন নাই পুল করতে ছেলের মাথা লাগে। হেই মাগো, তুমি কী করে টাকা লিলে গো। আঁ! ভুবনের হাতের মুঠোয় মাস মাস টাকা আসার স্বপ্ন, কারখানা, ধোঁয়া, বাবু বাবু চেহারা, পয়সার ঝনঝন। বলল, তুর কি মাথাটো খারাপ হনছেক নাকি? পুল করতে ছেলের মাথা লাগে। সি সব দিন নাই। এখুন গমমেট উ-সব মানে না। আগে মানত। তখুন সাঁকো বাঁধতে ছেলের মাথা লাগত। বিটা বিটি চুরি হত। ই ত চিনা

মানুষ। যাক কেনে বিটা। একট গেলে তুর ক্ষেতি কি! ভুবন উঠানের বারান্দায় অন্যান্য সন্তানদের চটের থলেতে পড়ে থাকা দেখল। তারপর সুখীর দিকে তাকাল। সুখী কবে যেন একটা সন্তানের জন্ম দেবে। ভুবনের ঠিক হিসাব নেই। রাখে না। ও ঘরের খয়েরী পাঁঠি, সাদা পাঁঠি, চাঁদি ইত্যাদি ছাগীকুল কখন সন্তান দেবে এর হিসেব মোটামুটি জানা। ঘরে এখন কুলুচ্ছে না। গায়ে গায়ে থাকে সব ছাগলগুলো। তার জন্যে আজকাল রাতেও শব্দ করে। সকালবেলায় মলমূত্রে ভরিয়ে দেয় ঘর। ভেতর থেকে একটা ঝাঁঝাল গন্ধ বের হয়। খুকাকে খাসি করা হয় নি। এদিকে সময় হয়ে আসছে। গায়ে বোটকা গন্ধ ছড়াবে। ভুবন ভেবে রেখেছে খুব শিঘ্রি ওকে বিক্রি করা হবে। এই পূজোতেই। মায়ের থানে বলি হবে। পূজোর সময়ই দাম। মানত রাখলে নোট খসাতে লোকে কসুর করে না। তারপর খাসি আছে। তখন ঘর কিছু খালি হবে। আবার কিছু ছাগশিশু কুঁই কুঁই করবে।—একটা গেল ক্ষেতি কি, বলে সুখী ফোঁপায়—তুমি কি মানুষ লও গো? আঁ অমন কথা তুমি বলতে পারলে। জিভট তুমার পুড়ে গেল নাই। আঁ, দয়া মায়া বুকে কিছু নাই—বলে মাথার চুল এলিয়ে দু-হাঁটুর ফাঁকে মুখ রাখল। পিঠ ওঠানামা করতে থাকল, মাথা কাঁপছে। খুব জোরে নয়, শুধু শরীরে ফোঁপানির তালে তালে আলোড়ন। ভুবন—সাধে বলে মেয়েমানুষ—বলে এখন কোমর থেকে বিড়ি বের করে ধরাল। রুদ্ধ কান্না, শরীরের আলোড়নে যে শব্দ আসছে—তা ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট এবং ভুবনের কাছে অর্থহীন।

ধরমের কোন শব্দ নেই। শুধু ফোঁপানির শব্দ। উপুড় হয়ে ছেঁড়া চটের ভিতর ঢুকছে। অন্ধকার আরও ঘন। সারা গাঁয়ের উপর নিশীথের চাদর বিছানো। সূর্য পূর্বের গর্ভে। আলো অনেক অনেক দূরে। শুধু ফোঁপানির কান্না সহযোগে—ছেলের মাথাতে পুল হবেক.... বাবা গো আমাকে বিচবে নাই, আমি যাব নাই, অ খুকা তুকে ছেড়ে যাব নাই। ই গাঁ মাঠ....মেয়েমানুষের বড় মায়া। দু-ঘরের দুটো সংসার। একট থেকে একট গেল। টাকা আসবেক......তুমার বিটা দেখে ভাবলম একট গেলে ক্ষতি কি.....এই ঘরে উঠোনে অন্ধকারে বাতাসে পাকে পাকে জড়িয়ে একটা জটিল আবর্ত তৈরি করে ফেলল। এবং এক সময় ভুবন তার উরুতে চাপড়ে দিয়ে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে বলে উঠল, শালা, আমার বিটা বটেক, আমি জানি নাই উর কত দাম হবেক? ভুবনের মুঠোর ভেতর নোট দুখানা ভিজতে লাগল।

প্রাণধর্ম

প্রতিবন্ধী শব্দটা কাশী এই প্রথম শুনল। নতুন শব্দ আক্‌ছারই কানে বাজে। প্রতিক্রিয়া হয় না। হাটে-বাজারে এখানে ওখানে কত অপরিচিত শব্দই তো শুনতে হয়। কিছু অবোধ্য কিছু বোধগম্য। নিষ্প্রয়োজনে শুকনো পাতার মত টুপ করে গা ছুঁয়ে পড়ে যায়। ফিরে দেখারও প্রয়োজন পড়ে না। নিছকই তা শব্দ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কতই তো শব্দ। প্রতিবন্ধী শব্দটা তার উপবই বর্ষিত। নতুন সংযোজন। সুতরাং মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। মনে মনে দু'বার উচ্চারণও করে সে।

কাশীর বাঁ পায়ে ঘাটতি রয়েছে। ছোট, দুবলা, ঈষৎ বক্র। জন্মের পর থেকেই। টেনে চলতে হয় কষ্ট করে। ফলে ল্যাংড়া এবং খোঁড়া অভিধা। প্রতিবন্ধী সম অর্থবহ। কিন্তু খোঁড়া কিংবা ল্যাংড়ার মত কুৎসিত সূচাল বল্লমের খোঁচা কি ভোঁতা কাটারির কোপ নয়। শব্দটা বেশ পরিচ্ছন্ন ভব্যসভ্য এবং শ্রুতিমধুরও বটে।

ফলে কাশী খুশি বোধ করে। নতুন জামাকাপড় পরলে যেমন নিজের রূপ-সংক্রান্ত বোধে সজাগ হয়ে ওঠে, যেমন নতুন মনে হয় নিজেকে, অবিকল সে অনুভূতি কাশীর। কাছে আয়না থাকলে নিজেকে সে দেখে নিত।

কাশীর বয়স ছাব্বিশ। মাঝারি স্বাস্থ্যের ফরসা যুবক। লুঙ্গির উপর হাফশার্ট পাটাল বুকে। নাক মুখ চোখ যথেষ্ট শ্রীময়। সরু করে কামান গোঁফ। বসে থাকলে পায়ের দুবর্লতা পরিলক্ষিত হয় না। মুখে টুকরো হাসি ঝুলে থেকে বেদনাকে ফুটতে দেয় না। খাড়া নাক, শক্ত চোয়াল, চিবুকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী ভাব আছে। উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু লেখাপড়া হয়নি। ক্লাশ সিক্সে দু'বার ফেল। ঘরেই বসে থাকত। বছর চারেক হল মদন সৌ'য়ের শ্রীদুর্গা বিড়ি ফ্যাক্টারিতে বিড়ি বাঁধছে। সকালে যায় সন্ধ্যায় ফেরে। নলপুরে ফ্যাক্টারি, বুনগড়া থেকে দু'মাইল রাস্তা। মাটির সড়ক।

কাশীরা চার ভাই। বড় শ্রীনাথ অন্ডালে রেলে চাকরি করে। গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে বছর সাল জমির ধানের ভাগটা নিতে আসা। মেজ শিবনাথ স্কুল পিওন। দাদার কাছে প্রায়ই যায়। বড়র পক্ষে বরাবরই। সেজ ত্রিনাথ গাঁয়েই থাকে। জমি মাপ-জোকের কাজ জানে। নিজেই চাষ করে। ঘর ভাগাভাগি। তিন ভাইয়ের তিনটে রান্নাঘর। ভাগের মা ছোট কাশীনাথের দিকে। জমি পাঁচ ভাগ হয়েছে। মায়েরও একটা ভাগ। মা মারা গেলে অংশটা চার ভাইয়ে বর্তাবে। এখন কাশীনাথের অধিকারে। কাশীনাথের মা রোগাভোগা নয়। বেঁটেখাটো শক্ত মেয়ে-মানুষ। গ্রাহ্য করে না বৌয়েদের। সেবা প্রত্যাশীও নয়।

একটু আগে প্রতিবন্ধী ভূষণটা কাশীকে দিল অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ সাহা। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। কালো রোগা কাঠামোয় ধুতির উপর ধবধবে সাদা শার্ট। টেকো মাথা। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। হাতে ঘড়ি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। বুনগড়া স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক। তুখোড় বক্তৃতাবাজ। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী চন্ডী মণ্ডল আর তার দলকে তুলোধুনা করে স্রেফ কথায়। কণ্ঠস্বর উঁচু-নিচু করে, আবেগ, অলঙ্কার, মজার কাহিনী শুনিয়ে লোকের বাহবার সঙ্গে ভোটও কুড়িয়েছে। সবাই ভেবেছিল সুখের হাতে শেকল পরিয়ে গাঁয়ের মাটিতে এনে দিয়ে বলবে, লাও, এবার তোমরা কি করবে কর।

'এই যে কাশী, তোমাকেই খুঁজছিলাম। ভরতকে বলেছিলাম। বলেনি তোমাকে?' সাইকেল থেকে ঝুপ করে নেমে বলল, 'দেখা হয়নি নিশ্চয়! তুমি তো সারাদিন নলপুরে। যাক্‌গে একবার পঞ্চায়েত অফিসে এসো। কাল, না হয় পরশু। দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।'

কাশী অপলকে চেয়েছিল। কিছু করার জন্য সে তো আবেদন জানায় নি।

'বুঝতে পারলে না তো?'

কাশী বলল, 'না।'

অনিরুদ্ধ হাসল, 'বুঝলে, তুমি তো প্রতিবন্ধী। মানে জান? পায়ের তোমার অসুবিধে রয়েছে না। এই যে কষ্ট করে হাঁটছ। মানে—।' অনিরুদ্ধ মুহূর্তকাল থমকে থাকল। খোঁড়া বলবে না বলেই পায়ের অসুবিধা বলল। আবার ওই শব্দটাই ফসকে যাচ্ছিল। বলল, 'অন্ধ, খঞ্জ, তারপর ধর বোবা হাবা এরা সব প্রতিবন্ধী। শরীরের ঘাটতি জীবন চলার প্রতিবন্ধক। এই দুর্বল শ্রেণীকে দেখার দায়িত্ব সমাজের। আদিম যুগে, দুর্বলকে সবলে সংহার করত। এখন দুর্বলকে রক্ষা করা মানুষ নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে। আমাদের রাষ্ট্রও এর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নানারকমের সাহায্য দিচ্ছে সরকার। তোমাকে সাহায্য দেওয়া হবে। যাতে তুমি দাঁড়াতে পার।'

কাশী অবাক হয়ে শুনছে। খুঁড়িয়ে হাঁটাটা যে একটা যোগ্যতা সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। বিস্ময় তার জন্যও কিছু কম নয়। প্রাপ্তি ঘটবে এর ফলে।

'যাক্‌গে বুঝলে তো। চলছে কোথায়? বিড়ি ফ্যাক্টারিতে? তা হেল্প পেলে তুমি তখন নিজেই একটা বিড়ি ফ্যাক্টারি খুলতে পারবে। সারাদিন তো দশ টাকাও হয় না।' ওধার থেকে সাইকেল থেকে নামল সন্তু। তার দিকে চোখ রেখে অনিরুদ্ধ বলল, 'সন্তু যে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পরশু যেতে বলেছে। শুনেছ তো।' আবার কাশীর দিকে চোখ রেখে বলেছে, 'তাহলে যাও কাশী।'

প্রতিবন্ধী শব্দটা তারপর থেকেই সঙ্গী। পা টেনে চলার সঙ্গে বুকে ছলাৎ ছলাৎ করে বেড়াচ্ছে। দিব্যি অনুভূত হচ্ছে শব্দের মর্যাদা। পঞ্চায়েত এখন প্রবল প্রতাপান্বিত মহিমাময় জমিদার। প্রধান বড়বাবু। মেজ, সেজ, ন ছোট সব সদস্যবৃন্দ। তাঁদের নিয়ন্ত্রণেই গ্রামজীবন। বিচার আচার, সুখ-অসুখ। অনুগ্রহ

দানের জন্য তাকে আহ্বান। যাবে বৈ কী কাশী। কালই যাবে। জন্ম ইস্তক জানা ছিল ঈশ্বরের এ অভিশাপ। পূর্বজন্মের পাপের ফল। পূর্বজন্ম বলে কিছু আছে কী? পাপ? কী পাপ?

ভগীরথ ঠাকুর বলে, 'বল কী! পূর্বজন্ম নাই? স্মরণে নাই তোমার। আরে পূর্বজন্মের পাপ-পূণ্য নিয়েই তো মানুষের পরের জন্ম। নইলে আমি বড়লোকের ঘরে জন্ম নিলাম না কেন বল। কেন বিড়ি বাঁধছি। এমন অন্নকষ্ট!'

ভগীরথের কুচকুচে কালো বর্ণ, গোলগাল চেহারা। বেঁটেখাটো। চাপা নাক। টেকো মাথায় সামান্য চুল। চারটি ছেলেমেয়ে। জমি আছে বিঘে দুয়েক। অন্যে চাষ করে। ভগীরথের কথায় কথায় শাস্ত্রবাক্য এবং দেবতার আখ্যান শোনানোর অভ্যাস। দেবভক্তিও অগাধ। বাল্মীকি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম, কালীপ্রসন্নের মহাভারত, ভাগবত, গীতা, চণ্ডী, সারাবলী ইস্তক শাস্ত্র রয়েছে ঘরে। বাপের সংগ্রহ। পাঠ করে ভগীরথ। কুমোর পাড়ায় গ্রীষ্মের সন্ধ্যাবেলায় এ বছর রামায়ণ ধরেছে। রোজ একঘন্টা পাঠ। শ্রোতারা সিধে দেয়। চাল, আলু, পটল, তেল, নুন। সম্পূর্ণ পাঠ হলে ত্রিশ টাকা দেবে। একটা ধুতিও সঙ্গে।

ভগীরথ ঠাকুর বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে ধর্মের আখ্যান শোনায়। সত্যের জয় মিথ্যের পরাজয়। দুষ্টের দমন শিষ্ঠের পালন। পাপের সাজা পূণ্যের সমৃদ্ধি। কিন্তু সবকিছুই তো শাস্ত্রবদ্ধ। সকলই অতীত এবং ইতিহাস। বর্তমান বড় হতাশ করে। কাশী ভাবে, পরজন্মে অশুভকর্মের ফল মানুষগুলি পাবে, এমন একটা সম্ভাবনায় অবশ্য সুখ।

পরজন্মে কাশী কী অপরাধ করেছিল, কী সাঙ্ঘাতিক পাপ, নলপুর যাবার পথে সে ভাবছিল, অনিরুদ্ধদা যা বলল তাতে তো এই খোঁড়া হওয়াটা দেখা যাচ্ছে সৌভাগ্য-সূচক। সুযোগ পাবে সে এরই জন্যে।

খটখটে শুখো রাস্তা। আকাশে মাত্র কটা সিঁড়ি ডিঙিয়েই সূর্য তাপ উদগীরণ করতে শুরু করেছে। দিন কয়েক আগে কালবৈশাখী মাতলামি করে গিয়েছে। তারপর কেবলই তাপদগ্ধতা। কাশী হাতের ছাতাটা খোলে। বারটায় খেতে আসার সময় ছাতাটা খুলতে হয়। আজ সকালেই ছাতা খুলিয়ে ছাড়ল।

মদন সৌয়ের বিড়ি ফ্যাক্টারিতে সাতজন কর্মচারী। খড়ো চাল লম্বা ঘর। খেজুর পাতার তালাই বিছানো আছে। একদিকে বিড়ি পাতার স্তুপ। বিড়ির প্যাকেট। ভগীরথ বিড়ি বাঁধতে বসে গিয়েছে। ওদিকে শ্রীধর আর সুবোধ। ধনঞ্জয় বিড়ির বাণ্ডিলে লেবেল বসাচ্ছে। নিজের কুলোটা নিয়ে বসার মধ্যেই কাশী বলে ফেলল, তার নবতম ভূষণটির কথা এবং অনিরুদ্ধ সাহার প্রস্তাব।

ভগীরথ ঘাড় ঝুঁকিয়ে বিড়ি বাঁধছে। কাজ থামল না। চোখ তুলল কাশীর দিকে, 'প্রতিবন্ধী! এই প্রথম শুনলে! কেন প্রতিবন্ধক শোন নাই তুমি। প্রতিবন্ধক মানে বাধা। অঙ্গহানি জীবন পথে চলার বাধা। সেজন্যেই তোমাকে সাহায্য। যাতে জীবন পথে তুমি গড়গড়িয়ে চলে যেতে পার। ভাল। ভাল।'

শ্রীধর বলল, 'যা বলবে তাই বল সরকার গাঁয়ের কথা ভাবে।'

'সব ভাবনা, গাঁ পর্যন্ত আসতে দেয় নাকি? পঞ্চায়েত ত সব সমান নয়। দেখ না কাশীকে পাইয়ে দিয়ে নিজেরাও মুনফা করবে। কমিশন ঝাড়বে।'

'বাঃ কষ্ট করে ভোটে দাঁড়িয়েছে!' ধনঞ্জয় বলল, 'পেলে কে ছাড়ে! আরে কাজ তো হচ্ছে। কাশী, কী সাহায্য করবে? লোন! ডি আর ডি এ!'

ভগীরথ বলল, 'কাশীর জন্যে নির্ঘাত বিশেষ ব্যবস্থা। হয়ত দেখবে পুরোটাই অনুদান। লোন কিছুই না।'

'তা সত্যিই মাইরি, এত লোন হয় জানা ছিল না। শুয়োর, ছাগল, হাঁস, মুরগী, গরু পুষতে লোন।' সুবোধ বলল, 'আমাকেও গাই কেনা লোন দেবে বলেছে।'

ভগীরথ বিজ্ঞের মত বলল, 'লোন শোধ করছে সব? খবর নিয়ে দেখ।'

'আরে এর সঙ্গে অনুদান আছে। যা নেবে শোধ দিতে হবে না।'

পঞ্চায়েত, ঋণ প্রসঙ্গ, সদস্যের ভূমিকা, ভালমন্দ আলোচনা চলতে থাকল। সকলেরই হাত কিন্তু ব্যস্ত। মাথা নিচু। মজুরি উৎপাদনের উপর। আঙ্গুলে ছাই মাখছে, পাক দিচ্ছে, সূতো পরাচ্ছে অদ্ভুত এক যান্ত্রিকতায়।

দুপুরে খেতে আসবার পথটাতেও কাশীর মাথায় প্রতিবন্ধী শব্দটা ঘুরছিল। সামনাসামনি না হোক, সকলেই তাকে খোঁড়া কাশী বলে। কখনও কখনও মুখ ফসকে অনেকের সামনেও বেরিয়ে যায়। প্রতিবন্ধী বললে ঢের শোভন হয়।

মাটির সড়ক আগুন সেঁকা। চতুর্দিকে যেন হাজারো উনুন জ্বলছে। মানুষজনও নেই। কাশী আগুনের ছ্যাঁকা খেতে খেতে ভাবে, এর পর সে খেতে আসবে না। দশটা নাগাদ খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যেতে ফিরবে। হুঁ, কাল থেকেই। কাল তো আবার পঞ্চায়েত যেতে হবে।

অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিস মাঝ গাঁয়ে। ইউনিয়ন বোর্ডের মাটির ঘরে ক'বছর চালানোর পর একতলা তিন কামরা ঘর করা হয়েছে। সামনে বারান্দা। পাঁচিলে ঘেরা কাঠা তিনেক জায়গা। বাড়ির চারদিকে ফুলের গাছ। ইউক্যালিপটাস দুটো সামনে। মাঝে বৃত্তাকার ইঁটের ঘেরা। একটা বাঁশ পোঁতা আছে। পতাকা উত্তোলিত হয় উৎসবে। স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র এসব দিনে। কাঠের গেটের পরই মাটির সড়ক। পরদিন এগারটা নাগাদ গেটটা সরিয়েই কাশী দু'পা বাড়াতেই বারান্দায় অনিরুদ্ধ, 'এসো কাশী, ভূপেনদা আছেন। তোমাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম।'

বারান্দায় তিনটে সাইকেল। উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে চৌকিদার কালী। তার পাশে দফাদার ভুবন। ওদিকে পাশের গাঁয়ের আরও দু'জন চৌকিদার। সকলেই চোখ তুলে কাশীকে দেখছে।

ঘরে ঢুকতেই সামনে সাজান ক'টা চেয়ার। বড়সড় টেবিল। বসে আছে সেক্রেটারি দীপক। সামনে ফাইল মেলা। চোখে চশমা ভূপেন ব্যানার্জী প্রধান। ধুতির উপর আদ্দির পাঞ্জাবি, ভরাট স্বাস্থ্য।

অনিরুদ্ধ চেয়ারে বসল না। বলল, 'বস কাশী, ভূপেনদা তোমার জন্যে একটা

সেলাইকলের ব্যবস্থা করছে। খুব শীঘ্রি পেয়ে যাবে।'

কাশী অবাক চোখে তাকাল। বলল, 'সেলাই কল! কিন্তু আমি তো মেসিন চালাতে জানি না।'

ভূপেন ব্যানার্জী বলল, 'শিখে নেবে। আমি অবশ্য ব্লকে বলে এসেছি, তুমি জান। বুঝলে, না করো না। তোমার বিড়ি বাঁধার চেয়ে ঢের ভাল। শিখতে ক'দিন।' একটু থেমে বলল, 'দীপক, কাশীকে দিয়ে সব সইটই করিয়ে নাও। বুঝলে কাশী, কাল একবার আসবে। উঁহু, পরশু এস।'

দিন দশেকের মধ্যে সেলাই কল পেয়ে গেল কাশী। প্রাপ্তিতে সে যত না খুশি হল, তার চেয়ে বেশি খুশি হল মা। খুশির কারণ সর্বাণী। বাণী। চাঁদুজ্যাঠার মেয়ে।

সর্বাণীকে ওর স্বামী নেয়নি। শ্বশুরঘরে মাসটেক ছিল মাত্র, তারপর চলে এসেছে। কালো রঙ, মাথায় স্বল্প চুল, বে-ছাঁদ দাঁতের সারি, কপাল কিছুটা বাড়তি উঁচু। সাজসজ্জা না করা এবং দুঃখী মানসিকতা কোন সৌন্দর্য গড়ে না।

কাশী যুবতীর মধ্যে অন্য সৌন্দর্য টের পায়। ওর হৃদয় নামক ভান্ডারটির নানান প্রকোষ্ঠে ঐশ্বর্য অপরিমিত। তাদের ঘরে উজাড় হয় অনেক কিছু। মা স্নেহ করেন। মেয়েও হাত বাড়িয়ে কাজ করে। যখন-তখন ঘরে আসে। কাশীর সঙ্গে সম্পর্ক বলতে ওর জন্যে বুকের মধ্যে একটা কষ্টের পোকা লালন করা।

চাঁদুজ্যাঠা মারা গিয়েছে। দাদার সংসার। বৌদির যন্ত্রণা বাণী। শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারলে বাঁচে। বাণীর বর বছর খানেক হল বাস অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। শ্বশুরঘর থেকে খবর দেয় নি। অশৌচ এবং শ্রাদ্ধাদি কর্মেও ডাকেনি। তবে বাণীর বৌদি সিঁদুর মোছা এবং থান কাপড় পরান কর্মটি করেছে। ক'দিন পরই অবশ্য দাদা থান পরা বন্ধ করেছে। বলেছে, আইবুড়ো মেয়ের মত থাকবি। ওটা আবার বিয়ে নাকি? মাছ-মাংস খেতেও জোর করে। বাণী খায় না। দাদার স্নেহের জন্যে বৌদির উপর রাগ বাণীর বাষ্প হয়ে যায়।

মা বলল, 'সেলাই কল পেয়ে ভালই হল। বাণীর হিল্লে হল।'

'বাঃ বাণী কল চালাতে পারে?'

'ওর বাবা তো গাঁয়ের একমাত্র দর্জি ছিল। বাণী সব শিখেছে।'

বাণী বলল, 'না মা সব জানি না। এখন কত নতুন ছাঁট-কাট হয়েছে।'

'শিখে নিবি। গাঁয়ে চলবে। শুধু তো মদনের কল রয়েছে। তুই মেয়েদের ব্লাউজ-সায়া করবি। ফ্রক করবি।'

কাশী বলল, 'বা-রে আমি?'

'তুই তো কাজ করছিস্। অবসরে শিখে নিবি। আমার বাণীর জন্যে ভারী ভাবনা ছিল। দাদা খুব স্নেহ করে। বোনকে দেখবে। কিন্তু বৌটা তো—। সেলাই করে দু'পয়সা রোজগার করলে তো আর মুখ নাড়তে পারবে না।'

কাশী বলল, 'মুখ নাড়ান যাদের স্বভাব, তারা মুখ নাড়িয়েই যাবে। বাণী

ঘরে করে না, কী? ঝি, রাঁধুনি কী নয়।'

বাণী বল, 'তুমি ছিট্ এনে দাও কাশীদা। আগে আমি মায়ের একটা সায়া তৈরী করব।'

সেলাই কল চালু করতে টুকটাক জিনিস পড়তে থাকল। নতুন জিনিস তৈরীর চেয়ে পুরোন ছেঁড়া সেলাইয়ের খদ্দেরই বেশি। আর পুরোন মানেই পঞ্চাশ পয়সা এক টাকা বড়জোর। বাণী দুপুরে সেলাই করে। পয়সা সে নেয় না। মায়ের কাছে জমা রাখছে। বলেছে 'খরচা করব না। জমুক কিছুদিন।'

বাণীর কাজ করাটা আলোচনার বস্তু হয়ে উঠতে দেরী হয় না। বাণীর বৌদি শুধু নয়, গাঁয়ে আরও মানুষ রয়েছে না। কাশীর দাদা বৌদি দুঃখী মেয়েটাকে 'আহা হা' করলেও ভাববে না, কিসের মোহে যুবতী আসে! পাড়ার লোকের শিরঃপীড়া হবারই কথা। প্রতিবন্ধী বলে কাশী সেলাই কল পেল, সে নিজেই চালাক না। বাণীর উপর এত দরদ কেন? যুবতী মেয়ে অবিবাহিত কাশীর মধ্যে কোন কাণ্ড ঘটছে কী না কে জানে।

নরেন নিজেকে সাচ্চা মানুষ, স্পষ্টবক্তা বলে জানে। জমি-জায়গা দেখেই কেটে গেল। দু'ছেলে অবশ্য চাকরি করে। একজন ব্যাঙ্কে অন্যজন স্কুল টিচার। পয়সা-কড়ি ইদানীং হয়েছে। বলল, 'কাশী তুমি বিড়ি বাঁধতে যাও?'

'হ্যাঁ। যাই।'

'তাহলে সেলাই কলটা কী হচ্ছে? ঠিক কথা, কে যেন বলছিল বিভুর বোনটা নাকি চালাচ্ছে? ব্যাপারটা কী ঠিক হচ্ছে। যুবতী মেয়ে। তোমার ঘরে গিয়ে কাজ করছে।'

কাশীর চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। বলে, 'সেলাই কলটা আমাকে দিয়েছে। আমি যাকে খুশি দিয়ে কাজ করাতে পারি।'

'বটেই তো। তবে কথা হচ্ছে। তাই বলছি।'

মেজবৌদি বলল, 'ঠাকুরপো, বাণীর সঙ্গে তোমাদের বরাবরের ভাবসাব। কিন্তু সেলাইয়ের কাজ করাতে এখন লোকে যা তা বলছে।'

'কেন, বলছে বল দেখি।'

'যুবতী মেয়ে। সময়টা তো খারাপ।, দেখতে খারাপ, কিন্তু শরীরের ধর্ম—। তুমি খুব ভাল ছেলে। আমরা জানি। সবাই তো বিশ্বাস না করতেও পারে ভাই।'

বিড়ি কারখানায়ও কথা হয়। বাণীর সম্পর্কে কৌতূহল সব গাঢ়। যেন বাণীকে সেলাই করতে দেওয়ার ব্যাপারে তার গভীর একটা উদ্দেশ্য আছে। সে গোপন করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কও আছে। কাশী বিতর্ক করে না। সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে মনে মনে। ভগীরথ পর্যন্ত ভ্রু কুঁচকে বলেছে, 'কাজটা ভাল করছ সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা কী জান মানুষ নিজের খবর নিজেই জানে না।'

এসবের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কাশীর মনে প্রচন্ড আঘাতকারী সংযোজন ক্রন্দনরতা বাণীর নিবেদনে, বৌদি আসতে দেবে না। বলেছে তাহলে ওখানেই থাকতে হবে। বাণী অবশ্য বলে, সে থেকে যেত। কিন্তু রোজগার তো এই সেলাই কলের এতই কম যাতে একবেলারও অন্ন জুটবে না।

মা বলে, 'তোর দাদা কী বলে?'

'দাদা কী বলবে? দাদার সামনে বৌদি ভালমানুষ। দাদা না থাকলেই তো—।' বাণী কথা শেষ করতে পারে না।

'দাদাকে বলবি। দাদা তো বলেছে, সেলাইয়ের কাজ করছিস্ খুব ভাল।'

'দাদাকে সব কথা বলা যায় না।' বাণী আঁচলে চোখের জল মুছে বলে, 'কত বলব। দুদিনেই দাদা বিরক্ত হবে। সকালে বেরিয়ে সেই রাত্রে ফেরে। দোকানের কাজ। পরিশ্রম কী কম। তারপর সংসারের অশান্তি। আমি তো বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করি না। যা বলে শুনি। যদি আসতে না দেয়—।'

মা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তবে বিকেল বিকেল ফিরে এসে ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কাশী বলে, 'আমি কিছু করবই।'

'ওমা, তুমি কী করবে। আমার বিধাতা পুরুষই তো আমার জন্যে কিছু করতে পারে নি।' বাণী আলগা হাসে।

হাসিটা ছোঁয় না কাশীকে। সে জেদের সঙ্গে বলে, 'দেখ না কী করতে পারি।'

বাণী বড় বড় চোখে তাকায়।

কাশী দেখে, বাণীর মুখে কোন কথা নেই। কিন্তু সুগভীর এক প্রত্যাশা। বাণীর কিসের আগ্রহ তাদের ঘরে আসার? মায়ের স্নেহ? তার তো অসহায়ত্ব টের পেয়েছে। তবু কাকে ভরসা? কাশীর মনে হল, যে দ্বন্দ্ব, হাত বাড়ানর জন্যে যে সঙ্কোচ, বাণীকে রক্ষার যে পরিকল্প মনে তমসাচ্ছন্ন ছিল, তা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে একটা শক্ত জমি। সবুজ ঘাস বিছান। নির্ভয়ে পা রাখতে পারে।

বাণী দাঁড়ায় না। চলে যায়। সন্ধ্যেবেলায় মা রুটি করছে। দাওয়ায় বসে আছে কাশী। কিভাবে সে কথাটা পাড়বে তারই মগ্নতা। হ্যারিকেনের আলো ছিটকে পড়েছে উঠোনে। ওদিকে দাদাদের ঘরে ভাইপো-ভাইঝিরা পড়ছে। জ্যোৎস্না নেই। নিকষ কালো অন্ধকারে গাছগাছালিতে শব্দ উঠছে। তাপের শীর্ষে ধরিত্রী সন্ধ্যায় বাতাসের হাত ধরে যেন ঢালে নামছে।

'মা একটা কথা ছিল।'

মা ঘাড় ফেরাল কোন শব্দ না করে।

'আমি সর্বাণীকে বিয়ে করব।'

একটি মাত্র বাক্য। চমকে ওঠা মায়ের বুকে যেন আর্তনাদ হয়ে ফিরে এল, 'কী বললি, তুই!'

'শুনলে তো। ওকে ত' তুমিও ভালবাস।'
'ছিঃ ছিঃ! মনে এই মতলব ছিল! বিধবা মেয়ে!
'তাতে কী। বিধবা বিয়ে আইন সঙ্গত।'
'আমি গলায় দড়ি দেব। বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।'
কাশী শান্ত গলাতে বলল, 'রুটি পুড়ে যাবে মা। ওদিকে দেখ।'
'যাক্ পুড়ে। আগড়া-কুগড়া ওই মেয়েটাকে দেখে—ছিঃ ছিঃ।'
কাশী বলল, 'রূপই সব নয়। আমার অন্যায়টা কী দেখছ?'
'বিয়েই যদি করবি তো মেয়ের অভাব!'
'কে বলেছে! মা, তুমি বাণীকে ভালবাস না?'
'ভালবাসি বলে কী তাকে বৌ করতে হবে নাকি?'
'চেঁচিয়ো না মা। পরিষ্কার করে বল, আপত্তিটা কিসের।'
'সব দিকেই আপত্তি। আমি এ বিয়ে হতে দেব না।'

কাশী কী এতদিনেও মাকে চেনেনি! বাণীর উপর এত স্নেহ-ভালবাসা চকিতে চলে গেল কোথায়? মা কী দেখতে পায় না ওর কষ্ট? সহানুভূতি কী নিছকই মুখের? না, হয়ত তা নয়। কিন্তু নিজের পুত্রকে যে ভূমিকা নিতে হচ্ছে, তখনই বোধকরি সব কিছু বদলে যাচ্ছে। আশ্চর্য! কী করে মাকে বোঝাবে? হিসাবের এতবড় গন্ডগোলটা সে কী করে মেটাবে? মা যে বাধা দেবে এটা তার ধারণা ছিল না। একটা স্রোত বইতে বইতে যেন শক্ত প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে পড়ল। আঘাতে দীর্ণ কাশী ঝিম হয়ে বসে থাকে। মা ঘাড় ফেরাচ্ছে না। রুটি সেঁকে যাচ্ছে। সামনের উনুনের মতই উত্তপ্ত।

সহসা কাশীর মনে হয়, মাও তাহলে এক প্রতিবন্ধী। কী নেই মায়ের? কোন্ অঙ্গের ঘাটতি? মস্তিষ্কের? চেতনার? আশ্চর্য, সে কোথায় দাঁড়াবে? যারা সন্দেহ করে তার এবং বাণীর সম্পর্কে তারা প্রতিবন্ধী নয়? সরল ভাবনাকে বক্র করে দেখা, সরলতাকে সরল ভাবতে না পারা প্রতিবন্ধকতা নয়! সবাই প্রতিবন্ধী। এত ভাঙাচোরা মানুষের পৃথিবী। সে কোথায় দাঁড়াবে?

'মা, তুমি ভাব একটু।'
'আমার কিছু ভাববার নেই।'

কাশী শক্ত গলাতে বলল, 'কোথায় তোমার বাধা সেটা আমাকে বলতেই হবে। দেখাতেই হবে। নইলে আমি ছাড়ব না।'

মায়ের উত্তর নেই।

কিন্তু বাণী পরদিন ঘরের ভেতর ঢুকে মাদুরে ঝিম মেরে বসে থাকা তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত কৌতুকের হাসি হাসে। কৌতুকের না পাগলিনীর হাসি? মাথার চুল খোলা। উঁচু কপাল! প্রসাধনহীন কালো মুখে কমনীয়তার বদলে শুকো ভাব। শ্রীহীনতা আরও সোচ্চার। আধময়লা ছাপা শাড়ি, ব্লাউজ। পরিপাট্য নেই, শোভনতা নেই।

'আমাকে বিয়ে করবে বলেছো? ও কাশীদা, পাগল হলে নাকি?'

'কেন? তোমার কী আপত্তি আছে?'

'আমি যে বিধবা। বিধবার আবার বিয়ে হয়? ছিঃ ছিঃ।'

বাণীও এক প্রতিবন্ধী। বৈধব্যসংস্কার প্রতিবন্ধকতা। কাশীর মস্তিষ্কে বেজে ওঠে। তারপর বলে, 'আমি বিয়ে করব।'

বাণী হাসে। বলে, 'তোমার পেটে পেটে এত জানতাম না তো!'

কাশী উঠে দাঁড়ায়, 'আমার দিকে তাকাও।'

বাণীর হাসির বেগ যেন বাড়ে।

কাশী দুহাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিতে যেতেই বাণী সরে যায়। তারপর বলে, 'ছুঁয়ো না আমাকে। ছুঁয়ো না।'

'বাণী!'

'এগিয়ে এসো না। আমি তাহলে চেঁচাব কিন্তু।'

কাশী মূক শক্ত। হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার হৃৎপিন্ড প্রচন্ড শব্দমুখর হয়ে ওঠে। বেদনায় কুঁকড়ে যায়।

তাকে থমকাতে দেখে বাণী পেছন ফেরে। দেওয়াল ধরে যেন নিজের বেগ সামলাতে চায়। তারপর দুহাত বাড়িয়েও দেওয়াল ধরতে না পেরে বসে পড়ে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কাশী এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারে না। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেন এগুতে পারছে না? মা, বাণী, পাড়ার মানুষ প্রতিবন্ধী হতে পারে। সে নয়। এক পা নির্ভর মানুষটা এগিয়ে যাবে। দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলবে, বাণী কেঁদো না। এই তো আমি। এই তো—।

পাথর কাশী যেন প্রাণ পায়। আর প্রাণের ধর্মই তো বাঁচা এবং বাঁচান।

ভাতচুরি

জ্যৈষ্ঠের শুরুতেই অস্তিত্বটা টের পাওয়া গিয়েছিল। তারপর এখন আষাঢ়ে পা দিতেই তীব্রভাবে অনুভব করতে পারল এ অঞ্চলের মানুষ দলটার অস্তিত্ব। অবশ্য দল কি না সেটা ঠিক জানা যাচ্ছে না। তবে একটা মানুষের পক্ষে যে এটা করা অসম্ভব তা বোঝা যাচ্ছে বৈকি! একদিনে তিন পাড়ার চার পাঁচ ঘরে কেমন করে ঢুকতে পারে একটা মানুষ। মানুষ তো আর দেবতা নয় যে অদৃশ্য হওয়ার মন্তর শিখবে, নিমেষের মধ্যে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে উড়ে যাবে। তারপর এক ঘরে ঢুকে চুরি করে নিশ্চয়ই চোরের বুক ঢিপঢিপ করে, দ্বিতীয় ঘরে ঢোকবার সাহস অন্তত সেইদিন সেই সময় আর থাকে না। সুতরাং দল আছে। একটা মানুষের কাজ এ নয়, হতে পারে না। আর দলটা মানুষেরই দল।

অথচ প্রথম দিকে এটা যে মানুষের কাজ তা কেউ ভাবতে পারে নি। কুকুর বিড়ালের কাজ বলেই মনে করেছিল সবাই। তক্কে তক্কে ছিল কুকুর বিড়াল ধরার জন্যে। এমনকি ঘরের আশেপাশে কুকুর বিড়াল এলে লাঠি হাতে বৌ-ঝিরা তাড়াতে শুরু করেছিল। কুকুর বিড়ালেরা গাঁয়ের বাইরে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। আর সকাল বিকেল যখন তখন আচমকা ঢুকে পড়া কুকুর বিড়ালের কান্না গাঁয়ের মধ্যে এ পাড়া সে পাড়া থেকে প্রায়শই শুনে শুনে মানুষেরাও যেন ব্যতিব্যস্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু তাতেই বা কি হল? তাতেই কি বন্ধ হল দুষ্কর্ম? তাতেই কি শান্ত হল গাঁয়ের আবহাওয়া?

না হল না। যেমনকার তেমনি চলতে থাকল কাজ। শুধু পেটের জ্বালায় কুকুরেরা মাঝে মাঝে গাঁয়ের ভেতর ঢুকে পড়লে মানুষের মুখ দেখলে লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকল, কখনও বা মানুষ দেখেই চোঁচা দৌড় দিতে শুরু করল মার খাওয়ার ভয়ে।

অথচ অব্যাহত গতিতে দলটা একটার পর একটা ঘরে ঢুকতে থাকল। আর সবচেয়ে বড় কথা কেউ তাদের কাপড়ের খুঁটটারও সন্ধান অনেক চেষ্টা করেও বার করতে পারল না। ভাতচুরি যেতে কাঁদল, গালাগালি করল, শকুনির মত চোখ রাখল—কিন্তু কিছুতেই রোধ করতে পারল না।

এদিকে জ্যৈষ্ঠের তাপ যত বাড়ছে, মাঠ ঘাট পুকুর শুকিয়ে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, ততই বাড়ছে চালের দাম। একে তো চাল মেলাই ভার, গরমে জলের মত বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে, তার উপর দাম যা বাড়ছে তাতে একদিনের রোজগারে একবেলার ভাত হয়ে ওঠা ভার হয়ে উঠছে। আর এই সময়ই কি

না ভাতচুরির হিড়িক।

পরপর চারদিন সহ্য করেছে মানদা। কিন্তু আর নয়। আর সে পারছে না। তিনটি ছেলেমেয়ে তার। ছেলেটির তো বয়েস চার বছর। বড় মেয়েটি বছর বার হলো। তার পরেরটি বছর আটেক। তাছাড়া আছে বুড়ি শাশুড়ি। অথচ রোজগারের মানুষ একটি। অঘ্রাণে কিছু ধান জমিয়ে রেখেছিল। তার থেকেই মেপে মেপে নিয়ে ফ্যান ভাত করে কোনরকমে দিন যাচ্ছিল। কিন্তু পর পর চারদিন ভাতচুরি গিয়ে কাবু করে দিয়েছে তাকে। চোর অবশ্য কয়েকমুঠো ফেলে রেখে দেয়। সেটুকু দিয়েই আধপেটা রাখে ছেলেদের। বুড়ি শাশুড়িরও জোটে নি। মুড়ি দিয়ে রেখেছে তাকে। তবে মানদা নিজের চেয়ে স্বামীর জন্যেই কষ্ট পেয়েছে। নিজের পেটের জ্বালাটার চেয়ে স্বামীর পেটের জ্বালাটাই তার কাছে কঠিন মনে হয়েছে। কেঁদেছেও তার জন্যে। বলেছে, 'তুমার পেটে কুছু না পড়লে খাটবে কি করে গো!'

পাঁচকড়ি বৌকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে, 'আমার লেগে ভাবিস না বৌ। সেই যে তু ফ্যান খেতে দিলি, উতেই আমার পেট ভরে রইছেক। এখুন আর কুছু লাগবেক নাই।'

কিন্তু পাঁচকড়ির ঐ সান্ত্বনা বাক্য শোনার পর মানদার মনের জ্বালা মেটে কৈ। মেটে না। বরং আরো উগ্র হয়। অদৃশ্য শত্রুর উপর রাগে শরীর পুড়তে থাকে। ভগবানের কাছে বারবার কামনা করতে ইচ্ছে করে, হে ভগবান তুমি দেখো। তুমি দেখো যারা পেটের ভাত কেড়ে নিছে, তাদের যেন শাস্তি হয়, তারা যেন নরকে যায়, তারা যেন পাপের কুণ্ডে চিরকাল ডুবে থাকে।

পাঁচকড়ির কিন্তু কোন জ্বালা নেই। স্ত্রীকে বিমর্ষ দেখার পর বলেছে, 'কি বলবে বল, চুরির উপর ত কারু হাত নাই গো। উ যে চুর বটেক।'

মানদা শুধু ছলছল আঁখি মেলে স্বামীকে দেখেছে।

কিন্তু চারদিনের দিন সে আর পারল না। পাঁচকড়িকে চেপে ধরল। ছেলেগুলোকে অবশ্য দিয়েছে, শাশুড়িকেও ভাত দিয়েছে। ভাত নেই স্বামী-স্ত্রীর। অথচ ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে মানদা ঠায় চোখ রেখেছিল। তারপর উনুনে চাপিয়ে পুকুরে গিয়েছে।

ছেলেমেয়েরা তো দিনরাত্তির এপাড়া ওপাড়া ঘুরছে। হয় গুগলি আনছে নয় শাক আনছে। থাকে শুধু শাশুড়ি আর পাঁচকড়ি। তাও শাশুড়ির আবার পাড়া বেড়ান স্বভাব। ঘরের মেঝেয় দু'দন্ড বসে থাকতে পারে না। চোখে কম দেখে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে, তবু পাড়ায় এ ঘর ও ঘর থেকে সে ঘরে যাতায়াত না করলে পেটের ভাত হজম হয় না। আর পাঁচকড়ি? তারও তো কাজ, তারও তো বাইরেই কাজ।

সুতরাং, ঘরে থাকার মানুষ বলতে সে একলা।

তবে আজ ঘরে পাঁচকড়ি রয়েছে। তাছাড়া আজকাল প্রায়ই পাঁচকড়ি যখন-

তখন মাঠ থেকে ঘরে আসে।

তাই মানদা ভাতের হাঁড়ি কোলছাড়া করে যেতে সাহস পেয়েছে। যাবার সময় স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গিয়েছে। বলেছে, 'আমি চললাম, ঘরের দিকে নজর রেখো।'

পাঁচকড়ি উঠোনে বসে খড়ের দড়ি পাকাচ্ছিল। মানদার দিকে তাকায় নি। বলেছে, 'হুঁ।'

অথচ তার মধ্যেই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

মানদা অবশ্য প্রথমে এসেই ছেলে তিনটেকে মেরেছে, গালাগালি করেছে। ধিঙ্গি ছেলেমেয়ে সব। শুধু খেলা আর খেলা। ঘরের দিকে নজর নাই। তারপরই রাগ পড়েছে পাঁচকড়ির উপর।

কিন্তু উল্টো রাগ ঝাড়ল পাঁচকড়িই। বলল, 'ই বাবা তু যে ঘর ছেড়ে গেইছিস, তা জানব কি করে? বলে যেতে পারিস নাই?'

'তুমাকে তো বলে গেলম্।'

'আমি শুনি নাই।'

'তুমি শুন নাই।' মানদা ঝাঁঝিয়ে উঠল। বলল, 'দড়ি বাঁধাতে এমুন্ মুন দিন্ছিলে যে আমার কথাটা কানে যায় নাই?'

'বলছি তো যায় নাই?'

পাঁচকড়ি বিড়ি ধরিয়ে দড়ি পাকাতে মন দিল। দড়ি পাকাতে পাকাতেই বিড়বিড় করল, 'আমার হন্ছে যত ঝঞ্ঝট! একটুস্ বিড়ি কিনতে যাবার জু নাই। ইদিকে দুকানে বিড়ি কিন্তে গেলুম, আর সব ফাঁক।'

'নাগো, ঝঞ্ঝাট তুমার কিসের? সংসার তো তুমার লয়, আমার ইকার। তার লেগে ত মরণ হন্ছে।' মানদা কোমরে কাপড় বেঁধে ঝগড়া লাগতে যেন প্রস্তুত হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি জান না গাঁয়ে এখুন লিতুই লিতুই ভাত চুরি হছেক। আজ ইর ঘর কাল উর ঘর। পটলার ঘরের ভাতের হাঁড়ি লিয়েই পালিনছিল, তা তুমি শুন নাই।'

'লুকে খেতে পেছেক নাই, চুরি ত হবে।' পাঁচকড়ি মানদার কথায় ঝাল বুঝতে পারল না। বলল, 'লুকের দুষ কি বটেক? সব যে আধপেটা খেঁয়ে রইছেক! দেশে ধান নাই, চাল নাই।'

মানদা পাঁচকড়ির কথায় এত বিস্মিত হল যে তার আর কথা সরল না। স্বামীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আশ্চর্য মানুষ তো! ঘরে চুরি হয়ে গেল তাতে দুঃখ নেই, তার উপর আবার চোরের হয়ে সাফাই!

মানদা কি জানে না দেশে চাল নাই, ধান নাই, লোকের ঘরে ভাতের হাঁড়ি চড়ছে না! জানে বৈ কি। খুব ভাল করেই জানে। নিজেরা না হয় কিছুটা সচ্ছল। যা চাল জমিয়ে রেখেছিল তাই অল্প অল্প করে ভেঙে ভেঙে কোনরকমে পেট ভর্তি করছে। কিন্তু আরও মানুষ? না মানদা জানে তাদের হাঁড়ির খবর।

তবে তারজন্যে আর সে কি করতে পারে? কতটুকু ক্ষমতা তার?

পাঁচকড়ি বলল, 'আরও চুরি যাবেক।'

'কেনে যাবেক?' মানদা রাগে গরগর করল।

পাঁচকড়ি নিশ্চুপ।

বলল, 'তুমি পুরুষমানুষ লও? মেয়েমানুষ বট। চুরের ভয়ে তাই বলছ আরও যাবেক। ক্ষেমতা নাই তুমার ঘরের ধুন আটকাবার।'

'আমি না হয় আটকালাম্ অন্য লুকের ঘর ত চুরি যেছেক।'

'সি আমাদের দিখার কি দরকার? লিজের দেখে না, আবার পরের!' মানদা পাঁচকড়ির উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল।

পাঁচকড়ি এবার কিন্তু একেবারে চুপ করে নির্বিকারভাবে বিড়ি টেনে যেতে থাকল। ঘুরেও দেখল না বৌকে।

মানদার রাগ তাতে যেন আরও চড়ল। বলল, 'একদিন খালি পেটে থাক তা হালে পেটের জ্বালা বুঝবে এখুন।'

পাঁচকড়ি এবারও কথা বলল না।

পাড়াশুদ্ধ লোকের হা-হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস এবং সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে দলটা কিন্তু নির্বিকারভাবে কাজ করে যেতে থাকল। আজ এ বাড়ির ভাত চুরি যায় তো কাল অন্য বাড়ির। কেউ আর বাকি থাকছে না। আর আশ্চর্যের কথা চোর যেন সব সময় তক্কে তক্কে থাক। একটু সুযোগ পেলেই ভাতের হাঁড়ির দিকে হাত বাড়ায়। কেউ জল আনতে গেলে, কি কেউ পুকুরে গেলে, কি কেউ ঘরের বাইরে কোন মানুষের সঙ্গে গল্পে মশগুল হলে, ওমনি ঢুকে পড়ে চোর। তারপর চোখের পলক ফেলতে ভাত নিয়ে উধাও। না, হাঁড়ির দিকে লোক নেই। লোভ শুধু ভাতে। তাও আবার সব ভাত নয়, কিছুটা ভাত।

আর এদিকে বর্ষার দু' আঁজলা জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধানক্ষেতে কাজ বেড়েছে। এক পেট ভাত খেলেও কিছুক্ষণের মধ্যে পেট ক্ষিধের জ্বালায় হু হু জ্বলে। কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। আবার ভাত নিয়ে বসতে ইচ্ছে করে।

তার উপর চুরি।

অথচ আশ্চর্যের কথা কারও যেন হুঁশ নেই চুরির ব্যাপারে। ঘরের মেয়েমানুষ আর কি করতে পারে? বকাঝকা আর সবসময় সর্তক দৃষ্টি দিয়ে রাখা ছাড়া তাদের সাধ্য কি? চোর ধরবে তো পুরুষে! পুরুষেরাই তো দল পাকিয়ে চোরের পেছনে লেগে থাকবে। কিন্তু হায়, পুরুষেরাই সব চুপ।

মানদা পাঁচকড়ির উপর গায়ের রাগ মিটিয়ে ভেবেছিল মানুষটা বদলাবে। হয়ত চেষ্টাচরিত্র করে ভাতচুরির দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পাড়ার মানুষদেরও বলবে, উৎসাহিত করবে। কেননা পরপর কদিন ফ্যানভাত দিলেও তারপর মানদা সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল। বোঝাতে চেয়েছিল পেটের জ্বালা।

কিন্তু পাঁচকড়ি যেন নির্বিকার। গজগজ করে একবাটি জল খেয়ে শুধু শুয়ে

পড়েছে।

আর তারপর থেকেই মানদার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছে। অবশ্য সন্দেহ হলেও তাকে মনের মধ্যে তেমন আমল দেয় নি। বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

ঘরের মানুষকে যাবার সময় বলল, 'আমি পুখোর যেছি গো। ঘরট দেখো। ভাত রইছেক।'

'হুঁ।' পাঁচকড়ি গরু বাঁধার জন্যে খুঁটি পুঁততে পুঁততেই সাড়া দিল।

মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ যেতে ফিরে এল। আড়াল থেকে দেখল, পাঁচকড়ি গোগ্রাসে ভাতের হাঁড়ি থেকে ধবধবে সাদা ভাত বের করে খাচ্ছে।

মানদা সামনে গিয়ে দাঁড়াল না। কথা বলতে পারল না। পাথরের মূর্তির মত নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে দেখতে থাকল একটা ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরানর কঠিন প্রয়াসকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাতচুরির দলের ছবিটাও তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, কোন দলই নেই। ঘরের মানুষেরাই চোর। ভাতে পেট ভরে না, তাই.....তাই....এই নিষ্ঠুরের মত পথ নিয়েছে।

মানদার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। পাঁচকড়ির জন্য না সংসারের জন্যে কে জানে! আর মানদা নিজেও ভেবে পেল না, কেন তার কান্না, কিসের জন্যে কান্না! শুধু মনে হল, এক জোড়া পায়ের উপর আছড়ে পড়ে সে বুকের মধ্যেকার জমান কান্নাটাকে উজাড় করে দেবে।

কিন্তু কোথায় এক জোড়া পা? মানদা আছড়ে পড়ার মত একজোড়া পাও খুঁজে পেল না।

ইতিহাসের অংশ

লোডশেডিং ঝপ্ করে শব্দহীন করে দেয়। অচেতন হয়ে পড়ে লেদমেশিন। ফিতে স্থির। আঁকড়ান লোহার টুকরো ধরাই থাকে। নিচে পড়ে থাকে লোহার ডাঁই, বাবরি, তেলজল। তেলকালিতে ছাপছোপমাখা শেডের অভ্যন্তর আলোহীনতায় কয়েক পোঁচ আরও কালি মেখে বসে। পুরনো জং ধরা টিনের চাল ফুটোয় ফাটায় রোদের লম্বা শিস বাজায় দু'চার জায়গায়। বাতাস এবং আলোর প্রচন্ড ঘাটতিতে ভাদ্রতাপের গুমোট গাঢ় ছাউনি ফেলে। মুক্তি দাসকে বেরিয়ে আসতে হয়। বেরিয়ে আসে রতন আর হাফ মিস্ত্রি বিষ্ণু। বয় গোকুল আগেই খেতে গিয়েছে।

মুক্তিনারায়ণ দাস। এখানে হেডমিস্ত্রি। কেউ বলে, মুক্তিদা। গোকুল বলে, বড় মিস্ত্রি। মুক্তির মাথার সব চুল পঞ্চাশেই পাকা, চোখে চশমা, ডাঁটিটা মোটা কালো সুতোয় খসে পড়ার ভয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা থাকে, তেলকালিতে বর্ণলুপ্ত খাঁকি প্যান্টের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হাফশার্ট। চেহারায় লড়াকু ভঙ্গি মোটেই নেই। ঈষৎ ন্যুব্জতায় অবনমিত চরিত্র বোঝা যায়। চোখেমুখে ছাপোষা অভাবী দীনতা। খোঁচা দাড়িগোঁফে পরাজয়ের ছাপ। কঠিন ধাতুর নিয়মিত চাপে শরীর যেন রসহীন।, ছুটির পর ধুতি শার্ট পরলে খানিকটা ঝরঝরে লাগে।

শেডের বাইরে মস্ত এক নিমগাছের বিশাল ছায়া। অন্য কারখানাগুলো থেকে হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি, শার্ট, ছেঁড়া পাজামায় দুলাল, বাবলু, নন্টে, দ্বিজপদ, নারান, কানাইরা। বার বছর বয়স থেকে ষাট বাষট্টির শরীরগুলো তেলকালি লোহা রঙ মেখে ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটা শেডের নিচে আটটা ক্ষুদে কারখানা, ডাইনে—বাঁয়ে আরও দুটো শেড মিলিয়ে এগারটা। সবাই বেরিয়ে পড়লে ছায়ায় অকুলান পড়ে। দুটো ঠেলাগাড়ি খানিকটা জায়গা জুড়ে আবার। জায়গাটার ধুলোর বর্ণ চমৎকার মিশে আছে লোহাগুঁড়ো, বাবরি আর তেলকালির সঙ্গে।

একটা স্কুটার পিচরাস্তা থেকে বাঁয়ে ঘুরে এই পরিসরে এসে শব্দ থামল। আরোহীর ঘেমো ফোলা মুখ, ঝাঁকড়া চুল, কালো বর্ণ প্যান্টের ওপর সবুজ দাগ টানা শার্ট। ইনি কাঁড়ারবাবু।

কাঁড়ারবাবু কারখানার ভাষায়—কোম্পানি। মুক্তি দাস, রতন, বিষ্ণু গোকুলের বাবু নয়, মালিক নয়—কোম্পানি। কোম্পানি এসেছে, কোম্পানি টাকা দেয়নি, কোম্পানি প্রচুর লাভ করেছে, কোম্পানি লোকটা খুব ভাল, দাঁড়া কোম্পানি আসুক, কোম্পানি না এলে বলতে পারছি না। —কাঁড়ারবাবু সেই কোম্পানি।

কোম্পানিকে কারবার দোতালা বাড়ি দিয়েছে, সুন্দরী বৌ ছেলেমেয়ে, ফ্রিজ, কালার টিভি, স্কুটার। সেকেন্ড হ্যান্ড মারুতি কেনার ব্যবস্থা হচ্ছে।

স্কুটার ছেড়েই বলল, 'কতক্ষণ।'

মুক্তি দাস এগিয়ে এসেছিল, 'এইমাত্র গেল।'

'এদিকে আসুন।' কোম্পানি শেডের ভেতর ঢুকল, 'কাজটা উঠবে তো।'

'দেখি চেষ্টা করে।'

'পার্টিকে দেবেন কী করে? পরশু আবার ফিপটিন আগষ্ট। সব বন্‌ধ।

মুক্তি দাস কথা বলে না। এমন করে তাকায় যেন ফিপটিন আগস্ট তো কী। তবে বন্ধটা বন্‌ধ হয়ে যেন বোমাতঙ্কের মত বাজে। বন্‌ধ অর্থ এক রোজ খতম।

'বুঝলেন কোনওরকমে কাজ তুলে দিতেই হবে। রতন বিষ্ণু তো এসেছে।'

'হ্যাঁ। ওই তো।'

'ওদেরও বলুন। অন্তত রাত ন'টা পর্যন্ত করুক।'

'করতে দিলে ত। যা ঘন ঘন লাইন যাচ্ছে।'

'আমাদের মেরে দিল। এখানকার আয়রন ইন্ডাস্ট্রিই উঠে যাবে। ওদিকে পাঞ্জাব লেগে পড়েছে। দুর্গাপুরের অবস্থা খারাপ। কোথায় দাঁড়াব!'

অসহায় চোখে স্তব্ধ যন্ত্র দেখে কাঁড়ার। এন ডি থেকে বি কম করেছে। ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের পটভূমিকায় প্রাচীন এই কারখানা নগরীর ক্রমাবনতিতে সেও চিন্তিত। তবে কোম্পানি হয়ে লেবারদের সঙ্গে এ আলোচনা সাজে না। লোডশেডিং-এর নখর আঁচড়ে বিরক্তি এখন উগরে দিল। ক্ষুদ্ধতার প্রকাশ পাত্র-পাত্রী বিচার করে না।

স্কুটারে কোম্পানি চলে যায়। মুক্তি দাস আয়রন ইন্ডাস্ট্রি, পাঞ্জাবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, দুর্গাপুরের হালচাল, রেলওয়ে অর্ডারে ঘাটতি, ক্রমক্ষয়মান অবস্থা নিয়ে ভাবে না, জানেও না। সে জানে কোম্পানি অর্ডার আনে। সে জানে বিদ্যুতের ঘাটতিতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সে জানে তাতে তার উপার্জন কমে। সে জানে চার-পাঁচটা কারখানা ছেড়ে একটাতে এসেছে, আর একটাতে যেতেই পারে। সে জানে বয় থেকে হেডমিস্ত্রিতে এসে সত্তর টাকা রোজ হয়েছে। সে এও জানে মন্দার খবর থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির বাড়ি হয়, গাড়ি হয়।

ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্প আধুনিকীরণ না হওয়া, বিবিধ সমস্যা এই শিল্পের এবং খবরাখবর জানে বড় ছেলে বাব্লু—অবিনাশ। তাকে জানতে হয়। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করে টিউশনি করে। চাকরির ধান্দায় তাকে সব শিল্পেরই অযুত তথ্য, সমস্যা এবং সমাধানের বয়ান মুখস্থ করতে হয়। শুধু শিল্পই বা কেন। সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি শাসননীতি সংবাদ কী বাদ যায়। বর্তমানে কী ঘটছে, কবে কোথায় কখন কেন কী ঘটেছিল, সমগ্র পৃথিবীর সব তথ্য মস্তিষ্কে রাখতে হয়। বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথমা থেকে মেরুপ্রদেশে

কোন বৈজ্ঞানিক কী আবিষ্কার করলেন তাও।

মেয়ে মালতী বাঁচিয়ে দিয়েছে। পাড়াতেই প্রেম করে বিয়ে। এখন অবশ্য এ পাড়ায় থাকে না। দু'টি ছেলেমেয়ে। জামাই চাকরি করে রেশন অফিসে। ছোটছেলে কাবুল ক্লাশ টেনে পড়ছে। দারুণ ফুটবল খেলে। একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে খেলার জন্য। স্ত্রী শান্তি সার্থকনামা না হলেও খুবই গোছানো। বেচারা নিয়মিত পেটের রোগে ভুগে বড়ই শীর্ণা। রোগা হাড়ে একা ঘরের কাজ করতে হয়।

এক ঘন্টা পর বিদ্যুৎ আসে। আবার কারখানার মেশিন চলে। পরশু স্বাধীনতা দিবসের ছুটিটার কথা মনে হয় মুক্তি দাসের। আনন্দবোধ করে সে। বয়স বাড়ার সঙ্গে ছুটির এক ভিন্ন স্বাদ বুঝি পাওয়া যায়।

রাত্রিবেলায় রুটি আর পটলের তরকারি। খাওয়ার সময় শান্তি বলল, 'শুনেছ বাবলু পাশ করেছে।'

'কিসের পাশ।'

'চাকরি পরীক্ষার।'

'তাহলে চাকরি হয়ে যাবে।' মুক্তি দাসের ভিতরের উল্লাস যেন বিস্ময় ভেঙে বেরিয়ে আসে।

বাবলু বলল, 'চাকরি এখন কোথায়? পি এস সি'র পার্ট ওয়ান পাশ করেছি। পার্ট টু দিতে হবে। ওটা পেরুতে পারলে—।'

'ডবল পরীক্ষা, চাকরিটা কী রে?'

'ক্লার্কের পরীক্ষা।'

'কী যে হল, চাকরির বাজার।' মুক্তি দাসের মধ্যে হতাশার বিশাল ডানা ছায়া ফেলে।

বাবলু বলল, 'আমি একটা চাকরি পাবই বাবা।'

কাবুল বলল, 'তুই পার্ট টু পাস করে যাবি। আমি হলে—। যাক্ গে বাবা শুনেছ, দাদা টিভি আনছে।'

বাবলু বলল, 'মায়ের জন্য।'

'অত টাকা তোরা পেলি কোথায়।' আনন্দের চেয়ে যেন অবাক বেশি মুক্তি দাস।

'ইনস্টলমেন্টে কিনছি। ও তোমাকে ভাবতে হবে না। মাসে মাসে শোধ করে দেব। মা এর ঘর তার ঘর টিভি দেখতে যায়। বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলেছি, ত্রিশ টাকা কারেন্ট ভাড়া নেবে।'

মুক্তি দাস নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। তার পরিবার ভাল। ছেলে মেয়ে বৌ। ছেলে তো নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছে। গোপেনের ছেলেও তো রয়েছে। মস্তানি করে বেড়ায়। গোপেন মদ খায়। লোহার লাইনে এই মদ্যপানটা বেশ চালু। অবশ্য এখন আর কোন লাইনে নেই। মদ খাওয়া যেন

জল ভাত। না, তার ছেলেরা ঢের ভাল। গ্রাজুয়েট। তাদের এই টালির চাল বস্তির ঘরে মাধ্যমিকই নেই তো গ্র্যাজুয়েট। বস্তির অনেক গ্লানি। সকাল থেকেই জল নিয়ে সংসারে ঝগড়া গালাগালি মারামারি। এরমধ্যেও তো ছেলেরা দাঁড়াল। বাবলু চাকরি পেলেই ভাল ঘর নেবে। টিভি আনুক। মুক্তি দাস আনন্দ কুড়ুতে চায় এ সংবাদে।

পনের আগষ্ট কারখানা বন্ধ। ছুটির আবহাওয়া চারদিকে। এবার আবার স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর। জোর উৎসব। মুক্তি দাস মেয়ের বাড়ি যাবে। দিন বিকেল হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল তেরঙা ঝাণ্ডা উড়ছে অনেক বাড়িতে, মাইক বাজছে। অনেক ক্লাবেরই আজ ফিস্ট। সকালে রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছিল স্কুলের ছেলেদের। ড্রাম, বাঁশি নিয়ে ছেলেরা ছবির মত হাঁটছিল। খবরের কাগজগুলোতেও রঙিন ছবি। বৈশিষ্ট্য বলতে অন্য ছুটির দিনের সঙ্গে এছাড়া আর কী। আজকের দিনটিতে ভারত স্বাধীন হয়েছে। ইংরেজ ছেড়ে গিয়েছে এ দেশ। এই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে বহু মানুষ। ইতিহাস সবাইকে জায়গা দেয়নি। মুক্তি দাস সামান্যক্ষণই এসব ভাবে।

মেয়ের বাড়ি গিয়ে অন্যরকম আবহাওয়া। নাতি-নাতনি দুটিকে নিয়ে খেলা, গল্প করা, চা-মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া। মেয়েজামাই ছাড়ে না। রাতে খেয়ে যেতে হবে। মাংস হয়েছে। রাতের জন্যও রাখা আছে।

জামাই প্রদীপ বলে, 'কী লাইন মাংসের দোকানে। আধঘন্টার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।'

'কেন এত ভিড়।'

'বাঃ ফিপটিন আগস্ট। মাংস খেতে হবে না।'

প্রদীপ যেন অবাক হয় শ্বশুরের কথায়। মুক্তি দাসও কম অবাক হয়ে প্রশ্নটা করেনি। উত্তর শুনে অবাক হওয়াটা মোছে না।

ফেরার পথে কাণ্ডটা ঘটে। খানিকটা হেঁটে নারকেলতলায় এসেছে। ক্লাবঘরের সামনে আলোর বন্যা। ফিস্ট হচ্ছে। রাস্তার ওপর বসানো একটা পেল্লাই বাক্স থেকে, 'পরদেশী পরদেশী যাঁহে কাঁহা, মুঝে ছোড়কে, মুঝে ছোড়কে' গমগম করছে এক নারীর তীব্র বেদনার আকুতি। বাজনার ঝমঝমানির মধ্যে সুরেলা গভীর আর্তি যেন মুক্তি দাসের পঞ্চাশ বছরের দেহখানায় ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এ গান প্রথম শোনা নয়। জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। রেডিও টিভি টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটে চায়ের দোকানে, পান-বিড়ির দোকানে, এখানে সেখানে কতবারই শোনা। কিন্তু আজ কেন জানি তার মাথায় শব্দ এবং অর্থ এমন ফোঁড় দিয়ে দিল। ক্লাস সিক্সের পর আর লেখাপড়া হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতা, স্বদেশী, ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে এই পরদেশী শব্দটা কেমন যেন মিল খেয়ে গেল। দিব্যি মনে আছে সে শুনেছে ইংরেজরা খুব ভাল ছিল। দেশে শাসন ছিল। এ দেশ থেকে লুট করে নিয়ে গিয়েছে অজস্র সম্পদ, অনেক সর্বনাশ করেছে, তবু কেন যে

বেশ কিছুকাল তার কৈশোরে ইংরেজ শাসনের প্রতি অতি সাধারণের কিছুটা দুর্বলতা ছিল। ঠাকুমার কাছে সে শুনেছে। কেন যে! এই পরদেশীকে আহ্বান, ছেড়ে না যাওয়ার জন্য এমন বেদনা কী সরলরেখা তৈরি করে। মুক্তি দাস নিজেও প্রশ্নটার উত্তর জানে না। অভ্যন্তরে তুমুল তোলপাড় খায় সুর, শব্দ।

রাস্তায় ওপর দু'টো ছেলে কোমর দুলিয়ে নাচছে। মাংস রান্নার গন্ধ মৌ মৌ করছে।' ক্লাবের সামনে বাঁশের গায়ে লাল সাদা সবুজ কাগজ মুড়ে খুঁটি অলঙ্কৃত করে তেরঙা পতাকা টাঙানো হয়েছে। গোল করে খুঁটির চারপাশে ছড়িয়ে আছে ফুল। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন হচ্ছে।

চুড়িদারপরা একটা মেয়ে হেঁটে আসছে বিপরীতে। নৃত্যরত একটা ছেলে রাস্তার একেবারে ধার ঘেঁষে সভয়ে পেরিয়ে যাওয়া মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। তারপর সামনে কোমর দুলিয়ে নাচ। মেয়েটি আতঙ্কে ছুটে গেল। ওমনি হাসির হুল্লোড়। মুক্তি দাসকে একেবারে কাছে দেখেও গ্রাহ্য নেই।

দৃশ্যটা কেন যে মুক্তি দাসকে ক্রুদ্ধ করে দেয়। সাধারণ মানুষ হিসাবে অমিত সহনশীলতা নিয়ে তো দিনযাপন। চোখের সামনে কত কিছু দেখেও তো নীরবতা, বেলেল্লাপনার ঘটনাও তো কতই শোনা, পঙ্গুত্ব নিয়ে গা-বাঁচান চরিত্র হয়ে ওঠা মক্‌স করে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ যে কী হয়ে যায়। ফিপটিন আগস্ট, পরদেশী পরদেশী গানের ধাক্কা, যেটুকু পড়াশুনা স্বাধীনতা সংগ্রাম, অজস্র মানুষের আত্মত্যাগ, এই দেশ মহান ইত্যকার বাণীর আঘাত। হতে পারে কিছু একটা! কিংবা এততেও মনুষ্যত্ব বিলোপ হয় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়ত এই কারণেই। সে সামনে দাঁড়ায় থমকে, 'কী হচ্ছে কী রাস্তায়।'

'দাদু মাইরি খচে গিয়েছে।' ঝাঁকড়া চুলের মাথা, প্যান্টের উপর স্যান্ডো গেঞ্জির রোগা ছোকরার কথায় মদের গন্ধ। থমকে বলে, 'বাড়ি যান দাদু।'

'লজ্জা করে না। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অসভ্যপনা করছ।'

'রাগিও না দাদু। দিদিমা বেধবা হয়ে যাবে মাইরি। শালা একটু ফুর্তি করতে দেবে না।'

ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা আর একটা ছেলে এগিয়ে এসে পিঠে হাত রেখে চুকচুক শব্দ করে ঠেলা দেয়, 'আগে বাড়ুন দাদু—আগে বাড়ুন।'

ছেলেটার ঠেলাতেই মুক্তি দাস এগিয়ে যায়। তার রাগ প্রশমিত হয় না। অপমানের জ্বালা বুকের ভিতরের আগ্নেয়গিরিতে প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছে। সে কী করবে ভেবে পায় না। অথচ করা কিছু দরকার। খানিকটা হেঁটে আসার পর তার চোখে পড়ে থানা। হ্যাঁ, থানা যাবে। প্রশাসনই জব্দ করতে পারে।

টেবিলের বিপরীতে কালো ফ্রেমের চশমা, মাথায় কোঁকড়ান চুল, ভারী মুখকে মুক্তি দাস বলে, 'দেখুন নারকেলতলায় রাস্তার ওপর মদ খেয়ে কতকগুলো ছেলে অসভ্যপনা করছে।'

'বসুন।'

মুক্তি দাস বলল, 'একটা মেয়ের সামনে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করছিল।'

'বয়স কত হল আপনার?'

'পঞ্চাশ।'

'সাতচল্লিশে জন্ম।'

'হ্যাঁ।'

'আগস্ট মাসে।'

'হ্যাঁ।'

'তারমানে আপনি পুরো স্বাধীনতা কাল।'

'কী বলছেন!'

'নেহেরু থেকে রাজীব গান্ধী, যুক্তফ্রন্ট থেমে বামফ্রন্ট সবেই আছেন। নকশাল মুভমেন্টেও বোমাবাজি করেছেন।'

'আমি বোমাবাজি করেছি!'

'তাছাড়া আবার কে। ইতিহাস তো তাই বলে। কিন্তু কিস্যু বোঝেন নি। নইলে আগ বাড়িয়ে মাথা গলাতে যান ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপারে। স্বাধীনতা দিবসে ওরা না হয় একটা আমোদই করছে।'

'একটু মানে। মদ খেয়ে রাস্তার উপর।'

'কোথায় করবে? জায়গা রেখেছেন? বাড়ির অংশ বাড়িয়ে রাস্তা পর্যন্ত কভার করেছেন, মাঠ খেয়েছেন, পুকুর চুরি করেছেন, বাগান সাফ করেছেন।'

'একটা মেয়েকে ওরা—'

'মেয়ে না হলে আমোদ আবার কী। বুঝতে শিখুন মশাই। ওদের কাজ দিতে পারছেন না। মিছিলে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন, ভোটের বাক্স ভর্তি করাচ্ছেন, একটু আনন্দ করলেই ব্যাগড়া।'

'আপনি কী বলছেন!'

'ঠিকই বলেছি। ব্যাপারটা আপনার গায়ে মাখাই উচিত হয়নি।'

'আপনি এ কথা বলছেন। আইন, শাসন—'

'দেখুন ফর্টি সেভেনের ফিপটিন আগস্ট আমারও জন্ম। আপনার কথা শুনে বন্ধুর মত এসব কথা বললাম। আইন আছে। আপনি ডায়রি করতে পারেন। আমিও এক্ষুনি বেরোতে পারি। কিন্তু আপনাকে কোন সেফটি দিতে পারব না। আপনি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করেন। ভেবে দেখুন—'

'তা হলে এরকমই চলবে?'

'তাই চলে। ইতিহাস তো এ কথা বলে না।'

মুক্তি দাস কথা খুঁজে পায় না।

'আপনি যান। আমি রাউন্ডে বেরুব। তখন ধমক দিয়ে আসব।'

মুক্তি দাস বেরিয়ে আসে। তার রাগ অপমান বোধ এখন আর নেই। শুধু মস্তিষ্ক জোড়া কথার চাপ। যে কথাগুলো শুনে এল তা এতই জটিল যে সে

কেমন করে ইতিহাস, সে কেমন করে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট থেকে বামফ্রন্ট, সে কেমন করে নকশাল আন্দোলন হয়, হতে পারে ভেবে পায় না। তার ওপর পরদেশীর ছেড়ে যাওয়ায় অসহায় নারীর কান্না সুরে যেন জড়িয়ে থাকে মনে।

বাড়ি ফিরে মেয়ের বাড়ির খবর দেয় মুক্তি দাস। রাস্তার ঘটনা, থানা যাওয়ার কথা সে বলে না। বাবলু ঘরেই রয়েছে।

'হ্যাঁরে ইংরেজরা আবার ফিরে আসতে পারে এদেশ শাসন করতে।'

'তাই হয়।' বাবলু হাসে, 'উপনিবেশবাদের আর জায়গা নেই।'

'মানে কী।'

বাবলু অল্পক্ষণ ভেবে বাবাকে বোঝানার মত করে বলে, 'এক রাজ্য এখন অন্য রাজ্য দখল নিতে পারে না। বাবা পৃথিবী বদলে গিয়েছে।'

'ভাল হয়েছে না মন্দ!'

'সব কী ভাল হয়। তবে ওই দখল বললাম না, এখন তো পৃথিবীর সব দেশই বাণিজ্য অধিকারে আওতায় চলে আসছে পরস্পরের। আমাদের দেশের সামগ্রী যদি প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াতে পারে, তাহলে তো সর্বনাশ। অন্য দেশ লুটে নিয়ে যাবে। এভাবে দখল হতে পারে। স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। আমাদের দুর্দশা আরও বাড়বে।'

'তাহলে তো কাজ করা দরকার। ভাল জিনিস তৈরি করা দরকার।'

কাবুল দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। বাবাকে দেখে বলল, 'যাক্ চলে এসেছ। নারকেলতলায় মারামারি হয়ে গেল।'

'মারামারি।'

'হ্যাঁ, মদ খেয়ে একটা মেয়েকে নাকি ইনসাল্ট করেছে। মেয়েটার পাড়া থেকে এসে দারুণ পিটিয়েছে।'

'খুন-জখম হয়েছে নাকি?'

'তা কী করে জানব। আমি ভাবছি বাবা ওই পথ দিয়ে আসবে।'

'বোমাও চলেছে নিশ্চয়।' বাবলু বলল, 'খুন না হয় জখম তো হবেই।'

মুক্তি দাস ঠোঁট চেপে রাখে। ক্ষণপূর্বের ঘটনার সে যে সাক্ষী। অপমানিত হয়েছে বলে থানায় গিয়েছিল। মেয়েটির পাড়া থেকে প্রতিবাদ এসে মারধর করা ব্যাপারটা ঘটায় সে খুশি নয়, আতঙ্ক বোধ করতে থাকে।

'হ্যাঁ রে যারা মার খেল তারা তো ছাড়বে না।'

কাবুল অগ্রাহ্য ভঙ্গিতে বলল, 'মিটমাট হয়ে যাবে। কত হচ্ছে।'

'তা না হয় হয়ে যাবে। কিন্তু কতদিন এরকম চলবে?'

বাবলু বাবাকে অবাক হয়ে দেখে। এসব কথা তো বাবা বলে না। বাবার হল কী! আজ স্বাধীনতা দিবস বলে। দেশ, স্বাধীনতা, প্রগতি, উন্নয়ন এসব নিয়ে ভাবনা এসেছে, আসতেই পারে। বাবলু জানে, তার বাবার প্রজন্মের আগের প্রজন্ম, পরবর্তী প্রজন্ম স্বাধীনতাকে ঘিরে অনেকে স্বপ্ন দেখেছিল। হয়ত

বেশি স্বপ্ন দেখেছিল, তাই ভাঙাটাই আঘাত দেয়। গড়েছেও তো অনেক কিছু। অতীত তো সবসময়ই মধুর হয়, বর্তমানকে কঠিন মনে হয়। বাবার উদ্বিগ্নতায় তার কষ্ট হয়।

পরের দিন মুক্তি দাস কারখানায় বেরিয়ে যায় ঠিক সময়ে। প্রশ্নটা যে তার মধ্যে খোঁচা দিয়েছিল তার জ্বালাটা সহনীয় করে তুলেছে। তাকে কাজটা করে নিতে হবে। কোম্পানির তা না হলে মান থাকবে না, ক্ষতি হবে। সকাল থেকেই তকতকে রোদ। ছুটির দিনের পর কেমন যেন জড়তা থাকে শহরে। দোকানপাট, বাজার, মানুষজন আমেজ কাটিয়ে উঠতে সময় নেয়।

কাঁড়ারবাবু সুখবর দিলেন। কাল ছুটির দিন হলেও এক পার্টির সঙ্গে কথা হয়েছে। বড় একটা অর্ডার আসছে। বাইরের কাজ। ফিনিশিং ভাল চাই।

মুক্তি দাস বাইরের কাজ শুনেই বাবলুর কথাটা ধরে বলল, 'বাইরের কাজ। এখন তো চীন জাপান রাশিয়া আমেরিকা থেকে জিনিস আসবে। আমাদের জিনিস ভাল করতে না পারলে লোকে নেবে নাকি!'

'অলরেডি অনেক প্রডাক্টস নেমে পড়েছে। সার্ভেও করছে বিদেশী কোম্পানি-গুলো। দেখুন না কী হয়—আমরা লড়াই করতে না পারলে!'

'না পারলে কী বলছেন। পারতে তো হবেই।'

'ঠিক কথা মুক্তিবাবু!' লোকে যদি বুঝত, তাহলে ইতিহাসটাই বদলে যেত।'

আবার সেই ইতিহাস। কিন্তু সে একা বদলায় কী করে। অথচ দায় তো থাকেই। অংশও থাকে। মুক্তি দাস তো রাস্তায় নষ্টামি বন্ধ করতে পারে না, চাকরি দিতে পারে না বেকারদের, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারে না, সব মানুষের ক্ষুধার অন্ন দিতে পারে না, সবার বাসস্থান দিতে পারে না। সে এও জানে ঘুষকে ঘৃণা করে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, সবার মঙ্গল চায়, গড়তে চায়, তার মত এমনই ইতিহাসের অজস্র অংশগুলো। তাতেই বা কী হচ্ছে। হ্যাঁ, সে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারে, পরদেশী পরদেশী অমন সকরুণ সুরকে ছুঁড়ে দিতে পারে কাজ করে। মনে হতেই সে একটা আশ্রয় পেয়ে যায়। দারুণ উৎসাহে মেশিন চালু করে। যন্ত্রের শব্দ মুক্তি দাসের চারপাশের সব গ্লানিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মগয়ার ঢাক

মাথার লাল পাগড়ি কান ঢেকে চিবুকে পাক খেয়েছে। গায়ে আঁটিসাট জরিদার লাল জামা, লাল চাপা পাজামা। হাঁটুর নিচে তিন থাকে ঘুঙুর। সজ্জায় রঙ আছে কিন্তু মরা। চেকনাই নেই। ছেঁড়া, সেলাই ফোঁড়ের দগদগে নানান আকৃতির যেন ঘা। কাঁধে লাল শালু মোড়া ঢাক, হাতে কাঠি।

ওই হল বাপ। পঞ্চু মিরধা। পিছনেই মেয়ে। নয়না। ঢলঢলে পুরোন খয়েরী রঙ ব্লাউজ, নীলচে ইজের পরা। কোমরে গোবরলেপা ঝুড়ি। ওর মধ্যে কাঁসি আছে। বাপ মেয়ের রঙ রোদ পড়া তামাটে। অপুষ্টি আর দারিদ্রের ছাপ আঁকা। বাপের পোশাক খুললে স্বচ্ছন্দে হাড় গোনা যাবে। পঞ্চাশ ছুঁই গোলগাল মুখ, ঈষৎ টাক, কোঁকড়ান চুল, নাক কিছুটা চাপা। বার বছরের মেয়ের হাড় জিরজিরে চেহারায় লম্বাপানা মুখে তেলা কাঁঠালপাতার ঔজ্জ্বল্য। চোখজোড়া দীর্ঘ। খাড়া নাক। শীর্ণ হাতে লাল-নীল চার গাছা করে কাচের চুড়ি। মাথার বাদামী তেলহীন চুল দু' বিনুনি করে সাপের মত ঝোলান।

বাপ চলেছ ঢাক বাজাতে। ঘুঙুর বাজছে ঝুমুর ঝুমুর। মেয়ে বাজাবে কাঁসি। বাপের পায়ের দাগে দাগে হাঁটছে।

ভাদ্র মাস। পূজোর গন্ধ বাতাস এখনও মাখেনি। কিন্তু পঞ্চু মগয়া ডোম। এ ঢাক মগয়ার ঢাক। পূজো নয় যখন তখন বেজে ওঠার হিম্মত রাখে গেরস্তর উঠোনে। বাজলে আপদ বিপদ বলে পালাই পালাই। অশুভ মুছে শুভ আসে। সুখ নামে ধবধবে সাদা ডানার উজ্জ্বলতা নিয়ে। পঞ্চু ঢাক বাজিয়ে নেচে-কুঁদে গেরস্তর উঠোনে মঙ্গল ডাকে, 'হেই গো বাজন শুন, সুখে থাক ছেলেপিলে লিয়ে মা-ঠাকুরুণরা। ইর শব্দে অশান্তি যাবেক। দুখ থাকবে নাই। যেমুন কী না শাঁখের শব্দ গো। হেই-হেই।' এর সঙ্গে ঢাকের বোলের তালে তালে গান, 'দুমকার বিটি ভাল বটেক গো, আমার লেগে রুটি করেছে।' কিংবা 'ইটের গাঁথুনি খড়ের ছাউনি, এমুন বাঙলা বানালেক কে! দিনের বেলা রোদ ঢুকে, রেতে চাঁদের আলা; বর্ষাকালে জলে ভাসি, এমুন আমার বাঙলা।' বাদ্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচ। ঢাকখানা পাক খাইয়ে কেরামতি। ছেলেমেয়েদের দিকে তেড়ে তেড়ে যাওয়া। দেখে গেরস্ত আর মা-ঠাকুরুণদের মুখেও হাসির ঝিলিক ফোটে। বলে, 'বাহারে পঞ্চু। যেমুন বাজনা, তেমুন নাচ বটে বাপু। কিন্তু গান যে করিস শুনতে পাই না।' পঞ্চু বলে, 'আজ্ঞে শুনবেন কী! ঢাক বলে, আমি মগয়ার ঢাক। আমার বোল শোন চাঁদেরা, আপদ যাবে, বেপদ যাবে, সুখ সোয়াস্তিতে থাকবি। গান ঢেকে তাই বাজন শোনাচ্ছি। ঠিক বটে কী না। হে-

হে।'

ভাদ্রের সকাল। রোদ ঝকঝক করছে। দেবতা নাকাল করছেন বড়। বৈশাখ থেকে কলসী উপুড় করেছেন। কিন্তু শ্রাবণের পর কাৎ করা কলসী সোজা করে নিলেন! তারপর চোঁ চোঁ করে টানছেন সূর্যি ঠাকুর সহস্র মুখ দিয়ে রস। চড় চড় করে ফাটছে ক্ষেতের মাটি। নির্জীব হয়ে পড়েছে ধানের গুচ্ছ। পুকুর ডোবা শুকুচ্ছে। সূর্যিঠাকুরের সহস্র মুখের তেষ্টা তো কম নয়।

পঞ্চুর নিজের জমি নেই। চষেও না অন্য কারও জমি। তবে কিনা ধান ভাল ফললেই তো সুখ। দাম কম থাকবে। লোকে কাজ করাবে। তার ঢাকের বোল শুনতে ডাকবে, 'এস হে। এস হে।'

পঞ্চু বলে, 'রোদ দেখেছিস্। সারাদিন জ্বালাবেক।'

'বাবা কুন গাঁয়ে যাবে?'

'কানমোড়া।'

'সে তো ঢেক দূর বটে। বেলেড়া চল কেনে!'

'দূর কোথা! এই তো ডাঙা। তা বাদে ক'টা আর মাঠ।'

'বাবা চাল পেলে আজ ভাত হবে বল! বাবা লুকে চাল দিবে?'

'কেনে দিবে না। আমি মগয়া বটি।

নয়না খুশী হয়। দ্রুত পা চালিয়ে বাবার একেবারে পিছনে আসে। বলে, 'চাল তিন টাকা। তুমি জান বাবা।'

পঞ্চু কথা বলে না। মেয়ে এখনও বড় বোকা। যেমন শরীরে বাড় নেই, তেমনি বুদ্ধিরও। সে না কত্তা। সে না সংসার চালায়, দিন দুনিয়ার খবর রাখে। তাই না ঢাক নিয়ে বেরুল। ঝাড়ল, মুছল ঢাক, আদ্দিকালের ছেঁড়া শালুর জামা, পাগড়ি, ঘুঙুর, বাঁধল। না, ইচ্ছে করে না। লোকের এখন বিশ্বাস নেই। উঠোনে দাঁড়ালে বলে, থাক বাজনা, অন্য ঘরে দেখ। যেন সে ভিখারী! ভেবেছিল, দূর গাঁয়ে যাবে। নগর ছাড়িয়ে এই বীরভূম ছাড়িয়ে হু-ই দুর্গাপুর বর্ধমান, আসানসোল, চাই কী খোদ কলকাতা! কিন্তু যেতে যে শঙ্কা লাগে! অচেনা মাটি অচেনা মানুষ! কী হতে কী হয়ে যায়। ভোমরা বলে, দূরে যেঁয়ে কাজ নাই। দিনমানে ঘর ঢুকতে হয়!

পঞ্চুর মনে পড়ে, সেই যখন সে বাপের সঙ্গে কাঁসি নিয়ে ঘুরত। আহা— কী দিন কী দিন। চাল আলু বেগুন মুলো দিয়ে সিধে দিত মা-ঠাকরুণরা। গলায় লাল পেড়ে কাপড় জড়িয়ে পেন্নাম করত ঢাককে। তখনকার মা ঠাকরুণরা পুণ্যি চাইত। এখনকার ঠাকরুণদের পুণ্যি লাগে না। ভিক্ষে দেয় বিরক্তিভরে। কেউ বলে না, যেমুন নাচ, তেমন গান, তেমুন বাজনা। বাহারে।

বাপ মেয়েতে ডাঙায় পড়ে। লাল কাঁকুড়ে ডাঙা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক'টা মহুয়া গাছ। বাঁ দিকে ঝাঁটিশালের বন। টিনের চাল। দেওয়ালের অংশ।

নয়না বলে, 'বাবা দাদার আজ জ্বর ছেড়ে যাবেক বল।'

পঞ্চু শুধু শব্দ করে, 'হুঁ।'

পঞ্চুর পনের বছরের ছেলে প্রহ্লাদ একটা জড় মাংসপিন্ড। ঈশ্বরের কঠিন এক অভিশাপ। তালগোল পাকিয়ে পড়ে থাকে, মানুষ নামের একটা বিদ্রূপ হয়ে। জলেজুলে চোখে তাকায়। বেঁচে থাকার সাগ্রহ পিপাসা তাতে ধকধক করে জ্বলে। পিঠে কুঁজ, শিরদাঁড়া ঢেউয়ের মত মাঝ বরাবর উঠে নেমেছে। লিকলিকে হাত পা। এখন অসাড় হয়ে পড়েছে। খাইয়ে দিতে হয়। অথচ আশ্চর্য, মুখখানা কত কোমল, কেমন নিখুঁত নাক চোখ ঠোঁট চিবুক। ডাক্তারবাবু বলেছেন, অসাধ্য রোগ গো। ছেলেবেলায় চিকিৎসা করাতে হত! কিন্তু জন্ম থেকেই এই দশা। তবু তো ভরত গুণিনের মন্ত্রপড়া তেল, কবচ, মদনপুরের কালীঠাকুরের পূজোর ফুল চড়ান, হোমিওপাথি ডাক্তারের পুরিয়া, সরকারি হাসপাতালের ট্যাবলেট, লাল জল দিয়েছে। কিন্তু উঠে দাঁড়াল না ছেলে। বয়সের সঙ্গে হাত পা কাঠিসার হল। স্বরে এল জড়তা। কে যেন পাকিয়ে একটা পনের বছরের ছেলেকে ঝুড়িতে ভরে ফেলার উদয়াস্ত চেষ্টা করে চলেছে।

পঞ্চুর বড় মায়া ওই ছেলেতে। কোলে করে হাটে মেলায় যাত্রার আসরে নিয়ে যেত। এখন প্রহ্লাদ পারে না ওই শ্রম সহ্য করতে। অবসরে সে গল্প করে। প্রহ্লাদের স্বর জড়িয়ে যায়। জিভখানা ঝুলে পড়ে। কষ বেয়ে লালা ঝরে। পঞ্চু তখন থামায় ওকে। মায়ায় ওর স্বরও রুদ্ধ হয়ে আসে। ছেলের কষ্ট বুকে মোটা সূচের ফোঁড় দেয়। দুঃখময় দিন যাপনের গ্লানি নিয়েও ছেলের জন্যে কিছু করার তীব্র অসহায় আকুতি বুকের মধ্যে ডানা ঝাপটায়।

ভোমরা বলে, 'কী করবে বল। ইর উপর ত মানুষের হাত নাই।'

পঞ্চু বলে, 'কুনুদিন আমাদের পেহ্লাদ উঠে দাঁড়াতে পারবে নাই!'

'হুঁ।'

'তাহলে আমরা মরলে উ কী করবেক? কে দেখবেক উকে? কী খাবেক?'

'ভগবান দেখবেক।'

পঞ্চু হাসে, 'ভগবান দেখলে উকে দাঁড় করিন দিত।' ঘাড় নাড়া দেয়। তারপর ঝুঁকে ষড়যন্ত্রীর গলা করে বলে, 'আমার মুনে হয় উ মরে গেলে খালাস পাবে।'

ভোমরার আতঙ্কে চোখের তারা বিশাল হয়। ত্রস্ত হাতে সে পঞ্চুর মুখ চাপা দেয়। কেঁপে কেঁপে বলে, 'আর বলো না গো। পেহ্লাদ আমাদের ছেলে বটে। নাড়ি ছেঁড়া ধুন। আমাদের রক্ত মাস লিয়ে—।'

ছেলে! প্রহ্লাদ কী ছেলে! না অভিশাপ! চরণ বলছে, পাপের ভোগ বটে পঞ্চু তুমার। বুঝলে শুনতে খারাপ, কিন্তুক মরলে তুমরা বাঁচবে—উ লিজে বাঁচবে। এমন জেবন কী দরকার! শুধু চরণ নয়, পাড়ার মাসি-পিসি থেকে বুড়োরাও হুঁকোর টান দিয়ে এক কথাই বলেছে। তবে কি না ছেলে ত বটে। কিন্তু পঞ্চুরও রাগ হয়। খাওয়ার জন্যে যখন দুধের শিশুর মত অভাবের ঘরে পনের বছরের ছেলেটা কাঁদে, চেঁচায়, তখন মনে হয় গলা টিপে শেষ করে

দিই। কিন্তু সে তো মুহূর্তের। ওই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি সাপের মত ফণা তুলেই মায়ার মন্ত্র মুগ্ধতায় কেমন যেন নুয়ে যায়। বিশাল ফণা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

তবে প্রহ্লাদের কথা পঞ্চুর কতক্ষণই বা মনে থাকে। একটি স্থূল সামগ্রীর মত পড়ে থাকে প্রহ্লাদ। সময় সময় ভোমরা চেঁচায়, 'মর। মর তুই। আমার হাড়মাস কালি করলেক গো খুঁড়াটা!' প্রহ্লাদও কম যায় না। কাঁপা গলায় বলে, 'চুপ কর হারামজাদী, নিজে ভিজে ভাত খেলি! দিলি নাই। আমার পেট নাই? খিদে নাই? আঁ-আঁ।' প্রহ্লাদ ভেংচি কাটে, মুখে নানা রকমের বিকৃত শব্দ করে। হাঁফায়। জিভ ঝুলিয়ে উত্তেজনা সামাল দেয়।

নয়নার সঙ্গে ভারী ভাব। ঝগড়া করে না। নয়নার জন্যে, হাড়গোড় যখন অসাড় হয়নি, তখন কাগজের ফুল বানিয়ে দিত। মাটির পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল তৈরী করে দিত। চুল বেঁধে দিত। এখনও নয়না দাদার জন্য কিছু খাবার পেলে নিয়ে আসে। গাঁয়ের গল্প শোনায়। মাঠ, পুকুর, পাখি কার বাড়িতে কে এল কে মরল কে গরু কিনল দাদাকে বলে। প্রহ্লাদেরও আগ্রহও কম নয়। কিছুদিন আগে একটা শালিখ ছা এনে দিয়েছিল। প্রহ্লাদের কী আনন্দ।

ডাঙা ডিঙিয়ে আবার ক্ষেতের আলে পড়ে বাপ মেয়ে। খানিকটা গিয়ে একটা ভাঙচুর খাল। বর্ষায় দুপাশের জল টেনে নিয়ে যায়। এখন শুকনো। জায়গায় জায়গায় ডোবার আকৃতিও আছে। একটাতে দুনি ধরে ক্ষেতে জল দিচ্ছে দুজন মানুষ। খালে নামতেই একজোড়া বক বাপ মেয়ের শব্দে উড়ে গেল।

'বাবা আমরা ঢেক চাল পয়সা পাব বল!'

'কে জানছেক!'

'পেলে দাদাকে নগরের বড় ডাক্তর দিখাবে বাবা!'

বোকা। হদ্দ বোকা মেয়ে। কত আশা। অনেক চাল পয়সা পাবে। পঞ্চুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বদলে গিয়েছে পৃথিবী। বদল গিয়েছে মানুষ! কুনুরের জমিদার বাজনা শুনে মেডেল দিয়েছিল বাপকে। হুঁ, তারও অনেক কিছুই জুটেছে। পুরোন ধুতি, জামা। কিন্তু অভাব কী মিটেছে! ছেলেবেলায় খেতে পেত ঠিক ঠিক। বাপেরও জমি ছিল না। পঞ্চুর ভাবতে ভারী ভাল লাগে, আগে ঢের ঢের সুখ ছিল। ঢেক সুখ। দু'বেলা ভাত। শীতে জামা। ঘরের হাঁড়িতে চাল। আর ভোমরা যখন এল! কী চমৎকার বাঁধুনি ছিল শরীরের। ঢলঢলে গোলগাল মুখ, যৌবনের রেখায় ডোরা লাল হলুদ শাড়ির পাড়ে, সবুজ ব্লাউজ বসে ফুটিয়ে তুলত মেয়েমানুষের শরীরের আশ্চর্য ঐশ্বর্য। নিটোল হাত পায়ের গড়ন, ভারী কোমর, বুকের স্থির নরম ঢেউ। না, না, ওসব একেবারে যায়নি। কাঠামোর মধ্যে একটা যাদু এখনও আছে। তবে তার সেই মুগ্ধতা এখন আর নেই। তখন মনে হত, এত রূপবতীর তার কণ্ঠমালা হবার কথা নয়। বলত, 'তুই এত সুন্দর হলি কী করে বৌ। ভগবান তুকে ঢেকখুন ধরে গড়েছে। দায়সারা করে নাই।' ভোমরা ছলকে হাসত। বলত, 'নিজের বৌকে সবাই

সুন্দর দেখে গো।' তখন কী অভাব ছিল না! দু'জনের অন্ন জুটত কী! মুনিষের কাজ পেত। খড়ের চালে ফুটো থাকত না। তুচ্ছ! সবই তখন তুচ্ছ।

তারপর সময়ের ফেরে সেই তুচ্ছতাই তাকে পাকে পাকে জাড়াল। বিষ উদগার করতে থাকল। পঞ্চু টের পেয়েছে, মেয়েমানুষের চেয়েও খিদে বড়। পঙ্গু ছেলেকে সে ডাক্তার দেখাতে পারে না। কচি মেয়ের উপোসী মুখ দেখতে হয়। বৌয়ের গায়ে রঙিন শাড়ি ওঠে না।

'বাবা দাদার ঢেক কষ্ট—বল। ভগবান ভাল নয়। মা কালী কথা শুনে না! বলেছিলাম কালী মা, তুমি দাদাকে ভাল করে দাও। আমি ঠিক এক টাকার মুন্ডা দুব। আর দুব না। না।'

পঞ্চু মেয়েকে দাবড়ায়, 'চুপ কর। ঠাকুর দেবতার কী দুষ! বিবাক মানুষের দুষ। নিজের পাপের ফল মানুষ নিজে ভুগ করে।' বলেই পঞ্চুর মনে হয় তার পাপ! কী তার পাপ! কী!

গাঁয়ের মুখেই টিনের চাল মাটির বাড়ির বাইরে রাস্তা লাগোয়া দাওয়ায় ক'জন ছেলে পঞ্চুকে ধরল। ঝাঁকড়া চুল, রোগা মুখের একজন বলল, 'দাঁড়াও—দাঁড়াও। তোমাকে দূর থেকে দেখেই আমরা ঠিক করলাম। মদনপুরের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। আমরা জিতবই। দুমকা থেকে প্লেয়ার আসছে। গোল হলেই তুমি ঢাক বাজাবে। থেকে যাও তুমি গাঁয়ে দুপুরটা! কী রাজী!'

একজন শ্যামলা ছেলে বলল, 'পয়সার কথা ঠিক করে নে।'

জোড়া আঙুল দেখিয়ে ছেলেটি বলল, 'হুঁ, কড়কড়ে দু'টাকা দুব।'

পঞ্চুর মনে হল, কপাল মন্দ নয়। নিজের পেট দেখাল, 'দিনভর থাকব। পেট রইছে দু'জনার।'

'ঠিক আছে। মুড়ি গুড় দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।'

বসে থাকা একটা পাজামা পরা ছেলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল, 'এক হাত বাজনা শোনাও দেখি।'

ঢাকে কাঠি বাজতে ছেলেরাও নাচে যোগ দিল। জানিয়ে দিল, বেড়ে বাজাও। তাহালে ওই কথাই রইল।

বাজনা শুনিয়ে সারা গাঁ ঘর ঘর বাজিয়ে জুটল, এক সের চাল, নগদ টাকা। মুড়ি দিয়েছে ছেলেরা। ভাদুরে রোদের দহন কম মারাত্মক নয়। নাচ, গান, দ্রুততালে হাতের কাঠির আন্দোলন কুলকুল করে ঘামিয়ে দিয়েছে পঞ্চুকে। গায়ে চাপ হয়ে বসে থাকা জামা পাজামা এখন সহস্র পিঁপড়ের কামড় জ্বালা দিচ্ছে। দু'পায়ের পেশীতে টান লাগছে। তবু সোয়াস্তি বিকেলে দুটো টাকা জুটবে। আনন্দে বাবুরা বেশীও দিতে পারে!

শালপাতার ঠোঙায় বাপ-মেয়ে পেট পুরে মুড়ি .খেয়ে নেয়।

নয়না বলে, 'বাবা আমি ছুটে ঘরে চালট দিয়ে আসব গা!' বাবার দিকে আয়ত চোখে মেলে রাখে মেয়ে।

পঞ্চু মুড়ির ঢেঁকুর তুলে গম্ভীর গলায় বলে, 'না।'

'তাহলে মা ভাত করতে পারবেক! আমরা ত মুড়ি খেল্‌ম।' নয়নার মুখ ভারী হয়।

'তুর মা ব্যবস্থা করবেক।' হাতে আধা খাওয়া বিড়ির টুকরো নিয়ে বলে, 'যা দেখি, কুথাম আগুন লিয়ে আয়।'

'বাবা দাদা যি কাঁদবেক!'

পঞ্চু দাবড়ে ওঠে, 'বাড়া তু জ্বালাস ত।'

নয়না ছটফট করে, 'আমি পারব বাবা। খেলার আগেই ছুটে চলে আসব।'

ইঁদারাতলায় তেঁতুলের ছায়ায় চিৎপাত হয়ে যায় পঞ্চু। বলে, 'যা বলছি কর। কাঠিতে করে আগুন আন।'

পঞ্চুর কপাল মন্দ। মদনপুর গোল দিয়ে বসল পর পর দু'খানা। সারা মাঠ থমথমে। গোল শোধ হল না। পঞ্চুর স্বাভাবিক বুদ্ধিই বলে দিল, প্রাপ্তির আশা না রাখাই ভাল। তবু রোদ এখনও আছে। হাঁটা সুরু করলে ঘরে পা দিয়েও সূর্যিঠাকুরের লাল মুখ দেখা যাবে। নয়নাও তাড়া দিচ্ছে।

ঘরে ফিরে দেখল প্রহ্লাদ আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। বসে থাকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। সে সামর্থ্য নেই। কাৎ হয়ে নির্জীবের মত পড়ে আছে। ভোমরা মাথার কাছে বসে। ফ্যাকাশে উদ্বিগ্ন কাতর মুখ। দিনভর স্নান-আহার কিছু হয়নি। অবসন্ন দেহটা নড়ল স্বামীকন্যাকে দেখে। তারপর কষ্টে যেন উঠল।

'পেলে কিছু? সারাদিন ত পার করে এলে!'

'সেরটেক চাল পেয়েছি। তিনটে টাকা! বুঝলি পেতাম, কিন্তুক—।'

'ছেলেটার কাছে দাঁড়াও। কেমুন যেন করছিল। শ্বাস লিতে বাড়া কষ্ট হচ্ছেক উর।' বলতে বলতে ঝুড়ি থেকে চাল বের করে। এলুমনিয়ামের থালায় ঢালে। বলে, 'দেখলে ত। গেলে—যা পেলে!' তারপরই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেয়েকে বলে, 'অ মা নয়না, উনুনট একটু ধরা।'

পঞ্চু ঢাক রেখে প্রহ্লাদের পাশে বসে। ফিস ফিস করে বলে, 'পেহ্লাদ। বাপ। ও বাপ পেহ্লাদ।'

প্রহ্লাদ সাড়া করে না। শুধু বড় চোখজোড়া মেলে একবার। তারপর রাজ্যের ক্লান্তি যেন পাতা জুড়ে দেয়।

পঞ্চু সস্নেহে বলে, 'ঘুম আসছেক! ঘুমো! ভাত হছে। হোক-ডেকে খাওয়াব।'

প্রহ্লাদের ভাত হতেও কোন উৎসাহ দেখা দেয় না। অন্ধকার নামে। গাঁয়ের কুকুরগুলো শব্দ বাজিয়ে থেমে যায়। শেয়ালের হাঁক শোনা যায়। পাড়ার শব্দ মরে রাত্রির স্তব্ধতা নামে। মাংসপিন্ড ঘিরে থাকে স্বামী-স্ত্রী।

ভোমরা গলায় রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ গ ছেলেটার জন্যে কী করবে বল দেখি।'

'বড় ডাকতার দিখাতে পারলে হত।' পঞ্চু বলে, 'কিন্তুক টাকা কই? কুথা পাব আমি?' পঞ্চু বলে, 'বৌ! জানিস বৌ, কদম আমাদের ভিটেট কিনতে

পারে! দুব—দুব বিচে!’

‘থাকবে কুথা! একটুস জমি। পা রাখতে পারছি। তখুন!’

পঞ্চু শব্দ করে না।

‘আমার বাডা ডর লাগছে। পেহ্লাদের জ্বর ত ছাড়ান দেয়। ইবার কিন্তুক জ্বর যেছে নাই।’ কেঁদে ফেলে ভোমরা।

পঞ্চু নাড়া দেয় ভোমরাকে, ‘এই বৌ, এই কাঁদিস না।’

‘আমি কী করব গো! কুথা টাকা পাব!’

পঞ্চু সাহস দেয়, ‘কাল আমি দেখব। তু শুয়ে যা। ঘুমো বৌ!’

পরদিনও কিছু করা যায় না। পড়শীরা আসে। ধারের কথা শুনে বলে, ‘হায় হায়, এমন বেপদ, থাকলে কী আর না দি গো।’ উঁচুপাড়ার মহিম বলে, ‘পেতল কাঁসাও ঘরে কিছু নাই? আমার যে বারণ আছে ভাই। বাবা বলে গিয়েছে মরণকালে, মহিম টাকা বড় নচ্ছার জিনিষ। খালি হাতে কাউকে দিবি না। জিনিষ কিছু রাখ, পাঁচ-দশ টাকা নাও। টাকায় দশ পয়সা মাসে সুদ।’

দিন যায়। এর মধ্যে চেয়ে আনা দুধ খেয়েছে প্রহ্লাদ। মুড়ি দিয়েছিল আলতা। ভুবনের মা দিয়েছে ভাত। আধ সের চাল দিয়েছে শাকু। সেদ্ধ গমভাঙা দিয়েছে ধনাপিসি। না, প্রহ্লাদ খায়নি। সংসার খেয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রীদের প্রতি মানুষ বড় দয়ালু হয়ে ওঠে। জীবনের চরমতম ভয় তো ওখানেই। সেই ভয়টাই বুঝি দরিদ্র ডোমপাড়ার সব ঘর থেকেই আদায় করে দেয় খাদ্যের ভাগ। আর জীবিত তিনটি মানুষ পরম আগ্রহে তারই অপেক্ষা করে। লোকজন সরে গেলে গোগ্রাসে খায়!

প্রহ্লাদ নিস্তেজ হয় আরও। ডাকে চোখ মেলে আবার বুজে ফেলে। ওঠানামা করে বুক জীবনের অস্তিত্ব জানায় কেবল।

গাঁয়ের কোয়াক মণ্ডল এসে বলল, ‘ভাল ঠেকছে নাই, রাত পার হবে কী না ঠিক নাই। বৌকে বলো না। যতই হোক মা বটে!’

ভোমরাকে না বললেও মায়ের মন জানতে বাকী থাকে না। প্রহ্লাদের পাশ ছেড়ে মেয়েমানুষ একবারও ওঠে না।

রাতে পঞ্চু লম্ফের আগুনে বিড়ির টুকরো ধরিয়ে বলল, ‘তু শু বৌ। আমি দেখি।’

ভোমরা কোন কথা বলে না।

নয়না গুটিয়ে শুয়েছিল। ফিস ফিস করে বলল, ‘বাবা একট কথা বলব!’

‘তু ঘুমোস নাই।’

‘ঘুম আসছে নাই বাবা।’ নয়না কষ্ট জড়ান স্বরে বলে, ‘বাবা, তুমার ঢাক বাজালে ত বেপদ আপদ চলে যায়। তা দাদা যদি মরে যায়। বেপদ ত এসে গেইছেক। তুমি ঢাক বাজাও কেনে। আমি কাঁসি বাজাব।’

ভোমরা বলে, ‘হাঁ গ তোমার ঢাক বাজলে বেপদ যায় বল! যম ঘরে

ঢুকতে পারে না বল! ঠিক বলেছেক নয়না।' উৎসাহে সে গলা দীর্ঘ করে, তুমি ত ঢেক লুকের মঙ্গল ডাক। আমার ঘরের উঠনে বাজিয়ে কুনু দিন ত সুখ ডাক নাই!' ছেলের পাশ ছেড়ে উঠে আসে। হাত চেপে ধরে পঞ্চুর, 'আজ মঙ্গল ডাক। ঢাক বাজাও। আমি কাঁসা বাজাব।'

নয়না উঠে পড়ে এসে বলে, 'মা আমি কাঁসি বাজাব। তুমি ত কুনুদিন বাজাও নাই। বেপদ যদি তোমার হাতে কাঁসি দেখে না যায়।'

ভোমরা মাথা নাচায়। বলে, 'ঠিক। ঠিক বলছিস্ মা। তু কাঁসি বাজা।'

পঞ্চুর ঘোর লাগে। অন্ধকার সামনে জমাট বেঁধে আছে। দাওয়ায় বসে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আকাশ জুড়ে আলোর লক্ষ ফুটকি কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে। বাতাস আসছে। কিন্তু চারপাশ জুড়ে কী স্তব্ধতা। যেন পৃথিবীতে কেউ বেঁচে নেই। অন্ধকারে লম্ফের লালচে আলোয় এই মাটির দাওয়ায় কেবল মাত্র তারাই তিনটি প্রাণী।

উঠে পড়ে পঞ্চু, দ্রুত লাল শালুর জামা-পাজামা পরে নেয়। পাগড়ি বসায়। ঘুঙুর বাঁধে। তারপর ঢাক নিয়ে নেমে পড়ে অন্ধকার উঠোনে। সুরু করে দেয় নাচ। নয়না কাঁসি নিয়ে প্রাণপণে বাজায়। লম্ফের শিখাটা কাঁপছে। পঞ্চু নাচে। দুহাতের কাঠি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় উত্তেজক বোল তোলে। রাত্রির স্তব্ধতা খান খান হয়ে পড়ে। একটা নয় অজস্র কাঁচের আসবাব যেন ভাঙছে ঝনঝন শব্দে! দেখে না পঞ্চু, পাড়ার লোক ঘিরে ধরেছে। পঞ্চু নাচে। কাঠিতে পড়ে ড্যাং ড্যাং ন্যাকটা পাট্যাং ড্যাং। নয়না কাঁসি বাজায়, ঝন্ ঝন্ ঝনর ঝন্!

পাড়ার লোকে দুজনকে ধরে, 'হয়েছে কী! বাপ-বেটিতে রেতের বেলা খেপলে নাকি? আঁ।' ঝাঁকুনি দেয়।

পঞ্চুর চেতনা ফেরে। নির্জীবের মত বসে পড়ে। পড়শীরা স্তোক দিয়ে সরে যায়। নয়না দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে। হাতের কাঁসি সে ছাড়ে না। লম্ফের শিখাটা কেঁপে কেঁপে যায়। বাকহীন স্থির চোখে বসে থাকে।

মধ্যরাতে নয়না বলে, 'ও মা দেখ। দেখ, দাদাকে। লড়ছে না। গা ট দেখ, কালিন্ গেইছে!'

ভোমরা দেখে নাড়া দেয়। তারপর ছুটে গিয়ে ধরে ঢাকটা। দু'হাতে তুলে বলে, 'ভেঙে দুব। তুমি এতে মানুষের মঙ্গল ডাক! আমার মঙ্গল কে ডাকছেক? কে ডাকলেক?'

পঞ্চু মাথা নাচায়, 'ভাঙ! ভাঙ, শালার ঢাক।'

ভোমরা নির্জীব হাতে ঢাকটা গড়িয়ে দেয়। ভাঙে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যে নয়—নিজেদেরই পেটের জন্যে। পঞ্চু দেখে মেয়েমানুষ আছড়ে পড়েছে মাটিতে। আর্তনাদের রেশ কেঁপে কেঁপে ফিরছে। দেখে মঙ্গলের মগয়া ঢাক গড়িয়ে যাচ্ছে প্রাণহীন এক মাংসপিন্ডের দিকে।

দাম্পত্য চিত্র

জীপ এন্তার শব্দ ছড়ায় ছুটতে ছুটতে। হামলাবাজ বাতাসের চাবুক বাজে। স্টিয়ারিং-য়ে বিষ্ণুর কান ছোঁয়া শব্দটা অধরা থেকে যেতেই ভ্রুকুঁচকে জিজ্ঞাসায় এসে দাঁড়ায়, 'স্যার কিছু বললেন।' সুমন্ত সামনের আয়তকার কাচের উপর চোখ রেখে বলে, 'গাড়িটা দাঁড় করাও।' এবং দাঁড়ান মাত্র দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার আগেই সুমন্ত বলে ওঠে, 'এখানে একটু অপেক্ষা করব।' উচ্চারণের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত 'কার জন্য' অথবা 'কেন' অবধারিত প্রশ্ন মাথা চাড়া দেবার আগেই সুমন্ত বলে ফেলে, 'কেউ আসবে না, এমনি।' ব্যাপারটা বিষ্ণুর কাছে আরও জটিল হয়ে পড়ে।

বিষ্ণু স্বাভাবিকভাবে বি ডি ও সাহেবের উপর চোখ ফেলে রাখে। খোঁচা দাড়ি গোঁফের ভারী মুখ, খড়ানাসা, পুরু কালো ঠোঁট। মুখখানা যথেষ্ট বড় হলেও উর্বর নয়। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যে, অনেক কষ্টে অষ্টম শ্রেণীর সার্টিফিকেট জোগাড় করে উনিশ বছর চাকরি হয়ে গেল। সে উপরওয়ালার কাছে সর্বদাই বিনীত এবং তাঁদের সম্পর্কে অহেতুক কৌতুহলও রাখে না। তবে নতুন এই বি ডি ও সাহেবকে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতেই হয়। চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় হু-হু হাওয়ায় এই ভাঙচুর নির্জন পিচরাস্তায়, আচমকা গাড়ি দাঁড় করায় কেন! সপ্রতিভ, চমৎকার স্বাস্থ্যশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, উনত্রিশ তিরিশের এক যুবক অফিসার কিছুদিন এসেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি কাজ বোঝেন, অত্যন্ত ঠান্ডা মাথা এবং ব্যবহারেও মৃদু হাসির সঙ্গে সৌজন্যের পরিমিত প্রকাশে কেমনভাবে হৃদয়জয় করতে হয়। বিষ্ণুর শোনা কথা, ফিল্মের কোন নায়কের চেহারার যেন আদল আছে। থাকতে পারে। তবে পৌরুষ সৌন্দর্যে সে নিজেও চমকিত। ব্লক অফিসে 'হিরো বি ডি ও' বলতে শুনেছে এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে। কিন্তু এমনি এমনি বি ডি ও সাহেব কেন গাড়ি দাঁড় করায়!

সুমন্ত কাচের উপর চোখ রেখে নির্বিকার। তার প্রখর উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টিতে কাচের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান পিচরাস্তা, দু'পাশে তাল এবং বট অশ্বত্থ-গাছ, কোমর বেঁকিয়ে রাস্তাটা ডাইনে মোড় নেওয়ার ফলে সরাসরি একটা সবুজ বুনোঝাড়ের প্রতিরোধ কিছুই থাকে না। সুমন্তর এ মুহূর্তে নিজেকে শিকারি বলে মনে হয়। শিকার অদৃশ্য। হাজারীবাগে পোস্টেড চ্যাটার্জী কলকাতায় আসায় অরণ্য প্রসঙ্গ, শিকার ইত্যাদি এসেছিল। চ্যাটার্জী বলেছিল, আয় না একবার। বন্যপ্রাণী শিকার নিষিদ্ধ, চোরাগুপ্ত শিকার ত চলছে এবং শিকারই আর নেই, এরকম শব্দ এবং বাক্যগুচ্ছ বিনিময়ের মধ্যে চ্যাটার্জী বলেছিল,

এখন মানুষের সমাজে শিকার চলেছে ফ্রেন্ড। উই আর অল হান্টারস্।

কিন্তু সুমন্ত কী শিকার করতে চায়। শরীরের কোন সচেতন স্নায়ু ধাতব হিমনলের আয়ুধ হয়ে গিয়েছে! খেলা বলা যেতে পারে। ইয়েস, লুকোচুরি। হৈমন্তী কোথায় লুকোয়? কোথায়? স্মৃতিতে কৈশোরের মামার বাড়ির দৃশ্য এসে জেঁকে ধরে। মামাতো দাদা কোথায় যেন লুকোত। কখনো বের করা যায় নি। সেভেনটি ওয়ানে লুকোতে পারে নি। পুলিশের গুলি এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল। নিয়তি! হৈমন্তী, তুমি কতদিন লুকোবে।

রূপপুরের বাতাসে কী যেন আছে! সূর্য যেন এখানে অসম্ভব রকমের নিচে নেমে আসে। বিকিরণে মাটি হয়ে ওঠে পাথুরে। শুরু হয় প্রকৃতি জুড়ে এক গভীর উদাসীনতা। ওড়াওড়ি করে শুকনো পাতা, খড়কুটো, ধুলোবালি। উড়িয়ে ভাসিয়ে নিঃস্ব হয়ে মায়াহীন প্রকৃতি রূপ থেকে অপরূপে যান।

সুমন্তর এসব ভাবনা নেই। একক হৈমন্তী তার বুদ্ধির তার অনুভূতি তার সচেতন প্রতিটি সংবেদনশীল কোষগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বাঁ পাশে ঝাঁটিশালের জঙ্গল ঘনিষ্ঠ নয়, ছাড়া ছাড়া। পিচরাস্তাটা হঠাৎই টিলার উপর উঠে পড়েছে। ফলে দূরের দৃশ্যগুলো এখন চমৎকার। ক্ষেত, স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ বৃক্ষশ্রেণী দিগন্তরেখা বরাবর পাহাড়ের একটা মোটা নীল দাগ এবং চড়াই উৎরাইয়ে যেন গ্রথিত ছোট গ্রামের আভাস সবই সুমন্তর দৃশ্যাতীত। একক হৈমন্তীতে সে মগ্ন। অনায়াসে তার এখন প্রত্যক্ষ হয় হৈমন্তী ঘর থেকে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দীঘল দেহরেখা ঘেরা ছাপা লালশাড়ি, লাল ব্লাউস, উজ্জ্বল কপালে ঘোষিত সিঁদুরে টিপ, নিটোল বাহু, হাতঘেরা চুড়ির রাশ, মৃদু গলায় বলছে, 'খুকীর মা তুমি ঘরে থাক। আমি একটু আসছি। সাহেব তো সদরে গিয়েছে। ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে।' অর্থাৎ চমৎকার এক অবসর আমার জুটেছে। আমি সদ্ব্যবহার করি।

ভাবনামাত্র সুমন্তর পুরুষ শরীর অসম্ভব শক্ত হয়ে ওঠে। চোখের তারা বড় বড়। সে হৈমন্তীর মুখোমুখি দাঁড়ানর জন্য প্রবল তাড়না অনুভব করে। এবং তখনই মনে হয় দাম্পত্য জীবনের অযুত ঘটনামালা, বিবাহপূর্ব কলকাতার সেই মধুরতম সম্পর্ক, প্রেম নামক পুষ্পিত এক বৃক্ষের অদ্ভুত আন্দোলন, বাতাস মাতোয়ারা তার সৌরভ সকলই যেন বায়ুতরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

অথচ এ সবই তো সত্য ছিল। এ সবই তো সে অনুভব করেছে হৈমন্তী নামের পৃথিবীর এক যুবতীর কাছ থেকে কেমন অদ্ভুত ভাবে উঠে আসে। আলগা কথা টুকরো হাসি কিংবা নির্জনতার সুযোগ সেই ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে জীবনে প্রথম নারী শরীরের রোমাঞ্চকর স্পর্শানুভূতিতে তীব্র কাতর হয়ে পড়েছিল, তার সবটুকুতেই প্রবলভাবে বেঁচে থাকার এই জীবনের মূল্যকেই তো সত্য করে তুলেছিল। হৈমন্তীই না তার প্রশস্ত বুকে মুখ রেখে প্রথম বলে, 'তুমিই আমার ভালবাসার কাঙ্খিত পুরুষ। তোমার মধ্যে সবকিছুর পূর্ণতা সুমন্ত।'

তখন নিজেকে বিশাল আকাশ বরাবর শির এবং পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত বিশালতায় সে তো অনন্য। বিয়ের পর ভালবাসার শয্যায় সে এক মধুরতম কবিতা। শিক্ষিতা, বাবা গেজেটেড অফিসার, বালিগঞ্জে বাড়ি, গানের গলা আছে, সাজেসজ্জায় আধুনিকা রূপবতী। যুবতী বধূটি শয্যায় কেবলই নারী। যা পুরুষের কাম্য। যেখানে আদিম খননের উৎসটি থেকে উঠে আসে একাত্মতার পরিপূর্ণতা। তখন তীব্র উত্তেজনায় ঘন শ্বাসে শুধু উচ্চারিত হয়, আমি খুশি। খুশি। আঃ। দাম্পত্য জীবনের টুকরোগুলোও তো তারই উৎপাদন, 'এই তুমি এত সিগারেট খাবে না।' 'তোমার লজ্জা করে না ঘন ঘন এত শ্বশুর বাড়ি আসতে।' 'সত্যি বলছি বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না।' 'উঁহু, মোটেই তোমাকে এই শার্টে মানাবে না।' 'তোমার বাড়ির লোক এত ফ্রি আমি ভাবতেই পারি না।' স্কুল শিক্ষিকা পিসতুতো বৌদি বলেছিল, 'প্রেমিকা এবং স্ত্রী'র কম্বিনেশন এমন দেখা যায় না।' রূপপুর আসার ব্যাপারেও হৈমন্তী বড় বড় চোখ করে বলেছিল, 'ও মা, আমার আবার কী অসুবিধা হবে! বরঞ্চ এনজয় করব। শহর নয়, আবার অজ গ্রাম নয়। তুমি আবার বলছ নদী আছে কাছাকাছি। ফ্যান্‌ট্যাস্টিক। আমি কখনও গ্রামে যাই নি।' এসব কথার কী ভীষণ উচ্ছলতা এবং প্রেম। তারপর ঘন শ্বাসের সঙ্গে আয়ত চোখে বলেছে, 'তুমি সঙ্গে থাকলে সাহারা এবং সমুদ্র আমার কাছে এক।' এই সবই যুবতীর বক্ষদিঘির তরঙ্গশীর্ষে শ্বেতপদ্মের মত, মূল যার গভীরে।

রূপপুর আসার পর এ সবই বিগত জন্মে অথবা অন্য কারও জীবনে শ্রুত কাহিনী করে দিয়েছে কিছুদিনেই। স্পষ্টতঃই এ ভিন্নতর জীবন। এক অগাধ রহস্য জালে যুবতী বধূটি আবিষ্ট হয়ে আছে। আর সুমন্ত কাছাকাছি যাওয়া মাত্র সে বুনুনি ঘন হয়ে উঠছে।

রূপপুর এ রুখুসুখ জেলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী এক ভুখন্ড। একদা রূপপুর হিন্দু এবং পরবর্তী মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল। বিশাল বিশাল অট্টালিকা, উদ্যানের সঙ্গে রাজকীয় দম্ভের ঐশ্বর্যে, সৈন্যবল, হাতি ঘোড়ার শব্দে, অসির ঝনঝনানি, কামানের তোপে এবং ঘটনামালায় যৌবন ঝলকে উঠেছিল। সে সবই ইতিহাসের পাতায় বন্দী। লোকগল্পে হারিয়ে যেতে বসা সে সব কাহিনীও শীর্ণ। চিহ্ন ঋতুচক্র প্রায় নির্মূল করে দিয়েছে। বড়সড় আধ শহুরে বর্তমান গ্রাম। ক'টা পাড়া। ঝোপঝাড় জঙ্গল। গাঁয়ের পশ্চিমে বিশাল দিঘি সংলগ্ন 'রাজার ভিটে' নামে পরিচিত জঙ্গল। সদর থেকে পিচরাস্তা এসে গাঁয়ের মুখেই হারিয়ে গিয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে গাঁয়ে। ব্যাঙ্ক, ব্লক অফিস, জি এল আর ও অফিস, থানা, দোকানপাটে আশেপাশের গ্রামগুলির কর্মকেন্দ্র। সপ্তাহে দুদিন হাট। বেশির ভাগ মাটির বাড়ি। দালান কোঠাও রয়েছে কিছু। আর মস্ত মস্ত তিন দিঘি। ঘিরে অতীত গল্প। রূপপুরের চেহারায় এখনও বুনো ভাব। যেন আত্মগোপন করার জন্য সে গাছগাছালির বোরখা নিয়েছে।

সব ব্লকেই সমস্যা আছে। গ্রামীণ রাজনীতি, পঞ্চায়েত, বর্গাদার, অনুদান ইত্যাদি ইত্যাদিতে ফাইল, কাজের চাপ, নিজের কৌশলে বুদ্ধিমত্তায় করায়ত্ত করা অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই সে রূপপুরকে চিনে ফেলেছে। কিন্তু হৈমন্তী যে অসম্ভব অচেনা। ঠিক কবে থেকে অথবা কোন ঘটনায় যুবতীর রূপান্তর সুমন্ত মনে করতে পারে না। রূপপুর আসার পর হৈমন্তীর খুশির উচ্ছ্বাস সে দেখেছে। পাশাপাশি তারা হেঁটেছে। অদূরবর্তী নদীতীর, বুনো ঝোপ, গাছগাছালি, প্রান্তর এবং ক্ষেতের উপর দিয়ে পড়ন্ত চৈতালী বেলায় রূপপুর ছাড়িয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে অনেকটা পথ। তবে এ তো রোজ হয় না। অসুবিধাও ঢের। রূপপুর বিষয়ক কোন অভিযোগ ও মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না। খুকীর মা বর্ষীয়ান মহিলাটি ঘরদোরের কাজ করে দেয়। অফিসের পিয়ন অনন্ত যে কোন কাজ পেলেই খুশি হয়। সংলগ্ন কোয়ার্টার্সের একতলা বাড়িখানার সামনে চিলতে বাগান। হৈমন্তী তবু কেন অচেনা হয়ে যায়। প্রেম কাতরতার জায়গায় এক গভীর বিষাদ এবং তার মধ্যে না পাওয়ার এক ক্ষুধা সে ঐ চোখের মধ্যে স্পষ্ট করে পায়।

হৈমন্তীর এক অদ্ভুত উত্তর, 'কেন। কী হয়েছে আমার।' উচ্ছ্বাসহীন যেন শব্দমাত্র। হাসি নেই। কৌতুকের আবির ওড়াওড়ি করে না। সুমন্তর ভেতরে আগ্নেয়গিরির ঘুম ভেঙে প্রবল আলোড়ন। সে নরম দু-হাত চেপে ধরে বলে, 'তোমাকে বলতেই হবে।' হৈমন্তী বেদনার অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে কুঁকড়ে যায়। বলে, 'আহা লাগছে ছাড়।' সুমন্ত চাপ কমায় না। নরম এই রমণীদেহ তার প্রবল চাপে সে জানে খুশী হয়। এবং বহুবার বলেছে, 'আরও জোরে চেপে ধরে রাখ। আঃ।' স্মরণমাত্র সুমন্ত বলে, 'লাগেনি। বল। তোমাকে বলতেই হবে।' হৈমন্তী যন্ত্রণায় রক্তিম হয়, 'তুমি কী। বলছি জানি না। আমি কিছু জানি না। ছাড়।' হাত আলগা হয় সুমন্তর। দু-চোখ ঠিকরে আসে, 'সামথিং হ্যাপেন্‌ড।' হৈমন্তী অদ্ভুত গলায় বলে, 'কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ঠিক জানি না।'

এসব থেকে সুমন্ত অনায়াস সিদ্ধান্তে যায়, হৈমন্তীর এক গোপনীয়তা আছে। রূপপুরের মাটিতে সেই গোপনীয়তাকে চমৎকার উপভোগ করছে হৈমন্তী। এবং সহজ একটা সম্ভাবনাই তার পৌরুষ সত্তাকে নাড়া দেয়। দ্বিতীয় পুরুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সন্দিহান হয়ে ওঠে, রূপপুরে সে আছে। হৈমন্তী মিলিত হয়। সেই অস্তিত্ব তাদের বিগত জন্মে পাঠিয়েছে।

সেদিন সুমন্ত সদর থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই একটা অদ্ভুত গন্ধ পায়। তার পরিষ্কার মনে হয় কে এসেছিল। সোফার উপর হৈমন্তী ছাপা শাড়ি ঘেরা পাথরপ্রতিমা। অপলক চাউনি মেঝেয় গাঁথা। সুমন্তর শব্দও তাকে স্পর্শ করে না। চকিতে সন্দেহের কীট ধারাল শুঁড়ে মাংসে তার গেঁথে যায়। সে এসেছিল। বাতাসে তারই গন্ধ। কোন দৃশ্য কিংবা কোন পরিকল্প রচিত হয়েছিল।

সুমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে, 'কে এসেছিল?' ঘুম ভাঙে হৈমন্তীর। জড়ানো গলায়

বলে, 'কে গো। কে?' সুমন্তর অভ্যন্তর কম্পনে ভাঙচুর হয় 'জান না? তুমি জান না! ন্যাকামো করছ!' হৈমন্তীর মুহূর্তে চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। একটাও শব্দ সে করে না।

সুমন্ত সিদ্ধান্ত নেয় তাকে সে ধরবে। হৈমন্তীকে সদরে যাচ্ছি বলে সে জীপে উঠেছে। সময় রোদের রঙকে শোষক কাগজের মত শুষে নেয়। মাথার উপর পাখির ঝাঁক উড়ে যায়। পাশের বনভূমিতে চৈত্রের এলোমেলো বাতাসের শব্দ ফেরে। খড়বোঝাই একটা লরি এবং কিছু পরে ঝরঝরে একটা বাস রূপপুর থেকে সদরের দিকে ছোটে। পিচ রাস্তা সেই একই, শূন্য। বাঁদিকে একটা সাঁওতালি গ্রামের ঘর দেখা যাচ্ছে। সুমন্ত বিষ্ণু উভয়েই নীরবে বসে। সময়টুকু বড় দীর্ঘ মনে হতে সুমন্ত কথা বলে, 'বিষ্ণু তুমি এখানে কত দিন আছ?' বিষ্ণু ঘাড় ফেরায় 'সাত বছর।' সুমন্ত পরবর্তী জিজ্ঞাসা খুঁজে পায় না। আরও কিছু নীরব সময় ব্যয়িত হয়ে রূপপুরের দিকে গাড়ি ফেরে।

রূপপুর ব্লক অফিসের সামনে জিপ থেকে নেমে সুমন্ত দ্রুতপায়ে কোয়ার্টার্সের দিকে যেতে, দেখে দরজা মুখে খুকীর মা দাঁড়িয়ে আছে। সে প্রশ্ন করে, 'বৌমণি কখন বেরিয়েছে? কোন দিকে গেল?' তার স্বরে প্রবল উত্তেজনা। খুকীর মা উত্তর দেবার আগেই সে সামনের টানা বারান্দায় দেখে হৈমন্তী চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুল খোলা, গায়ের উপর পাতলা গোলাপি শাড়ি। পিঠের বেড় ঘুরে আঁচল দিয়ে বুক ঢাকা। প্রসাধনহীন নিষ্কলঙ্ক মুখ। ভ্রু'রেখার মাঝে বড় টিপটা এসে ছুঁয়েছে। দীঘল যুবতী শব্দহীন। তারপরই বিস্মিত এবং স্ট্যাচু হয়ে যাওয়া সুমন্তর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। বলে, 'খুকির মা দাঁড়িয়ে আছ কেন তুমি।' এবং সুমন্তকে বলে, 'এস।' বারান্দায় উঠতে সুমন্ত যেন শব্দ ফিরে পায়। বলে, 'ভাবলাম তুমি বেরিয়েছ! ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের স্ত্রী তো সেদিন এসেছিলেন। তাছাড়া জি এল আর ও'র মেয়ে।' ঠোঁটে মৃদু কাঁপুনি নিয়ে হৈমন্তী বলল, 'তুমি আমাকে ফলো করার জন্য ফিরে এলে—।' সুমন্তর বুকে গেঁথে যায় কথাটা। সে অস্বীকারের চেষ্টা না করে বলে, 'সেটা তুমি জানতে। তাই বের হওনি।' মাথা আন্দোলনের সঙ্গে হৈমন্তী বলে, 'না। এখুনি বেরুতাম।' প্রায় বিস্ফোরণের মত সুমন্ত বলে ওঠে, 'কোথায়।' হৈমন্তী বলে, 'এই ঘরের বাইরে।' ছিটকে আসে তপ্ত বুলেটের মত শব্দ, 'হোয়াট!' হৈমন্তী হাসে, 'যাও মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমি চা করছি।'

রূপপুরে রবিবারের চেয়ে বৃহস্পতিবারের হাট জমাটি। এ জেলা ছাড়া পার্শ্ববর্তী বিহার থেকেও গরুছাগল মোষ এ হাটে বিক্রি হয়। তার সঙ্গে আনাজপত্র, নিত্য সামগ্রী। পার্শ্ববর্তী সব গ্রামগুলির মানুষই হামলে পড়ে। রূপপুর মেলার আকৃতি নেয়। হৈমন্তী হাট যাবার প্রস্তাব তুলতেই সুমন্ত বলে, 'কেন' এবং 'এমনি' উত্তর পাওয়ামাত্র অর্ধদগ্ধ দাম্পত্য সম্পর্কের জ্বালাটা প্রবলভাবে চাড়া দিয়ে ওঠে। সে শক্তগলায় বলে, 'না। দরকার কিছু থাকলে

খুকীর মা কিংবা অনন্তকে বল।' হৈমন্তী বলে, 'আমার দরকার ওরা আনতে পারবে না। তোমার কিছু দরকার থাকলে আনতে বল।' সুমন্ত বলে, 'আমার কিছু দরকার নেই।' হৈমন্তী নীরব তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফেলে রেখে মাথা নাচায়, 'আছে সুমন্ত আছে। ওদের শেকল কিনে আনতে দিতে পার!' এবং সুমন্তর জিজ্ঞাসু বিস্মিত দৃষ্টির জবাবে বলে, 'আমার জন্যে!' সুমন্ত চেঁচায়, 'কেন?' সশব্দ হাসির সঙ্গে নুয়ে ভেঙ্গে পড়ে হৈমন্তী বলে, 'তুমি ভাবছ আমি পালাব।' হাসি থামিয়ে বলে, 'তাহলে হাট যাচ্ছি। এখনই কিন্তু ফিরে আসব।'

সুমন্ত চেঁচিয়ে ওঠে, 'স্টপ। থাম তুমি।'

হৈমন্তী একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখ সুমন্তর উপর নেই। রক্তের ভিতর কী যেন তার হয়। প্রবল শক্তি তাকে টান টান করে রাখে। সুমন্ত মুছে যায়। এ ঘর মুছে যায়! রক্তমাংসের এই স্থুল শরীর, কামনা বাসনার প্রতিনিয়ত কীটের দংশন আকাঙ্খার দিকে আছাড় বাধা খেয়েও ধাবমানতা এসব মিলে মিশে যে পার্থিব জীবনের শুরু এবং মৃত্যুহিমে সমাপ্তি, তার মধ্যে কীভাবে যেন জেগে উঠেছে এক দ্বিতীয় পৃথিবীর অস্তিত্ব অথবা দ্বিতীয় জীবন অথবা আকঙ্ক্ষার এক ভিন্নতর কেন্দ্র। হৈমন্তী ঠিক এ রকমই ব্যাখায় আসতে পারলে খুশি হত। গায়ের উপর জড়িয়ে যাওয়া আস্তরণটা শুকনো পাতার মতো খসে যেত টুপটাপ করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে। কিন্তু গভীর মগ্নতা তার বুদ্ধিকোষগুলোকে আবৃত করে দিয়েছে। যেন এক শিকারির তূণ থেকে ছুটে আসা তীর বিদ্ধ হয়ে এক ভিন্ন মায়াময়তার আবেষ্টনী এনে দিয়েছে। তাকে ডাকে। কতদূর থেকে দিগন্তরেখা পার হয়ে বিন্দুর মত আয়তনহীন অস্তিত্ব হাঁক পাড়ে।

রূপপুরের বাইরের মাঠের ধারে একা একা সেদিন এসেছে হৈমন্তী। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিমের দিগন্তরেখা বরাবর মোটা দাগের মত পাহাড়শীর্ষে রক্তিম কদম্ব হয়ে ফুটে আছে সূর্য। হু হু হাওয়ায় শাড়ির আঁচল উড়ছে তার। সামনে ক্ষেতগুলো শয়ান। নাড়া খাচ্ছে গাছগাছালি। ওদিকে রক্তিম কদম্ব রাঙিয়ে দিচ্ছে ধরিত্রী। সোনা সোনা। যেন গলন্ত সোনায় এ ভূভাগ ডুবে যাবে। হৈমন্তী হাঁটার সময় রূপপুরের বাইরে তাকিয়ে যে শুষ্ক গৈরিক প্রকৃতিকে ভেবেছিল এক বৈরাগী দেখল কী অমিত তার ঐশ্বর্য। অজস্র সোনা। যেন বৈরাগীর পায়ের তলায় নিবেদিত হচ্ছে সমস্ত সম্পদ সমস্ত ঐশ্বর্য। অথচ কী উদাস নিঃস্ব চৈত্রের গোধূলি—কিছুই নিল না। তুলে নিল পশ্চিমের কদম্ব তার সম্পদের ডালি। এবং তখনই রক্তের অণুতে পরমাণুতে যেন বয়ে যেতে থাকল এক স্রোত। হৈমন্তী যাতে ভেসে গেল। সুমন্ত নেই, বাবা নেই, মা নেই, কলকাতা নেই, রূপপুর নেই, শিক্ষা নেই, সংস্কৃতি নেই, প্রাচীনতা অথবা আধুনিকতা বলে কিছু নেই—তখন কেবলই এক রহস্যময়তা। তারপরই ওই দৃশ্যের জন্য আকুলতা। কিন্তু আর দেখা যায় না। যেন অদৃশ্যলোক হঠাৎই দৃশ্য হয়ে গিয়েছে। নিষিদ্ধ প্রদেশের দ্বার উন্মোচিত হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সুমন্তকে বলা যায় না। বললেও বোঝান যায় না। সন্দেহ করে। যেন তার গোপনীয়তাকে সে যেমন করেই হোক সূর্যালোকে দাঁড় করাবে। গোপনীয়তা সুমন্তরও আছে। সবই উম্মোচিত হয় না। নিজস্ব কিছু না কিছু থাকে। হৈমন্তীর এই ভাবনাই যেন তাকে শক্ত করে দিয়েছে। সন্দেহ দিয়ে সুমন্ত তাকে নগ্নিকা করে দিতে চায়। কী লজ্জা! আর এই লজ্জায় যেন কাঙ্ক্ষিত পুরুষরূপে প্রতীতি সুমন্তকে একটা ভাঙ্গাচোরা মানুষ করে দিয়েছে। ভাঙ্গাচোরা মানুষকে নিয়ে ঘর করে কেমন করে! কেমন করে শরীরে শরীর মেশায়। চার দেওয়ালের আবেষ্টনীর উষ্ণতা অনুরাগ ধরে রাখে!

হৈমন্তী সচেতন হয়। পা বাড়ায়। সুমন্ত এগিয়ে পথ আগলায়। 'তুমি যাবে না।' পুরুষের শরীরের শক্ত বাধা। হৈমন্তী সুমন্তর চকোলেট গেঞ্জির প্রশস্ত বুকের দিকে তাকায়। স্বামী নয়, এক আদিম পুরুষ। সে বলে, 'পথ ছাড়।' সুমন্ত হৈমন্তীর দু কাঁধ করে ঝাঁকায়, 'অসম্ভব। বল সে কে?' হৈমন্তী কাঁপে, 'ছাড়। আমি জানি না। জানি না। প্লিজ সুমন্ত.......।' সুমন্তর শিক্ষা সৌজন্য খসে পড়ে, 'ন্যাকামো হচ্ছে। বল, কে!' হৈমন্তী দাঁতে দাঁত চাপে, 'পিছন পিছন গিয়ে দেখেছ তো!' সুমন্ত মাথা নাচায়, 'হ্যাঁ আমাকে দেখেই সে আড়ালে চলে গিয়েছে।' হৈমন্তী বলে, 'সুমন্ত তুমি আমার গোপনীয়তা জানতে চেও না।' সুমন্তর দাবী গলায় জমে, 'তুমি আমার স্ত্রী। তোমার সব কিছু জানার অধিকার আছে।' অধিকার! দাবী! রি রি করে ওঠে শরীর। তবু হৈমন্তী আবার বলে, 'তুমি বুঝবে না।' সুমন্ত পাগলের মত ঝাঁকুনি দেয়। আঁচল খসে পড়ে হৈমন্তীর। দুচোখ বিস্ফারিত হয়। এবং সুমন্তর প্রবল ঝাঁকুনির সঙ্গে এক ধাক্কায় সে মেঝের উপর ছিটকে পড়ে আর্তির শব্দ তোলে। ওভাবেই পড়ে থাকে। দু'চোখে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, এক হাতের তালুতে সে শরীরের ভার রাখে। সুমন্ত তাকে তুলতে সামান্য নিচু হতেই হৈমন্তী একটুও না নড়ে বলে, 'তুমি আমাকে ছোঁবে না।' সুমন্ত থমকে যায়। ঘাড় তোলে না।. সে সোজা হতে পারে না। হৈমন্তীর ভঙ্গিরও কোন রূপান্তর ঘটে না। স্টিল ছবির মত ঘরের ফ্রেমে আটকে থাকে দম্পতি।

রূপের খোঁজ

লোকে বলে, বিন্দা। ভোটার লিষ্টে বৃন্দাবন। বিন্দার বাপের বাপ, তার বাপ বহুরূপী সাজত। বিন্দার বাপ ও নেশায় যায়নি। আংশিক বৃত্তি বটে, তবে নেয়নি। কিন্তু তিন পুরুষের রক্তের ধর্ম, আংশিক বৃত্তির প্রবণতা যাবে কোথায়! জ্যাঠা বাহক হয়। বাপ হয় না। বাপ না হোক বৃন্দা তো হতেই পারে। ঝোঁক তো ছিল। না-কাজের শেষ শাওনে জ্যাঠার কাঠের বাক্সটা ঘরের কোণ থেকে যেন বলে উঠল, নেমে পড় হে।

জ্যাঠা দু'বছর আগে গত। জ্যাঠা কেষ্টঠাকুর থেকে কালী, রাধা, হনুমান থেকে বাঘভালুক, রাক্ষসী থেকে ছুরিকাবিদ্ধ রক্তাক্ত মানুষ, রাজা, রানী, গোয়ালিনী কত কী সাজত। নানা রূপ, নানা ভাব নানা ভঙ্গি নানা সংলাপ ঝাড়ত। গাঁয়ে ঢুকে হৈ চৈ ফেলে দিত। জ্যাঠা ন্যাওটা বিন্দা বসে বসে জুলজুল চোখে দেখত জ্যাঠার সাজ। কখনও কখনও সঙ্গী হত। কেষ্টঠাকুর সে, মা যশোদা জ্যাঠা। জ্যাঠা বলত, আমি মরলে তুই বউরূপী হবি।

হওয়া যায়নি। মা মরতে বাপ আধখ্যাপা। কুশাইপুরে সাতকড়ি সাধুর দোকানে কাজ জুটে গেল। খাওয়া দাওয়া, টিফিন, মাস মাইনে ত্রিশ টাকা। স্কুলের পাট চুকিয়ে কিশোরবেলা পার করে যৌবন ওই চাল ডাল তেল নুনের বস্তায়. সাধুঘরে ফাইফরমাস খাটায় বয়ে চলল। বাপ বাজ খেয়ে মরল, জ্যাঠা আগেই গিয়েছিল। সন্তান নেই। লোকে বলে, বংশের বড়বাড়ন্ত নাই। এক পুরুষের সংসার। অকালে তো যাবেই এক জুনা। বলার কী আছে!

এদিকে সাতকড়ি মরল।ভাইয়ে ভাইয়ে ফাটাফাটি। মামলা মোকদ্দমা, মারামারি, গাঁয়ে সালিশী—দোকান হাপিস। বড়ভাই সুবোধ তাকে তার কাছে রেখেছিল, তারপর সেও শ্বশুরঘর দুবরাজপুর গিয়ে উঠল।

বিন্দার তখন থেকেই মুনিষ খাটা। বউরূপী জ্যাঠা আশার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল। পর পর দু'ছেলে। বছর আড়ে আড়ে। আবার মেয়ে চাই। হা অন্ন, কাজ-টান, দু'ছেলেরই জামাপ্যান্ট, খাবার জোটে না, তো আবার মেয়ে। কেন নয়। রোগা শ্যামলা নরম চেহারার আশা তা বলে পেটে মেয়ে নেবে না, মা হবে না, শুধু বেটাতে চলে, বিটি না থাকলে ঘর কী। পরিবার পরিকল্পনায় ধীরেনের ভুজভাজংয়ে ভ্যাসাকটেমি করিয়ে আসতে মাথার চুল এলো করে আশার কী কান্না—আমার কী সব্বনাশ হল গো। শুনে সর্বনাশের খবর নিতে পাঁচুর মা, বড় পিসি, ভরতের বউ, পানি করে করে উঠোন জুড়ে কাকের, কা কা—অ বউ কাঁদিস না। অ বউ কাঁদিস্ না।

বিন্দা উবু হয়ে বসে। লজ্জা নেই, রাগ। আশা তখন ধীরেনের শ্রাদ্ধ দিচ্ছে। ধীরেন থেকে ডাক্তার, ডাক্তার থেকে গমমেন্ট। যাকে দেখা যায় না, অথচ যার ক্রিয়াশীলতা আছে। বিটির মা হবার মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার অসহায় ক্রোধ তারপর বেশ ক'দিন।

তবে আশা নিজেকে সামলে নিয়েছে। জন্ম থেকেই আশার না পাওয়ার ঘটনা আছে, অনেক অনেক হারানোর ব্যাপার আছে। মা বাপ ছিল না, ভাই বোন না,—মামা মামী। স্নেহ ছিল না, খেটেও সে ছিল ওদের ভার। আশা শিখেছে সহনশীলতাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হয়।

আশার বিন্দার উপর যত রাগ তত ভালবাসা। বিন্দাই তার মাটি যেখানে গ্রীষ্মে তাপ বর্ষণ করে, বর্ষায় বৃষ্টি নামায়, যেখানে বীজ বোনে, হরিৎশস্যক্ষেত্র বানায়, যেখানে তার প্রাণভোমরাটিকে সে লুকিয়ে রেখেছে।

কাঠের বাক্সের সব জিনিস উঠোনময়। রাজমুকুট, টুপি, জরিবসান নানারঙের জামা, পাজামা, ধুতি, সিল্ক লিলেনের শাড়ি ব্লাউস, জুতো, খড়ম, ত্রিশূলের মাথা, খাপে তরোয়াল, গয়নাগাটি, হার, পরচুলা টুকরো টাকরার যাত্রাদলের সাজের মত অজস্রতা। সবকিছু ঠিকঠাক। একটা গন্ধ ছাড়ছে বটে কিন্তু কীটদষ্ট নয়, নষ্ট নয়। শেষ শাওনের রোদের যেমন তাপ তেমন ঝকমকানি। মাথা বরাবর এক সূর্য সহস্র হয়ে ওঠার আগুন হানার খামতি দিচ্ছে না। সেই বাণে সব কিছুরই ধূলিমলিনতা ঝাড়াঝুড়িতে ঝলমলানি।

বিন্দা অবাক। পুরান বটে, কিছু ছেঁড়া খোঁড়া, কিন্তু নষ্ট নয়। কার যত্ন? আশার। ঝেড়ে মুছে রাখত। উঠোনে সে কোমরে হাত রেখে থমকে আছে। ছয় আর পাঁচ বছরের দু'বেটা লব কুশ রোগা শরীরে ঢিলে হাফপ্যান্ট, উদোম গা, মাথার চুল উসকো খুসকো, এটা নাড়ছে ওটা নাড়ছে। বিন্দা ধমকানিও দিতে পারছে না। অবাক ভঙ্গি নিয়ে সে বুঝি আশার অপেক্ষা করে আছে।

আশা, কোমরে এল্যুমিয়ামের কলসি, কাঁধে কাচা কাপড় সায়া, ভেজা শাড়িতে গা-ঢাকা, হাঁটু বরাবর উন্মুক্ত, নগ্ন বাহু, মাথার চুল এলো, স্নাত নরম মুখ, কোমর বেঁকিয়ে যে মুদ্রা গড়ে, শ্যামলা মুখের ঠোঁটে যে হাসি রাখে এবং শরীর ছলকে জলতরঙ্গের সুরে যে বলে ওঠে, 'ওমা, ইসব বাইরে কেনে,' সবই যেন বিন্দার কাছে হঠাৎ পাওয়া ঐশ্বর্য হয়ে যায়। রোদ পোড়ানিতে স্নিগ্ধতায় বরিষণ, অনেকদিন আগের যুবতী আশা স্নান সেরে যৌবন ছড়ায়। মোহিত বিন্দা বলে, 'আমি বউরূপী হব। হ্যাঁ রে তু ই সব ঝেড়ে মুছে রেখেছিস্ দেখছি। সব ঠিকঠাক আছে দেখছি।'

'থাকবে না! ঘরের জিনিশ বটে। রাখতে হবে নাই!' মাটির দাওয়ায় কলসি রেখে ঘরে ঢোকে আশা। কাপড় বদলে বলে, 'এমুন মতলব কেনে?'

'দু'পয়সা রোজগার করতে হবে। ঘরে চাল নাই, মুনিশের কাজ নাই।

'লোকে আমুদ পাবে? এখুন টি ভি, ভি. ডি ও। গাঁয়ে যাত্রাই হয় না।'

বিন্দা ধন্দে পড়ে। সময় বদলে গিয়েছে। জ্যাঠারও শেষদিকে তেমন রোজগার ছিল না। লোকেরও উৎসাহ ছিল না। জ্যাঠা দুঃখ করে বলত, মানুষ নাই । সব বদলিন্ গেল।

বদলটা হয়। কোন সঙ্কেত দিয়ে নয়, অনুভবেও প্রায়শঃই বাজে না। তারপর কোন ঘটনায় সেটা টের পাওয়া যায়। আশার বলে ওঠা, জ্যাঠার কথা মনে পড়া, বিন্দার নিজস্ব জানা থেকে বদল চিত্র মনে যে স্ফুট হয়, তা বড়ই এলোমেলো, পারস্পর্যহীন।

বিন্দার ভাবনাটাকে গুছিয়ে সাজান যেতে পারে এভাবে!

বদল জীবনযাত্রায় পোশাক আশাকে, কথাবার্তায়। বদল গ্রামের চেহারায় যাতায়াত ব্যবস্থায়। বদল খেলাধূলায় আমোদে। বদল চাষ ব্যবস্থায়, কথাবার্তায়। পঞ্চায়েত কর্তা, রাজনীতির চাষ ঘরের উঠোনে। ভোট, ব্যাঙ্কলোন, ডি আর ডি এ, জওহর রোজগার যোজনা, সাক্ষরতা অভিযান গ্রামের মাটিতে, যা ছিল না তাই ঘুরে বেড়ায়। মগয়ার মঙ্গলঢাক এসে ঘরে ঘরে বেজে চাল ডালের 'সিধা' আদায় করে মঙ্গল কামনা করে না গাঁয়ের। মনসামঙ্গলের গান হয় না। লেটো আলকাপ হয় না। পটুয়ারা আর পট দেখাতে আসে না।

বিন্দার জানার পরিধিতে আরও আছে। সাতকড়ির ছোটছেলে সুধীর কলেজে পড়ত, রাজনীতি করত। অবসরে সে সামন্ততন্ত্র, গণতন্ত্র, বিপ্লব, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ইত্যাদি ইত্যাদির কিছু পাঠ দিয়েছে। তা থেকে চতুর্থশ্রেণীর বিদ্যেতে মোদ্দা যে কথাটা বিন্দা বুঝেছে তা হল, শোষণ আর বঞ্চনার বিষ-বৃষ্টিপাতে অন্যায় ধারায় রাজা থেকে জমিদাররা লুপ্ত হয়েও অন্য চেহারায়। ধনতন্ত্র মূর্তি পালটেছে। গরিবিটা ভাগ্যলিপি নয়, কিছু শোষকের জন্য চেপে বসেছে। তাদের চিহ্নিত করতে হবে। রাজা জমিদার ঘৃণ্য। জনগণ একদিন জবাব দেবে।

বিন্দার কেবলই শোনা। বলার ঢঙের জন্য মুগ্ধতা। তার গরিবি যে ওদেরই দোষ তেমনটি কখনই মনে হয় নি। গণতন্ত্রের মত, জনগণ শব্দও তার কাছে অপরিচিত। কত কথাই শোনে, কতই তো ভুলে যায়। বিন্দার কাছে কখনই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

আশা অবাক চোখে রোদে পোড়া স্বামীকে দেখছিল। বলল, 'ওমা শুনেই মুখ চুপসে গেল। আমি বললম্ বলে। যেঁয়েই দেখে এস, লুকে পসন্দ করতেও পারে। বউরূপী দেখে আমুদ করতে পারে।'

বিন্দার উৎসাহ তো ছিলই। মুহূর্তের নিষ্প্রভ ভাব দ্রুত কাটিয়ে বলল, 'কিছু জিনিশ চাই, তেল, রঙ, ফ্রেঞ্চচক এট সেট।'

বড়ছেলে একটা মুকুট হাতিয়ে ছিল। জরি খসেছে, বলল, 'বাবা লুব?'

ওমনি ছোট কুশ একটা লাল শালুর কাপড় হাতে তুলল, 'বাবা লুব?'

বিন্দা কেড়ে নেয়, 'রাখ্। রাখ্।'

আশা উঠোনে নেমে দু'ভাইয়ের হাত ধরে টেনে আনে দাওয়ায়। বিন্দাকে

বলে, 'রোদে দাঁড়িও না। ছিয়াতে এস। জরির টুকরোগুলো ফেলো না, আমি ঠিক বসিন দুব। সেলাইও করে দুব। টাকা আছে আমার। যা কেনার কিনো। কিন্তু হাট থেকে এসে আগে আমার দেনা শোধ করবে।'

বিন্দা গয়লানি সাজবে। এক-দেখানিতে পয়সা। মুখে বোল, সারা মাস দুধ দিয়ে গেলাম। পয়সা দেবে না কী গো! কোমর দুলিয়ে মেয়েলী ঢঙে, চোখ ঘুরিয়ে গালে হাত দিয়ে অমনটি করা দেখে বেজার মুখ সহাস্য হবে। কেউ গ্রাহ্য না করলে লোক ডাকা, শুন গ ভদ্দরজুনা। ঘরে দুধ দিয়েছি মাস ভোর। ঠাকরুণ জানে, ছেলেমেয়েরা জানে, আমার নাই-গরুর দুধ। না পয়সা দিলে খাই কী করে। তুমরা বাবু আদায় করে দাও।

তবে জ্যাঠা বলত, 'এক রূপ দেখিন্ পয়সা আদায় তোর ভিক্ষেরই সমান। দশ পনের রূপ দেখাবি। তারপর আদায়। সেটাই হল মজুরি।'

কিন্তু দশ হাট পনের হাট দেখান কী সম্ভব। সপ্তাহে মঙ্গল আর রবি হাট। কতদিন লেগে যায়। ভিন্ গাঁ হলে ভেন্ন কথা।

বিন্দা গয়লানি সেজে পরদিনই হাটে। মাথায় লম্বা পরচুলো, কালো উঁচু-নিচু ঈষৎ লম্বাটে মুখে ফ্রেঞ্চচকের ঘামে ভিজে ওঠা বিশ্রী সাদাটে দাগ, বুকের জন্য নারকেলমালার স্তন, তার উপর রঙ চটা লিলেনের আদ্যিকালের সহস্র খাঁজ খাওয়া হলদে ব্লাউজ, গায়ে নীল শাড়ি, শিরাওঠা হাতে একরাশ কাঁচের চুড়ি, কোমরে মাটির ছোট্ট একটা কলসি। মাথায় 'বিড়ে' কলসি বসানর জন্য। কলসিটা তাতে মাঝেমধ্যে হাতে ধরছে আবার কোমরে রাখছে। তারসঙ্গে পথচারীদের সামনে দাঁড়িয়ে জ্যাঠার সেই পুরোন সংলাপ, 'সারামাস দুধ দিয়েছি। এখন পয়সা দাও গো কত্তা।'

বহুরূপী দেখে হেটো মানুষদের বিরক্তি নেই। বরঞ্চ অবাক চাউনি, কথা শুনে, ঢঙ ঢাঙ দেখে মুখে স্ফূর্তি ভোগের তরঙ্গ। খসখসে রোদের সকাল। হাট চত্বর রোদে পুড়ছে। ঘুরে ঘুরে সব ক'টা ব্যাপারী নয়, খদ্দেরদেরও ধরে বিন্দা। ছোট হাট। গোটা চল্লিশ ব্যাপারী আনাজপত্র নিয়ে বসে আছে।

আলু নিয়ে বসা টেকো মাথা, কালো, মোটাসোটা কেষ্টা বলল, 'অত জলমিশেল দাও কেনে গয়লা বউ। দুধ যে মুখে লিতে পারি না।'

গালে হাত গয়লানির, 'ওমা কুথা যাব। নাই-গরুর শুকো দুধ। জল না দিলে গুলে না গো।'

হাটে কালীপুরের ভোলা দাস তাদের গাঁয়ে যাওয়ার কথা বলতে কটাক্ষ হেনে শরীর দুলিয়ে বলে উঠল, 'গুয়ালর বউ বটি, হাটে হাটে দুধ নিয়ে ঘুরি কিন্তু মান ইজ্জত ছাড়তে লারি। শুনগো সব মানুষ, আমার পীরিতে মজেছেক। ঘর যেতে বলছে। তা আমি গেলে ঝাঁটাপিটে করবে নাই তো বৌ।' বলেই ভোলার কপালে চকাস্ করে চুমু খায়। হাসির হুল্লোড় ওঠে।

ফেরার পথে রোদে পুড়ে ঘেমে বিন্দা নিজের কাছে নিজেই বিস্ময়। কে

জানত, জ্যাঠার বিদ্যে তার মাথায় ভর করতে অমন করে সে বলতে পারবে! শুধু তো সাজা নয়, অভিনয় কলাটিও জানা দরকার, তবেই তো চরিত্রটি রূপ পাবে, লোকে উপভোগ করবে। তারপর আচমকা কোন রূপ ধরে চমক দেওয়ার ব্যাপার থাকবে, তবে না গাঁয়ের লোকের ভালবাসা, তবে না তোমার জন্য পয়সা, চাল আলু বেগুন, জামাকাপড়।

পঞ্চায়েত অফিসে অনিল মাস্টার ধুতি পাঞ্জাবি, চোখে চশমা পরে দাঁড়িয়েছিল। দেখেই ডাকলো, 'শোন। শোন।' বিন্দা কাছে যেতে বলল, 'তুমি তো বৃন্দাবন, গোবিন্দ বহুরূপীর ভাইপো।'

'হ্যাঁ।'

'বহুরূপী সাজা তো দেশ গাঁ থেকে উঠে গিয়েছে। তুমি সাজ নাকি? কোনদিন দেখি নাই।'

'জ্যাঠার বিদ্যে লুব ভাবছি।'

'নাও।' অনিল মাস্টার উৎসাহ দিল, 'ধরে রাখ এই শিল্পটাকে। পঞ্চায়েত অফিসে সময় করে একবার এসো তো! দেখি, তোমার কী ব্যবস্থা করতে পারি। এমনিতে কর কী তুমি!'

'মুনিষ খাটি।'

'তা খাট। তবে এটা ছেড়ো না। সরকার এখন সব রকমের শিল্পীদেরই অনুদান দিচ্ছে। যাতে তাদের চর্চ্চা করার সুবিধে হয়। ভাল কথা, সাজের জন্যে তো অনেক জিনিশ লাগে। তোমার ত—।'

'জ্যাঠার যা আছে। তাও লষ্ট অনেক। কিনতে হবে।'

'এসো তুমি। ব্যবস্থা হবে। হাটে পয়সা কিছু হল?'

'গুনি নাই। থলে আনলে চাট্টি তরকারি হত।' বিন্দা হাসল।

ঘরে ফিরল বিন্দা যেন রাজ্য জয় করে। মেয়েলি গলা করে দোরগোড়ায় বলে উঠল, 'দুধ এনেছি গো, কোথা গেল ঘরের বউ!'

আশা না দেখেই বলে উঠল, 'লাগবে নাই গো তোমার নাই-গরুর শুকো দুধ। ঘরে শিবের ষাঁড় চরতে গেইছে। ফিরলেই দুয়ে লুব।'

কালীপুরে দু'দিন পরেই শিব সেজে হাজির হয়। কাঁধে মস্ত ঝোলা, মাথায় জটাজাল, গলায় নীলরঙ মেখে নীলকণ্ঠ, কাগজের সাপ কাঁধে। কোমরে ছেঁড়া বাঘছাল, সারা গা ছাইমাখা, হাতে ত্রিশূল, কপালে বাহুতে রক্ত চন্দনের ছোপ, গলায় মালা, মুখে আওয়াজ ব্যোম্ ব্যোম্। চোখ ঢুলু ঢুলু। যেন চরস, গাঁজা, ভাঙের নেশায় টইটম্বুর।

মাঝে দু'টো গাঁ পড়ল। একটা সাঁওতালপাড়া। চাল পয়সা দিতে এল সব। হাতের পাতা খাড়া করে স্থির ভব, তথাস্তু কিংবা আশির্বাদ। বলছে, 'কৈলাস থেকে এলাম। ক'দিন থাকব পৃথিবীতে। তারপর অট্টহাসি, যার ঘরে অন্নপূর্ণা, তাকে তোরা ভিক্ষে দিবি। আসব, আবার আসব। হর হর ব্যোম ব্যোম।' ত্রিশূল

তুলে একবার নটনৃত্য দেখিয়েও দিয়েছে।

কালীপুর গিয়ে ভোলা দাসকে খুঁজতে হয় না, নিজেই ছুটে এসেছে। ফরশা রোগাপানা চেহারা, লুঙ্গির উপর একখানা সাদা পরিষ্কার পাঞ্জাবি। বলে, 'এলে তাহলে।'

বিন্দা ঢুলু ঢুলু চোখে একবার ভোলাকে দেখে, তারপর ত্রিশূল উঁচিয়ে বলে, 'ব্যোম। ব্যোম।'

'আহা, শুনবে তো আমার কথা। বোমা মারা তোমার রাখ। লাও, বিড়ি খাও।' পাঞ্জাবির পকেট থেকে বিড়ি বাড়িয়েছে ভোলা।

'গাঁজা দে। গাঁজা। ভৃঙ্গী কোথায়?'

'আমিই তো বাবা নন্দী ভৃঙ্গী।'

দর্শকদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে।

ভোলা গাঁ ঘোরানর সঙ্গী হয়ে যায়। পিছনে ছেলের দল। অন্যরকমের মজা এসেছে গাঁয়ে, রোদ চড়া। তার দাপটে ঘেমো গুমোট। চতুর্দিকে বর্ষার পচানি, তার চাপেই বাতাস ভারী। মেঘ নেই। একেবারে ঝকঝকে আকাশ।

ভোলা ঘরে নিয়ে এসে অন্নটিও দেয়। শিব হয়ে কোন দান নেয়নি বিন্দা। ভেবেছিল দুপুর গড়িয়ে ঘরে ফিরবে। রাতে ভাত। গাঁয়েই এখানকার দোকান থেকে মুড়ি কিনে চিবিয়ে নেবে। ভোলার ঘরে অন্নের আমন্ত্রণে তার হিসেব বদলে যায়। দুপুরে ফেরার দরকার নাই, বিকালে সাইকেল বসিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে বলে জানায় ভোলা। এত দরদ কেন তা অনুমান করতে পারে না বিন্দা।

ভোলার কাছে বিন্দার আকর্ষণ মূলতঃ বিন্দার সংলাপ আওড়ান অভিনয়ের ঢঙ ঢাঙ। ভোলার মধ্যে ওই পোকাটি আছে। অভিনয় কলায় ঝোঁক। যাত্রা, থিয়েটার কী সিনেমার নামার স্বপ্ন দেখে। গাঁয়ে 'সিঁদুর নিও না মুছে' পালা করে প্রচুর হাততালি পেয়েছে। কিন্তু সুযোগের বড় অভাব। নিয়মিত যাত্রাপালা নামান যায় না। কোথাও হলে ভোলা সেখানে ছোটে। রেডিওর নাটক, টি, ভি, ভি ডি ও-তে বেশই ঝোঁক তবে পাগলামি নেই। বাপকে চাষের কাজে সাহায্য, ঘরের অন্য খাটালিতেও আছে।

বাবা মায়ের একটাই রাগ, বিটির বিয়ে হয়েছে। তোরও বিয়ে করা দরকার। কিন্তু ছেলে বিয়ের নামে একেবারে ভীষ্মদেব।

পরের দিন বৃন্দাবন হনুমান। লম্বা লেজ, গায়ে লাগান তুলো, মুখে কালি। ছেলেরা হৈ হৈ করে পিছনে লাগে, কুকুরের দল পেছনে চেঁচায়। ভোলা সঙ্গেই থাকে। আজও নিজের ঘরে যেতে হয় না। অন্ন জোটে, ভোলার ঘরে। ভোলার মা বলে, 'আহা, দুটি ভাতই ত খাবে। অন্য কিছু লয়। তবে বাবা তুমি ওকে বুঝিয়ে বল বিয়ের জন্যে, বয়স হছে।'

ফেরার পথে ভোলা বলল, 'দাদা, শহুরে মেয়ে সাজাতে পার। আজকের

বউদের পারা। যারা সোয়ামী ছাড়া কাউকে চেনে না। খুব স্টাইল।'

বিন্দা তাই পরদিনই শহুরে বিবি। মুখে পাউডার, ঠোঁটে লালরঙ, গালে রুজ, সিঁথিতে ফিকে সিঁদুর, হাতে খেলনা ঘড়ি, কানে বড়সড় পিতলের রিঙ, গলায় হার, চোখে চশমা, পায়ে চটি, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, মাথায় ঘোমটা নেই, বুকের আঁচল বারবার খসে খসে পড়ে। ঘরে গিয়ে শরীরে ঢেউ তুলে মেয়েলি গলায় বলে, 'সিনেমায় যাচ্ছি। শাশুড়ি আমার কাপড় কাচছে। শ্বশুরকে চাকর রেখেছি। এমনি তো আর বুড়োবুড়িকে খেতে দিতে পারি না। হাজব্যান্ডকে বলেছি, বাসা কর কলকাতায়। না করলে ডিভোস করব।'

ভোলা ঘরে মাকে বলল, 'মা বিয়ে করলে এরকম করবে বউ।'

ভোলার মা একটা চ্যালা কাঠ নিয়ে হাসতে হাসতে তাড়া করল, 'পিটিয়ে সোজা করব বউকে। আয় তো এদিকে।'

গাঁয়ে বহুরূপীকে নিয়ে যেন উৎসব। কেউ বলে, 'জ্যাঠার পারা হনছে। একবার বাঘ সেজে এমন ডাকছিল যে গাঁয়ের ছাগল গরু দড়ি খুলে ছুটোছুটি।' চন্ডীমাস্টার বলল, 'ছোকরারা সাজসজ্জা নাই, কিন্তু ঢঙঢাঙ ভালই করে।' আগামীদিন কী সাজবে জিজ্ঞেস করে। বিন্দা বলে, 'উটি বলতে পারব না।'

রাজার কোমরে খাপের মধ্যে তরবারি। গায়ে ছেঁড়া জরির জামা, গলায় হাতে রাংতার গয়না, পায়ে জরির জুতো, মাথায় মুকুট। রাজকীয় গম্ভীর মুখ। ওই ভঙ্গিতেই বিন্দার হাঁটা। পিছনে ছেলের পাল। অজস্র কথা তাদের—ও রাজা, ঘোড়া কোথায়, কোথাকার রাজা বট, এ মা জমাট ছেঁড়া কেনে, কত মানুষ কেটেছ তরোয়ালে, রাণী কোথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজা বলেই বুঝি গাঁয়ে ঘরে আপ্যায়ন। যেমন কৃষ্ণ হলে কিংবা কালী সেজে এলে হয়। ভক্তিতে ফলমাকড় দেয়, মিষ্টি দেয়, প্রণামী পয়সা দেয়। রাজাকেও সরবত দিল বলাই ঘোষ। মিষ্টি খাওয়াল শেফালিপিসি। চেয়ার এগিয়ে দিল চক্রবর্তীদের ঘরে। রাজা বলে কথা।

এদিকে ভোলাও চেঁচিয়ে যাচ্ছে ঘরে ঢোকার সময়,'মহাপ্রতাপশালী, মহা শক্তিধর, মহাধিরাজ আদিত্যনারায়ণ আসছেন।' আসছেনটাকে দীর্ঘ টানে অনেকখানি ছড়িয়ে দিচ্ছে। নাটক করার সুযোগটাকে নিয়ে নিচ্ছে আর কী! দ্রুত গলায় বলে যাচ্ছে, 'মহারাজ এসেছেন গাঁয়ে—কোন দুঃখের কথা থাকলে বল। কে কী চাও-বল। কার খাজনা মকুব করতে হবে-বল। কার বিচার চাই-বল।'

রাজসাজে বিন্দা ভেবে পাচ্ছে না, প্রজাবর্গের কাছে এমন শ্রদ্ধাভক্তি পাওয়া যেতে পারে। রাজারা তো ঘৃণার পাত্র, শোষক, বঞ্চনা আর অপহরণের উপাদানে তার সিংহাসন। এদের আপ্যায়নে মজা না সত্যিকারের ভক্তি! মস্তিষ্ক যথেষ্ট নাড়া খায়। তবে তাতে কী গোছের তাচ্ছিল্য এবং গুরুত্বহীন তার কাছে।

ঘটনা ঘটল রায়বাড়ির সামনে। একদার জমিদার বাড়ি। এখন ধ্বংস সময় প্রহারে। এখন সবই গল্প কথা, সত্যিমিথ্যের সংবিশ্রণ। এখন প্রত্যক্ষ করা

কোন সাক্ষীই বেঁচে নেই। সাক্ষী বট, অশত্থ, বনজ নানা উদ্ভিদের ছাউনি ঘেরা ভাঙা পাঁচিল, ইঁটের স্তূপ। সাক্ষী প্রথম দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আধ ভাঙা পাঁজরা। একদা হাতির পিঠে নাকি রাজ আগমন ঘটত তাই অত প্রশস্ত এবং উঁচু করা হয়েছিল। সাক্ষী দোতালা বাড়িখানার কঙ্কালমূর্তি। ব্যবহার যোগ্য একটি কক্ষমাত্র। বাকির পরিত্যক্ত বিপজ্জনক অবস্থায় নীরব অস্তিত্ব। সংলগ্ন বাগানটিরও দারিদ্র্য দশা। মূল্যবান বৃক্ষেরা নেই। এখন পেয়ারা, আম, কামরাঙা, অফলা দুটো নারকেল। বাগানে গরু চরে। উত্তর পুরুষেরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। জমি জমা কবেই লোপাট। লক্ষীপুজোর একদা প্রসিদ্ধি ছিল। এখন গাঁয়ে সেটা বারোয়ারী হয়েছে।

একটি প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাণী কিংবা প্রেত মূর্তি বলা যায়। আধপাগলা বিভূতি রায়। মাথার চুল শণ সাদা, কঙ্কালসার শরীর, হাড়ের উপর সাদা চামড়ার ঢাকনা। চুপচাপ শুয়ে থাকেন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন। দেখাশোনা করে বাদল বাউরি। সেটা লোকটার অনুগ্রহই বলা যায়। বিভূতিকে মধ্যে মধ্যে নিজের অন্নের ভাগও তাকে দিতে হয়। এ পরিবারের এক শরিক শম্ভু রায় কলকাতায় থাকেন। তিনিই বিভূতির খরচা পাঠান।

বিভূতি রায় বিবাহ করেন নি। বি. এ. পাশ করেছিলেন। তিনি জমিদারির কোন চিহ্নই দেখেননি। বলতে কী দারিদ্র্যের মধ্যেই পার করতে হয়েছে দিন। শৈশবে রায়বাড়ির অর্ধেক ব্যবহারযোগ্য জিনিশ তাঁর দেখা। বিভূতির মধ্যে জমিদারি রক্তের বহমানতা বরাবরই। অহঙ্কারও ছিল যথেষ্ট। একদা সোনার চামচে দুধ খাওয়া পূর্ব পুরুষদের সমৃদ্ধি বিষয়ে বহু গল্পই প্রচার করত। তার সত্য মিথ্যার ভাগ নিরূপিত না হলেও লোকে হাসত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রায় পাগলামিতে পৌঁছে যায়। পলাশীর যুদ্ধের সময় তাঁর পূর্বপুরুষ কী ধরণের সহায়তা করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে কী ভূমিকা নিয়েছিল কোন এক রায় বংশধর, মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে কী ধরণের সমাদর ছিল ইত্যাদির কল্প গল্প জন্মের পূর্বের ব্যাপার হলেও আপন উপস্থিতি স্বচ্ছন্দে করে নিতেন। যুক্তি বাস্তববোধ, সময়ের হিসাব সে সব গালগল্পের তালগোল পাকান আকার করে নিজস্ব জগতে তাঁর অবস্থিতি ঘটে গিয়েছিল। প্রায়ই অসুস্থতা, বয়সের ঝাপটা ক্রমে তাঁকে ন্যুব্জ করেছে। একা একা বিড়বিড় করে সংলাপ আওড়ে প্রায় সময় শুয়ে কিংবা বসে তাঁর দিন যাচ্ছে।

ভোলা অমন পাগলের ঘরে একদিনও নিয়ে যায় নি বহুরূপীকে। কিন্তু কে জানত, লোকটা দরজা গোড়ায় লম্বা লাঠি হাতে ঝুঁকে বসে থাকা অবস্থায় শুনতে পাবে, হল্লা। দন্তহীন মুখের নাড়ানিতে বলবে, 'কে? কে বটে?'

ভোলাকে যেন মজার পায়। সে একেবারে সামনে গিয়ে বসে থাকা বৃদ্ধের সামনে গলার স্বর ছড়িয়ে চেঁচায়, 'রাজামশায় এসেছেন গো, মহারাজ। মহারাজ!'

'কে? কে?'

'মহারাজ। মহারাজ এসেছেন রাজ্যি দেখতে।'

ঝাপসা চোখে সামনেই বৃদ্ধ দেখেন রাজবেশে বিন্দাকে। তাঁর গলায় আর্তি ফেটে পড়ে, 'মহারাজ!' উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করেন, পারেন না। হাড়ের কাঠামো যেন ভেঙে যায় ঝুরঝুর করে। তিনি বসে পড়েন, 'ওরে কে কোথায় আছিস রাজার জয়ধ্বনি দে। ওরে বাজনা নেই কেন? শাঁখঘন্টা বাজছে না কেন?'

ভোলা বলে, 'যাঃ বাবা কী হল।'

বৃদ্ধের কম্পমান গলা বেজে চলল। কোন উচ্চারণই স্পষ্ট নয়। দন্তহীন মুখের ছিট্‌কে আসা আওয়াজ, যা রূপ নেয় কথার আন্দাজে অর্থবহ্ করে নিতে হয়। আওয়াজ ছড়িয়ে থাকে ভাঙা টুকরো কথার—আমার মনে আছে মহারাজ আপনি আগে যখন এসেছিলেন, তখন বাজী পুড়েছিল। কী শব্দ কী আলো ফুলের ছড়াছড়ি, কত শঙ্খের আওয়াজ, ব্যাগ পাইপ, বাঁশি-চারপাশে আপনার জয়গান। কুচকাওয়াজ করছে সৈন্যবাহিনী। কত হাতি ঘোড়া।

বিন্দা বড়ই ভয় পায়। চামড়া ঢাকা হাড়ের কাঠামোটা যেন টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যাবে। কাঁপছে হাড়ের পাঁজরা। মারা যাবে না তো! এগিয়ে সে বৃদ্ধকে ধরে, 'উরকম করছেন কেনে?'

বিভূতি রায় খামচে ধরেন জীর্ণ, প্রাচীন, যাত্রাদলের জরি বসান রাজপরিচ্ছদ। লম্বা নখের টানুনিতে ফড়ফড় করে ছিঁড়ে যায় জামা। টের পেয়েই যেন মুহূর্তে সচেতন, মুহূর্তে স্বাভাবিক মানুষটি হা হা করে করে ওঠেন। কোটরের ভেতর ঘোলাটে চোখে পিচুটি, চাউনি স্বাভাবিক, শ্লথ মুখের মাংস কাঁপছে ঠোঁটে লালা—

'এই সাজ আপনার। ফেঁসে গেল! আপনি রাজা। এই রাজপোষাক। হাঃ হাঃ হাঃ, বুঝেছি, কেড়ে নিয়েছে। আমারও প্রভু আমারও কেড়ে নিয়েছে।'

ছেলেরা নীরব। ভোলা এসে নাটকে স্তম্ভিত, বিন্দার মুখে কোন শব্দ নেই।

বিভূতি রায় তারপর বিদ্রূপে খান খান হয়ে বলে, তুমি রাজা লও। রাজা লও।

বাদল বাউরী দূর থেকে ছুটে আসে 'কী হয়েছে? কী হয়েছে? আহা, ঘর থেকে বার করলেক কে? আধক্ষিপা মানুষ। সরে যাও। সরে যাও।'

পাঁজকোলা করে বাদল মানুষটাকে ঘরে ঢাকায়।

ভোলা উৎসাহ দেয়, 'চল চল, অনেক ঘর আছে।'

বিন্দা উৎসাহ বোধ করে না। বলে, 'আজকে ঘর যাই। ভাল লাগছে না।'

'জামা ছিঁড়ে গেল বলে?'

'না জামা তো ছিঁড়াই বটে। রিপু করে পরেছি।'

'তাহলে আমাদের ঘরে খাবে। রাজা ভাত খাবে বলে আজ আটপদ রান্না হবে। মাছের ব্যবস্থা করলম্, দেখলে ত।'

ভোলার মায়ের জেদেই খেতে হয়। বিন্দা চুপচাপ। কেন যে মন খারাপ!

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। গায়ের জামাটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে করছে, সে নির্দিষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারে না। তার মন ঘিরে বিষণ্নতার মেঘ, নিঝুমতার আবেশ। মানুষ কোন কিছু হারালে, গভীর কষ্ট পেলে এমনটি হয়। একটা আধপাগলা লোক কিনা ধরে ফেলল।

পঞ্চায়েত অফিসের সামনে প্রধান, পাশে অনিল মাস্টার চৌকিদার চরণ। কী যেন কথা হচ্ছে ওদের। বিন্দাকে দেখে তিনজনেই।

অনিলমাস্টার বলল, 'আরে রাজা রাজড়া সেজেছিলিস্ মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ সাজ ঠিক হয় নাই।'

'ঠিকই। আরে রাজা বলে কথা। ঝলমলে পোশাক হবে। পোশাক থেকে মুকুট, ছিটকে পড়বে মনিমুক্তার জ্যোতি। না, না, এ সাজে চলবে না।'

কথাটা বিন্দাকে আরও ব্যথিত করে। দুঃখের আরো মেঘ এসে মুখ কালো হয়ে যায়। সে যে ভেবেছিল রাজা জমিদার শোষণ করে, বঞ্চিত করে সাধারণকে, গরীব করে অজস্রকে সম্পদের সিংহাসনে বসে, তাকে এমন সম্ভ্রমবোধ, এমন সম্মান কেন? কেন ঘৃণা নেই? পঞ্চায়েত মানুষজনদের সে জিজ্ঞাসা করতেই পারত। কিন্তু বিন্দার কাছে ঢের বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সাজ, দেখা দিয়েছে বহুরূপী হয়ে সে রূপ ধরার বিদ্যেটা দেখাতে পারল না তার অসফলতা। একটা আধপাগলা মানুষ তাকে ঠাট্টা করে গেল!

অনিলমাস্টার বলল, 'দ্বিজুদা, এর কথাই হচ্ছিল। শিল্পী বলা যেতে পারে। দেখছেন তো। এর তো টাকা পাওয়া উচিত।'

'আমি কী না বলেছি মাস্টার। দাও টাকা। বউরূপী বেশ মজা দেয় মানুষকে।'

'তুমি কালই এসো বৃন্দাবন।'

বিন্দা ঘাড় কাৎ করল। টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাও মনের ভার কমাল না।

বিকেলের দিকে গড়ান দুপুরে ফিরে আসা দেখে আশা বলল, 'কী হয়েছে! চলে এলে সকাল সকাল। ভাত খেয়েছ? না খেলে বল, ভাত আছে।'

'খেয়েছি। জান, আজ একদম রাজার পারা সাজ হয় নাই। ধরে ফেললেক।'

আশা বলে, 'ওমা ধরবে না! তুমি কী সত্যি রাজা বট। রাজা কী আর আছে।'

'লুকট জানত আছে। জমিদার ঘরের আধখিপা। আমার সাজ ঠিক হয় নাই।'

আশা যেন রেগে যায়, 'সাজ সাজ করো না। রাজার সাজ আর আছে নাকি? তা বলে ভেবো না রাজা নাই। আছে, ভিনু সাজে। তোমার মত বউরূপী সব গো। রাজা জমিদার গরীব মেরে ধন বাড়াত, জমি কেড়ে নিত, অত্যাচার করত—। এখুনও—।'

বিন্দা অবাক গলায় বলে, 'তুই জানিস্।'

'হুঁ।' ঘাড় কাৎ করে আশা অদ্ভুতভঙ্গি করে, 'রাজার ঠিক সাজ হয় নাই

বলে দুঃখু টস টস করছে! রাজা সাজবে কী। এক রূপ বটে!'

'তা সে রূপটা গেল কুখা?'

'মানুষের ভিতরে আছে। রাজা জমিদারের পারা শুষছে, কাড়ছে।'

বিন্দা তাজ্জব। আশা এত বুদ্ধি ধরে, এত বোঝে। ভেতরে আছে বলে, মানুষ এমন সম্ভ্রম করে। কিন্তু বহুরূপী হয়ে এই রূপ চলে যাওয়া কী চুরি যাওয়া কী কেড়ে নেওয়া কী ভেতরে যাওয়া কেমন করে বরদাস্ত করে বিন্দা। বহুরূপীর এক রূপ যাবে অথচ দুঃখ থাকবে না।

'জানিস্ পঞ্চায়েত আমাকে টাকা দেবে।'

'তুমি ত গেলে নাই।'

'যাব। কালকেই এক ফাঁকে দিখা করব।'

আশা বলল, 'হ্যাঁগো, কালকে কী সাজবে।'

'দারোগা। পঞ্চায়েতে যাব। যেঁয়ে বলব, রাজার রূপ ভেতরে ঢুকেছে। বলে দাও কোথায় আছে। আমি তাকে অ্যারেষ্ট করব। টুপি, রিভলভারের খাপ, বেল্ট, খাঁকি পোশাক সব আছে। দেখ্ না কী হয়।'

বিন্দা বহুরূপীর মনের আকাশ ঝকঝক করে, মুখের আকাশ ঝকঝক করে।

টান

যে মানুষ শুধু জমি চেনে সে মেয়েমানুষ চিনতে শিখলে বিষম কাণ্ড বেধে যায়। যেমন কি না বিলাস। এখন কৃষ্ণদাসের কথাগুলো বিলাসের কাছে নিছকই শব্দ। যেমন বউ কথা কও ডাকছে, শালিক কিচিরমিচির করছে, চড়ুইগুলো ক্ষুদে ডানায় ফড়র ফড়র ঝাপটান দিচ্ছে, উঠোনের ওধারে একটা কচি ছাগলছানা ম্যা ম্যা করছে বারবার—কৃষ্ণ দাস ওরকমই বকে মরছে। রাধাকৃষ্ণ লীলায় মিলনবিরহের কথকতা ভক্তিরসে আপ্লুত স্বর, কম্প-শিহরণ এবং মধ্যে মধ্যে 'রাধাকৃষ্ণ' বলে ওঠা, বিলাসের কাছে বিশুষ্ক পাতার উড়ে পড়া। উঠোনের চটে বসে তার সব ইন্দ্রিয় একাগ্র কৃষ্ণদাস-কন্যায়—বিশাখাতে। গা ধুয়ে ভেজা শাড়িতে ঘেরা বিশাখা যেন বিদ্যুৎলতা। পদসঞ্চারে জল ছপছপে নীল ডোরা শাড়ির শব্দের ছলাৎ ছলাৎ। ফরসা দেহরেখাটির ছন্দ যেন বুকের মধ্যে নদীধারা। বড় বড় চোখ, সুডৌল মুখ, মাথার কালো চুলের বন্যায় অমানিশার রহস্য—লাজুকলতা চাউনিতে বিজুরি।

বিলাস তাতেই মরেছে। জমি তো রয়েইছে—থাকুক। মাঠে একবার গেলেই হয়। গমক্ষেতে গরু লেগেছিল, খবর পেয়ে নিজে রাগে জ্বলতে জ্বলতে গেল না, বাগাল ছোঁড়াকে পাঠাল। ধজু বলল, আখ লাগাবে না? মাঠের ধারে যেছ না। বলল, যাব। যাব। বলদ, গাই দু'বেলা দেখা স্বভাব, এখন গোয়ালের ধার মাড়ায় না। মাঠে ঘুরবে, মাটি দেখবে, জল সেউত দেবে, গ্রীষ্ম আসছে কচু লাগাতে হবে—হবে। অত তাড়া কিসের। সব তাড়া কৃষ্ণদাসের ঘরে।

কৃষ্ণদাসের কালো বড়সড় মুখে সাদা ধবধবে গোঁফদাড়ি। মাথার চুলে কালো রেখা বড়ই সামান্য। উঁচু কপালে টাক। মোটা সোটা চেহারা। ভীরু ভীরু চাউনি। বৈরাগী। বৃত্তি কৃষ্ণনাম করে ভিক্ষা। জাতবৃত্তি। মাধুকরী।

কৃষ্ণদাস বিশাখার ফেরার শব্দে কৃষ্ণকথা থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বলে—ও মা বিশাখা, বিলাস ভাল চা এনেছে। চা কর দেখিনি। কখন যে চান করতে গিয়েছিস। সেই থেকে বসে আছে। বস বাবা, এক্ষুণি চা হবে।

বিশাখা ঘরে ঢুকে পড়েছে। বিলাস দরজার দিকে তাকায়। কালো কপাট। মাটির ঘর। খড়ো চাল। বিশাখার পরিচ্ছন্নতা এবং নিপাট গৃহ পরিচর্চার ঝকঝকে স্বাক্ষর। সাদা খড়িমাটি লেপা দেওয়াল ভেতরের। কুলুঙ্গির চারপাশে আলতারাঙা ফুল সবুজ লতায় চিত্রিত। বাইরের দাওয়া নিকোন। উঠোন পরিচ্ছন্ন। ধুলোর কণাটি নেই।

—হ্যাঁ, কি কথা যেন হচ্ছিল? কৃষ্ণদাস প্রশ্ন করে।

বিলাস দরজার দিকে তাকিয়ে বলে—তেষ্টায় ছাতি ফাটছে বিশাখা। তাড়াতাড়ি চা কর দেখি। তারপর মুখ ফেরায়—হ্যাঁ, কি কথা যেন হচ্ছিল!

কৃষ্ণদাস বোঝে, কৃষ্ণ কথায় অনুরাগ নেই বিলাসের। তবু স্বভাবে সে বলে যায়। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করবে! মাথা চুলকায় মানুষটা।

ওদিকে বিশাখা উত্তর দেয়—চায়ে কি তেষ্টা মেটে। গরম জলে তো জ্বলুনি।

—তাহলে শীতল জলই দাও।

—শীতল জলের অভাব খুব। পৃথিবীতে অন্যায়ে পাপে কেবলই তাপ। জল গরম হয়েই আছে। বলতে বলতে বিশাখা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

কৃষ্ণদাস খুশি হয়। মাথা নাচায়—বিটি আমার বলেছে ভাল। বরিগীর বিটি। রক্তের ধর্ম যাবে কোথায়! রাধেকৃষ্ণ। তবে কৃষ্ণ নামে সব শীতল গো। মনের তাপ দেহের তাপ ঘুচে যায়। রাধেকৃষ্ণ। বিলাস তুমি কিন্তু বাবা বড় চঞ্চল। আমি কি ভাল করে তোমাকে শোনাতে পারি না!

বিলাস বলে—সে কি কথা বরিগীজ্যাঠা! বলছ কি! তোমার গলাতে মধু।

কৃষ্ণদাস খুশি হয়। মাথা নাচায়—সবই তাঁর দয়াগো। গলা বল, কথা বল তাঁরই কৃপায়। রাধেকৃষ্ণ! বাবা কেমন আছে বিলাস? আহা বড় কষ্টে আছে গো। খাটিয়ে মানুষ বিছানায়।

বিলাসের বাপ আকু মণ্ডল। বাতব্যাধিতে পড়েছে আজ কয়েক মাস। ঝাঁড়ফুক, মালিশ, এ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি কবচ-তাবিজ সবই চলছে। এখন কবরেজি চিকিৎসা। লাঠি নিয়ে হাঁটতে হয়। ক'মাসে আধখানা চেহারা।

আকু মণ্ডলের দুই ছেলে বিলাস আর প্রকাশ। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বিলাসের বুদ্ধি ছিল বটে, কিন্তু বিদ্যে হল না। স্কুলের চার দেওয়াল মস্ত বড় যন্ত্রণা। তারপর শচীন মাস্টারের বেত, শাসন। ছোটভাই ক্লাসে এগিয়ে যেতে বিদ্রূপ। চাষে বাপের পিছু কিছু ঘুরত। জমির টান দেখে আকু মণ্ডল কৃতার্থ। মনে মনে বলেছিল, রেখে দে তো স্কুল। শ্লেট পেনসিল ফেলে মাটির বিদ্যে শেখ। লেখাপড়া হোক মাটিতে। ফসলের অক্ষর ফোটা। খাতার পাতার মত ভর্তি কর খামার। তা বিলাস শুনেছে বাপের কথা। চাষে বড় অনুরাগ। থৈ থৈ ফসল। দিনরাত মাঠে কাটে। ছোটভাই প্রকাশের কিন্তু বিদ্যাতে মস্ত অনুরাগ। স্কুল পেরিয়ে কলেজে গিয়েছে। হোস্টেলে থাকে। মাস মাস টাকা পাঠাতে হয়। বিলাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাই প্রকাশ। সাজগোজ কথাবার্তায় বিদ্যার অহঙ্কার টগবগ করে ফোটে।

বিলাসের বিয়ে হয় গত বছর। মিলজুল স্বামী-স্ত্রীতে শুধু নয়, সংসারের সঙ্গেও হল না। পণের টাকা কম, কম ওজনের গয়না, তারপর মুখের হুল ফোটান তীক্ষ্ম আঁশটে কথা। শাশুড়ির সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়াও করেছে বিয়ের কনে। খবর দিতে বাপ-দাদারা এসে বলল—কি করবেন, ছোট থেকেই

একটু মাথা গরম। ও ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের পাঁচ মাসে ছ'বার জেদ করে বাপের বাড়ি গেল। শেষবার গিয়ে আর ফেরার নাম নেই। বিলাসও শ্বশুরবাড়ি মাড়ায় নি। বৌ তার পছন্দ হয় নি। কালো ঢ্যাঙা। তা রঙ যাই হোক মুখশ্রী, কমনীয়তা, মেয়েলি ছন্দ, স্বর থাকবে তো! খনখনে স্বরে কেবলই বিরক্তি। চাউনিতে যেন বিষ ঝরে পড়ত। বিলাসকে মুখের সামনেই বলেছিল—'তোমারই বা কি ছিরি।' গিয়ে বাঁচিয়েছে তাকে। খবর রাখে না আর।

জাহান্নামে যাক্ বৌ। ওসব ভাববার অবকাশ বিলাসের নেই। প্রাপ্যের সম্ভাবনা যেখানে নেই তার জন্যে মন এবং সময়পাত মানুষ করে না। ভাবনায় ঠাঁই নিতে গুণপনা উপহার দিতে হয়। জমি নিয়েই সে দারুণ ব্যস্ত।

বিলাসের গিঁটগাঁট বাঁধুনি। গায়ের রঙ কালো। মাথার চুল কোঁকড়ান। মুখে ঘন দাঁড়িগোঁফের জন্যে একটা কালচে ভাব আছে। লোমশ পাটাল বুক। সাতাশের মতো বয়স। টগবগে ঘোড়ার মতোই তেজীয়ান। কর্মব্যস্ততায় তার কাছে পৃথিবীর চেহারাটাই অন্য রকম। বাতব্যাধিতে পড়ে থাকা বাপেরও স্বস্তি। বলে—বিলেস, আমার বেটার মতো বেটা।

তবে ওই যে কথা, অমন ব্যস্ত মাটি মশগুল, সংসারের হাল ধরা যুবকটির রক্ত ছলকে দিয়েছে এই বিশাখা। আকর্ষণে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণদাসের ঘরে ছুটে আসছে হরবখত। কাজকর্ম পড়ে থাকছে। বিশাখা গাঁয়ের মেয়ে। কৃষ্ণদাস সবার পরিচিত। দক্ষিণ পাড়ায় ঘর। তার মেয়ে বিশাখা যে কখন বিদ্যুৎশিখা হয়ে গিয়েছে! দুঃখীঘরের যুবতীর মুখে অমিত লাবণ্যের চিকনতা। একঢাল চুল। অমন হরিণী চাউনি। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউসে ঘেরা অঙ্গের অমন ঢলানি। বিলাসকে সবকিছু থেকে হেঁচড়ে টেনে অবিরত যেন সঙ্গকামী করে তুলছে। বিলাসের এ সৌন্দর্য হঠাৎই আবিষ্কার। রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে বেড়ায় এক হাত রেখে যুবতী দাঁড়িয়ে এলো-চুলে। পলক পড়ে না তার। বিশাখাও কি সেই মুহূর্তে পুরুষ-দৃষ্টির নিঃশব্দ ভাষাকে আহ্বান জানায়!

ঠিক দু'দিন পরেই আর এক ঘটনা। গোঁসাইপুকুরের পশ্চিমপাড়ে এন্তার বাঁশ, আঁকড়, বাকসের ঝোপ। তারমধ্যে দিয়ে হেলে সাপের মতো শীর্ণ রাস্তা। বিশাখা পা চেপে—উঃ আঃ করছিল। হনহনিয়ে আসতে গিয়ে থমকাল বিলাস—কি হলো!

—পায়ে কিসে কাটল। মুখ কুঁচকে পা চেপে ধরে বিশাখা গলায় ভয়ার্ত শব্দ তুলেছিল শরীরের বাঁকচুরে।

সর্বনাশ! সাপ নয় তো! বিলাস ভাবলেও উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করে উঠেছিল—কাঁটা ফুটে নাই ত? দেখি-দেখি—।

—কে জানে! উঃ কি জ্বলছে গো!

হাতে টর্চ নেই। সন্ধ্যের আঁচল কালিবর্ণ করছে প্রকৃতিকে। বলেছিল—দেখ, কাঁটা কি না। জ্বলছে এখনও!

—হুঁ।

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সামান্য খুঁড়িয়ে হেঁটে গিয়েছিল।

ঘরে ফিরেও মন আনটান করে বিলাসের। হাতে টর্চ ঝুলিয়ে খবর নিতে গিয়েছিল। কৃষ্ণদাস অবাক—এস বাবা। তা রাত্রিকালে!

—ভাবলাম, দেখে আসি। পা জ্বলছে এখনও?

—কার বল দেখিনি বাবা!

বিলাস তখন দরজার দিকে দেখছে—গোঁসাইপুকুরের পাড়ে যে বিশাখার পায়ে কি ফুটেছিল—।

—তাই নাকি? ওমা, বিশাখা বলিস নাই ত।

বিশাখা ঘরের মধ্যে ঝাপটা দিয়েছিল—কি বলব। হুঁচোট খেয়েছিলাম। তারপরই হ্যারিকেন নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। অন্ধকার আলো শরীরে মাখামাখি। নারীমূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখাগুলো উঁচিয়ে ছিল শিখরের মতো। বলেছিল—দাঁড়িয়ে কেনে। বসলে হয়। তা ভাগ্যি। খবর নিতে এলে—।

কৃষ্ণদাস বলেছিল—বস বাবা বস। কোনদিন ত পা দাও না।

বিশাখা কি সেদিন সত্যিই হোঁচট খেয়েছিল! তবে বিলাস যে আছাড় খেয়ে পড়েছিল সেই সন্ধ্যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে রাতে বিলাসের আকাঙ্ক্ষার শীর্ষবিন্দুতে দীপ্যমান হয়েছিল যুবতীর মুখ।

তারপর প্রায় আসা হচ্ছে তার। কৃষ্ণদাসের কাছে কৃষ্ণরাধা লীলা শোনা হচ্ছে। চা খাওয়া হচ্ছে।

শীত ফুরিয়ে বসন্ত। তা ক'দিনই বা মনোরমতা। বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতিতে টানা গ্রীষ্মের কাল নেমেছে। মাথার উপর মার্তন্ডদেবের অগ্নিফুৎকার। অফুরান ভাণ্ডারটি দিনভর উপচে ভাসাচ্ছে। শোষক অজস্র দাঁড়ায় গ্রীষ্মকীট শুষে নিচ্ছে সব সরসতা। পাথুরে মাটি আরও পাথুরে। চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে ক্ষেত। খাল ডোবার পাঁকের মাথায় শামুক গেঁড়ির সাদাটে খোল। রৌদ্রহীন অবেলার বাতাস অগ্নিস্নান করে ফিরছে গাছগাছালিতে। তরঙ্গ এসে পড়ছে গায়ে। উঠোনের কলকে গাছ নাড়া খাচ্ছে।

দাওয়ার বাঁশের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিশাখা। অদ্ভুত রমণীয় ভঙ্গিমায়। ঈষৎ বঙ্কিম। মাথার চুল এলান। তার দৃষ্টি পড়ে থাকে বিলাসের মুখে।

—শোন, পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে। আমাকে শুনতে হচ্ছে।

—তোমাদের রাধারাণীকেও শুনতে হয়েছে। বিলাস কৃষ্ণদাসের কাছে রাধাকৃষ্ণের কথা এন্তার শুনেছে। অংশ বিশেষ ধরা আছে মনে। বলে—আয়ান ঘরণীর কত জ্বালা ছিল। তুমি কতটুকু জ্বালা সইছ বল! তাও তো ঘরে তোমার শাশুড়ি-ননদ নাই।

—আমি রাধারানী নই।

—আমার রাধা ত বট।

—তা আর হতে পারছি কই। হতে গেলে যে তোমাকে সব ছাড়তে হবে। বিশাখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আয়ত চোখের অপলক দৃষ্টি পুরুষের উপর।

—ছাড়ব।

—সে কি সহজ কথা।

ঠিকই সহজ কথা নয়। বিলাস ভাবে, মা জেনে ফেলেছে। এখন আবার বিয়ে দেবার মতলব। কিংবা ওই মেয়েই আবার ফিরে আসুক। তাগাদা দিচ্ছে। আড়াল আবডাল নয়। পরিষ্কার কথা, বরিগীব ঘরে অত যাস্ না বাবা। জানি তুই ভাল ছেলে। পাঁচজনে দুষছে। কি লাভ দোষ কুড়িয়ে। তোর কত সুখ্যাতি! মেয়ের কি অভাব। কথা দে, মেয়ে দেখি। বিলাস বলেছে—একটতে সুখ হলো না। আর বিয়েতে নাই মা। লুকের কথা শুনো না।

এখন কিন্তু বিলাস অনায়াসে বলে—আমি তোমাকে বিয়ে করব বিশাখা।

—কি সর্বনেশে কথা!

—সর্বনাশ কি! চণ্ডীদাস রামীর জন্যে সংসার সমাজ ছাড়ে নাই।

—তাদের প্রেম যে নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাই। আর তোমার চোখ আমার চোখ যে কেবল শরীর খোঁজে।

—বরিগীর মেয়ে হয়ে তুমি কথা শিখেছ কেবল।

বিশাখা হাসে—বোষ্টমীও বটি গো।

—বোষ্টমের সঙ্গে মাত্র ক'দিন। তার কথা ভাব এখনও।

—রাগ করছ তো! কিন্তু লোভ আমার ঢেক গো। তার জন্যেই ত মরছি। না পারি ডুবতে, না পারি জল ছাড়তে। এদিকে বেলা যায় আমার। লোকের কথার তাপ মাখছি শুধু।

—আমি মনস্থির করেছি। বোষ্টম হব।

—বোষ্টম হবে! তোমার চাষ, গরু-বাছুর! তা মাটির চেয়েও আমি দামী?

—সোনা কি নিজের দাম বুঝতে পারে! বিশাখা, না করো না!

—আমার জন্যে তোমাকে কিছু ছাড়তে দেব না।

—যদি ছেড়ে এসে দাঁড়াই তোমার সামনে।

কৃষ্ণদাস এসে পড়ে—আরে কখন এলে। দাঁড়িয়ে আছ—বস।

চা খেয়ে কৃষ্ণদাসের ঘর থেকে বাড়ি ফেরে বিলাস।

বাবা বসে ছিল দড়ির খাটিয়ায়। আধখানা মানুষ। পায়ে মালিশ তেল ঘষছে পাটকুড়ুনি সরলা। এক বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। দাওয়ায় হ্যারিকেন। রান্নাঘরে লম্ফ জ্বলছে! ওধার থেকে প্রকাশ বেরিয়ে এল। প্যান্টের উপর ডোরা গেঞ্জি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, রোগপানা গড়ন। অসহিষ্ণুতার ছাপ মুখমণ্ডলে।

—কখন এলি?

—বিকেলে। দাদা টাকা লাগবে। ও টাকাতে হবে না। পঞ্চাশ টাকা এ মাসেই বাড়াতে হবে।

বিলাস ভ্রু কোঁচকাল—বলিস কি! তিনশই তো দিতে পারব না। এবার চাষ ভাল হয় নাই। বাবা অসুখে ভুগছে। ডাক্তারবদ্যি করতে হছে।

—তাহলে কি পড়াশুনা ছেড়ে দেব?

—আহা পড়াশুনা ছাড়বি কেন? খরচা একটু কমা। বিলাসের এই ভাইয়ের উপর আস্থা আছে। নিজে শেখেনি। ভাইকে শেখাবে। বলে—ঠিক আছে।

খেতে বসে মা আবার বৌএর প্রসঙ্গ তুলল—তাহলে নিয়েই আয় বিলেস।

চমক খেয়ে ভাত থেকে মুখ তুলল বিলাস। মায়ের হলো কি! বিপক্ষে ছিল মা। বিশাখার জন্য কি এখন রাজী! ছেলের যদি মন ফেরে। কিন্তু ওই মেয়েতে? বলল—কি বলছ। ওকে ঘরে আনবে আগুন জ্বালাতে। বরঞ্চ ছাড়পত্রের ব্যবস্থা হোক। ও মেয়েকে নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না। তুমিও পারবে না।

কৃষ্ণদাস খঞ্জনি হাতে নগরে দিয়েছিল ভিক্ষা করতে। হাটবারের দিন, ভিক্ষার সঙ্গে সংগ্রহ করে আনল এক বাবাজী। যমুনাদাস। গোলগাল ফরসা চেহারা। কপালে তিলক ফোঁটা। নধর কান্তি চেহারায় আহ্লাদে ভাব। বগলে গাবগুবি। আলখাল্লা, চাদর, ঝোলা। বয়স ত্রিশ বড় জোর। কৃষ্ণদাসের সংগ্রহ বিশাখার জন্য। পত্র করাবে যমুনাদাসের সঙ্গে। বোষ্টুমী পালিয়েছে যমুনাদাসের। ডেরা বোলপুরের কাছে। তা থাকতে রাজী কৃষ্ণদাসের ভিটেতে। যেখানে রাধাকৃষ্ণ নাম সেখানেই আশ্রম। পা দিয়ে বিশাখা দর্শনে আরও বিগলিত।

কৃষ্ণদাসকে বলতে 'হল না। দেখামাত্র বিলাস চিনেছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে। উঠোনে থমকে দাঁড়িয়ে সে একবার পড়ে নিল। চিনচিনে জ্বালা। তারপর সর্প বিষের মতো জ্বলুনি। ঈর্ষা বিষ নিঝুম করে না। এলিয়ে ঢলিয়ে দেয় না দেহ মৃত্যুর কোলে। প্রচন্ড শক্তি দেয়। আচ্ছন্নতা উন্মাদের বলে বলীয়ান করে।

—বাবাজীর নিবাস কোথা?

কৃষ্ণদাস বলে—বোলপুরে। নিয়ে এলাম বাবা। এখানেই থাকবে।

—বিশাখার সঙ্গে পত্র হবে বুঝি?

—বুঝেছ বাবা ঠিক। রাধেকৃষ্ণ। কৃষ্ণদাস পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, এ হলো মোড়লের বেটা। বড় চাষী। তবে কৃষ্ণভক্তি আছে।

বিলাস মনে মনে বলল—কৃষ্ণভক্তি নয় কৃষ্ণদাস, তোমার কন্যায় অনুরাগ।

পরের দিন সকালে বিলাস এল। কৃষ্ণদাস বেরিয়ে গিয়েছে। যমুনাদাস দাওয়ায় বসে চটে। বিশাখা নেই। পুকুর ঘাটে। গাইটা উঠোনে কলকের গুঁড়িতে বাঁধা। দুটো পায়রা নেমেছে। বিলাস কোনো ভূমিকা করল না। সটান সামনে দাঁড়িয়ে বলল—বাবাজী কেটে পড়। বিশাখাতে মন দিও না। ও আমার। আরে, হাঁ করে দেখছ কি। আমি বিলাস। হাতখানা দেখছ!

যমুদানাস বিস্ময়বিমূঢ়। ফোলা গাল যেন চুপসে গেল। একটিও শব্দ নেই মুখে। মাটির কলসিতে জল নিয়ে এসে দাঁড়াল বিশাখা—কি হলো।

—এই তোমার বাবাজীকে যেতে বলছি।

বিশাখা কলসী নামাল। চোখের পাতা পড়ল না।

—কি হলো বাবাজী! ওঠ। হাঁটা দাও।

যমুনাদাস উঠল। চটের পাশেই গাবগুবি, ঝোলা তুলে নিল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

জ্বলে উঠল বিশাখা, তুমি ওকে তাড়ালে কেন?

—মেরে ফেললে কি ভাল হতো? বিলাস দাঁড়াল না বলে। দর্পের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। মাঠে কাজ পড়ে রয়েছে।

ছুটে গেল বিশাখা। চেঁচিয়ে বলল—শুনে যাও, কথা আছে।

বিলাস থমকাল। ধীরপায়ে আবার দাওয়ার সামনে দাঁড়াল।

—এ তুমি ভাল করলে না, বাবাকে কি বলব!

—বলবে চলে গিয়েছে। বিশাখা তুমি কি ওর বোষ্টমী হতে?

—না।

বিশাখার অস্ফুট উচ্চারণ যেন সব বাঁধ ভেঙে দিল। বিলাস দাওয়ায় উঠল। পাশে দাঁড়িয়ে ঘন শ্বাস ফেলে বলল—আমাকে বিশ্বাস কর। বিশাখা ছুটে ঘরে ঢুকতে পিছন ফিরে থাকা তার দু'কাঁধ ধরে বলল—আমি তোমার জন্য সব করতে পারি। স্পর্শের মোহ তার রক্তে যেন সঞ্চারিত হলো। বিলাস দ্রুত নিজের দিকে ঘোরাল। দু'হাতে জড়িয়ে তারপর পিপাসার ওষ্ঠ নামিয়ে নিয়ে এল।

বিশাখা বলল, এ কি করছ! ছাড়। এ কি করছ!

বিশাখার জন্য বিলাস সবকিছু ছাড়তে প্রস্তুত এমন বোধের মধ্যেই কি আশ্চর্য, সব কিছু যেন বিলাসকেই ছাড়তে উদ্যোগী হলো। যেন ঢালে গড়িয়ে যেতে থাকল সবকিছু। হাত বাড়ানোর ব্যগ্রতাতেও ছোঁয়া যায় না। প্রতিরোধ, আঁকড়ে ধরার বাসনা জাগারও অবসর নেই। অসহায়ের মতো দেখতে হয়।

বাবা মারা গেল। শ্রাদ্ধ শান্তি করাতে খরচা কিছু কম নয়। ধার করতে হল। তখন জানা গেল তাকে গোপন করে বাবা আটহাজার টাকা নিয়েছে বটকৃষ্ণ ঘোষের কাছে জমি বন্ধক রেখে। সুদ নিয়ে যা এগার হাজার। বটকৃষ্ণ হাতে কাগজ নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—বিলাস শোধ কর, তা না হলে আর পাঁচ হাজার নিয়ে মা আর দুই ভাইয়ের জমিটা লিখে দাও। এ নিয়ে বিলাসের চেঁচামেচি। বাবা আটহাজার কেন নিল। করলটা বা কি। জানাও হল, প্রকাশের জন্যে। প্রকাশের আরও গুণ বের হল। কলেজ হোস্টেল থেকে মিশেছে যত বাজে ছেলের সঙ্গে। মদ, জুয়ায় ব্যয় করেছে অর্থ। ওই জুয়াতেই গিয়েছে আটহাজার নইলে খুন হয়ে যেত। এসবের সে কিছুই জানত না, কেউ তাকে বলেনি। অথচ কোর্টে কাজ করা জগদীশ সব জানে। গাঁয়ে বলতেও সে বাকী রাখেনি। প্রকাশকে ঘিরে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা জাগবে কোথায়, সর্বস্ব ওর জন্যেই শেষ হতে যাচ্ছে, তার ক্রোধেই বিলাস অবিরত জ্বলে। শুধুই জ্বলুনি। তার

সাধ্যের মধ্যে কিছু নেই। ঋণের উপর বাবার শ্রাদ্ধ শান্তি লোক খাওয়ানর ঋণ। সংসার চলছিল, বেশি তো ছিল না। এ সবের মধ্যে মায়ের বিছানা নেওয়া। বাবার মৃত্যুর দু'মাসও পার হল না। মা চলে গেল। তার আগেই প্রকাশের দাপটে ঘরের পেতল কাঁসা, সোনার গয়না টুকিটাকি বেরিয়ে গিয়েছে, হাটে উঠেছে গাই, ছাগল, দুটো পুকুরের সাতপয়সা আর তিন আনা অংশ বিক্রি হয়েছে, রেজিস্ট্রি করে দিতে হয়েছে চার বিঘে। পড়ে আছে নীরস তিন বিঘে জমি। যার অর্ধেক ভাগীদার ভাই! তাও খন্দের করে ফেলেছে। হুটহাট গাঁয়ে আসছে, দেখা করছে না তার সঙ্গে। পড়শীদের কাছে বিলাস ভাই ভাই ভাগাভাগিতে সাহায্য চাইবে কি, রাম জ্যাঠা, বিনোদ, ব্যানার্জ্জীবাবু, মাস্টারমশাই কারও কথা শোনে না প্রকাশ। একটাই যুক্তি, ওদের কথা শুনব কেন?

বিলাসের এখন পরিবর্তিত রূপ। আধা উন্মাদের। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় সংসারের এই নতুন রূপ পরিগ্রহ। দরজা জানলা দাওয়া উঠোন, কুয়োতলা, সজনে গাছ, ওদিকে খামারবাড়ি সব যেন চেহারা বদলে ফেলেছে। কেউ তার নয়। এত চেনা তবু তাকে বলে, তোমাকে চিনি না। জমি নাই তবু বলদ জোড়া জেদ করে রেখেছিল। বিক্রি করে দিতে হল।

কৃষ্ণদাসের দাওয়ায় বিলাস ঝিম হয়ে থাকে। কাজ নেই। প্রচন্ড ঝড়ে তছনছ সে। ভাঙা, ধ্বস্ত চেহারা। কাজ করবে, চাষ করবে কিন্তু জমি নাই।

বিলাস বলে—বিশাখা, আমাকে ছাড়তে হলো না। সব ছেড়ে গেল আমাকে।

—কিন্তু আমি এমনটি চাই নাই গো।

—জানি। দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিলাসের।

—মনের জোর রাখ। সব তোমার হবে।

বিলাসের মনের জোর নিঃশেষিত। পড়শীরা নানা কথা বলে। নিঃস্ব বিলাসের কাছে গ্রাম, মানুষের মুখ, মাটি দিনরাত্রি তাকে টের পাইয়ে দেয়, তার কোন কিছুই আয়ত্তাধীন নয়। নিজের উপর বিশ্বাস পর্যন্ত নেই। বিশাখাদের ঘরে সে যায়। কিন্তু দৃষ্টিতে কথায় ভিন্ন সুর। বিশাখাও কি তুচ্ছ হয়ে যায়! রক্তমাংসের কামনাজর্জরতা থেকে মুক্তি পায় সে! রক্তে দোলা জাগে না।

গ্রীষ্মদহনের পর বর্ষার সরস সজীবতা। অবিরত বৃষ্টিপাত। মাটি ডাকে। কিন্তু বিলাসের মাটি নেই। বলদ নেই। সর্বনাশটা এখন টের পায় সে। রক্তে প্রচন্ড ঝাঁকুনি। বিশাখার ভাবনা না, চাষের জন্যে ব্যগ্র তার দুটি বাহু, সমগ্র পুরুষসত্তা ককিয়ে উঠতে থাকে যন্ত্রণায়। মনে হয়, পাগল হয়ে যাবে সে। বিশাখার জন্য সর্বস্ব সে ছাড়তে চেয়েছিল! গিয়েছে তো সব। এখন মনে হচ্ছে, বিশাখার চেয়েও কামনার বড় ধন তার আছে।

বিলাস লজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে বটকেষ্টর কাছে গিয়েছিল। জমিটা চষতে দাও। বটকেষ্ট বলল, তা কি করে হয় বিলাস। আমার কিষাণ রয়েছে। ভূপেই চষবে। দিতে পারলে তো খুব ভাল হত। তবে নন্টু পাল নিজে থাকতেই

বলেছিল, বুঝলি বিলাস, আমার সঙ্গে চাষে থাক। বাঁধা মুনিষের যা রেট পাবি। বিলাস পরিষ্কার না করেনি ঠিক কথা, কিন্তু আদতে মুনিষ হবার ইচ্ছে তার নেই। থাক জমি, থাক মাটি, থাক চাষ, সে অন্য বৃত্তি ধরবে। মানুষ তো কত কি করে বেঁচে বর্তে থাকে।

কৃষ্ণদাসের ঘরের পাশ ঘেঁষে হাঁটার সময় বিশাখা থামায়—শোন!

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশ নক্ষত্রের বিছানা হয়েছে। পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন। দাওয়ার হ্যারিকেনের আলো এসেছে। কিন্তু অস্পষ্ট যুবতী। শরীর নেই, শরীরের ছন্দ নেই, যৌবনের গন্ধ নেই, অন্ধকারে কেবলই মেয়েলি স্বর।

বিলাস থামে।

—শোন, বাবা হরিনামের নেমতন্ন পেয়েছে। সঙ্গে তুমি যাবে। আসর বসবে। আরও বাবাজীরা আসবে।

বিলাস সাড়া দেয় না।

—জানি ইচ্ছে নাই! কিন্তু রোজগার তো হবে। নইলে যে পাগল হয়ে যাবে।

বিলাস বলে, আমার জন্যে দাঁড়িয়েছিলে।

—হ্যাঁ! তোমার জন্যে না ভেবে যে পারি না গো।

—ঘরে যাও বিশাখা। কাল আসব।

ঘরে ফিরে বিলাস অবাক হয়। ঘর তো নয়, শ্মশান হয়ে থাকে। সন্ধ্যাপ্রদীপও জ্বলে না। অন্ধকারে ডুবে থাকে রাতভর। শব্দহীন। কিন্তু হ্যারিকেন জ্বলছে দাওয়ায়। উঠানে দাঁড়াতেই পাশের ঘরের কাকীমা বলল—এলি। ছিলি কোথা এতক্ষণ। বৌমা এসেছে একাই। তখন থেকে বসে আছে। আমি উঠছি। আর রাঁধারাড়া করতে হবে না। আমাদের ঘরে দু'জনে খাবি। বলে আর দাঁড়ায় না।

বসে আছে মালতী। তার দিকে তাকায়। তারপর উঠে দাঁড়ায়, যেন অপেক্ষা করে মানুষটা কিছু বলবে। কিন্তু বিস্ময়বিহ্বলতায় বিলাসের কোন শব্দ নেই। নিঃস্ব তার কাছে এসে দাঁড়াল কেন। হ্যারিকেনের আলোয় পাথরপ্রতিমা মালতীর দিকে তাকায়, তারপর নেহাতই সৌজন্যেই বুঝি বেরিয়ে আসে—একা এসেছে?

—হ্যাঁ।

বিলাসের আর যেন কোন কথা নেই। মাথা নত। সে ভাবে, কেন এসেছে! কোনো সংবাদ তো রাখে না। শ্বশুরের মৃত্যুসংবাদ সে শুনেছে অবশ্য। ঝগড়াঝাটি হয়েছে নিশ্চয় দাদার সঙ্গে। নইলে একা আসবে কেন? তার শুধু মনে হয় এতদিন পর তার বাইরে বেরোনর দ্বার রুদ্ধ করার জন্যে বুঝি এল।

—ঘরের এ কি হাল হয়েছে। খবরও দাও না। এত কাণ্ড হয়েছে, ঘরের বৌ হয়ে কিছু জানি না। লোকের কাছে শুনতে হল। থাকতে পারলাম না। চলে এলাম। মালতী পাশে এসে দাঁড়ায়। তার স্বর সমবেদনায় আর্দ্র, ব্যথায় আতুর। বলে—তোমারও কি অবস্থা! আধখানা হয়ে গিয়েছে তুমি।

তাহলে কি বদলে গিয়েছে মালতী? বিলাসের মনে হয় সবই সম্ভব। কিছুই আশ্চর্যের নয়, হ্যারিকেনের আলোয় সে দেখে দুটি চোখের মায়াবী সৌন্দর্য, মমতার ঘন ছায়া। অভ্রকুচির মতো ঝিকিরমিকির তাতে। কিন্তু মুগ্ধতা না, ওর নম্রতায় বুকের মধ্যে হা হা করে যেন আরও উগ্র হয়ে ফেরে। সে শুধু বলে—কেনে এসেছ?

—বলব। সব বলব। মালতী মানুষটার কাছে আসে। বলে—বস তুমি। জল খাবে? তারপর ব্যগ্র হয়ে পাশের বাড়িতে কাকীমার কাছে ছুটে যায়।

রাত্রিবেলায় পাশে শুয়ে মালতী সব কথা বলে। বাবা মরতে দাদা-বৌদি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। সে ছাড়বে কেন? ঘর এবং জমির ভাগ নিয়েছে। তার উপর রাগ-অভিমান ছিল বটে, কিন্তু গতকালই যখন পিসতুতো ভাই অবিনাশের কাছে শুনল এখানকার কথা তখন বুক হু হু করে উঠেছে। তাই ছুটে এসেছে সব ভুলে। জমি পেয়েছে। চাষ করতে হবে না।

—চাষ! বিলাস যেন নতুন করে শব্দটা শুনল।

—চার বিঘে এগার কাঠা। ভিটের একদিকও পেয়েছি। কাঠা তিনেক হবে। বুকে শুয়ে মাথার চুলে হাত রেখে বলল—আমার জমিতো তোমারও জমি। তারপর অভিমানে বলল—তুমি নাকি বোষ্টম হয়ে যেছিলে! ইস্‌ হতে দিলে ত।

নরম শরীরের বেষ্টনী, জমির ইশারা যেন বিলাসের সিদ্ধান্তকে ভাঙচুর করে দেয়। অবিশ্বাস্য উপহারের ঔজ্জ্বল্য সামনে কিছুই দেখতে দেয় না। আলগা হয়ে যায় শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি। আশ্রয়ের উষ্ণতা সে টের পায়। চার দেওয়াল, মেয়েমানুষ, মাটি, ফসল, জল—। বিলাস ডুবে যেতে থাকে।

সকালবেলায় বিলাস বউকে নিয়ে হাঁটে। পিছন ফেরারও ইচ্ছে করে না তার।

মাংস বিষয়ক গবেষণা

পোলট্রিতে নানা সাইজের মুরগী মস্ত মস্ত খাঁচায়। জীবনকাল অর্থাৎ বয়সও একেবারে লেখা। আহা সব যেন সাদা থোকা থোকা মাংসের ফুল। আবার কদমফুলের মত কুঁড়িও রয়েছে। নড়ছে সব। তবে বেশি অবাক হয়েছি কুঁড়িগুলো নাকি দশ দিনে ফুল হয়ে যায়। কিন্তু অবাকেই তো শেষ নয়, মাথায় রেকর্ড হয়ে গেল, সাদা পালকে ঢাকা এই যে মাংসবৃদ্ধি, তো এদের প্রাণ আছে, মাংস আরও মাংস প্রবণতা আছে কী! বলা যেতে পারে, প্রাণ এবং তার অনুভব নিয়েই ভাবনা চিন্তা রেকর্ড হয়ে গেল। গাছের প্রাণ আছে, গাছ কী ভাবনা পীড়িত হয়? ব্যস্ রেকর্ড হওয়ার পর এখন চালাতে গিয়ে কি যে বিচ্ছিরি গ্রামোফোন-মাথা আমার, পিনটা আটকে যাবে না। ব্যস ওই এক কথা বেজে যাচ্ছে, প্রাণ, অনুভব, মুরগী, গাছ, মাংসের ফুল, কুঁড়ি! প্রাণ থাকলেই কী অনুভব? তো এরকম হয়। আমি তখন আবিষ্কার করতে চাই। মুরগী ভাবে কী ভাবে না, মাংস বৃদ্ধিতে তার মানসিক মদত কতখানি! এটা জানা খুবই জরুরী! এই জানাটাই আমার কাছে আবিষ্কার! আমাকে গবেষণা করতে হবে!

আমাকে পাগল ঠাওরালে আমি নাচার। আমি জানি, আমি পাগল নই। তবে হ্যাঁ, বড় ভুলে যাই। এই যে পোলট্রিটা দেখে এলাম হরিপাল স্টেশনে নেমে, কী যেন গাঁয়ে গিয়ে। হ্যাঁ, জল আর পানা টানা জাতীয় শব্দদ্বয়ের মিশ্রণে তৈরী। এখন মনে করতে পারছি না। অথচ পাক্কা দুটো দিন ছিলাম। তিনদিনও হতে পারে। নাম এবং সঠিক কথাটা মনে পড়লেই লিখে রাখব। তবে সেটাও সঠিক কী না, তাতেও সন্দেহ থেকে যাবে।

এই সন্দেহ ব্যাপারটা ভারী বিচ্ছিরি। মাথার কোন অংশটা অপারেশন করলে ওটা একেবারে কেটে ফেলা যাবে জানলে তাই করতাম। কিন্তু কথা হল, যদি জেনেও ফেলি, নিজে তো কাটতে পারব না, ডাক্তারবাবুরা সেই জায়গাটা নির্ণয় করতে পারবে কী না। যদি না পারে! হ্যাঁ, কথা হচ্ছিল অপারেশনের। হাসপাতালগুলো হয়েছে বটে! দ্রুত মরিবার জন্য সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর প্রস্তাব আমি দিতাম। কিন্তু 'বেঁচে আছে কোন বেটা,' ব্যস হয়ে গেল। যাক্‌গে, হাসপাতালে ভাল ভাল ডাক্তার আছে, নার্স আছে, কুকুর আছে, বিড়াল আছে, ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর আছে, নার্স ডাক্তারের প্রেম আছে, নার্স রোগীর প্রেম আছে। উদাহরণ, ফোয়ারওয়েল টু আর্মস, হেমিংওয়ে। আহা, কী মধুর প্রেম। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল কুকুর বিড়াল এবং ধেড়ে ইঁদুর খামচে মাংস খায়। খুব অন্যায়। তো সেই ঘুরে ফিরে মাংস। ওই যে পিন আটকে আমার গ্রামোফোন-

মাথা। সেই মাংসের ফুল, প্রাণ এবং অনুভব। সেই মাংস।

মাংসকে আঁকড়ে ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। এটাই প্রমাণ করে আমি পাগল নই। মাংস বিষয়ক চিন্তাভাবনা বিশ্লেষিত করে আমি আবিষ্কারের সিংহদরজায় যাব, তাই গবেষণাগারে পা রেখেছি। ঘর বন্দী হই নি। বামুনপাড়ার রাস্তাটা পেরিয়ে জয়চণ্ডীতলা। পুকুর, এদিকে ঘেরা মাঠ, বাড়ি, রিক্সা, বাস যাচ্ছে একটা। পুজোর পর মনে হচ্ছে, আবহাওয়ায় বেশ দেবী দেবী গন্ধ মিশে আছে।

আরে সমীরবাবু যে। সাইকেল থেকে এক ঠ্যাং নামিয়ে 'দেখবে না কি কেরামতি' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে যায়, আপনাকে দেখতে পাই না।

কেন কালই তো দেখা হল।

আমার সঙ্গে। বুকে হাত রাখে।

হ্যাঁ। বেশ জোরের সঙ্গে বলি।

আবার অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন তো!

হ্যাঁ। আরও জোরে বলি।

খুব ভাল করেছেন। রেস্ট নিন। মনটাকে ফ্রি রাখুন। আরে মশাই আপনি শিক্ষিত মানুষ, আপনাকে কী শিক্ষা দেব।

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

এই লোকগুলো খুব বাজে! তুমি সুব্রত না জগন্নাথ না হরেকৃষ্ণ না তারাশঙ্কর, যেই হও সাইকেল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে—। মন এত খারাপ করে দেয়।

না, ফ্রেশ হয়ে যায়। জয়া। জয়া আবার অমিতেশের প্রেমিকা। ওর চোখ আমার চোখ ধরে রাখে। তারপরই কেলেঙ্কারিটা হয়ে যায়। বেশ হাসি হাসি মুখে জয়া এগিয়ে আসছিল। সাদা ব্লাউজ, সাদা-শাড়িতে-পাড় কী সাদায় অন্য রঙ চোখেই পড়ে না, তারপর ঠোঁট, চিবুক, গলা, হাত—উঃ মাংস মাংস। থোকা থোকা ফুল। মাংসের ফুল।

তুমি যে একেবারে পোলট্রি মুরগী।

আপনি আমাকে পোলট্রি মুরগী বলছেন।

আমি পাগলও নই, বোকাও নই। জিভ কেটে মাথা নেড়ে বলি, ছিঃ ছিঃ কী যে বল জয়া। তোমাকে বলব কেন! আসলে আমি একটা ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছি। এই ধর আমি এখন পোলট্রির মুরগী—।

পোলট্রির মুরগী নিয়ে গবেষণা!

হ্যাঁ। আরে ওর তো গবেষণাতেই জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের খাদ্যের অভাব পূরণ করার জন্যে যে চেষ্টা তারই বলতে পার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ আবিষ্কার।

গবেষণা করে কী আবিষ্কার করতে চান?

তোমার উৎসাহ দেখে খুব ভাল লাগছে জয়া। তুমিও হেলপ করতে পার।

কিন্তু আগের গবেষণাটা কী শেষ হয়েছে?

কী বলতো!

প্রকৃতির নিম্নচাপ হয়। লো প্রেসার। হাইপ্রেসার হয় না কেন।

ওই নিয়ে ভাবছিলাম নাকি!

হ্যাঁ।

হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যাক ওটা ছাড়।

আপনি তো ডায়েরিতে সব লিখে রাখেন! পড়ে নেবেন। মনে পড়ে যাবে।

হ্যাঁ, এই যে তোমার সঙ্গে দেখা হল। এই দেখ, গ্রামোফোন পিন্‌টা—। মাংস—।

থামুন।

ঠকঠক করে দাবড়ানিতে গ্রামোফোন কেঁপে গেল আমার।

ডায়েরি পড়েন তো!

না।

বাঃ নিজে লিখে পড়েন না?

ও তো পড়ানোর জন্য। বুঝলে ইতিহাস যে লেখে সে কী পড়ে!

কে ইতিহাস লেখে?

মহাকাল!

ঘুম হচ্ছে আপনার?

ঘুম হচ্ছে কী হচ্ছে না, ভাবতে নেই। আমি ও ব্যাপারে ভাবি না। কিন্তু মাংস। শোন জয়া, বলতে পার মুরগী তো প্রাণী। তো পোলট্রির মুরগীর যে দ্রুত মাংসের বর্ধন তাতে কী মানসিক সায় থাকে মুরগীর? মুরগীর কী মন আছে? শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম?

কী বলছেন!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মাংস আর মন নিয়ে খুব ভেবেছেন।

সমীরদা আপনি বাড়ি চলে যান। আপনার জন্য এত খারাপ লাগে।

জয়া তোমার জন্যেও আমার খারাপ লাগছে। বলতে ইচ্ছে করে, বলি না। বলি, গবেষণায় বাধা দিও না। হ্যাঁ, তুমি কিন্তু উত্তর দাও নি।

শুনুন আপনার গবেষণার তো শেষ নেই। আপনি তো গবেষণা করছিলেন উৎপাদন যদি উন্নয়নের সূচক হয় মানুষের উৎপাদন বৃদ্ধি কেন উন্নয়ন নয়—?

তাই নাকি? এ নিয়ে ভাবছিলাম!

হ্যাঁ। শুনুন গবেষণা থাকবেই। আপনি বাড়ি যান। রোদ বাড়ছে।

বাড়ুক, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না!

শুনুন, গবেষণার অনেক বিষয় আছে। দীপাদি কেন আপনার জন্য কাঁদে? কেন বিয়ে করছেন না? এর উত্তর খুঁজুন।

কে দীপাদি?

আপনি দীপাদিকে ভুলে গিয়েছেন?

আমি দ্রুত নিজেকে সামলে নিই। এক্ষুনি আমাকে পাগল বলত জয়া। হেসে বললাম, ইয়ার্কি করছিলাম। সত্যি দীপার জন্য কষ্ট হয়। ও আমার প্রেমিকা। আমার বউ হবে। যাক্‌গে ওটা পরের কথা। এখন বল—মাংস এবং মন।

আপনি বাড়ি যান। যান বলছি।

জয়া এগিয়ে যাবার পর আমি বুঝি, জয়া পোলট্রির মুরগী। রক্ত মাংসের সুবিন্যস্ত নির্মাণে যে তৎপরতা, তাতে ওর মনের সায় আছে কী না, যদি জানাত। যদি নিজেকে পোলট্রির মুরগী ভেবে, অন্ততঃ একবার ভেবে আমাকে সহায়তা করত।

রোদটা বেশ কড়া। কোন দিকে যাই। সবই তো চেনা। আবার অচেনাও হতে পারে। তাতে কিছু যায় আসে না। বিস্তর মানুষ। পকেটে হাত ভরে দেখি, দু'টাকার কয়েন। যাক্ চা খাওয়া যেতে পারে।

রাস্তা আগলে বেঞ্চি। চায়ের ছোট্ট দোকান,ঝুপসি। ভাঁড়ে চা নিয়ে চুমুক দিই। কালো মোটাসোটা চাওয়ালা। নামটা মনে পড়ে না। বেঞ্চে দুজন বসে।

এক রিক্সাওয়ালা চেঁচিয়ে বলে, ভরতদা পোলট্রি পঞ্চাশ টাকা হয়ে গিয়েছে। খেয়ে নাও। খেয়ে নাও। মন্থর সাইকেলের চাকায় যেন ছেতরে দিয়ে যায়, খেয়ে নাও। খেয়ে নাও।

তাই নাকি! বেঞ্চির একজন চেঁচায়।

আমি উৎসুক হই, মুরগীর মাংস!

হ্যাঁ। সত্তর পঁচাত্তর হয়েছিল। ভাগ্যিস ব্রয়লার ছেড়েছিল। তবু মাংস পাচ্ছি।

বেঞ্চির সমবয়সী দু'জনকে মাংস এবং মন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত কী না ভাবি। তার আগেই দু'জনেই বেঞ্চি ছেড়ে উঠে যায়। হয়ত বা পঞ্চাশ টাকায় মাংস কিনতে।

কিন্তু আমার গবেষণার বিষয় তো দামদর নয়। চা-ওয়ালাকে পয়সা দেবার সময় প্রসঙ্গটা টানতে যাই, মুরগীর মাংস—।

আমরা মাছ মাংস খাই না। আমরা বৈষ্ণব।

এক টাকা পকেটে পুরে হাঁটি। তবে ভাগ্যিস চা খেতে গিয়েছিলাম। এ বিষয়ে একটা সূত্র পেয়ে গেলাম। বলতে কী ল্যাবরেটারিতে নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যেমন কিছু সৃজিত হয়, তেমনি ঘটনায়, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতেও কিছু সৃজিত হয় এবং কিছু একটা উঠে আসে। আমি সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠি।

অরিন্দমের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খুবই বুদ্ধিমান যুবক। ফরসা রঙ, মাঝারি স্বাস্থ্য, চোখমুখ শ্রীময়। ও পোলট্রির মুরগী কেটে বিক্রি করে। দোকান

নেই। রাস্তার ধারে বটতলায় টেবিল পেতে বসে। উঁহু, দাঁড়িয়ে থাকে। টেবিলের নিচে জলের বালতি।

অরিন্দমের কাছে গিয়ে দেখি, টেবিল সাফ। আর একটু দেরী করলে দেখা হত না।

স্যার! অরিন্দম খুব খুশি হয়, অনেকদিন দেখিনি। আবার ছুটি নিয়েছেন।

হ্যাঁ, তারপর তোমার হয়ে গেল?

হ্যাঁ, পঞ্চাশ টাকা দর। আরও কাটত। মাছ তো আশি।

অরিন্দম ক্লাশ এইটে আমার ছাত্র ছিল। তারপর ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। ও কিছুকাল টিউশনিও করেছে। তবে মুরগী বিক্রিতে লাভ বেশি। ও বলেছে, স্যার ছাত্রদের তো স্কুল টিচাররাই নিজেদের কোচিং ক্লাশে অ্যাডেসিভ দিয়ে জুড়ে নিয়েছে। পাব কী করে।

অরিন্দমের মুরগীর মাংস, রক্ত পালক ঘাঁটাঘাঁটি থেকে মস্তিষ্কের অনেক দরজাই খুলে গিয়েছে। ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। নইলে মাংস বিষয়ক ভাবনায় অরিন্দমকেই তো প্রথম মনে পড়ার কথা। যাক্ মনে পড়েছে, এই যথেষ্ট।

তোমার সময় হবে অরিন্দম!

কেন হবে না! একটু ফ্রেশ হয়ে আসব।

দরকার নেই।

জামায় রক্তের ছিটে, মাংসের কুচোও থাকতে পারে। বলে হাতায় টুসকি দিয়ে একটা মাংসের কুচো ফেলে দেয়। সামান্য হাসে। বলে, গায়ে গন্ধ আছে।

তোমার অসুবিধা নেই তো!

না।

এখানটায় তাহলে বসা যাক্। একটা আলোচনার দরকার।

অরিন্দমকে দেখা গেল খুবই উৎসাহী, বলুন। থেপসে বসে পড়ল রাস্তার ধারে মাটিতে।

তুমি জান আমি হরিপালের কাছে পানিশ্যাওলা বলে একটা গাঁয়ে গিয়েছিলাম! বলেই আমি হেসে ফেললাম।

তাই নাকি? গিয়েছিলেন! কিন্তু হাসলেন কেন? হাসির কিছু ঘটেছে?

আমি ওই গাঁয়ের নামটা ভুলে গিয়েছিলাম!

আচ্ছা। তাতে কী হয়েছে। আমিও অনেক কিছু ভুলে যাই। এই মুরগী কাটার পর, মানে এ ব্যবসাতে নেমে রক্ত, পালক মাংসের সঙ্গে ঘেন্না, রাগ, নানাজনের উপর ক্রোধ, ইংরেজি অনার্স, আর্থ সামাজিক অবস্থা, লিডার, রাজনীতি, মস্তান, আরও আরও সব তালগোল পাকিয়ে কী যে করে দেয়।

আচ্ছা পানিশ্যাওলাই তো বললাম। ওখানে গিয়েছিলাম কেন?

ইচ্ছে হয়েছিল। তাছাড়া আপনার দিদির বাড়ি।

রাইট। দিদি ভাগনি। আমার ভাগনিকে পণের টাকার জন্য, উহুঁ, টাকার জন্য পুড়িয়ে মেরেছিল, ইউ নো।

জানি।

মাংস পুড়িয়ে মানুষে খায়।

আদিমযুগে তো খেত। এখনও কিছু কিছু উপজাতিরা খায়। আসলে তেল মশলা এসব ঠিকঠাক পায় না। তাছাড়া পোড়া মাংসের টেস্টও তো অন্যরকম।

মাংস শব্দটা আবার আমার মাথা-গ্রামোফোনকে চাঙ্গা করে দেয়। জয়ার ধমকানিতে আটকে যাওয়া পিনটা বুঝি ভয় পেয়েছিল কিংবা রেকর্ডটাই। এখন বাজে।

অরিন্দম, আমার গবেষণা মানে—।

বিষয়টাই তো বলেন নি।

ওই মাংস নিয়ে।

মাংস? কিসের মাংস? স্যার, ইংরেজিতে ফ্রেশ মানে মানুষের মাংস কিন্তু গরুর মাংস বিফ, আবার খাসির মাংস পাঁঠার মাংস মিট, আবার—

শোন, ইংরাজি জাপানী কী চীনা নয়, আমি বাংলা মাংস বলছি। বাংলাতে সবই মাংস। হ্যাঁ চিন্তাটা, মানে অনুভব, মাংস, মন এরকম ছড়ান সব অংশগুলো নিয়ে—। ভাল কথা বুঝলে অরিন্দম, আমি ওখানে পোলট্রিতে মুরগী দেখলাম। থোকা থোকা মাংসের ফুল—।

মাংসের ফুল। দারুণ বলেছেন। সত্যিই তো সাদা ফুল, জুঁই কী রজনীগন্ধা। ফুল কাটলে টকটকে লাল রক্ত ঝরে।

অরিন্দম আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। গবেষণার বিষয়টা হল মাংস, প্রাণ মন।

স্যার তিনটেই সম্পৃক্ত। আলো জল বাতাস। যার থেকে প্রাণ। প্রাণের অবস্থান মাংসস্তূপে। তবে অস্থিও আছে।

গুড। তুমি ঠিক পথে চলেছ!

তাহলে মানুষ মাংসস্তূপ। মুরগীর মত পালকে না ঢাকা থেকে জামাকাপড়ে ঢাকা থাকে।

তার অর্থ মানুষ আর মুরগী প্রায় একই। মানে মিল। .

অরিন্দম হাত নেড়ে, যে হাতে শুকনো রক্ত চিটিয়ে আছে সাদা পালকের টুকরো আছে, বলে, ধরুন, কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় মানুষকে তা তো মুরগী ভেবেই। তাছাড়া বলে না কব্জা করলে, কী ঠকালে, 'মুরগী পেয়েছি।' তারপর স্যার ভোটব্যাঙ্ক, নেতারা যে খাঁচার মধ্যে লালনপালন করে থাকে, সে তো মুরগীর জীবন। তারপর ধরুন, যুদ্ধ বা লড়াই। মুরগীর ঠ্যাংয়ে ছুরি বেঁধে লড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্য মুরগীকে কেটে ক্ষত বিক্ষত কী খতম করে দেয়। একে বলে 'মুর্গী লড়াই'। তো আমাদের যুদ্ধ তো—। স্যার মনে পড়ে গেল,

শিবরাম চক্রবর্ত্তী 'রহস্যময় অট্টালিকা' নামে একটা বইয়ে যুদ্ধে কাটাকুটি করা মানুষদের মাংস রেঁধে বেড়ে খেলে ব্যাপারটার অর্থ থাকত বলেছেন। এমন কী স্যার উনি আমাদের সভ্যতার চেয়ে নরখাদকদের সভ্যতাকে ঢের উপাদেয়, ঢের সুস্বাদু বলেছেন। উনি মানে উনার গল্পের ব্রজেশ্বরের ভাবনায়।

বাঃ। বাঃ।

কিন্তু স্যার প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। মুরগীর মধ্যে শ্রেণীভেদ নেই। ধনী দরিদ্র, শোষক শোষিত, নেতা জনতা বলে কিছু নেই।

মিল যেমন থাকবে, তেমনি অমিলও তো কিছু থাকবে। কিন্তু—।

আপনার আমার কাছে জানার বিষয়টা যেন কী স্যার!

বললাম তো, মাংসের দ্রুতবর্ধন, সুবিন্যাস প্রচেষ্টা, মানে কী বলব ওয়া কী চায়। যেহেতু অন্যের ভোগে লাগবে। মন আর মাংসের।

চায় না। কিন্তু হয়ে যায়।

চায় না যখন প্রতিবাদ নেই কেন?

আমিও ভাবি। রাস্তা দিয়ে হাঁটে কত মোরগ, মুরগী মানে স্ত্রী মোরগ। বাজার করে, দোকান যায়। খায়, মাংস বাড়ায়। কেউ কেউ অন্য মোরগের ছুরিতে খতম হয়। কেউ কেউ খাবার কেড়ে নেয়।

অরিন্দম আমরা ভুল করছি। মানুষ আর মুরগীকে এক করে ফেলছি।

সরি স্যার। হ্যাঁ, কী বলছিলেন! প্রতিবাদ নেই কেন? ষড়যন্ত্রকারীর মতো গলা করে অরিন্দম ফিসফিস করে, কোন কোন মুরগী ছটফট করে বেশি। কাটা পড়তে চায় না।

বল কী! তা—তাদের কোন বিশেষ লক্ষণ আছে?

হ্যাঁ। আমি বের করেছি। সেগুলো একটু রোগা রোগা টাইপের হয়।

তার মানে মাংসের জন্য তারা নয়। মাংসেরই প্রয়োজন তাদের, এটাই— এই বোধটাই প্রকাশ করে থাকে!

বলে অরিন্দমের শুকনো রক্ত, পালকের টুকরো মাংসের টুকরো লেগে থাকা হাতটা চেপে ধরি উত্তেজনায়। আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপে। আমি জানি না, দীর্ঘ গবেষণার পর বৈজ্ঞানিকদের এমনই বোধ হয় কী না। টের পাই মাথা-গ্রামোফোনের উপর চাপান রেকর্ডটা কখন থেমে গিয়েছে। হাত বাড়িয়ে পিন লাগান সাপটার ফণা তুলে ঘুরিয়ে রাখি।

আমি পাগল মোটেই নই। ডায়েরির এই লেখাটা, কী বলব, হলপ করে বলতে পারি না—। যদি ঘটেই থাকে কিংবা না ঘটে থাকে, কী যায় আসে!

উপ্‌কার নামক মন্ত্র

পাগলা কুকুরটাকে মুচিপাড়ার নিচে বটতলার পাশে গরুফেলায় পিটিয়ে মারে ভগাই। পিটুনির পরও হাতে বিলিতি কঙ্কের মোটা ডালের লাঠিটা ধরা থাকে। কালো হাড় জিরজির রোঁয়া ওঠা কুকুরটা শরীর কাঁপিয়ে মুখে রক্তের একটা ক্ষীণ স্রোত নিয়ে নিথর হয়ে যায়। ভগাই সেটাকে খোঁচায় দু'বার। চার পা ছড়িয়ে থাকা মরা কুকুরের উপর লাঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে ফিরেও দেখে না।

ভগাইয়ের সারা গা ঘামভেজা, হৃৎপিণ্ড দাপাচ্ছে। পায়ের পাতায় ব্যথা, গোছে ব্যথা। কুকুরটা মরার আগে কম ছোটায়নি! ডোবার ধার, ঝোঁপ, বাঁশবন, মুচিপাড়ার আনাচকানাচ, হাঁড়িফেলা, পাকুড়তলা, বাবুদের খামার, চক্রবর্তী পুকুরের পাড়—বলতে কি গাঁ-দক্ষিণ পুরোটাই আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহারের চেষ্টা করেছে।

কোমরে চৌকিদার ভুবন হাড়ীর দেওয়া হাফপ্যান্টটায় ভগাই তার তেল চিটে গামছাটা কষে বেঁধেছে বেল্টের মত। গজদন্তী, উচঁকপালে, গাল বসা, খোঁচা দাড়িগোঁফের আবর্জনায় কালো চওড়া ঠোঁটের লম্বাটে মুখ, লম্বা পা, ঝুলন্ত শীর্ণ শুকো কালো শেকড়ের মত হাত ঝুলে আছে। ত্রিশ বত্রিশ বছরের মানুষটা উদোম গা, হাফপ্যান্টে না বালক না যুবক। গড়ণের বিশ্রিপনায় মানুষ নামের জীব হলেও এখন দেখামাত্র মনে হতেই পারে, লালচে চোখের চাউনি, ঠোঁট বাঁকানয় স্বাভাবিকত্ব নেই।

জাতে হাড়ী। গরু বাগালি কিংবা কিষানী দিব্যি করতে পারত। সে সব না করে বাউণ্ডুলেপনা স্বভাব নিয়ে গাঁ চক্কর দেওয়া জীবনকে দিব্যি মজায় পার করে যাচ্ছে। এমন মজা পনের বছর আগে কিশোরী বউ সাতটা দিনও সহ্য করতে পারে নি। সেই যে গেল, আর এল না। মা ছেলেকে ধুতি শার্ট পরিয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গেল। বউ আনবে। মা কত কড়ার করল, তুকে রানী করে রাখব, চল মা ঘরে। কাকুতি মিনতি, চিবুক ধরে চুমু খাওয়া। বউ শোনে না, বউয়ের মা শোনে না, বউয়ের ভাই শোনে না, বউয়ের বাপ শোনে না। মা বেটা ফিরে এল সারা রাস্তা বউকে শাপশাপান্ত করতে করতে।

কুকুরটাকে মারার পিছনে ভগাইয়ের ক্রোধ ছিল না, প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা ছিল না, জন্তু মারার মজা ছিল না, কোন লাভের সম্ভাবনা ছিল না। পাগলা কুকুর মারা উচিত, কাউকে কামড়াতেই পারে এমন পরোপকার প্রবৃত্তি ছিল না। বুধে তেড়ে আনছিল কিন্তু বুধেরও অনুরোধ ছিল না।

ভগাই তেতুঁলতলার ছায়ায় ঘাসের উপর শুয়ে ছিল। কালবৈশাখী নেই, বৃষ্টি নেই। সূর্য যেন মজা করতে হু হু করে নেমে মাটি বরাবর পৌছানর চেষ্টা

করছিল, রোদ না সূর্যেরই অঙ্গ বোঝা ভার। তেতুঁলের ছায়া গরম, বাতাস গরম তবু তো ফুরফুরানি বাতাসটা গায়ে মেখে আরাম পাচ্ছিল। বুধের তাড়া দেওয়া দেখেই এস্তে উঠে বসল। তারপর যেন কলের গাড়ি, ড্রাইভার চালাচ্ছে কিংবা তীর কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে—তীর ছুটছে--সে বিলিতি কঙ্কের ডালটা পেয়ে তেমনটি ছোটা শুরু করে দিল। আর বুধে তেঁতুলের ছায়ায় হাঁপাতে থাকল—যেন এতদূর পৌঁছানর দায়িত্ব তার ছিল। সেটা যথাযথ পালিত হয়েছে এমন নিশ্চিন্ত। 'যা শালা মরগা' বলে তারপর সে ঘরের পথ ধরেছিল।

রোগা কালো রাস্তার কুকুরটা সুফল মাজির ছেলে সুকুমারকে কামড়ায়। ঝাড়ফুঁক, পিঠে থালা বসান সত্ত্বেও সাবসিডারি প্রাইমারি হেলথ্ সেন্টারের ডি গ্রুপের স্টাফ নৃপতি, যাকে সবাই ডাক্তার বলে, তার কথামত ইন্‌জেকসান্ন, সিউড়ী ছোটা এবং কুকুরটাকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশও পালিত হয়। তারপরই সুফলের ঘোষণা, কুকুরটাকে মেরে ফেল।

সুফলের নিজের হাতে চাষ, যদিও লাঙল দেয় না, বত্রিশ বিঘে জমি, দুটো পুকুর, পঞ্চায়েতের মেম্বারশিপ, দোতলা বাড়ি, বড়ছেলে বি.কম.পাশ করেছে, মেয়ের জন্যে এম.এ. পাশ ইংরাজি টিচার বর নগদ দেড় লাখ টাকা, বার ভরি সোনা, আনুষঙ্গিক আরও সামগ্রী দিয়ে কিনেছে। তার ক্লাস এইটে পড়া ছেলেকে কুকুরে কামড়াবে, হ্যাপা সামলাতে হবে, টাকার শ্রাদ্ধ হবে, ছেলের মা জননী স্নেহে অধীর হয়ে কাঁদবে—সহ্য করা যায় কী করে। ফলে ঘোষণার সঙ্গে অনুচ্চারিত পুরস্কার যে বুধে কোন না কোন ভাবে পেতেই পারে, সেটা বুঝেই ঠ্যাঙা নিয়ে বেরিয়ে ছিল। বুধে ফাইফরমাস খাটে সুফলের। চাকর বল, গার্ড বল, চামচে বল—কোনটাই অসঙ্গত হবে না।

কুকুর মেরে ভগাই নিজেকে সামলাতে আবার তেতুঁলের ছায়ায়। শুধু টের পায় ক্ষিধেটা বেড়ে গিয়েছে। পেট হাউমাউ করছিল অনেকক্ষণ থেকে। এত বিরক্তি লাগছিল। নাড়ি ভুঁড়ি এমন কাণ্ডকারখানা বাধায় যে প্রায়ই ইচ্ছে করে পেট ফাঁসিয়ে যন্তরটা বা জন্তুটাকে দেখে নেয়। বেটার এত খাই খাই কেন। সেই রাগে কুকুর ধাওয়া হতেই পারে। বেচারা কুকুর। না, ভগাইয়ের তার জন্যে দুঃখ নেই। সে ভাবে, ছুটে পেট খেপে গেল আরও। শালা।

কী রে ভগাই। কাজ নাই!

খিদে লেগেছে। ভগাই উঠে বসে।

সাইকেল থামিয়ে লম্বা একটা পা মাটিতে, বাঁকানো হ্যাণ্ডেল, মাথায় টুপি, প্যান্টের উপর ফিনফিনে পাঞ্জাবি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তামাটে বর্ণের দোহারা চেহারার নেবুদা। ভাল নাম অনির্বাণ। প্রাইমারি টিচার। রাজনীতি করে, ও সংক্রান্ত বিস্তর ঘোরপ্যাচের পাকানো বুদ্ধি ধরে। বুদ্ধির শাখা-প্রশাখা শিরা উপশিরার রক্ত বহনের মত বার্তা, নির্দেশ বহন করে—যা দ্রুত নিঃসরণও সে করে দিতে পারে। চটজলদি সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকাণ্ডের তুখোড়পনায় নেতৃত্ব

ওরই হাতে। ভবেন মণ্ডল বলে, নেবুর কথা শোন, নেবু কী বলছে দেখ, নেবুকে গিয়ে বল। ভবেন পরবর্তী পর্যায়ে বিধানসভায় প্রবেশাধিকার পাবে, এটা নিশ্চয় করে জানে। তার গাড়ি যে লাইনের উপর দিয়ে যাবে তার ধাতুপথের নামই হল নেবুদা।

পেট থাকলে খিদে থাকবে। সকাল থেকে করলি কী?

কুকুর মারলাম।

কুকুর? কার?

জানি না। বুধে তাড়িন্ আনলেক।

নেবু সব জানে। তার বুদ্ধিকোষে সহসা যে প্রবাহ তার কাঁপনে ঠোঁট নড়ে ওঠে, তাহলে ত মিটে গেল। চলে যা সুফলদার ঘরে। গিয়ে বল, তোমার বেটাকে যে কুকুরে কামড়েছিল, সেটাকে মেরেছি। ভাত দাও।

দিবেক না।

ঘাড় দেবে। শোন্ আমার নাম করিস্ না। স্বর খানিকটা নামিয়ে নেবু বলল, কুকুরটার ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যা। ঘরের সামনে নিয়ে বসে থাকবি। কাউকে ফেলতে দিবি না।

ঠিক বলেছ। খুব বুদ্ধি বটে তোমার।

ভগাই আবার গরু ফেলায় ছোটে। কিন্তু দড়ি কোথায়! মুচিপাড়ায় গিয়ে এক আঁটি খড় পেলে পাকিয়ে 'লিয়ালি' দড়ি করে নিতে পারে। কিংবা পাঠকহীড়ের ধারে 'বাবুই' ঘাস ছিঁড়ে দড়ি। ভাবতে ভাবতে গরুফেলায়। হাড়গোড় ছড়ান ওদিকের ঝোপে। অবাক কান্ড, দড়িও। গরু মরার মত অবস্থা হলেই গলার দড়ি খুলে 'গোজন্ম' থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে বাঁশে বেঁধে আনার সময় দড়ি লাগে। সে রকম ভাবে এ 'পাগা' বা দড়ি কেউ ফেলে গিয়েছে।

ভগাই কুকুরটার একটা পায়ে দড়ি বাঁধল। খাটো দড়ি। বাঁধার পর কুঁজো হয়ে তারপর কুকুর হেঁচড়ে হাঁটা। ব্যস্ততায় খিদে নেই। এমন একটা বুদ্ধি প্রাপ্তিতে ভেতরে আহ্লাদ। তাকে এক থালা সাদা ভাত দেখায়, এক থাবড়া শাক, তরকারি, ঘোলাটে জলের মত ডাল, লাল টুকটুকে কাঁচা লঙ্কা ভাতের ডাইনে গোঁজা দেখায়। ঠোঁটটা ভগাই চেটে নেয়। ভরদুপুরে গাঁয়ের ভাঙা রাস্তা শূন্য।

খাটো ধুতির উপর সাদা হাফশার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, গোলগাল বেঁটেখাট চেহারার বছর পঁয়তাল্লিশের সুফল টেরি কেটে চকচকে মুখে একহাতে ছাতার বাঁট, অন্যহাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে যাবে বলে ঘরের বাইরে সবে পা দিয়েছে রাস্তায়। ভগাই আটকাল, তোমার কাছে এলাম।

মরা কুকুরটার উপর নজর সুফলের, তুই মারলি তাহালে। বুধে বলছিল—

হ্যাঁ, আমাকে ভাত দিতে বলে যাও।

ভাত! ভাত কেন?

বাঃ কুকুর মারলম্। তোমার বেটাকে যে কামড়িন্‌ছে।

হ্যাঁ। কাজটা ভালই করেছিস। গোটা গাঁয়েরই উপকার হয়েছে। কুকুরটা আরও কারোকে কামড়াত। কুকুরটাকে মেরে ফেলায় আহ্লাদিত সুফল।

সি ত বটেই। ভাত দিতে বলে যাও। তা না হালে দুয়োরে এই বসলম্। কুনু শালা আমাকে সরাতে লারবেক। বলে রাস্তার তপ্ত বালিতে ভগাই বসে পড়ে। সামনে মরা কুকুরটা। যেন সে কোন সামগ্রী বেচতে বসেছে।

আরে। আরে করিস্ কী!

তোমার কাজ করেছি।

সুফল বলে, আমার ইকা লয়। গোটা গাঁয়ের উপকার হয়েছে। আমি—

হ্যাঁ উপ্‌কার। লাও ভাত বল।

ঝামেলা বটে। সুফল ঘরের দিকে গলা বাড়ায়, এই হলা, কোথা রইছিস। ঠাকরুণকে বলে, ভগাইকে চাট্টি ভাত দিয়ে দে তুই।

চাট্টি লয়। পেটপুরে ভাত দিতে বল।

সুফল ফোলাগালের কুঞ্চনে দাঁত খিঁচোয়, আধপেটা খাবার পাত্তর তুই?

গজদন্তী যেন বড়ই আহ্লাদের কথা, এমন ভাবে হাসে। ছাতা মাথায় সুফল হেঁটে যায়। ভগাই উঠোনে ঢোকে। ওদিকে কুলগাছ। তার ছায়ায় উবু হয়ে বসে যায়।

হলধর রাঁধুনি। কাঁধে গামছা, শিরদাঁড়া বাঁকা, ক্ষয়া বয়সী মুখটায় চোপসান গাল। গামছায় মুখ মুছে নেয় দু'বার। তারপর শালপাতা পেতে দেয় নিঃশব্দে। ভাত, ডাল, কুমড়োর ঘ্যাঁট, পাটের শাক পরপর ফেলা যায়। পাতার বাইরে পড়া একটা কুমড়োর টুকরোকে ভগাই ধুলো ঝেড়ে পরম যত্নে ভাতের উপর রাখে। গম্ভীর গলাতে বলে, কাঁচা লঙ্কা দাও লাল দেখে। খাওয়ার পর ভগাই তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে। কুকুরটাকে টেনে নিজের ঘরের সামনে আনে।

ঘর বলতে নিতান্তই কুঁড়ে। কালচে খড়ের পাতলা চাল, মাটির কলসি, ন্যাকড়ার বালিশ, ময়লাচিটে কাঁথা, একটা টিনের গ্লাস, এলুমিনিয়ামের থালা বাটি, কালিপড়া হাঁড়ি, ডেকচি। ঘরের ভেতর থেকে তালাইটা এনে ভগাই ঝোঁকা বাঁশঝাড়ের ছায়ায় পাতে, তারপর শুয়ে পড়ে। পাশাপাশি হরিশ আর সর্বধনের ঘর। পাড়াটা ঝিম মেরে আছে। শূন্যি শূন্যি। একটা কুকুর লম্বা জিভ ঝুলিয়ে ভগাইকে দেখে। স্বজাতির শব সামনে পড়ে। একবার শুধু শুঁকে যায়।

ভগাইয়ের গলা বরাবর পুরে নেওয়া ভাত, তারপর জল যেন শ্রান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে। খাদ্য পড়ায় বুদ্ধিকোষও 'কাজ করতে হবে' এমন দায়িত্ববান হয়ে উঠে, ভাবায়, সুফল দারুণ কথা বলেছে। কুকুরটা আরও কাউকে কামড়াতে পারত। সুতরাং গাঁয়ের সবার কাছে চাঁদা তুমি চাইতেই পার। সকলেরই কাজ করেছ। সকলেরই উপ্‌কার। গভমেন্ট উপ্‌কার করে ট্যাক্সো নেয়, পঞ্চায়েত মেম্বার উপ্‌কার করে টাকা নেয়, বলাইবাবু দরিদ্রনারায়ণ সেবা সমিতি চালায়, চাঁদা তুলে বেড়ায়—উপ্‌কার—উপ্‌কার করলে টাকা নেওয়ার দস্তুরমত হক্

তৈরী হয়। ভগাইরে ছাড়িস্‌ না বাপ।

তাই ছাড়ে। ভগাই যেন গাঁ-ময় উপ্‌কারী লোক, উপ্‌কারের ছড়াছড়ি প্রত্যক্ষ করে। নেতা হয়ে বর্গাদারের উপ্‌কারে অন্ন আবার জমির মালিকের অন্ন, গাঁয়ে টিউকল করার উপ্‌কারে দু'পয়সা আমদানিতে অন্ন, স্কুল লেখাপড়া শেখানর উপ্‌কারে অন্ন, ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার, ভাগাভাগি করে দেওয়া উপ্‌কারে অন্ন, ভোট দাও উপ্‌কার করব অন্ন। কত অন্নরে। একেবারে ভাতের পাহাড়।

ভগাইকে শুধু উপ্‌কারের খোঁজ করতে হবে। আপাতত মরা কুকুর মজুত। তোমাদের কামড়াত—উপ্‌কার—দাও অন্ন।

কুকুরটাকে টানতে টানতে দক্ষিণে বাচ্চুদের বাড়ি থেকে শুরু করে বদ্যিপাড়া, বামুনপাড়া, বেনেপাড়া, কুমোরপাড়া ঘুরে বেড়াতে লোকে তাজ্জব বনে যায়। হ্যাঁ, চাঁদা দিতেই হয়। পুজোআচ্চা, যাত্রা থিয়েটার থেকে অসুখ, বিটির বিয়ে, মরেছে দাহ করতে হবে, কীর্তনের আসর—দাও চাঁদা! তা বলে কুকুর মেরে কেউ চাঁদা নেয়?

কেনে দিবে না? উপ্‌কার হয় নাই?

আঁ, উপকার কী।

তোমাদের ত কামড়াত কুকুরট।

চাল তিন কেজি, নগদ সাতটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ভগাইয়ের মরা কুকুরটাকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। তারপরই চুমু সুফলকে। তারপরই নেবুদাকে। কিন্তু কুকুরটাকে কী এখনই পুঁতে ফেলা উচিত হবে? পাশের গাঁ বনপুরে কী সাতগাঁয়ে তো বেটা চারপায়ে যেতেই পারত, কামড়াতেও পারত। কুকুরটাকে টেনে আদায়ে বের হবে নাকি?

রাতে মুড়ি খেয়ে কুকুরটাকে উঠোনে ফেলে সে ঘুমিয়ে নিল। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত সে উপ্‌কার শব্দটা নিয়ে বাচ্চা ছেলের খেলনার মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 'উপ্‌কার, উপ্‌কার' 'সোনার চাঁদ' করে দারুণ মজা পেল। না, উপ্‌কারের অণ্বেষণ তাকে এরপর করতে হবে। উপ্‌কার মানেই অন্ন।

পরের দিন সকালে সে কুকুরটাকে মাটিতে পুঁতল। তারপর চিনু ঘোষের দোকান থেকে কাপড়কাচা সাবান আর ব্লেড কিনল। টিনের বাক্স থেকে মেজবাবুর দেওয়া পাজামা, কলকাতার বাবুদের দেওয়া পাঞ্জাবি বের করল। ব্লেডে দাড়ি কামাল। পুকুরে গিয়ে নিজে সাবান মাখল। পাজামা পাঞ্জাবি কাচল।

পুকুরে জামাপাজামা কাচার সময়ই নজরে পড়ে, শম্ভু রায়ের ইটভাটা থেকে ঝুড়ি করে ইট নিয়ে যাবার জন্য গোছাচ্ছে বদন পাল। ভগাই ছুটে গেল হেই হেই করে। তারপর এক গ্রস্থ ঝগড়া বদনের সঙ্গে। 'তুই বলার কে,' 'বটি বলেই বলছি,' 'চুরি করছিস্‌ আর মুখ' এমনি কথার পিঠে কথা। শেষ পর্যন্ত উপ্‌কার মানেই অন্ন, উপ্‌কারের প্রবল ভালবাসা ভগাইকে জিতিয়ে দেয়।

বিকেলবেলায় শম্ভুর কাছে যাবার জন্য পাজামা পাঞ্জাবি পরে ভগাই বের

হয়। দু'পা যেতেই কালু 'আরে ব্বাস্, ভগাই যে বাবু হন্ গেলি' বলে চমকে ওঠে যেন। আলতামাসি, 'অ তুই ভগাই বটিস্, আমি ভাবি কুথাকার কে বটে' বলে নিশ্চিন্ত হয়। সাইকেল থামিয়ে কানাইমাষ্টার অবাক হয়ে বলে, 'আরে ভগাই, এই তো খুব সুন্দর লাগছে! কী নোংরা হয়ে থাকতিস বল তো। দাঁড়া, তোকে একটা পুরোন পাঞ্জাবি দেব।' বাগাল বদনা ভ্রু' উপরে তুলে বলল, 'মাইরি ভগাই, বচ্চন বনে গেলি শালা।' ভগাই জামাটা ঝেড়ে মৃদু হাসে শুধু।

শম্ভুর রসকষহীন সিড়িঙ্গে চেহারা, দু'ভাঁজ সাদা ধুতি, উদোম বুকে স্পষ্ট পাঁজরা, চোপসান গালে খোঁচা দাড়ি। ভগাই ইট রক্ষা করেছে শুনে আনন্দ পেল। বলল, বেশ করছিস্। ইট ত চুরি করে ফাঁক করে দিলে শালারা। চল্লিশ হাজারের ভাটা। দশহাজারও আনি নাই খামারের পাঁচিল দিতে। তা হ্যাঁ রে ভগাই, সেজেছিস্, কোথাও যাবি নাকি?

না। ভগাই দাঁড়িয়েই মুখটা দেখে নিয়ে বলে, তোমার কাছে এলম। উপ্কারের দরুণ কিছু দাও।

মানে? শম্ভু অবাক।

ইট নিয়ে যেতে দিলম্ না। পাঁচশ, কে জি যা পার চাল দাও। তোমার ভাটা দেখব। কোন শালা ইট নিয়ে যেতে পারবে না!

চাল দিতে হবে কী রে?

তাহলে তোমার ইটের ভাটা ফাঁকা হোক। বদনা ইকা লয়, ঢেক লুক লেয়।

শম্ভু এরপর চাল না নিয়ে পারে না। আরও ভাটা রয়েছে। সামন্তদের, নন্দ দাসের, কিন্তু শুধু তো ইটভাটা নয়, মানুষের আরও 'উপ্কার' করার মত অনেকে জিনিশই রয়েছে। ভগাইকে শুধু খুঁজে নিতে হবে।

এদিকে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতায় প্রকৃতি একদিন খেপে ওঠে। কালবৈশাখীর আমন্ত্রণে তার পাগলপ্রায় অবস্থা। দুপুরের সূর্য ডুবিয়ে নিজের কব্জায় আনে যেন ঝড়ের রুদ্রমূর্তি। ধুলোবালি, খড়পাত নিয়ে দানবীয় আক্রোশে সব ভাঙ্গার জন্য দস্যিপনা। পিছনে বৃষ্টি নামে তারপর। গাছের ডাল ভাঙে, ঘরের চাল ওড়ে, বজ্রাঘাতে একটা তালগাছের পাতা জ্বলে। ভগাইয়ের ঘরের বাঁধন আলগা ছিল। ফলে পুরো চাল টোপরের মত খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়। উদোম চার দেওয়াল তারপর হা হা করে। তবে ভগাইয়ের ঘরের চাল আবার পুনঃস্থাপন হতে দেরী হয় না। খড়, বাঁশ সে আদায় করে এ ঘর ও ঘর থেকে। উপ্কার মন্ত্রে ভগাই দেখিয়ে দিয়েছে, তাকে সবারই প্রয়োজন।

নেবুদার সঙ্গে দেখা হয়। বলে, করছিস্ কী তুই!

কেনে?

তুই যে আদায়ের ওস্তাদ হয়ে গেলি। খুব কাজের মানুষও হয়েছিস্। ভাল। ভাল। কাজ করে খা। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করিস্ না। সর অবসরে তোকে তো কাজে লাগাতে পারি।

তা ত পারই। বল কী কাজ!

তোকে আমাদের পার্টিতে নিয়ে নেব।

আমি নিজেই পার্টি বটি। দাঁত দেখিয়ে ভগাই হাসে।

উহুঁ। একা বাঁচা যায় না রে। রোদ বাড়ছে। চলি। দেখা করবি—কেমন।

ভগাইয়ের বাউণ্ডুলেপনা ঘুচে পরিবর্তন, ঘরের চালে নতুন খড়, পাজামার উপর জামা, কখনও লুঙ্গি, চুল কাটা, দাড়ি কামান, বাউরী বউয়ের চিকিৎসার জন্য আদায় এবং সিউড়ীতে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়া, পেহ্লাদের মা মরতে বক্রেশ্বর যাত্রার ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধ শান্তিতে অংশ, ভুবনের মেজমেয়ের বিয়েতে উপ্‌কারী পরিশ্রম ইত্যাদি নতুন সংবাদ ক্রমশ পুরোন এবং স্বাভাবিক; এমনটিই যেন, হয়ে ওঠে। এর মধ্যে গ্রীষ্ম কেটে আকাশ মেঘ, বৃষ্টি, চাষের কাজের মগ্নতার কাল চলে আসে। ভগাই 'উপ্‌কার করলেই অন্ন' মন্ত্রে তুখোড় হয়ে ওঠে। গোপন মন্ত্র কোথাও প্রকাশ করে না। মন্ত্রসিদ্ধি তার চারিত্রিক ঋজুতা আনে, এতদিনের বোধের গ্রাম তাকে অন্য বোধে স্থাপনা দেয়। মন্ত্রের ধর্ম কিংবা অন্নের ধর্মজাত যেন আদ্যন্ত সে এখন।

টগরের চাউনিতে শরীরী মুদ্রায়, যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছলতায়, হাসিতে এর ফলেই ভগাইকে ঘিরে একটা চোরা স্রোত নির্মিত হয়ে যায়, টগর যা ভগাইকে দেখামাত্র পাঠায়। টগর মাতাল স্বামীকে লাথি মেরে চলে এসেছে। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরের এবং জমির ভাগ নিয়েছে। বিটির সমান অংশ বাপের সম্পত্তিতে। ভিন্ন থাকে, কাউকে পরোয়া করে না, সাজগোজ কথায় হাসিতে কোন দুঃখ রাখে না। একক কোন পুরুষে ন্যাওটা, প্রেমকাতর নেই। গাঁয়ের মেয়ে ফলে স্বচ্ছন্দে সে ছেলেদের সঙ্গে মেশে। মোহন কিংবা শ্যাম কিংবা অমন মস্তানি করা চেন্টো পর্যন্ত বুঝতে পারে না ঢঙঢাঙ, যৌনগন্ধী গল্প কথাবার্তা শুধুমাত্র তারই উদ্দেশে নিবেদিত কী না। টগর সতত যৌবন সুষমা ছোঁড়ে। ভগাইকে অমন চোখা চোখা বাণ হানাতেও প্রতিক্রিয়াহীন এবং চাউনিতে তার শরীর লেহনের চেষ্টাহীনতা তাকে ভগাইয়ের ঘরের কাছে আসতে বাধ্য করে।

কোমরে হাত রেখে বাঁকা ঘাড়, বাঁকা ভ্রু, শ্যামলা শরীরের মারাত্মক মুদ্রায় যৌবন তন্বীর উঁচু বুক, শীর্ণ কোমর এবং ভারী নিতম্বের শৈল্পিকতা নিয়ে টগর বলল, আমাকে ত দেখতেই পাও না। অত ডাকলাম্ ঘুরেও দেখলে না?

ভগাই অবাক, কখন বল দেখিনি? কুথা?

কাল বিকেলে। কলাইডাঙার কাছে।

শুনতে পাই নাই। ভগাই ছুরি দিয়ে যে আলু কাটছিল, বন্ধ রাখে না। যেন এতক্ষণে নজর পড়ল এমন ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে টগর, করছ কী! করছ কী! এ কী তোমার কাজ বটে? ছাড়! ছাড়! ছুরি দিয়ে আলু কাটছ! কেনে বঁটি কিনতে পার নাই। সর। বলে ধাক্কা দিয়ে প্রায় কেড়েই নেয় ছুরি।

তারপর ভগাইয়ের চোখে এক অনুপম দৃশ্য। যুবতীর ব্যস্ততা, কেরোসিন স্টোভের পলতে উসকে জ্বালানো আলু পটলের তরকারি করা, চা খাবে, চা চিনি আছে ত বলে নিয়ে খেয়ে বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে নারীর সান্নিধ্য সুখ, মোহিনীর অতি সূক্ষ্ম বেষ্টনী জালের আবৃতি—ভগাই বিমুগ্ধতার তরঙ্গ হয়ে যেতে যেতে কোন ক্রমে থামায়! ভাবে, টগর তার গোপন মন্ত্র 'উপ্‌কার'কে ধরে ফেলেছে। বিষম দ'য়ে পড়ে সে। উপ্‌কার মানে লাভের কড়ির বৃদ্ধি। টগরের কড়ি তার গাঁট থেকে বেরুবে। তবে বেশিক্ষণ এমন হিসেবীপনা রক্ষা করা যায় না। যুবতীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কপালে সবুজ টিপের পাশে যেন শিশির বিন্দু, বুকের আঁচল আলো অন্ধকারের খেলার মত নগ্ন স্তন ভাঁজ ভাঙে আর গড়ে, হাসি ঠোঁটের মেঘে বিদ্যুত ঘনায়, চুড়িপরা হাতের পুরুষ্টু আঙুলের সঞ্চালন আকর্ষণের ইঙ্গিতবাহী হয়ে ওঠে। বলে, টগর তুই সোয়ামীর ঘর যাবি না?

বাঁকা ভ্রু, ঘাড় স্থির, তুমি বউ আনবে না?

আসবেক নাই।

আমারও দশা তোমার মত। চোখের রেখা এবং ঠোঁটে হাসির রহস্যময়তা যেন স্থির হয়ে থাকে। তারপরই ভাঙ্গে হাসির ধারায়, আমার রাঁধা খেয়ে দেখবে। পছন্দ হবেক কী না কে জানে।

খুব হবে। যা গন্ধ ছাড়লেক। কিন্তু তুই খাবি না?

ওমা, নেমতন্ন করেছ।

বাঃ নেমতন্ন কিসের? রাঁধলি চাখবি না—এ কেমুন কথা।

তা এক ডুং চেখে দেখতে পারি। কিন্তুক নেমতন্ন না করলে খাব না। বল, কবে তাহালে আমাকে নেমতন্ন করছ। নিজে রাঁধব আমি। বলে রাখছি।

ভগাই এর পর জালবদ্ধ না হয়ে পারে না।

চেন্টো সাইকেল নিয়ে আড্ডা মারে। সঙ্গে থাকে মালু আর প্যাংলা। সকাল সন্ধ্যে ভেতো কিংবা বোতলের দেশী লিকার চাইই। উপার্জন বলতে চারটে পুকুরের মাছ চাষের ইজারা নেওয়া। তবে মস্তানি করে এর ওর কাছে টাকা আদায় করে থাকে। মোড়ের হাঙ্গামায় হাত চালান থেকে ধানের ঝগড়া, ঘরের ভাগ জাতীয় হুজ্জোতে মাথা গলিয়ে দেয়। ধরল ভগাইকে, কী ভগাইদা। ছাড় তো দশ টাকা।

কেনে।

কেনে কী। হাত উদোম মাইরি। তোমার কাছে ছাড়া কার কাছে চাইব।

ভগাই দেখে, মাথায় ঝাঁকড়া কোঁকড়ান চুল, কালো মুখ, সরু গোঁফ, লম্বাটে গড়নের মাঝারি স্বাস্থ্যের টান টান শরীর, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছোকরার চোখে যেন রহস্য। গায়ে নীল গেঞ্জি, কালচে প্যান্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল।

ছাড় ত মাইরি।

ভগাই ওই চাউনিতে প্রতিবাদী হতে ইতস্তত করে।

এবার চেন্টো গলা নিচু করে বলে, টগর কী বলছে!

ভগাই একেবারে কাহিল। অসহায় চাউনি তার।

মাথাটা ঝেড়ে নিয়ে চেন্টো বলল, কী যে কর! কামাচ্ছ ত বেশ মাইরি। টগর কী এমনি তোমার বাগানে ফুটতে গেইছে দাদা। সব খপর রাখি। কিছু অসুবিধে নাই। গাড়ি চালাতে পার গড়গড়িন। দাও—।

টাকা নিয়ে কী ঘুরছি? লে পাঁচটাকা।

তাই সই। হাত পাতে চেন্টো। ময়লা পাঁচটাকার নোটটা প্যান্টের পকেটে ভরে বলে, মাঝেমধ্যে ছেড়ো। নিশ্চিন্তে থাকবে। উপ্‌কার পাবে আমার কাছে।

আবার উপ্‌কার। শোনামাত্র ভগাইয়ের মনে হয়, মন্ত্রটা চেন্টোও তাহলে জেনে ফেলেছে। জানুকগে ছাই। তবে সে কাউকে শেখাবে না। টগরকেও না। টগরের কথা মনে হতেই ভগাই টের পেল, মিষ্টি মিষ্টি বাতাস আসছে, রক্তে তাপ জাগছে, আঁচল স্পর্শ, গায়ে গা লাগা, সেদিন বুকের উপর পড়ে নরম চাপের কিছু মুহূর্ত, তা গন্ধময় কামনাতুর স্পর্শ যেন চারপাশে এখন টের পায়।

ক'দিন পরে নেবুদা সাইকেল থামাল ভগাইয়ের সামনে। হনহনিয়ে হাঁটছিল। কাঁধে ব্যাগ। ওষুধ এনে দিতে হবে নিখিলের মায়ের। বাস ধরবে সাতটার। টগরের জন্য টিয়ারঙা চৌত্রিশ সাইজের ব্লাউস আনতে হবে। শাড়ি কিনেছে, ব্লাউস আনে নি। এখন সবে সওয়া ছ'টা। বাসের দেরী আছে।

তোর যে দেখাই পাই না। খুব কাজের লোক হয়েছিস।

ভগাই হাসল, তা যা বলেছ। কাজের শেষ নাই।

মন্ত্রটা শেখান নেবুদারই। ফলে গুরুদেব বলা যেতে পারে। দক্ষিণা চাইবে?

করে যা। তোকে দিয়ে হবে। শোন্ পাড়াতে তো নাম হয়েছে। কলকাতায় মিছিলের জন্যে বাউড়ী হাড়ীপাড়ার লোক তোকেই জোগাড় করতে হবে।

কলকাতা যেতে হবে? কবে? ভগাই কলকাতা দেখেনি।

দেরী আছে। লোক জোগাড়ের দায়িত্ব তোর।

ভগাই এখন 'উপ্‌কার' নামক মন্ত্র পড়ে। মিছিলে যাওয়া নেবুদার উপ্‌কার। নেবুদা উপ্‌কার করছে পার্টির তা থেকে উপ্‌কার ছড়িয়ে যাবে আরও উচুঁতে, আশেপাশে। এদিকে এখানকার কিছু মানুষকে কলকাতা দেখানর উপ্‌কার সে করছে। উপ্‌কার—ক্রমেঃ আবর্ত্তন এমনই যে ভগাই সম্পূর্ণ দেখতে পায় না বটে, তবে অনুভব করতে পারে বিশালত্ব। গজদন্ত দেখিয়ে সে বলে, ঠিক আছে, ব্যবস্থা হবে। লোককে বলব। তাহালে আমাকে কী দিবে বল দেখিনি।

নেবুদা ভগাইকে চক্রবদ্ধ করে সে চক্রের ঘর্ষণ পেয়েও দিব্যি হজম করে চোখ মটকায়। যেন মরা কুকুরই আবার দেখায়, এ সব বলতে হয় নাকি! পঞ্চায়েত ভোট আসছে সামনে।

ক্ষেতজননী

বার বিঘে সরস ধানি জমি, নদীর চরায় দেড় বিঘে তড়ি অর্থাৎ আখ, আলু, বেগুন, মুলো কপি এবং রবিশস্যের চাষযোগ্য নধর ভুঁই এবারের ফলনে ফটিক মণ্ডলের খড়ের চালকে ঝকঝকে করগেট শিটের রুপোলি মুকুট পরিয়ে দেয়। বড় ছেলে চন্দ্রনাথ বেসিক ট্রেনিং নিয়ে এক বছরের মাথায় প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারি জুটিয়ে ফেলে। সাইকেলে পঁচিশ মিনিটের রাস্তা—দূর গাঁও নয়। মেয়ে কাজলা দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক পাস করে। আর দুই ছেলেমেয়ে সূর্য এবং চঞ্চলা পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ফার্স্ট এবং থার্ড হয়ে ওঠে। একসঙ্গে দুটো গাই বকনা বিইয়ে দেয়। দু'হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ পায়। পঞ্চায়েত সদস্য হলধর ডেকে চার কেজি সরষের মিনিকিট দেয়। কলকাতাবাসী দাদা দু'বিঘে সরস জমি সস্তা দরে তাকেই বেচে। সাড়ে চারশ টাকায় কেনা দামড়াজোড়া এ বছর অন্তত বারশ টাকার বলদ হয়ে জমি চষে।

এরকম একগুচ্ছ সৌভাগ্যের মূলকেন্দ্রের দিকে ফটিক মণ্ডল ধাবিত হয়ে যখন আবিষ্কার করে নিজের বুদ্ধি এবং বিশালকায় আত্মঅস্তিত্বকে, তখন একটা ধারাল সংবাদ অট্টহাসির মতো আছড়ে পড়ে। যা অবিশ্বাস্য। চমৎকার আঁট বাঁধুনির গেরস্তঘরের শক্ত দড়ি এবং খুঁটি দিয়ে বাঁধা বেড়াটায় যেন শিং গুঁতিয়ে ঢুকে পড়ে একটা জীব। ফটিক মণ্ডলের ঐ উপমাই মনে হয়। শোনামাত্র গিরিচূড়া স্খলিত হওয়ার মতো পতনের শব্দ এবং ধুলোর ঝড়ের বিপন্নতা কেটে যেতে ক্রোধ এবং আনুষঙ্গিক ওরকম ভাবনায় তার বাহান্ন বছরের রোগা দেহটা ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। শিরাপথে রক্তধারা থমকে যায়। এবং শ্বাসক্রিয়ার জরুরি ব্যবস্থাটাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তার গেরস্ত সত্তার গায়ে বর্গাদার নামের লাল টকটকে আঁচটা লাগবে আদপেই ভাবনার কোনো অব্যবহৃত কক্ষে পর্যন্ত ছিল না।

গ্রামের হাওয়ায় আটষট্টিতে যুক্তফ্রন্ট, একাত্তরে নকশাল, তারপর জরুরি অবস্থা, অঞ্চল থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত, ভোটাভুটি, মিছিল, পাড়ায় পাড়ায় চরম উত্তেজনা, বর্গা অপারেশান। পাক খাচ্ছে কোথাও ঘূর্ণি হয়ে কোথাও-বা ঝড়। বর্গা করে সাগর হাড়ী চক্রবর্তীর বড় বিটির বিয়েতে নগদ হাজার টাকা নিয়ে জমি ছাড়ল, ক'দিন দেদার খরচা করে তারপর কাঠ উপোস। চার বিঘে জমি ঘোষবাবু বিক্রি করতে এসে দশ কাঠা দিয়ে দিল বলাইকে, 'সই দে বাপ, জমি ছাড়।' ভোটভোট বচসায় সন্ধ্যেবেলায় কানু গুপ্ত লাঠির ঘায়ে পাকা তিনমাস হাসপাতাল, 'কর শালা ভোট।' পঞ্চায়েত সদস্য হলধর ফুড ফর ওয়ার্কস, ডি

আর ড্রি পুকুর কাটা ইত্যাদি ইত্যাদিতে ফুলে ফেঁপে ইয়া। দেওয়ালে পোষ্টার পড়ল, 'চোরা হলধর, সাবধান।' ধরম পুজোয় দু'পাড়ার তুমুল লাঠালাঠি। পুলিশ নেতা সামাল সামাল। বেনামী জমি, ভেস্ট জমি নিয়ে দারুণ হুড়োহুড়ি।

কিন্তু হাওয়া ফটিক মণ্ডলের উপর শান্ত, নিয়ন্ত্রিত। সে কোন কিছুতেই নেই। কিংবা হাঁস—জলে দিব্যি ভাসে। সে কখনই গাঁয়ের বাইরে এক পা বাড়ায় নি। চাষ ছাড়া অন্য কর্মও না। বাপ ঠাকুরদার জমি স্বহস্তে চষে এসেছে। বছর ছয়েক আগে বুধের বাপ কেষ্টকে সে কিষাণ রাখে। পেটের রোগে কাহিল হয়ে পড়েই লাঙ্গলের বোঁটা ছাড়তে হয়। তা কেষ্ট দু'বছর চষে সাপে কাটতে বুধে লাগল। উৎপাদন ঘরে মোটামুটি স্বচ্ছলতার দীপ্তি ছড়িয়ে রাখে। অসুখবিসুখ কিংবা শরিকি ভাগের বিবাদ, পড়শির ঝামেলা অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা চরম কিছু নয়। বস্তুত তার মাটির দোতলা, ওদিকে রান্নাঘর, গোয়াল উঠোন যেন দ্বীপের মত এক অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দিন এবং রাত্রিকে নামায় এবং তুলে নেয়। এই দ্বীপ গড়ে তোলার জন্যে চতুর্দিকে যে জলের বেষ্টনী সেটা তার সুবাক্যের ব্যবহার, ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা, বাইরের ঝামেলায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করা এবং বাইরের ক্রোধকে অপ্রকাশিত রাখা ইত্যাদি কিছু মানবিক গুণ। ফটিক মণ্ডল সৌভাগ্যবান, এ ধরণের গুণাবলী প্লাবনকে প্রতিহত করতে পারে না কিন্তু। তার চার সন্তানের গর্ভধারিনী জ্যোৎস্নাময়ী অবশ্য বলে, ভোঁদড়।

বৈশাখের তীব্র দহনে উঠোনের মাটি জ্বলন্ত উনুনের পার্শ্বতল। পশ্চিম দেওয়াল ঘেঁষা ডালকাটা সজনেগাছ গোড়াকে ন্যাংটোর মতো কুৎসিত দেখায়। রান্নাঘর থেকে পুঁটিমাছ ভাজার আঁশটে গন্ধ ঘরের দাওয়া ভরিয়ে রাখে। দামাল বাছুরজোড়া হাম্বা ডাক এবং খুঁটি তোলার দুরন্ত চেষ্টা চালায়। সূর্য দুলে দুলে পড়ে, 'আওরঙ্গজেবের ধর্মের গোঁড়ামি এবং অনুদারতা মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। অ্যাঁ, আওরঙ্গজেবের, আঁ আওরঙ্গজেবের ধর্মের—।' চঞ্চলা বাইরে থেকে ছুটে এসে বলে, 'অ বাবা ইলেকটিরিকের লুক এসেছে, দেখ গা মুখুজ্জে ঘরে কাজ করছে, অ বাবা আমাদের আলা লিবে না!' ঘর থেকে কাজলা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে। ডোরা শাড়ি, টিয়ারঙ ব্লাউস উজ্জ্বল শ্যাম মেয়ের ঢলঢলে গোল মুখ। আড়চোখে রান্নাঘরে মাকে দেখে উঠোনে নামে। পাশের গাঁয়ের সুবোধ তার বন্ধু সুধার দাদা—ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে চাকরি করে। সুবোধের সঙ্গে তার প্রণয়। জ্যোৎস্নাময়ী কিভাবে যেন টের পেয়ে গিয়েছেন। চঞ্চলা দিদির দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসে। সুবোধ এসেছে পাড়াতে।

দাওয়ার দেওয়ালে হেলান দিয়ে এ মহূর্তে ফটিক তার পদক্ষেপ বিষয়ে চিন্তিত হয়। বুধের কাছে সরাসরি ব্যাপারটা উত্থাপন করা সঙ্গত কি না। পৃথিবী বড়ই অকৃতজ্ঞ। বুধেকে তার যথেষ্ট স্নেহ রয়েছে। বুধের দেহে অসুরের বল। যেমন শক্তপোক্ত চেহারা তেমনি সৌষ্ঠবেও সুপুরুষ। গেরস্ত বলে মান্যগণ্য

করে। বীজ, সার, বলদ, লাঙ্গল সব তার। বুধের শুধু শ্রম। ফটিকের মনে এসে পড়ে, অসুখে বুধেকে সে কর্জ দিয়েছে, ওর বৌকে পুজোয় চল্লিশ টাকা দামের শাড়ি দিয়েছে, ঘরে এলেই চা রুটি দেয়। শীতে কাজলা বুধের জন্যে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছে। তবে কি না, ফটিক এটাও স্বীকার না করে পারে না, বুধের জমির উপর এক গভীর মমতা আছে। উৎপাদন বাড়ানো, মাটির শক্তি ধরে রাখা, জল যথাসময়ে দিয়ে তোয়াজ এ সবে তার এক চুল বিচ্যুতি নেই। জমিকে সে মায়ের মতোই আদরে রেখেছে। উঁচু নিচু নিজে কোদাল পেড়ে সমতল করে। আলের বাঁধুনিও দেখার মতো। গাঁয়ে বুধে একজন দক্ষ ফলনকারী চাষী বলে সুখ্যাতিও পেয়ে থাকে। এসবে গেরস্ত হিসেবে তার অহংকারকে আরও উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু তা বলে বুধে তো বর্গাদার হতে পারে না!

ফটিকের মনে হয়, এটা কারও চক্রান্ত। বুধে তারই শিকার হয়েছে। সাতকড়ি বলেছিল, 'তুমার ত বগ্‌গাদারের ডর নাই, বুধে ঘরের লুক।' সে মিষ্টি হাসিতে সমর্থন জানিয়েছিল। এরকম ঈর্ষা সে সাধন ঘোষ, কানাইয়ের চোখেও দেখেছে। বস্তুত বর্গাদার নামক ঝটিকাটি গাঁয়ের মাটিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত তথাকথিত ভদ্রলোক পাড়াতে এসে পড়ে দিশেহারা করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ স্বত্বলোপের আতঙ্ক সকলেরই চোখে। জমি নামক ব্যাপারটা দু'পাঁচ বিঘে জমির মালিকের কাছে যন্ত্রণা মনে হয়। বিদ্যের মতো জমিও হরণ করা যায় না, ব্যবহারে উৎপাদন দেয় এবং বেঁচে থাকার এক পোক্ত ভরসা, এই চিরন্তন বোধকে আঘাত হানে। কোথায় কাগজে কলমে খতিয়ান দাগ নম্বরে অধিকারীর পাশে বর্গাদারের নাম উঠবে, এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়। বর্গাদার নামের একটা দুরন্ত নদী গেরস্ত এবং কিষাণের মধ্যে প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। ফটিক কিন্তু এতে মোটেই বিচলিত হয় নি। জ্যোৎস্নাময়ী পড়শির খবরে এবং বর্গাদার নামের শব্দটায় কম আতঙ্কিত ছিল না। তবে কি না বুধে নিজে বলে, 'লা গেরস্ত, বর্গাদার কুন দুখে হতে যাব!' এবং এ বিষয়ে তার বিরূপতার কারণ হিসেবে বুধে অন্যের জমির মালিক হওয়া যায় না এবং সূর্যচন্দ্র উঠছে, ধর্ম নামে একটা ব্যাপার আছে, সেটাও সভয়ে উচ্চারণ করেছিল।

ফটিকের রোগা কাঠিসার চেহারায় দুটি চোখ বড় বেশি উজ্জ্বল। লম্বাপানা মুখে গোঁফদাড়ি ঘন নয়। একটু মেয়েলি ঢঙ আছে। কপাল সামান্য উঁচু। স্বচ্ছলতা এবং জীবনযাপনের অব্যাহত ধারাজনিত একটা সুস্থতার ছাপ তার দীর্ঘ নাসা, সরু ঠোঁট এবং চিবুকে দৃশ্য হয়। শরীরের অনুপাতে মুখমণ্ডলের প্রাণবন্ততা পঞ্চাশ ডিঙিয়ে যাওয়া বয়সেও আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে। অতিরিক্ত নীল চুবোন গেঞ্জিটা বেয়াড়া, ঢলঢল করছে এখন। উঠোনের রোদে ঠায় তার দৃষ্টি বাঁধা। বাইরে গিয়ে মুকুন্দর কাছ থেকে শুনে এসে সেই যে বসেছে, বিড়ি ধরায় নি একটা। গোবর সার দু'গাড়ি দেবার কথা পেহ্লাদের। যেতে হত। বাছুর দুটো বাঁধা। বাগাল ধনা সেই যে ঘর গিয়েছে ফেরেনি। গাই দুইতে হবে। একটু

হাঁকডাক করার সঙ্গতিও তার এখন নেই। বিছুটির জ্বলুনির মতো বুধে তার সর্বাঙ্গে ঘষে গিয়েছে।

বর্গাদার ব্যাপারটা এমন কিছু ভয়ঙ্কর নয়। জমি চষে যে মানুষটা তার নাম লেখা হলে সে বোঝে এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বুধেকে তার প্রয়োজন। বুধে চিরকাল চষে যাক, এটা তার আন্তরিক কাম্য। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, নাম লেখানোর পর ভাগ দেবে কি না, বিপদ-আপদে বিক্রি করতে চাইলে রাজি হবে কি না। গ্রামের ঘটনাগুলো কিন্তু পরপর অবধারিত গেরস্তর অধিকারচ্যুতির ইঙ্গিত করছে। বুধের স্বাতন্ত্র্যতা বিশ্বাসযোগ্য এমন নিশ্চয়তা কোথায়! বুধের অধিকারের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়াটাও তো বিশ্বাসভুক্ত ছিল না। ফলে ক্রোধ তার রক্তের মধ্যে চিন্তামাত্র প্রবল বেগে ধাবিত হচ্ছে। ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলতে দুর্মর ইচ্ছে হচ্ছে।

রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে জ্যোৎস্নাময়ীকে সংবাদটা দিতেই মেয়েমানুষের চোখের পাতা পড়ে না। পানাপাতা ডৌল কালো ভারী মুখ, পান খাওয়া পুরু লাল ঠোঁট, ভ্রু'র উপর কপালে গালে চিবুকে, ঠোঁটের উপরিভাগে ঘাম জবজবে। চুড়ি, শাঁখাপরা হাতে খুন্তি। চোখের পাতা পড়ে না এবং একটা অস্ফুট আর্তনাদও বেরিয়ে আসে, 'বল কি গো!' যেন পরমাত্মীয় বিয়োগের সংবাদ এইমাত্র তার কাছে পৌঁছাল।

ফটিক শুধু বলে, 'হুঁ।'

'তুমি ছেড়ে দিবে?'

'কি করব!'

'বুধে এমুন করলেক!'

'লুভ!'

'হারামজাদাকে ঘরে ঢুকতে দিও না। আসুক ঠাকরুন বলে—।'

'উহুঁ, কুছু বলো না।'

'দিদি ঠিকই বলেছিল, ছুটুলুককে কুনু বিশ্বেস নাই।'

বঙ্কু এসে ডাকে, 'কাকা ঘরে রইছ, অ কাকা।' তারপর উঠোন ডিঙিয়ে রান্নাঘরের দিকে যায়। পাজামার উপর পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। ফরসা রোগা ছোকরা। কলেজে পড়ে। বলে, 'দেখলে ত। শুনেছ নিশ্চয়ই বুধে কি করেছে! খুব তো বিশ্বাস ছিল। তখন বললাম, দাও হাইকোর্ট করে। সিঁদুরমুখী মৌজাতে ইনজাংসান হয়ে আছে। চড়কডাঙ্গা মৌজা—।'

ফটিক গিরগিটির মতো মাথা নাচায়, 'ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আমি পছন্দ করি না, জানিস তো।'

'উচুঁপাড়ার সব গেরস্ত হাইকোর্ট করেছে, খালি—। হুঁ, এবার কী করবে!'

ফটিক টের পায়, সংবাদটাতে বঙ্কু উৎফুল্ল। গাঁয়ে জোর রাজনীতি করছে। পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ানোর মতলব আছে। তা থাকুক। কিন্তু তার দুঃসংবাদে

উল্লাস এটা কেমন করে সহনশীলতার ঠান্ডা ঘরে পুরে সে হাসতে পারে। বঙ্কু একা নয়, সে অনায়াসে কল্পনা করতে পারে, পাঁকে গলা অবধি ডুবে যাওয়াটাও সমশ্রেণীর কাছে দারুণ উপভোগ্য ব্যাপার। মানুষের মনের মধ্যে অনেক জন্তুর ঘোরপ্যাঁচ রাস্তার ঠিকানা লেখা থাকে। ফলে বুধে নয়, এখন বঙ্কুকে সে প্রতিরোধ করার জন্যে কথার বুনুনি চালায় মনে। এবং বলে, 'করুক কেনে, আমি ত জমি বিচছি না। আর ঠিক মত ভাগ না দিলে দেখা যাবে।'

'বুঝলে কাকা, আমাদের এককাট্টা হতে হবেক।'

ফটিক শুধু শব্দ করে, 'হুঁ।' তারপর নীরব হয়ে যাওয়া তার পড়ুয়া পুত্রের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, 'পড়। তু কি শুনছিস্।'

জ্যোৎস্নাময়ী রান্নাঘর থেকে এসে বলে, 'এই কাজলী, গেলি কুথা?'

বঙ্কু উত্তর দেয়, 'ওই যে ইলেকট্রিকের—।'

জ্যোৎস্নাময়ী জোর পায়ে বাইরে দরজায় এসে ডাকে, 'কাজলী, কাজলী, চলে আয়। পাস দিয়ে ধিঙ্গিপনা দেখ, চলে আয় বলছি।'

কাজলী ভয় ভয় চোখে মায়ের দিকে তাকায়। জ্যোৎস্নাময়ী একটিও কথা বলে না। মানুষের মুখের ভাষার চেয়ে দৃষ্টির ভাষা মোটেই দুর্বল নয়।

তুমুল রোদ এবং গরম হাওয়ার দিন বিকেলে পশ্চিম আকাশ ঝাঁপিয়ে কালবৈশাখীকে পেড়ে ফেলে। বৃষ্টির চেয়ে ঝড় ধুলোবালি পাতা খড়কুটো নিয়ে এন্তার ভাঙচুরে মুহূর্তে আবহাওয়ার বদল ঘটিয়ে দেয়। এবং পুরো গাঁ জুড়েই এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। ভাঙচুর বাসার পাখাপাখালির আর্তনাদ, মানুষের হাঁকডাক, ছাগল, ভেড়া, গরু মোষের বিপর্যস্ত এবং দলছাড়া অবস্থার ডাক, ভেঙে পড়া আমের ডাল, উড়ে যাওয়া খড়ের চাল, বাতাবেকারি এবং খড়ের স্তূপ, তা সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ততা গাঁয়ের মাটিতে অস্তসূর্যের তলায় পুরোদমে হুল্লোড়িত হয়। 'অ টেঁপি, আমাদের ছাগলটা দেখেছিস্, কালো পাঁঠিট লো, কুন দিকে যে গেল', 'আহা বিবাক চাল যি তুমার উড়ে গেইছে খুড়ো,' 'দুটো লয় একটা ডাল ভেঙেছে আমের, লে শালা ইজমালির গাছ ভাইয়ে ভাইয়ে ইবার লাগুক, যেমুন কেবো তেমনি নীলে, দুই সমান', 'জল হলে ভাল হত হে, খালি ঝড়, তা একটুস্ ঠান্ডা ত হল' ইত্যাদি বচসাও এর মধ্যে সমানে চলে।

এমন সময় ফটিককে বাগাল ছোঁড়া ধনা সংবাদ দেয়, একটা বাছুর আসে নি। চন্দ্রনাথ এবং সূর্যও খুঁজতে বের হয়। অন্য গাঁয়ের পালে গেলেই বিপত্তি। ঝড়ের সময় গাঁয়ের বাইরে পাশের গাঁ রসপুর আর ছাতিনার পালও ছিল। গোয়ালে গাইটা বাছুরের জন্য আকুল। ওটাকেও ছেড়ে দেয় ফটিক। এদিকে পরতে-পরতে কালো ধোঁয়ার মতো অন্ধকার নেমে পড়তে থাকে। চারপাশের শব্দটা সেই ধোঁয়ায় আটক পড়ে যায়। ঘরে লম্ফ, হ্যারিকেন জ্বলে। কিন্তু গাই বাছুর বাইরে থাকলে সোয়াস্তি কোথায়। ফটিক বারবার ঘর বার করে। চন্দ্রনাথ এবং সূর্য দুবার ঘুরে এসে সংবাদ নেয়, এসেছে কি না। ধনার কোন পাত্তা

নেই। ক্রমে আকাশে তারা ফোটে। ঝড় এবং সামান্য বৃষ্টিপাতে অন্যদিনের তুলনায় এক শীতল সন্ধ্যা। কিন্তু বাছুরের উদ্বেগ চরম উষ্ণতাকে জড়িয়ে রাখে। জ্যোৎস্নাময়ী রাতের আহারের জন্যে উনুন পর্যন্ত ধরায় না।

বুধে, ধনা, গাইবাছুর একসঙ্গে ঘরে আসে। ততক্ষণে আকাশময় নক্ষত্র। বাছুরের সঙ্গে বুধে সোয়াস্তি এবং জ্বলুনির সংমিশ্রিত আকর। ফটিক গম্ভীর হয়ে বলে, 'তু।'

'ধনা বললেক পেছি না, তারি লেগে বেরুলম্।'

ফটিক বুঝে উঠতে পারে না, সে কীভাবে শুরু করবে। উঠোনে বুধে দীর্ঘ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খালি গা, পাটাল বুক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কোমরে খাটো একটা টেনা। হ্যারিকেনের আলোতে মুখচোখের প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। ফটিক বলে, 'তুর সঙ্গে কথা আছে।'

বুধে সাড়া করে না। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তু বর্গাদারে নাম লিখালি?'

'হুঁ।'

'কেনে?'

'পাঁচজনাতে বললেক। তাবাদে ভাবলাম, সবাই যখুন লিখাছে।'

'তোকেও লেখাতে হবেক। তারপর পরশা যেমুন মুখুজ্জেদের সঙ্গে লেগেছে তেমনি লাগবি।'

'না গেরস্ত।'

'ধানের ভাগ দিবি না।'

'কেনে দুব না গেরস্ত।'

'তাহলে লেখালি কেনে?'

'বললেক অধিকার।'

'অধিকার।'

'আজ্ঞে গেরস্ত।'

'তুই কি বলেছিলি মুনে আছেক তুর?'

জ্যোৎস্নাময়ী সংলাপে অংশ নেয়। বলে, 'উকে উসব বলছ কেনে? যা করার ত করেছেন। ইবার লিজে বুঝ, লিজে ভাব। উকে ঘরে যেতে দাও।'

বৈশাখের দিনগুলি পার হয়ে জ্যৈষ্ঠ, এবং আগামী বর্ষার শুভ সূচক দু'এক পশলা বৃষ্টি ঝরে পড়ে। ইতিমধ্যে ফটিক বুধের সাক্ষাৎকার, সংলাপ, আগামী চাষপর্ব বিষয়ক আলোচনায় বর্গাদার নামক শব্দটির ক্রীড়াশীলতা শুরু হয়ে যায়। বুধের ভূমিকা তুচ্ছ। সে নীরব। এবং স্বাভাবিকতা বজায় রাখার জন্যে আগ্রহশীল। একক ফটিকই প্রতিপক্ষ ঠাওরে যুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ে, অস্ত্রাঘাতে ব্যস্ত হয়। জ্যোৎস্নাময়ীরও মত, আর সহজ সম্পর্ক নয়। কিন্তু কিভাবে—সম্পর্ককে কোন ঘটনা-মাধ্যমে হননকারীতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। অসহযোগিতা এক

ভয়ঙ্কর আয়ুধ। যেহেতু যুগ্ম কর্মধারাতেই উৎপাদন, সুতরাং—। বঙ্কু ঘন ঘন এসে উত্তেজনা বাড়ায়। আশু মুখুজ্জে বলে, 'বুঝলে ফটিক, কুছু কর। বলি, মাঠের ধারে ঠ্যাং খুঁড়া করে ফেলে দিতে পার।' গোবিন্দ সংবাদ দেয়, বাগ্দী বাউড়ীরা বলেছে, ভদ্দরলুকদের তেল মারবে! সিদুঁরমুখী মৌজা ইনজাংশান পাওয়ার পর আশেপাশের মৌজাও হাইকোর্টগামী করার জন্যে চেষ্টা চলে। ফটিক এতে উৎসাহ না দেখানোতে হরেন বলে, 'ফটিকদা বুধের পা ধরবে নাকি গো?' প্রচন্ড রাগ হয় তার। বুধেকে খাদ অর্থাৎ অগ্রিম দাদন দেবার ব্যাপারে হাতের মুঠি খুবই ধীরে ধীরে খোলে। পঞ্চাশ টাকা কর্জ চাওয়াতে সে পরিষ্কার না বলে। কিন্তু কোনো শক্ত আঘাতই দেওয়া যায় না। ফটিকের সব ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে বর্গাদার বুধে।

তারপর উচুঁ নিচু আল ডিঙ্গিয়ে গোবর সারের গাড়ি নিয়ে যেতে ডান আলি বলদটাকে খোঁড়া করে নিয়ে আসে বুধে একদিন। ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। বজ্রাঘাতের মতো নির্মম। ফটিক পুত্রশোকের কাতরতায় হাউমাউ করে কাঁদতে বসে। ধবধবে সাদা বলদজোড়া চমৎকার জুড়ি হয়েছিল। যেমন চেকনাই তেমনই শক্তি। দেখামাত্র যে কোনো ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, 'কার বটে গো বলদজুড়া।' শুনে অহংকারে বুক ফুলত। কান্না, চরম ব্যস্ততা, গো-বেদে ডাকা এসবকেই জ্যোৎস্নাময়ী মুহূর্তে নিরসন করিয়ে দিল। উপলব্ধি করিয়ে দিল, ডান আলির পঙ্গুত্বপ্রাপ্তি আশীর্বাদ। প্রতিহিংসার অন্ধত্ব বড় ভয়ঙ্কর। বলদটাকে ভেতো মদ, পটি বাঁধা, গণেশপুর থেকে গো-বেদে তারণকে নিয়ে এসে চিকিৎসার ব্যবস্থার পরও দেখা গেল, চাষে অক্ষম। এটাই কাম্য ছিল। বুধে নতুন বলদ কেনার কথা বলতে বলে বসল, 'টাকা কুথা পাব? উতে চষ।'

'সে কি গেরস্ত, খুঁড়া বলদে চাষ হবেক কি?'

'তার আমি কি করব বল।' ফটিক দিব্যি হাত নাড়া দিল।

'আপুনার পায়ে পড়ি গেরস্ত, এমুনটি করবেন নাই।'

ফটিক বলল, 'উপায় নাইরে। চাষ না হলে আমারই খেতি।'

গাঁয়ে ব্যাপারটা নিয়ে চরম উত্তেজনা। ফটিককে বাহবা দিয়ে গেল অনেকে। সংবাদও দিল, বুধে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলদের। গোপীনাথদের দলে গিয়েছিল। তা ঢু ঢু। এ সময় বলদ দেবে কে! এদিকে দিন এগিয়ে চলে। আকাশের দেবতা এবার একফসলি ভুঁইয়ের উপর যথেষ্ট সদয়। আগেই বুঝি নেমে পড়বেন। তার আভাস দু'একদিন ছাড়া ছাড়া দেখিয়ে যান। চাষের মরসুমের ব্যস্ততা সারা অঞ্চল জুড়ে। ছড়িয়ে পড়ে কিছু কিছু জমিতে। বুধে আসে না।

জ্যোৎস্নাময়ী বলে, 'বুঝলে একবছর ধান না হলে আমরা মরব নাই। উ কি করে দেখ। জান, পাড়াতে বলছেক বেশ করেছ তুমরা।'

ফটিক হর্ষ অনুভব করে। স্ত্রীর উপর চোখ রেখে বলে, 'বুধের বৌট এসেছিল—লয়?

'হুঁ, চালের লেগে। তা চাষ না হলে চাল দিবেক কে!'

চন্দ্রনাথ বলে, 'বাবা এ তুমি ঠিক করছ না!'

ফটিক দাবড়ে দেয়, 'চুপ করে থাক।'

প্রতিহিংসার চরম উত্তাপ ঘরের হাওয়ায় ভরপুর হয়ে থাকে। বুধের বলদ সংগ্রহের দুরন্ত চেষ্টার সংবাদ আসে। এবং বুধে যে তার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে এমন কথাও শুনতে হয়। সে খোঁড়া বলদে অনায়াসে চাষ হতে পারে, বুধেরই অনাগ্রহ, এ ধরণের কথা বলে বেড়ায়।

আকাশের দেবতার জোর বর্ষণে বীজ বোনা শুরু হয়ে যায়। ফটিকের আবহাওয়া দেখে মনে হয় এবার উৎপাদন ভাল হবে। সে কল্প-চোখে গাঁয়ের চারপাশে অগণিত গ্রীষ্মজর্জর ক্ষেতকে শস্যশ্যামলা দেখতে পায়। বায়ু তরঙ্গ সবুজ সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত করে। তবে কিনা দেবতার হালচাল বোঝা দুষ্কর। শেষদিকে মুখটি বুজে দিলেই কুপোকাত। এসব চাষ সংক্রান্ত উদ্বেগাকুল ভাবনার মধ্যে বঙ্কু এসে ঠাট্টার ছলে বলে, 'কাকা দেখে এসো গো তুমার মাঠগলা। শালা, জল খেছে।' কানাই বলে, 'তুমার মাঠগলা দেখে মুনে হয়, হ্যাঁ পুরুষ মানুষ বট, লে সামলা ইবার বগ্‌গাদার। সব দিবেক গমমেন্ট।'

শোনাতক্ ফটিকের মাঠগুলো দেখার বড় বাসনা হয়। ছাতাটা মাথায় নিয়ে এক বিকেলে সে বেরিয়ে পড়ে। দুপুরে আকাশের দেবতা একটা বর্ষণের ঝাপটা দিয়ে থেমে আছেন। তবে কিনা আকাশের ঘোলাটে মুখের গর্জানি সূর্যকে হেনস্তা কবে রেখেছে। যে কোনো সময় তিনি ঝাঁপাবেন। গাছগাছালিতে এখনও জলের টোপা আটকান। মাটি ভেজা। ঢালু জায়গায় কাদা। প্রকৃতিতে বর্ষার গন্ধ ভুরভুর করছে। পোড়া মাটি ভিজে বাতাসে তার তৃপ্তির স্বাদকে মিশিয়ে দিয়েছে। ফটিকের চাষীসত্তায় সেই চমৎকার ঘ্রাণ উঠে আসে। বড় আনন্দময় এই ঘ্রাণ।

বালিচক মৌজাটা গাঁয়ের পশ্চিমে। পাশাপাশি আল বাঁধা চারটে দাগ নম্বরে তার দেড় বিঘে ভুঁই। সামনে এসে ফটিক স্তম্ভিত। ক'টা শালিখ বোধ করি পোকা সংগ্রহে ব্যস্ত। মাথার উপর একটা কাক ডাক ছুঁড়ে যায়। ওদিকে হাল মারছে ভূপতি। পাশে কানাইয়ের বীজতলা অর্থাৎ আফড়ে ভুঁই। সবুজ মুখ উঁকি বাড়ায় নি। তবে এবার বাড়াবে। কিন্তু তার বীজতলা। ফটিক সারা শরীরে বিছুটির তিড়বিড়ানি জ্বালা অনুভব করে। ঘন ছায়ায় বিষাদের মতো মেঘলা বেলা নেমে এসেছে মাটির পৃথিবীতে। ফটিকের মনে হয় একটা ভয়ঙ্কর ঠাট্টার মতো তার ভূখন্ডটুকু হা হা করছে। কিংবা না, ফটিক অনুভব করে নিপাট শুয়ে থাকা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সদ্য বর্ষাস্নাত ঘাস ছাওয়া এই ক্ষেত যেন বড় দুঃখিনীর মতো শুয়ে আছে। বুক মোচড় দিতে থাকে তার। মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রচন্ড রাগ জন্ম নেয়। যেন কোনো শত্রু দ্বারা অত্যাচারিতা মা জননী ক্ষেত। বুধে এবং নিজে ছাড়াও তৃতীয় প্রাণময় একটা অস্তিত্বের সে যেন আকুল উচ্চারণ স্পষ্ট শুনতে পায়, 'অ রে ফটিক, বাপ আমার, দশা দেখ বাপ। আমার

যি দমবন্ধ হয়ে আসছেক। বুক হু হু করছেক। দেখ্—দেখ্—কেমন পড়ে আছি দেখ।' ফটিক বিড়বিড় করে, 'শালা বুধে, তুর লেগে শালা।' এবং কেমন যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায় ফটিক মণ্ডল। সব বোধ তার এখন এই মৃত্তিকাতে লীন। জ্যোৎস্নাময়ী, সংসার, অধিকার, গেরস্ত, বর্গাদার সকলই তুচ্ছ। ক্রন্দনরতা জননীর কাছে সে নতজানু হয়ে পড়ে। অন্নপূর্ণা ক্ষেতেই তো জীবন। তাকে কি না সে প্রবঞ্চিত করছে। এই বোধ তার অতীত চাষীস্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। সে অনুভব করে, তার হাত পা এ মাটি চষার জন্যে বড় ব্যগ্র। শিকড় ছেঁড়া বৃক্ষের মতো উৎপাটিত হয়ে তার সমগ্র সত্তা এখন আছড়ে পড়তে চায়। তারপর যেন অবোধ এক বালিকাকে তার সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছা হয়, 'দাঁড়া দাঁড়া কাঁদিস্ না, আহা কাঁদার কি আছে? কি লিবি বল, দেখ—কাঁদে দেখ।'

বুধের ঘরে ফটিক মণ্ডল কাঁপতে কাঁপতে হাজির হয়। সন্ধ্যের আঁধার আঁচল উপর থেকে নিঃশব্দে নামছে। বাঁশবনে পাখপাখালির দুরন্ত বচসার শব্দ। ডোবার ওদিকে বুধের ঘরের সামনে গিয়ে দেখে বসে আছে ঝিম মেরে।

'বুধে—এই বুধে তু গেইছিস্ মাঠের ধারে? বলি, দেখেছিস।'

'যেতে লারি গেরস্ত।'

'কেনে দেখে এস গা, কি দশা করেছ—যাও দেখে এস গা।'

'দেখতে লারি গেরস্ত। খালি খালি চোখে জল আসে। তার লেগে ভাবছিলম্ ভিটেট বিচে দুব। উ টাকাতে বলদ কিনব।'

'লেহাল করবে। বলি তু ভিটে বিচার কে? তুর জমি?'

'আজ্ঞে লা গেরস্ত।'

'তাহলে। টাকা দুব আমি। কালকে সকালের মধ্যি বলদ চাই। বলি তুথে আমাতে ঝগড়া, তাতে মা জননী কি দুষ করেছে? আঁ কি দুষ করেছে?'

ফটিক মণ্ডল ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে না গেরস্ত বটে! ক্ষেত না মা জননী বটে!

মানুষের হজমশক্তি

মানুষের হজমশক্তি নিয়ে মোহন বড় চিন্তায় পড়ে। তার মনে হয়, মানুষের হজমশক্তি সাঙঘাতিক। তরতাজা একট মানুষকে একটা মানুষ দিব্যি হজম করে। ঘরবাড়ি, জমিজিরেত, পুকুর ডোবা, শাখাপ্রশাখাবহুল বৃক্ষ, জীব এবং জড় যাবতীয় পার্থিব সামগ্রী কত সহজেই না হজম হয়ে যায়। গোপীকে হজম করে ফেলল হলধর মণ্ডল। ছাব্বিশ বছরের জোয়ান। ঘাড় গর্দানে পোক্ত মদ্দ। রক্তমাংসের পিণ্ড পাকিয়ে কত সহজে লাশ হয়ে পড়েছিল কাঁদর ধারে। হলধরের মাতাল পুত্রকে গোপী হজম করে ফেলতে চেয়েছিল। গোপীর যুবতী বধুকে সন্ধ্যেবেলায় নাকি—থাক বৃত্তান্ত! তবে গোপী হজম হতে ওর যুবতী বৌও হজম। হলধরপুত্রের এখন রক্ষিতা। আটকাঠা খামার বাড়ি নিজেদের নামে পরচায় চাপিয়ে নিয়েছে কানু বসু—এক্কেবারে হজম। বিভূতি গাঁয়ে ফিরে এস এল আর ও, জি এল আর ও, সেটেলমেন্ট, বি ক্যাম্প করে হদ্দ। হজম হয়ে গিয়েছে কী না! খেলকদমের গাছটা হারধন আর নরেন্দ্রর সীমানায়। নরেন্দ্রর একটি মাত্র কন্যা। মানুষটা শিক্ষকতা করে এসেছে। হারাধন জোয়ান তিনপুত্রের তুখোড় জনক; স্রেফ কথাতেই ডালপালা গোড়া মাথা কেটে নিয়ে হজম করে ফেলল মস্ত খেলকদম গাছটা।

এ ধরণের গুচ্ছ গুচ্ছ উদাহরণ এবং ঘটনামালা মনে ক্রমাগত দুলুনিতে এবং খোঁচায় উত্থিত হতে থাকে মোহনের; সন তারিখ আগে পরে যাই হোক না কেন, মোদ্দা ব্যাপার মোহনের সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে এ সবই অভিজ্ঞতা। কিন্তু চিন্তাভারগ্রস্ত কিংবা গভীর কাতরতা কিংবা মানুষের ভয়ঙ্কর ক্ষুধায় আতঙ্ক কখনও শিহরিত করে নি, আকছার এসব ঘটে ঘটে ক্ষয়িত বিবেক অগ্নিমন্দায় ভুগছে। জলের কুমির বনের বাঘের চেয়ে মানুষ ঢের আদিম এবং বন্য এবং অসামাজিক,—এ সবই সর্বজ্ঞাত, গ্রাহ্য, নিন্দিত হলেও অপরিহার্য। এ সবের ভিতরই জীবনের প্রবাহমানতা। নতুন ইতিহাস, সমৃদ্ধি। সংসার, জমি, গরুবাছুর, প্রেম পরিণয়, জন্ম মৃত্যু—সাপলুডোর মতো কখনও সাপের মুখে কখনও সিঁড়ি ধরে অবধারিত পরিণতির দিকে।

কিন্তু মানুষের এমন তীব্র শক্তিশালী হজম ক্ষমতা অথচ সে সামান্য এক মুরগীকে হজম করতে পারছে না কেন। পালক, মাথা, ঠ্যাং, পেটের নাড়িভুঁড়ি বাদ দিলে পাঁচশ গ্রামের কিছু বেশি হবে। মুরগীটা জিতেনের। কিছু আগে তার গোয়ালঘরে ঢুকে পড়েছিল। পারুল ধরে ফেলেছে। দিনমানে মুরগী ধরা সহজ কর্ম নয়। তবে পারুলবালার কাছে অনেক কিছুই সহজ। সে ঝুড়িচাপা দিয়ে

বলেছে, 'এই কেউ খুঁজতে এল বলবে নাই।' তা খুঁজতে এদিকে এল জিতেনের বাগাল পদা। কালো ঢ্যাঙা ছোঁড়া। তীরের মতো ছুটতে পারে। বাপ বাজ খেয়ে মরেছে। মা, একগন্ডা ভাইবোন। মুরগীর খোঁজ তার কাছে করেনি। ওদিকে ছোট পিসি এঁটো বাসন নিয়ে ঘাটে যাচ্ছে, তাকেই জিজ্ঞাসা করল। শোনামাত্র রক্ত চিনচিন করে উঠলে রক্তকে অপরাধী করা যায় না। জিতেন সম্পর্কিত ভাই। চার পুরুষ চলছে। মরলে হাঁড়িফেলা অশৌচান্ত ঘাটে ওঠাও সারতে হয়। বর্তমানে শত্রু। জ্ঞাতিশত্রু। বিষাক্ত সাপের মতো ক্রূর ভয়ঙ্কর। সাত কাঠা ভুঁইয়ের বিবাদ পরস্পরকে বিপরীত মেরুতে দাঁড় করিয়েছে। দলিল পরচায় তার নামে দাগটা, দখল করেছে ও। ওর মুরগী। ধরে ফেলার জন্য পারুলকে সাবাস দিতে হয়। উহুঁ আদর। মনে হতেই পারুলের দীঘল উঁচু বুকের দেহখানা চোখের উপর ভেসে ওঠে। শ্যামোজ্জ্বল মুখে আয়ত চোখ, খাড়া নাক, রুপোর হার জড়ানো গলা, আঁচল এবং ব্লাউজ ছাপানো বুকের তরঙ্গ, কোমর, নিতম্ব। দুটি সন্তান উপহার দিয়েও যুবতী ক্ষয় করেনি তার দেহরেখার সূক্ষ্মতা, মুখের লাবণ্য, বাহু, গলা চিবুকের চিকনতা। এখনও সুর বাজে। দৃষ্টিতে মায়াবী জ্যোৎস্না হৃদয়ের স্পর্শকাতর ঘরগুলিকে ভরিয়ে দেয়। তার সঙ্গে ভালোবাসা এবং গ্রাম্য বধূটির স্বামীভক্তির প্রাবল্য যেন অন্যতম এক সৌন্দর্য। কেমন যেন নেশাচ্ছন্ন করে তাকে! শত্রুর মুরগী ধরায় মুহূর্তকাল সে রমণীর বুদ্ধি চাতুর্যের কথা ভাবে এবং মনে পড়ে কৃত্রিম অনুযোগের মেঘাছন্নতায় অভিমানের গরিমায় পারুল প্রায়ই বলে, 'আমার বুদ্ধিতে চল, আখেরে লাভ হবেক।'

কিন্তু রক্তের চিনচিনে ভাব, পারুলের যৌবন, শত্রুর একটি বস্তু করগত হওয়ার উল্লাস, প্রতিহিংসার নাতিশীতোষ্ণ উত্তাপ বায়ুশূন্য বেলুনের মত চুপসে আসে। মধ্য ফাল্গুনের উড়ু উড়ু বিকেলের বিশুদ্ধ বাতাস যেন সব জলীয় উপাদান শোষণ করতে থাকে। হৃৎপিন্ডে ভয়তরাস অনুভূতি নাচে। সামনে ধূসরতা নামছে। ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ছে সন্ধ্যার আঁচল। দিনভর তপ্ত এবং ধুলো ওড়ানো বাতাসে শীত শেষের হাহাকারের পর এখন কিঞ্চিৎ শীতলতা প্রকৃতিতে! তবু বড় উত্তপ্ত ঠেকে নিজেকে! ফাল্গুনের এই দিনগুলোয় কেমন যেন বাউলের বৈরাগ্য জড়িয়ে থাকে। গাছে বাতাসের অদ্ভুত করুণ এক শব্দ। সামনের নিমগাছ, ওদিকে জোড়া মহুয়া, আমড়া, বাঁশঝাড় পাতা ঝরিয়ে নিঃস্ব। উদাসী ভাব ধুলোবালি খড়পাতা নিয়ে ইতস্তত ওঠা এ সময়ের ঘূর্ণির মতো মনকে বড় বিপন্ন করে তোলে। ঘরের মধ্যে ঝুড়িচাপা মুরগীর অবস্থান এসবের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মোহনকে ঘরের বাইরে ধূলিময় পথের উপর দাঁড় করিয়ে রাখে। এবং মানুষের হজমশক্তি বিষয়ক চিন্তার দিকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। একটা মুরগীকে সহজপাচ্য করতে যা কী না জরুরি।

মোহনের কোমরে নীল চৌঘরে লুঙ্গি, ঘি রঙা টেরিকটনের শার্ট। লুঙ্গিটা সামান্য তুলে পড়া। পায়ের কনুইয়ের পর কিছুটা লোমশতা দেখা যাচ্ছে।

পাঞ্জাবির বোতাম খোলা। চওড়া প্রান্তরের মতো বুক। কালো রোমরাশির বুনুনি তাতে। লম্বাপনা গড়ন। সাধারণ মানুষের তুলনায় সব কিছুই মানুষটার দীর্ঘ। এক হাতে উনিশ ইঞ্চি হয়। স্বাস্থ্যশ্রীতে সুপুরুষ। সামান্য টাক। চোখ দুটি বড় বড়। মোহনের মধ্যে একা শিল্পীসত্তা আছে। সে চমৎকার প্রতিমা নির্মাণ করতে পারে। পুজোয় এ গাঁ সে গাঁয়ে বায়না পায়। যাত্রায় অভিনয়ও করে।

মোহনের বাবা দর্জির কাজ করত। একটিমাত্র সেলাইকল। তবে গাঁয়ে ওই একটিই। ফলে উপার্জন মন্দ ছিল না। জমি রেখে গিয়েছে বার বিঘে। একটা পুকুর। টিনের হাতবাক্সে মরার সময় দু'হাজার টাকা ছিল। মোহন লেখাপড়ায় অষ্টম শ্রেণীতে ইস্তফা দেয়। ছোটভাই রূপেন বি কম পাস করেছে। ইষ্টার্ন কোলফিল্ডসের শাখতোড়ে অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। শনিবার বাড়ি আসে। বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। রূপেনের দাদার উপর ভক্তিশ্রদ্ধা উভয়ই বর্তমান। একমাত্র বোনটির বিয়ে হয়েছে অন্ডালে। ছেলে রেলের চাকুরে। বাল্যে মোহনরা মাকে হারায়। বাবা ছোটমাসিকে বিয়ে করে। তার কোন সন্তান হয় নি। বছর দশেক আগে মাসির উন্মাদ লক্ষণ দেখা দেয়। সাধ্যমতো চিকিৎসা, কবিরাজি, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি ঘটান সত্ত্বেও পরিবর্তন হয় না। এক রাতে তারপর কোথায় যে চলে গেল। কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। অনুমান, মারা গিয়েছে। গোড়ার দিকে, 'তুমার মাকে দেখলাম হে, মুনে হল উই বটে, ছিঁড়া কাপড় পরে হি হি করে হাসছিল' গোছের সংবাদ কানে আসত।

মোহনের জীবন যাপনের ধারাটির মধ্যে এক নিপাট সারল্য আছে। ভাইয়ের মাসিক টাকা, জমির উৎপাদন সংসারে সচ্ছলতা এবং সঞ্চয়ে কোন কুটিলতা অথবা হরণবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করে না। সে গাঁয়ের মানুষদের কাছে ভালোমানুষ হিশেবে স্বীকৃত। যাত্রার দিকে ঝোঁকের জন্য কিছু আমুদে ছোকরা তাকে পরিবৃত করে রাখে। কলকাতার যাত্রা আশেপাশে কোথাও হলে সে অবধারিত দর্শক। কলকাতার যাত্রা দলে যোগদানের একটা স্বপ্নসম আকাঙ্ক্ষাও তার মধ্যে লতার মতো জড়িয়ে আছে। দশ আর আট বছরের দুটি ছেলেমেয়ে। আজই মামার বাড়ি গেল। নিয়ে গেল ওর মেজ শ্যালক। ব্যবধান মাত্র তিনটি গ্রামের। মা বাবা না যাওয়াতে ছেলেমেয়েদের কোন আপত্তি নেই। দুদিন থাকবে। নুনপালার জন্য কালই উৎসব এবং মেলা। মামার বাড়িও ওদের কাছে প্রিয়।

জিতেনের সঙ্গে যে জমি নিয়ে বিবাদ তা দখল করেছে জিতেন। কাগজপত্রে যাই থাক, দখলিস্বত্ব সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। জমিটা কালীতলা মৌজার বাহান্ন খতিয়ান ভুক্ত তিনশ সতের দাগ নম্বরে। চৌদ্দ শতক ভূঁই। কালীতলা মৌজার উপর দিয়ে একটা শীর্ণ খাল বহমান। ভাঙচুর খালের জলধারণ শক্তি মোটেই নেই। সংস্কারের অভাবে কার্তিক থেকেই সে শূন্য উদরের ফাটিফুটি মাটি দেখায়। তবু সংলগ্ন জমি যথেষ্ট সরেস। দীর্ঘকাল জিতেনরা ভোগ করছে। দোষটা বাবার। তহশিলদার অনাথ না জানালে জানা যেন না। জিতেনের কাছে

বলতে সে জানিয়ে দিয়েছে, পরচা ভুল, পরে সে কারেকশান করিয়ে দেবে। জমিটা ওরই। পারুল বলেছে, 'তুমি সেটেলমেন্ট অফিসে যাও।' ছোটকাকা বলেছে 'পরচা কী ভুল হয় নাকি! জিতেনটা আমাকে জমি শিখুবেক। দক্ষিণে তারকের পাঁচকাঠা, উত্তরে রহিম শেখের এক বিঘে, পশ্চিমে বিনোদ সাহার আর পুবে তো তোমাদেরই। মাঝখান ওই টুকরোটা পেলেক কুখা থেকে। তা এতদিন যদি কানা হয়ে থাক বাবারা।'

গ্রাম পঞ্চায়েত এখন মা বাপ। পঞ্চায়েত সদস্য অনিমেষ হালদার সিড়িঙ্গে চেহারাটা গ্রামীণ উন্নয়ণমূলক ক্রিয়াকান্ডের বিপুল ব্যস্ততার ফলে এখন শাঁসে জলে, তসর মটকার পাঞ্জাবি গায়ে উঠেছে। মেদ জমছে। সে ব্যাঙ্কে ঋণ পাইয়ে দেওয়া, মিনিকিট ইত্যাদি ইত্যাদি কর্মে এমনই ব্যস্ত যে মোহনের বক্তব্য সম্পূর্ণ শোনার সময় দিতে পারে না। কিংবা জননেতার এই বুঝি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য,সে বড় সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। জিতেনের সঙ্গে ঝামেলা। জিতেনের ঘরে বারোটি ভোটার। তার ঘরে দুটি। সুতরাং বলছে, 'এতদিন ঘুমুচ্ছিলি কেন! ঠিক আছে পরে দেখব।' মোহন জানে পরেটা আসবে না। ভোট আসারও ঢের দেরি।

পারুলের ডাকে চমক খেয়ে উঠোনে দাঁড়ায় মোহন। অত বড় মানুষটা কুঁকড়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে ভয়ের দামামা সমানে বোল তুলে চলেছে। সামনের ডোবার বাঁশঝাড় এবং গাছগাছালিতে পাখপাখালির দুরন্ত কোলাহল। সন্ধ্যার মঙ্গলশঙ্খের কাছাকাছি নিনাদ উঠল। মোহনের সারা উঠোন ঝকমক করছে একশ পাওয়ারের ল্যাম্পে। তিলপুরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। আলোকিত গ্রাম অভিধায় সে সম্মানিত। পঞ্চায়েত অফিস পোস্টাপিস আছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা হচ্ছে শীঘ্র। গাঁয়ে সাবসিডারি প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের অস্তিত্ব ফিকে হলুদ বাড়িটুকুতে না ওষুধ না ডাক্তার, কর্মহীনতার শিকার কৃষিমজুর দিনমজুর কয়েকশ এবং দারিদ্র নামক দানব বর্তমান; বিদ্যুতের ঝিকিরমিকির অহঙ্কার তার মধ্যেই দীপ্যমান।

'আক্কেল বলিহারি, ক্যাবলার মত কুলিতে দাঁড়িন কী করছিলে! ব্যবস্থা কর।' পারুল বলে।

কুলি অর্থ গাঁয়ে মধ্যেকার রাস্তা। ব্যবস্থা অর্থ মুরগীটাকে কাটাছাঁটা করা।

'উরা খুঁজাখুজি করছেক।'

পারুল হতাশ গলায় বলে, 'খুঁজবে নাই। পাঁচ পয়সার মাথার কাঁটা হারালে খুঁজতে হয়। বেটা ছেলে যে কেনে হন্‌ছিলে! আমি মশলা বাঁটছি গা।'

মোহনের টিনের চাল মাটির বাড়ি দোতলা। উপর নিচে খুদে তিনটে কক্ষ। সংলগ্ন বারান্দা। পাঁচকাঠা জমিতে ভিটে। বাঁ দিকে দু'কক্ষের একতলা করেছে গত বছর। ইন্দারা, বাথরুম, পায়খানা। বাথরুমের দিকে সজনে গাছ, ঘেরার মধ্যে কাঁচলঙ্কা, বারমেসে বেগুন, এবং মরসুমি ফুল হয়।

পারুল বাঁ দিকের নতুন ঘরে। টিউব লাইটের দেওয়ালে প্রতিফলন অতি উজ্জ্বল দুধেল আলোকের সৃষ্টি করেছে। আলোস্নাতা রমণীর উপর বিচ্ছুরণে সে এখন ভিন্ন সৌন্দর্যশালিনী। যুবতী মনোরমা। পরিপাটি পারুলের কপালে বড় টিপ, মাথার দীঘল চুলে একটা গিঁট, এক হাত চুড়ি, লাল ব্লাউসের উপর একধোপ লালডোরা তাঁতের আটপৌরে শাড়ি।

'কী হল? দাঁড়িন্ রইলে!'

'মুরগীট জিতেনের।'

'শুনলম্।'

'বাগলা ছুঁড়া, উর বিটা ঘুরঘুর করছেক। গন্ধ পাবেক।'

পারুল থমকে যায়। তীক্ষ্ণ চোখে স্বামীকে দেখে। ঠোঁট কামড়ায়। মনে পড়ে যায় হাঁসমুরগী চুরি গেলে পালক এবং গন্ধের খোঁজে ঘুরে বেড়ানই রীতি, এই তো শম্ভুকে ওই বুদ্ধির প্রয়োগ করে মহিম পাত্র হাতে নাতে ধরে ফেলল। অপমানিত এবং লাঞ্ছিত শম্ভুর উপর গাঁয়ের সব হাঁসমুরগী চুরি যাওয়ার দোষ বর্তায়। পরদিন বিচারসভা বসে এবং জরিমানা হয় শম্ভুর। ঘটনাটা পারুলকে সজাগ এবং সন্ত্রস্ত করে দেয়। সে ক্ষণকাল বিমূঢ় হয়ে থাকে।

'তা কী করবে এখুন।' পারুলের কণ্ঠস্বর নিচুখাদে নেমে আসে। ভয় বড় সংক্রামক। মোহনের সঙ্গে তাকেও এক চাদরে জড়িয়ে ফেলে। উদ্বেগ-আকুল গলায় বলে, 'উঠোনে দাঁড়িন্ কথা হয় না, উঠে এস।'

স্বরে মোহন টের পায় পারুলের তার মতই হজমশক্তি বড় কম। সে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

'শুন মুরগীট ছেড়ে দিয়ে এস।'

'মাথা খারাপ। নিয়ে বেরুলেই ত ধরা পড়ব।'

'কাট ত এখুন। মশলা না দিয়ে সিজিন খাব।'

'একট বুদ্ধি বার কর কেন!'

দুজনেই নীরব হয়ে থাকে। সামনের রাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে কারা যেন পেরিয়ে যায়। উল্টোদিকের ঘোষেদের বাড়িতে টেপ রেকর্ডে ঐতিহাসিক নাটক চলছে জোর গলায়। মোহন এবং পারুলের বুদ্ধিকোষ অত্যন্ত উত্তপ্ত। ব্যস্ত, উদ্দীপ্ত হয়ে উৎপাদনমুখী হয়ে ওঠার মুহূর্তে বামুনঠাকুরুণ হাঁপ এবং ফোকলা দাঁতের জড়িত কথা নিয়ে ঘরে ঢোকে। উভয়েই বিরক্ত হয়। বামুন ঠাকরুণ বিরক্তিরই। বৃদ্ধার শীর্ণ চেহারা, শাদা শ্লথ মাংস শরীরে জড়ানো। ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটে। বসা গাল। মাথায় পাকা চুল। বামুন ঠাকরুণের পরঘরে কিছু না কিছু খাদ্যের অন্বেষণে চরকির মতো ঘোরা একমাত্র কাজ। পুত্র নিবারণ এবং তার স্ত্রীর কাছে বৃদ্ধা গলগ্রহ। পেটপুরে ভাত পর্যন্ত দেয় না।

মোহনের এ সময় মনে পড়ে যায়, বামুন ঠাকরুণের হজমশক্তি খুবই তীব্র। বাসী এক থালা খিচুড়ি ক'দিন আগে হজম করে ফেলল। পারুল দিয়েছিল

নেহাত কাতে পড়ে। হাঁড়ির ঢাকা আলগা ছিল সারারাত। খামচে খামচে খাওয়ার চিহ্নও ছিল। বিড়াল কিংবা ধেড়ে ইঁদুরের কীর্তি আর কী।

বামুন ঠাকরুণ উঠোন থেকেই শুরু করল, 'কুথা গেলে, অ বোমা, আজ ইকাদশি বটে। তুমি আমার মা বট। দাও মা একডুং চা করে। আর কুছু দিতে হবে নাই। অ মোহন, সাঁঝবেলাতে ঘর বসে। উদিকে দেখ গা কাণ্ড—।'

'কী হন্‌ছে?'

'জিতেনদের একটা মুরগী কে খেলেক। তা গাঁয়ে ত মাতাল কম নাই। না বাবা বলব নাই। অ বৌমা উনুন ধরাও নাই? তা ছেলেগলা কুথা গেল তুমার? কাউকে দেখছি নাই। বাড়া ভাল ছেলে হন্‌ছে তুমার। সুনার চাঁদরা বেঁচে থাকুক। তুমি আমার ঠিক মায়ের পারা বৌমা। তারি লেগেই ত তুমার কাছে আসি। মুখটা একদম যেন ছেঁকে বসান। তা দিবে ত একডুং চা।'

পারুল বলে, 'উনুন ধরাই নাই।'

'জনতা আছে ত। কেরাচিনেরও অভাব। বলি অভাব কিসের নাই।'

'গুড়রুটি খাবেন?'

'ও মাগো, মা দিবে খাব না। আর গুড় কিসের লেগে। মায়ের মুন বিটির গুড় পছন্দ তা জানে!' বুড়ির ঘোলাটে দুচোখে উল্লাস ঠিকরায়।

মোহন ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'তাড়াতাড়ি দিন্ দাও দেখি।'

বুড়ি গুড়রুটি খেয়ে উঠোনও পার হয় নি, হন্তদন্ত হয়ে এল শঙ্কর। দাওয়ায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে মোহন। কপালে হাত। পারুল দাঁড়িয়ে আছে। প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি হয়ে যাবে। রোগা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। সবসময় ফিটফাট। শিল্পীসুলভ ভঙ্গিকে সে বহন করে।

'খবর পেয়েছ তাহলে মোহনদা! তোমার মুখ দেখেই বুঝছি। কুছ পরোয়া নাই। অসীমরা রাজপুরের যাত্রা আনবেক, আমরা নিজেরা করব। 'ভাঙা হোক, তবু ভাই নিজেরই বাসা।' বুঝলে শত্রুতা। তুমি বল গাঁয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি রাখা ঠিক নয়। তা ঝগড়া কারা করছেক। শিবরাত্রিতে যাত্রা করব, এতো আমাদের তিনমাস আগে ঠিক করা বটে। হ্যাঁ, বই নিয়ে গোলমাল হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত তো 'নীচুতলার মানুষ' বাছা হল। লড়বি তো নিজেরা বই কর। তা নয় রাজপুরের দল। তবু কলকাতার দল হলে খানিকটা কথা ছিল। আরে চুপ করে আছে কেনে?' শঙ্কর ভ্রুকুঁচকে থাকল, 'যা বাবা, অ বৌদি কী হল?'

পারুল একগাল হেসে বলল, 'কী আবার হবে। চা খাবে নাকি ঠাকুরপো!'

'কর। হাফ কাপ। বুঝলে এ সব পঞ্চায়েত।'

মোহন বলল, 'পঞ্চায়েতের আগে কী গাঁয়ে ঝগড়াঝাঁটি ছিল নাই?'

'ছিল। তবে এমুন দলবাজি তো ছিল নাই। অসীমদিকে নাচাচ্ছে কে জানতো। বাউড়ী পাড়ার ভোট অসীম সব পাইয়ে দিবেক—অত্ত সুজা!' শব্দ করে হাসল, 'আরে বাবা জমানা বদল গিয়া। গুপলা হাবাগোবা মানুষ। বল্‌লাম, হ্যাঁরে

কাকে ভোট দিবি! বলল ভোট কাকে দুব তা গুপনের বটে। বলব কেনে। যাকগে, আজ রিহার্সেল হচ্ছেক ত।'

'না। আজ আমি যাব নাই। তুরা কর গা।'

'সি কী কথা। তুমি না থাকলে—।'

চা খেয়ে শঙ্কর উঠে যাবার পর মোহনের মস্তিষ্ককোষ মুরগীটা আবৃত করে রাখে। পারুল ঘরের কী যেন কাজ করছে। বিকেলেই রুটি তরকারি হচ্ছে। আজ বুধবার। রেডিওতে যাত্রার আসর। শোনার আগ্রহ থাকে না। ঝুড়িচাপা মুরগীটা নিঃশব্দ। মোহনের ভাবনা হয়, মুরগীটা যে ধরা পড়েছে, একটা ভিন্ন ঘরে বন্দী, এই বোধ ওই জীবের আছে কী না! চেঁচামেচি করে নি। সে সিদ্ধান্ত নেয়, ভোর ভোর উঠে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে। সকাল হলেই বিপত্তি। পাটকুড়ানি হলার মা আসবে। বাসন মাজার সঙ্গে মেঝে নিকোনো ঝাঁটা দেওয়াটা কাজ। গোয়াল সাফ গরু খুলতে আসবে বাগাল ছোঁড়া। ছোট ভাই আসবে না। ছেলেমেয়ে দুটোও না। তাছাড়া আরও কেউ এসে পড়তে পারে। ভাবনার সঙ্গে দ্রুত ভোর নামার প্রার্থনা মোহনের মনকে আকুল করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় মোহন কিংবা পারুল কারও ঘুম আসে না। বাইরের শব্দরা মুছে যায়। রাত্রি ঘন হয়।

'কাজটা ঠিক হয় নাই।'

'তুমার লেগে—বুঝলে তুমি বিটাছেলে লাও।'

'ঘুমোও দিখি। না হলে ভুরে ঘুম ভাঙবেক নাই।'

'মেজাজ করো না। অতটুকুন এক মুরগী—।'

'ছুটুতে তখুন ক্লাস ফোরে পড়ি। আমি একজুনার ভূগোল বই চুরি করেছিলাম।'

'ই ট চুরি লয়। মুরগী ট লিজে এসেছে।'

সহসা মোহনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'আগেকার সম্বন্ধ থাকলে—।'

অমনি রক্ত ছলকে ওঠে পারুলের।

জিতেনের বৌদি সুবাদে পারুলের সঙ্গে জমাট ঘনিষ্ঠতা ছিল। চা খাওয়া কী মেলা থেকে এটা ওটা এনে দেওয়া, হাসি, ইয়ার্কির ব্যাপার স্যাপার। তবে মাত্রা বেশিই ছিল। ঠিক শোভনীয় মনে হত না মোহনের। জিতেন সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। মেয়েমানুষ দোষও ছিল। বাড়ির ঝি আলতার সঙ্গে আশনাই ছিল জিতেনের। চরিত্রের এ ধরনের আঁশটে গন্ধ বিয়ের আগে থেকেই। যাই হোক পাড়ার অন্য চোখ এবং অন্যমনে এর প্রতিক্রিয়াজনিত ঘাতও এসে পড়ত তার কাছে। জিতেনের সংসারে এ নিয়ে কোনো অসন্তোষ ছিল না, এমন কথা নয়। তবে তা মোহনের অজ্ঞেয়। এ ব্যাপারে সে ফোঁসও করেছে। কিন্তু পারুলের পেলব বাহুলতা এবং সঘন অভিমানী শ্বাস কী কান্নার আভাসে মুছে যেতে সময় নেয় নি। কয়েকমাস ধরে বিবাদের দূরত্ব তাকে কিন্তু পারুলের উপর বিশ্বাসী করেছে!

দেওর ভাজের সম্পর্ক একটু রসাল হতেই পারে।

'পারুল।'

'কী হল আবার। ঘুমোও দেখিনি।'

মোহন পারুলের পিঠের উপর হাত রাখে। আপত্তি করে না পারুল।

পাটকরনি অর্থাৎ ঝি হলার মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। দিব্যি ফরশা। রোদ ওঠে নি বটে, কিন্তু সকালের পরিচ্ছন্ন আলো জানলা গলে ঘরকে ভাসিয়ে দিয়েছে। ত্রস্তে উঠে পড়ে উভয়েই। পরস্পরের উপর আতঙ্কভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। সর্বনাশ! মুরগীটার দ্রুত ব্যবস্থা কর দরকার। পারুলাবালা বুদ্ধিমতী। গায়ের কাপড় কোনোক্রমে জড়িয়ে সে মেঝেয় দাঁড়ায়। তারপর দ্রুতপদে মুরগীর মুখ একহাতে চেপে নিয়ে আসে, 'তাড়াতাড়ি ঝুড়িট আন।'

মোহন লাফিয়ে নামে। ডানা ঝাপটাচ্ছে মুরগীটা। কিন্তু পারুলের মুঠি শক্ত। দাঁতে দাঁত চেপে সে ঝাপটা খেয়ে যাচ্ছে। বাতাসে শব্দ করছে জোর। ওদিকে হলার মা বাইরের দরজার কড়া নেড়ে যাচ্ছে।

'ঠাকুরঘরে নিন্ চল। উ ঘরে হলার মা ঢুকে না।'

ঠাকুরঘরে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে হাঁপাতে থাকে পারুল। বুক ওঠানামা করে। বলে, 'দাঁড়িন্ দেখছ কী! দুয়োরট খুলে দাও গা। ভেঙে দিবেক যি।'

মোহন বেরিয়ে যায়।

ফটোতে সব দেব-দেবীর অবস্থান। সিঁদুরচর্চিত একটা ঢিবি, ওদিকে মাটির লক্ষ্মীর মূর্তি, একদিকে পুঁটলি জড়ানো নানান দেব-দেবীর পুষ্প, লক্ষ্মীর হাঁড়ি, আতপের হাঁড়ি। বড় পবিত্র এই ঘর। পারুল যাকে তাকে ঢুকতে দেয় না। মুরগীর মতো নিকৃষ্ট অস্পৃশ্য এবং অপবিত্র জীবকে এ ঘরে স্থান দেওয়ায় কিন্তু পারুলের স্বস্তিই আসে। সে একবার ঝুড়িটা দেখেই বেরিয়ে আসে।

বেলা বাড়ে। হলার মা ঘর যায়। বাগাল ছোঁড়া গরু নিয়ে চরাতে বের হয়। রান্নাঘরে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া ওঠে। দাওয়ায় বসে এঁচোড় কোটে পারুল। ফাল্গুনের বাতাসে রুক্ষ এবং শুষ্কতার তরঙ্গ। রোদ যথেষ্ট চড়া। পাশে শিরিষ গাছের বাদামি শুঁটিগুলো ঝুনঝুনি বাজায়। মোহন এঘর ওঘর এবং উঠোনে পাক খায়। মধ্যে মধ্যে পারুলকে দেখে। চোখাচোখি হতেই পরস্পরে টের পায়, মুরগীর বদলে দুজনেই পরস্পরকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে স্বস্তি পেত।

'কুনু মুরোদ নাই।' পারুল ঝাপটা দেয়।

'তুমার লেগেই ত।'

'থাম দেখিনি। এখুন কী করবে বল!'

'কী করব?'

'বলি, থলেতে ভরে ফেলিন্ দিয়ে আসতে ত পার।'

'রেতে তাই করব। দিনের বিলা উসব হয় না।'

মোহনের স্ত্রীকে বড়ই হিংস্র মনে হয়। চাউনিতে বাঘিনী। ফলে সে ঘর

থেকে বেরুনোর কথা ভাবে। এক বিঘেতে গম বুনেছে। একবার দেখে এলে হত। কালকের রিহার্সালের কী হল, তাও জানা দরকার। সন্তোষদের ওদিকে গেলে হত। বস্তুত মোহন নিজেকে কী ভাবে ব্যস্ত রাখবে তাতেই কাতর হয়ে পড়ে। কাল রাতে ঘুম আসতে আসতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। চোখে সে জ্বালাবোধ করছে। কেন যে মুরগিটা ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠছে তার কাছে। এবং এখনও কেন যে সঙ্গ ছাড়া হচ্ছে না।

লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে মোহন বেরিয়ে পড়ে। পকেটে গোটা কয়েক বিড়ি, দেশলাই নিয়ে বেরিয়েছে। সেই দুপুরে ফিরবে। বাইরে যদি স্বস্তি জোটে। হাতে খঞ্জনি নিয়ে ব্যানার্জিদের দরজায় গান ধরেছে হরি বৈরাগী। সাইকেল নিয়ে পেরিয়ে গেল জিতেনের ভাই। কলসি কাঁখে রায়বাড়ির অণিমা হেঁটে যাচ্ছে টিউওয়েলের দিকে। প্রখর রোদ। কটা গোলপায়রা চক্রবর্তীদের বারান্দায় বকম বকম করে ফিরছে। মুখোমুখি শঙ্করের সঙ্গে দেখা।

'কুন দিকে?'

'মাঠ যাব। রিহার্সাল হন্‌ছিল?'

'হ্যাঁ, বেশিক্ষণ লয়।'

জিতেনদের ঘরের দিকে তাকাতে পরে না মোহন। হৃৎপিন্ড বেজায় দাপাচ্ছে। গমক্ষেত, বলাইয়ের সঙ্গে মিনিকটি বিষয়ক কথা, পঞ্চায়েত, ঘোষদের বলদজোড়ার তারিফ, পাগু বাগদির খবর নেওয়া, দশ দশখানা বিড়ি শেষ করে মোহন ঘরে ফিরতে সূর্যের প্রখরতা ঢের বেড়ে যায়।

ঘরে পা দিয়েই মোহন স্তম্ভিত। জিতেন রান্নাঘরের দোরগোড়ায় পিঁড়ি নিয়ে বসে। বৌদির সঙ্গে গল্পে এমনই মশগুল যে তার আসাও টের পায় না। মোহন উঠোনে দাঁড়িয়ে পারুলের হাসি শোনে। এবং যেন কোনো চরমশক্তির টানে এগিয়ে যায়।

'অয় এসেছ তুমি! ওমা, অবাক হন্ গেইছ! আমিই ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালাম। বলছি-বলছি।' পারুল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। আঁচলে হাত মোছে। ছাপা লালফুল শাড়ি, লাল ব্লাউজ। মাথার চুল খোলা।

মোহন শব্দহীন, পাষাণ।

'তুমি রাগ করবে বলে সকালে বলি নাই। ঠাকুরপোকে তাই বলছিলাম, তুমার দাদাকে ভাই ডরে বলতে পারি নাই। ভুর বিলাতে দেখি দুয়োরের উপাশে একট মুরগী ঝিমুছেক। শুনেছিলাম জিতেন-ঠাকুরপোদের মুরগী পেছে নাই। অমনি ধরে রাখলাম। তাবাদে ডরও হল। আমরা শত্তুর। না জানি তুমি কী বলবে। জিতেন ঠাকুরপো কী ভাববেক!' পারুল চোখমুখে হাতের কাঁচের চুড়ি বাজিয়ে বলে যায়, 'ওমা, হাঁ করে দেখে। ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালাম। ভাগ্যি যি শত্তুরের ঘরে এল।'

জিতেন বলল, 'বারবার শত্রু বলো না বৌদি। যতই হোক জ্ঞাতি বটি।'

'না ভাই তুমাদের ত—। তা বিটাছেলেরা বুঝ।'

'বুঝাবুঝির কী আছে; জমি পরচায় থাকলে দাদারই হবেক।'

পারুল ছলকে হাসল, 'উ কথা থাকুক। শুন ঠাকুরপো কী বলছেক, তুমিই বল ঠাকুরপো।'

'না তুমি।' জিতেন হাসল। স্যান্ডো গেঞ্জিতে শ্যামলা স্বাস্থ্য ঝিলিক দিচ্ছে। চওড়া পিঠ বুক। লিলেনের ডোরাকাটা লুঙ্গি।

পারুল আহ্লাদী মেয়ে এ মুহূর্তে। বালিকার মতো চপলা। বলে, 'বলছে, মুরগীট আমাকে রাঁধতে। ঠাকুরপোও সন্ধেবেলায় খেতে আসবেক।'

জিতেন বলে, 'তা যদি বল।'

পারুল চোখ কপালে তোলে, 'ওমা, কুথা যাব। গল্প কবতে করতে যে ঢেক বিলা হল। ওগো, চান করতে যাও। রেতে মুরগী খাবে এখুন।'

মোহন তেল মেখে গামছা নেয়। জিতেনের বুঝি বেলা হয় না। সে রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এধার থেকে মোহন ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। জিতেনের হাসি হাসি মুখ, পারুলের হাসি ছিটকে বেরিয়ে আসছে। শুধু কী হাসি? মোহন তো পারুল বলে চিনতেই ভুল করছে। শাড়ি পরার ধরণ কী পালটেছে! মাথায় এলানো চুল কিংবা হাসি কোনটা ভিন্ন পারুলের। মেয়েমানুষের শরীর বড় রহস্যময়। শরীরের অদ্ভুত রমণীয় মুদ্রায় সে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে পারে। জ্যোৎস্নার মতো মায়াবি, সমুদ্রের মতো রহস্যময় নীল হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে। মোহন এসব ভাবতে চায় না। উঠোনে খদখদে রোদে ক'টা গোলাপায়রা। উড়ু উড়ু শুষ্ক বাতাসের তরঙ্গ আসছে। সে অনুভব করছে একটা গভীর স্বস্তি। বিশালকায় হয়ে উঠেছিল যে মুরগীটা সে ছোট্ট হয়ে গিয়েছে। হাতের পাতায় স্বচ্ছন্দে তোলা যায়। ঠোঁটের কোণায় পরম সুখের একটা হাসি তার উঠে আসে। নিঃশব্দ। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় জিতেনের সশব্দ হাসির সঙ্গে জলতরঙ্গের মতো পারুলের হাসি ঠিকরে পড়ছে। পড়ুক।

কাঁধে গামছা ফেলে পুকুরের দিকে যাবার পথে মোহন মানুষের হজমশক্তি বিষয়ক ভাবনায় মোটেই পীড়িত হয় না।

দরদাম

মাতৃগর্ভ থেকে প্রথমেই পা বের করে পৃথিবীর মাটি ছোঁয়ার কৃতিত্ব নবজাতকের না মায়ের না ঈশ্বরের নির্দিষ্ট না জটিল দেহক্রিয়ার অজ্ঞাত ফল, এটা ফেলা বাউরীর ভাবনার বিষয়ই নয়, সে পাদক—পা ছোঁয়ালে ঘাড় পিঠের ব্যথা সারে মানুষের, সুতরাং মূল্যবান বাঁ পা'খানা তার, একে ব্যবহার করে উপার্জন হলে, যেটা এতকাল বোকার মত করেনি, লোক আসামাত্র কৃতার্থ হয়ে বুলিয়ে দিয়েছে—এখন করছে। ব্যবসায়িক দরাদরিতে কুণ্ঠা নেই। দিব্যি বলে, 'তা সকালে খেতে পাব না তিন দিন, বসে থাকতে হবে, তিনদিন পা বুলানও খাটনি বটে, কেনে পয়সা লুব না, তা তুমি যখন বলছ, নগদ দু'টাকা না দিয়ে আটআনা কমই দিবে। তবে চাল এক সের দিতেই হবে।'

নাকা হাড়ীকে সাতসকালে দেখে খদ্দের এল সুখ বুকে ধাক্কা মারে এবং হিসাবও দ্রুত করতে যায়, পাওনাটা কেমন হবে, কতটা ধার্য সঙ্গত। ঘাড় বেঁকিয়ে আসছে, ঘাড়ে নির্ঘাত ব্যথা। তো ভাবনাকে ভেঙে দেয় নিজের হাতে ধরা এ্যলুমুনিয়ামের গ্লাসটা। ঝাঁ করে মাথায় বেজে ওঠে, চায়ের লিকারে মুড়ি ভিজোন ঢোঁকের সঙ্গে বার তিনেক পেটে গিয়েছে। এখন পা মূল্যহীন—নিছকই পা। বাসি মুখে শূন্য উদরেই ওর গুণপনা, তারমানে পাক্কা চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘাড় বেঁকান নাকার দিকে আফশোষে ভিজে তাকায় সে।

ফেলার হাতে অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসটাই আগে চোখে পড়ে নাকার। সে হতাশ হয়। ব্যথাটা খোঁচা দিয়ে তার মুখে বিকৃতি আনে। ঘুম ভাঙার পর সে টের পায়, ঘাড় বাঁয়ে বেঁকে গিয়েছে। সোজা করতে পারে না। শিরদাঁড়ার টান, মাথাটার খিলান ভেঙে গিয়েছে। ঘর থেকে বের হয়ে ঘাড়েই মন এবং চেষ্টার উদ্যোগ সোজা করার—কিন্তু এমন বেয়াড়া খিলান, নড়ে না। মুণ্ডুটা—। রানী আসতেই সে সখেদে আতঙ্কটা ছুঁড়ে দেয়, 'অ মা রানী দেখ বেটা, আমার ঘাড় সুজা করতে লারছি।' চোখের কোণায় যন্ত্রণা অশ্রু আঁকে।

রানী বাপকে দেখে। বলে, 'ঠিক হবে যাবে—বেয়াড়া হয়ে শুয়েছিলে।'

নাকা বলে, 'নারে ঠিক হবে না। কী বাজছে—উঃ!' কাতরানি তোলে।

রানী বলে, 'একবার ফেলার কাছে যাও। পা বুলিয়ে দিলে ঠিক হবে।'

তাই ফেলার ঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছে। কিন্তু ফেলা! বাসি মুখে নেই, মুখের সামনে চায়ের গ্লাস। এমনটিই তো হবার কথা। হনহনিয়ে আসছে, মনসাঘরের কাছে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় কোমরে শূন্য কলসী গুগলির ঝগড়ুটে পিসি। কে না জানে মেয়েমানুষ বড়ই অলক্ষুণে, শুভ কাজে বেরিয়েছ কী, ওর

মুখ দেখলে হয়ে গেল। আবার জিজ্ঞেস করে বসল, 'কোথা চললি।' জিজ্ঞাসা মানেই টুকে দেওয়া। তুকতাকের ব্যাপারে এই টুকে দেওয়াটা সিদ্ধি দেয় না। কপাল মন্দ, নইলে পূবের মাটি ফুঁড়ে আলোর ফোয়ারা সবে উঠছে, কাক, শালিক, চড়ুই বিস্তর হট্টগোল করছে—এর মধ্যে কি না ফেলা মুখ ধুয়ে চা নিয়ে বসে!

ফেলার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি গোঁফের ঘনত্বে, দৈর্ঘ্যে, ঠোঁট চিবুক ঢাকা, চোখজোড়া জ্বলন্ত, কালো বর্ণ, খাড়া নাক, কোমরে লুঙ্গি, দু'পা 'দ' করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে আছে। মাস চারেক আগে স্ত্রী-বিয়োগ হতে কিছুটা রুক্ষ হয়ে পড়েছে। বয়সকালে মেয়েমানুষ সঙ্গ না হলে মেজাজ ঠিক করা কঠিনই বটে। মুনিষ খাটে। সম্বল বলতে এই ভিটে। গ্লাসটা নামিয়ে রাখা এবং চাউনিতে তার কাছে প্রার্থী আসার অহঙ্কারের ছাপ পড়ে। প্রায় দ্বিগুণ বয়সী মানুষটা হোক না, তার 'পা' প্রত্যাশী এখন তো। সে দাতা ও গ্রহীতা। রানীর বাপ এই যা। বলে, 'কী হয়েছে?'

'বেঁকে রইছে। সোজা করতে পারছি না কিছুতেই। শিরট টনটন করছে—কী করে যে হল।'

'অমন হয়। ডরের কিছু নাই। ঘাড়, কুমর, কাঁধ। কাল আসবে। পা বুলিন দুব। দুটো টাকা, এক পাই চাল সিধে লাগবে—আলু, ডাল, তেল, হলুদ—সিধেতে যা লাগে আর কী—তিনদিন।'

নাকা বয়সে ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে কোন একটায়, হিসাব কে রাখে, লম্বাটে অবয়ব, গাল চুপসেছে, মাথায় পাকা চুলের দাপটই বেশি, ভীরু চোখ কোটরের মধ্যে, বেশি পরিশ্রমে তার এখন হাঁপ ধরে। শরীরের কলকব্জাগুলো নিয়ত বোঝায় তাদের ক্ষয়, শক্তি সামর্থ শেষে পৌঁছেছে। ঘাড়, বেয়াড়া শোয়া কী অন্য কোন কারণে, সম্মুখে ভয়গহ্বরের আতঙ্ক, এমন প্রফুল্ল সকালকে ভাদুরে গরমে রূপান্তর ঘটিয়েছে, সেটা একপাশে সরিয়ে সে তাজ্জব ফেলার কথায়। পা আগে গর্ভের বাইরে এসেছে তাতেও রোজগারের মওকা নিচ্ছে। মানুষ কী হয়ে গেল রে বাবা। টাকা ছাড়া কেউ কথা বলে না। তাল, বেল পর্যন্ত বিক্রি হয়। পয়সা চিনেছে বটে লোকে। আর তারই ফলে সর্বদা 'নাই নাই'। অভাব তো ঘুচছে না। তো বুঝবে কী। ভাবে, ফেলা কিছু নেয় বটে শুনেছে, কিন্তু তিনদিনে ছ'টাকা, দেড় কেজি চাল! কী কাণ্ড!

অবাক চাউনি এবং নীরবতায় ফেলা বলে, 'তাহলে কালকে এসো। বেলা করো না। কমসম করে দুব—ও নিয়ে ভেবো না। ওরকম রেট করেছি। ওই বললম্। তোমার সঙ্গে দামদর করব কী। পাড়ার মানুষ বট।'

ঘরে ফেরার পথে পালেদের বাঁশঝাড়ের কাছে নারায়ণ চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। পঞ্চাশের মত বয়স, বেঁটেখাট ফরসা মানুষটি, গোলমুখ, চোখে চশমা, হাইস্কুলের শিক্ষক। বলে 'কোথা থেকে?' নাকা ঘাড়ের বৃত্তান্ত শোনাতে বলে,

'ও ঠিক হয়ে যাবে, বেয়াড়া হয়ে শুয়েছিলি হয়ত—ফেলা পা বুলুলে ভাল হবে, যত সব, তোরা এখনও সেই অন্ধকারেই থেকে গেলি, বলি কী, হাসপাতালে ধুর্জুটির কাছে যা, আমি বলে দেব, ভাল করে দেখবে এখন।'

নাকার মেয়ে রানী, 'ফেলা পা বুলুনির দাম চাইছে কী কাণ্ড' বলে অবাক হয় না। নাকা ভাবে, অবাক হবে কী। নিজেই তো একটা জ্যান্ত অবাক। প্রায় সময়ই তার অচেনা মনে হয়। শেষ বয়সের সন্তান। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁইয়ে জন্মাল মেয়ে। সতের আঠার বছর বয়স হল। হোক নাকার কাছে একরত্তি, লোকের কাছে তো মস্ত। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, মুখ চোখের গড়নে শ্রী আছে, টানা চোখ, সাজলে গুজলে চমৎকার দেখায়। স্বভাবে চাবুক, বুদ্ধি ধরে, মানুষ চেনে, সাহস আছে, শক্তি আছে। মেয়ে মানে মেয়ে নয় লতার মত, বরঞ্চ শক্ত অর্জুনের কাঠিন্য। কে বলবে তার মেয়ে। স্বভাবে সে ভীতু, নুয়ে পড়ার প্রবণতা সব কিছুতেই, কাউকে চটায় না, ঝগড়াঝাঁটি গলাবাজিতে নেই—গেরস্তলোক, বামুন দেবতার জাত, তাঁদের দয়াতেই বেঁচে থাকা—কৃতজ্ঞতায় সর্বদা নত। রানী ফোঁস করে, 'নিজেকে অত ছোট ভাব কিসের লেগে। অ রে আমার গেরস্ত, অ রে আমার বড়লুক, বামুন-ঠাকুর—গতর খাটাই খাই, এমনি কেউ দেয় না। চেনা আছে সবাইকে। আবার আমাদিকে বলে, ছোটলোক। ছোটলোকের বিটির দিকে নজরে তো চাটিস্—পেলে থুথু খাবি।' তো এরকম কথায় অবাক না হয়ে পারা যায়। পড়শীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে লাগে। মাসি, পিসি জ্যাঠাজেঠি যেই হোক অনেয্য কথায় মুখের মান দিয়ে দেয়। মা না মরলে এমনটি হত না। মেয়েকে নিয়ে ন্যাকার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কী করতে কী হয়ে যায়! শুধু তো কাজে নয় মুখের কথাতেও পাপ হয়ে যায়। ছোটলোকের এত বাড় ভাল নয়। অভিশাপ লাগতে পারে।

রানী চা করেছে। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খেয়ে নাও। আমি যেছি। টিনের কৌটোতে মুড়ি আছে। খেয়ে নিও।'

চা খেতে খেতে রোদ বাড়ে। ঘাড় নিয়ে অস্বস্তি কাটে না, মন ওখানেই। সে কীভাবে ঘাড়টাকে সোজা করবে তার মতলব ভাঁজে নানারকম। কিন্তু শক্তি সামান্যও যে প্রয়োগ করা যায় না। চা খেয়ে বিড়ি ধরায়। বেলা বাড়ছে। বালিশটা সে রোদে দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরও কম বেয়াড়া হয়ে উঠছে না। কম বেশি যন্ত্রণা থাকেই। পেট খারাপ না হয় সর্দিকাশি জ্বর, পুকুরঘাটে পিছলে পড়ে গিয়ে দুমাস ভুগল। তো ঘাড় বেঁকে যাওয়াটা অভিনব। দেওয়ালে হেলান দিয়ে সে দেখে, সামনের রাস্তা দিয়ে লোক হাঁটছে, পিলুদের মুরগীটা দশবারটা হলুদ তুলোর ডিমের মত বাচ্চা নিয়ে উঠোনে ঘুরছে। দেখতেও চোখে টান লাগছে। কী যে করে সে।

রানী বেলাতে আসবে, তারপর রান্না। সে মাছধরা চাবজাল বোনে। নন্দুর পিসি সুতো কিনে দিয়ে গিয়েছে। অনেকটা এগিয়েও গিয়েছে কাজ। এতক্ষণ

বসে পড়ত সে জাল দিয়ে। কিন্তু বাঁকা ঘাড়ে তো জাল বোনা যায় না।

বটু গেরস্তর ঘরে রানী পাটকুড়ানি। বাসন মাজা, ঘরঝাঁট, এটা ওটা করতে হয়। চা জল খাবার, একবেলার অন্ন। মাইনে দশটা টাকা। তা গেরস্তর উপর রানী চটেই আছে। আজ ছাড়ি কাল ছাড়ি করছে। কথা ছিল যত কাজের, যত দিন যাচ্ছে তত বাড়াচ্ছে। জাঁতাতে বিড়িকলাই পিষে দে, জামাকাপড় কেচে আন, এক্ষুণি ঘর যাবি কী, কয়লা ভাঙ, ইঁদারার জল তোল। নাকা তো যায়নি—রানীর মুখেই শুনছে।

দেখা হতে এই তো ক'দিন অগে বটু গেরস্ত বলল, 'তোর বিটি খাটতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বটে, চোরটোর নয়। কিন্তু মুখ বটে—একটু বুঝুলে তো পারিস। আমাকে পর্যন্ত কথা শোনাতে ছাড়ে না।'

বটু গেরস্ত মান্যিগন্যি মানুষ, কত জমি, পুকুর ডোবা, বাপ ছিল আবগারী দারোগা। গেরস্তর টকটকে ফরসা রঙ, রাজপুত্রের মত চেহারা ছিল, এই বয়সেও সুপুরুষ। এমন মানুষকেও কথা শোনায়—কী আর বলবে নাকা।

ঘর থেকে ভজনের কামারশালে গেল নাকা। কাঁহাতক বসে থাকে। প্রায় অবশ্য গিয়ে বসে। সমবয়সী, বন্ধুলোক। টিনের টুলের পাশে জমিতেই বসল। কাজ হচ্ছে কামারশালে। হাপর টানছে ভজনের ভাইপো। কাস্তে পাঁজান হচ্ছে। পাঁজান মানে কাস্তের খাঁজে ধার-শাণ দেওয়া। আগুন উঠছে, ভজনের খালি গা, বুকের লোমে ঘাম জমেছে। ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিল নাকাকে। সাঁড়াশিতে একটা কুড়ুলের লাল লোহা টেনে আনল, পিটিয়ে আবার আগুন গুঁজল। বলল, 'বিষ্টে তোকে খুঁজছিল, জাল করাবে।'

ফেলা পাদক হয়ে যদি পায়ের দাম বাড়ায়, স্রেফ বুলিয়ে দেওয়াতে তাহলে জাল বোনার দাম সে বাড়াবে না কেন? দশ টাকা থেকে পনের টাকা করবে। ভাবতে ঘাড়ের টনটটানি। বিরস গলায় বলল, 'আর জাল বুনেছি—দেখ্ কী দশা।'

'কী হল?' একবার ভজন দেখে নিয়ে আবার আগুনে সাঁড়াশি গোঁজে।

'বুঝতে পারছিস না? ঘাড় যে সুজা করতে পারছি না।'

কাজ ছেড়ে বন্ধুকে দেখে নিয়ে ভজন উদ্বিগ্নতার সঙ্গে বলল, 'কখন থেকে হল? খুব বেদনা? বালিশ রোদে দিবি? রুগ হলে ভাল হবে না সহজে। ছুটু গেরস্তর দেখলি না, মুখ বেঁকে ঘাড় বেঁকে কী কান্ড! পাক্কা একবছর লাগল ঠিক হতে! প্যারালিসিস। তোর অবিশ্যি খেঁচকি টেঁচকি মনে হয়।'

নাকা বলল, 'সকালেই গেইছিলাম্ ফেলার কাছে। ঘাড়ে পা বুলোনের লেগে—তা বাপের জন্মে শুনি নাই—বলে কিনা দুটো টাকা একটা সিধে—রেট করেছি।'

'তোর কাছেও চাইল?'

'কেনে আমি কী লাটসাহেব বটি যে চাইবে না। বলছি, মানুষের কী হল!

সবের দাম।'

'হবে আবার কী, যেমন কাল তেমন মানুষ।'

'মানুষই কাল করে। মানুষের স্বভাব দুষেই এ সব হচ্ছে।'

ভজন বলল, 'ফেলা তাহলে পায়েও রোজগার করছে, কিন্তু ভাবছি তোর কাছে চাইছে'—স্বর নামিয়ে বলল, 'দুদিন বাদে শ্বশুর হবি।' বিস্মিত নাকার পলকহীন চোখে চোখ রেখে তারপরও বলল, 'কী হল! জানিস্ না? শালে ঢের লুক আসে—সব আমার কানে যায়।'

নাকার হৃৎপিন্ড তড়াক্ করে উঠেছে শোনামাত্র। দু চোখ স্থির। ফেলা রানীকে বিয়ে করছে কিংবা রানী ফেলাকে, তাদের ভালবাসা হয়েছে, কী বিয়ের প্রস্তাবই সোজাসুজি—সে বাপ হয়ে জানে না। ভজন শুনেছে।

মুখ গোমরা করে নাকা বলল, 'আমরা ভিনু জাত বটি।'

'জাত বলে আর কিছু আছে নাকি? গাঁয়ে কত কাণ্ড হয়ে যেছে।'

রানীর কাছে ফেলার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবে কী, মেয়ে তো আগুন হয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এল। ঝগড়া করে জবাব দিয়ে এসেছে কাজের। বিকেলের পাট সারতে যাবে না। শোনামাত্র নাকার কানে তীর বেঁধে। কী সাঙ্ঘাতিক! একবারে জবাব। দুশো টাকা দেনা আছে বটু গেরস্তর কাছে। ধান চাল ধার দেয়। সুদ নেয়, কিন্তু দেয় তো। তারপর মান্যগন্য মানুষ, গেরস্ত বলে কথা—অন্নদাতা। ওনাদের পায়ের তলাতে থাকাই তো ধর্ম। তার সঙ্গে ঝগড়া। এ সংবাদ ঘাড়ের ব্যথা রাখতে দেয় না।

ঘরের উঠোনে খই ফোটায় রানী, হাতের কাজ বন্ধ করেনি, কাঠের উনুন ধরাচ্ছে, জল নিয়ে এল ইন্দারা থেকে, হাঁড়ি ধুল, আলু আর কুমড়ো ফালি কুটতে বসল, বাপকে সজনে শাক পাড়তে বলল, তারই ফাঁকে ফাঁকে, 'বেশ করেছি, বলেছি। ঢের দিন সয়ে এসেছি। ঢিলা মারলেই পাটকেল খেতে হবে। কাজ করি পয়সা দিস্—মিনি মগনা। এক বলে কাজে লাগালি আর বেশি খাটাস। আবার মাগী ছোঁয় না। না ছুঁস ত ছোটলোক কিসের লেগে বলবি। আজ কী হয়েছে জান, ঘরে ঢুকেছি ওমনি মাগী—তোরা ছোটলোকেরা কী যে হয়েছিস্ ঠাকুর বামুন মানবি না— দিলি তো ছুঁয়ে, আবার ডুব দিতে হবে। ব্যস্ যেই বলেছি ঠাকরুণ ব্যাভারে মানুষ ছুটলুক ভদ্দরলুক—তা তোমাকে তো মনে হচ্ছে ছুটলুকের বাড়া। অমনি জ্বলে উঠল। আর ঠাকরুণ নয় গেরস্ত বলে, তোর খুব মুখ। ঠাকরুণের পায়ে ধর—ধরি নাই—জবাব নিয়ে এসেছি।'

নাকা বিব্রত গলাতে বলল, 'তোর রাগ বেশি বটে। আমরা ছুটলুকই ত বটি। গরীব মানুষ মানেই ছুটলুক। জেতে ছুটু মানেই ছুটলুক।'

'কে বলেছে?'

'চিরকাল শুনছি। উদের সেবার লেগেই আমরা।'

'চুপ কর।'

'রানী তু বিটিছেলে বটিস।'

'ত কী, মান অপমান নাই আমার। জান—শুনবে—ওই পিন্টু বলে কী আয় রানী, পা টিপে দে দেখি, খুব ব্যথা রে। ওর মা বললে, যা টিপে দে, মা বুঝে না ছোঁড়ার চরিত্র।

'গাঁয়ে থাকতে হবে।'

'ত কী। গাঁ কী গেরস্তর বাপের।'

রানীর গায়ে সোডায় কাচা রঙচটা শাড়ি, ব্লাউস, মাথায় রুক্ষ চুল, চোখে মুখে আগুন। বটু গেরস্ত বলেছে, নাকা তোর কথা বলছি না—তবে বাগ্দী বাউরি পাড়া কী হয়ে গেল বল দেখি—যত রাগ ভদ্দরলুকদের উপর। তো এখন রানীর কথাগুলোর, এমন রুদ্রাণীর ভঙ্গি, সে মুখে বললেও মনে মনে খুশি হয়। দেখে চোখ মুখ শরীর সবই বিশাল হয়ে উঠেছে। প্রতিরোধের জন্যে শক্ত হয়ে মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়েছে। কী কঠিন আর কী অচেনা। তার গায়ের লতা নয়, বরঞ্চ তাকেই আশ্রয় দিতে পারে। সব তালগোল পাকায় মাথায়। চোখের পলক পড়ে না তার। ভাবে, পাদক হয়ে যদি ফেলা পায়ের দাম বাড়ায় তবে শ্রমের দাম মানের দাম রানী বাড়াবে না কেন!

তবু ভয় থেকেই যায়। বটু গেরস্ত না দুশো টাকার তাগাদায় আসে। অর্থ বন্ধনের চেয়ে বড় বন্ধন নেই। মানুষকে হীন আর আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ঘর ছাদনের সময় ধার নিয়েছিল। সুদ আছে টাকার। রানী মাইনে থেকে কত করে যেন দেয়। জাল বোনার রোজগার থেকেই সে রানীর হাতে দিয়েছে। ওসব জটিল হিসাব জানে না। গেরস্ত যা বলত, তাই দিত। বছর টেক আগে এ নিয়ে গোলমাল। তখন রানী হিসাব নিজের হাত নিল। বলল, 'বাপের সঙ্গে লয়—এবার থেকে আমার সঙ্গে দেনাপাওনা।' যা হোক, তার কতটা শোধ হয়েছে, কত বাকি এই যে ঘর ছেড়ে দিয়ে এলি, এক্ষুণি চেয়ে বসলে দিবি কোথা থেকে, তার অঙ্কটাই বা কত ভাবনাটা আসে বটে, কিন্তু তেমন পীড়াদায়ক নয়। রানী ছোট মেয়ে নয়।

বটু গেরস্ত বিকেল পর্যন্ত এল না। রানী বিকেলে কাজে যায় নি। ঘর ঝাঁট দুপুরে বাসন মেজে দেওয়া, হ্যারিকেন মোছা এসব করে আসতে হয়।

নাকা সন্ধ্যের মুখে পুকুরের দিকে গিয়েছিল। ফেরার পথে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরতেই চোখে পড়ল, আগে আগে তার ঘরের দিকে হাঁটছে কে যেন। গতি ধীর করল নাকা। হ্যাঁ, তার ঘরেই গেল। ডাক শুনে উঠোনে এল রানী।

'তোমার বাবা নাই?'

'না। কী বলছিলে?'

'কাল ঘাড়ে পা বুলিয়ে দেব—সকালেই পাঠাবে। দুটো টাকা এক পাই চাল বলেছিলাম—।'

'বাবার হাতে দিয়ে দেব সকালেই।'

ব্যস্ত গলাতে ফেলা বলল, 'না, না, লাগবে না।'

'লাগবে না? কেনে? পায়েরও ত দাম আছে। মিনি মাগনা দেবে কেনে?'

বিগলিত গলা ফেলার, 'না মিনি মাগনা কাউকে দুব না। বাপ যখন তোমার—দু'দিন পরে সম্বন্ধ হয়ে যাবে ত একট—বলতে কী ঘরের মানুষ।'

'হবে কী হবে না তার ঠিক কী। আমি ভেবে দেখছি। ভেবো না বিয়ে হলে কৃতার্থ হব।

'আমিই কৃতার্থ হব নাকি? মেয়ের কী অভাব?'

'বেটাছেলেরও অভাব নাই। তবে তুমি ছুকছুক না করে বিয়ে করবে বলেছ—তাই।'

ফেলা খুশি হল। তার স্বর নম্র, প্রশংসাস্নাত। বলল, 'আমার এমন চরিত্তির লয়। বিয়ে করব। বৌ পোষার হিম্মত আমার আছে।'

'ও মা আমি কী টিয়াপাখি না কুকুর বিড়েল যে পুষব বলছ।'

ফেলার বিব্রত গলা, 'কী যে বল। বউ ঘরের লক্ষ্মী। কুকুর বিড়েল হতে যাবে কেন! তবে পাখি বলতে পার।'

'ভেবো না খাঁচায় ভরে রাখবে।'

'তোমাকে জানি। তা বটুগেরস্তর ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছ শুনলাম।'

'হ্যাঁ। শুনেছ তো মেজাজ। আমাকে নিয়ে ঘর করতে পারবে তো!'

'বেটাছেলে আবার ঘর কী করে। ঘর করে তো মেয়েরা।'

'উঁহু, ইকা মেয়েরা লয়। যাক্, সে সব তুমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে লুব। এখুন এস—; বাবা যে কুথা গেল।'

ফেলা বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল, কিছু দিও না—সে লজ্জার হবে।'

রানী বলল, 'লজ্জার কী আছে। পায়ের দাম। ছাড়বে কেন! বুঝলে, নিজের দাম বুঝতে শেখ। কী করে যে তোমার সঙ্গে ঘর করব।'

নাকা অবাক না হয়ে পারে না। সে ঝোপের ওপাশে নিমগাছের গুঁড়িটায় নিজেকে আড়াল করে নেয়। ফেলা চলে গেল।

কিন্তু এ কী শুনল কথাবার্তা। এরা স্বামী-স্ত্রী হবে—ভালবাসা, বিয়ে। উঁহু, প্রেমপীরিতের ব্যাপার থাকলে কথাবার্তা অন্যরকম হবে। তবে হ্যাঁ, তার আহ্লাদ হচ্ছে। মেয়ের তো পাত্রই পছন্দ হয় না। ফেলাকে পছন্দ. করেছে।

ঘরে ফিরতেই রানী বলল, 'ঘাড় ঠিক হয় নাই ত। কাল ফেলাদার কাছে যেও।'

নাকা বলল, 'যাব।'

টর্চ হাতে বটু গেরস্ত হাজির, লুঙ্গির উপর গেঞ্জি, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, ব্যস্ত পায়ে সন্ধ্যা গড়াতেই ছুটে এসেছে।

'এই যে রানী, আহা কাজে গেলি না। ঠাকরুণকে বাসনমাজা থেকে রাজ্যের কাজ করতে হল। ঘরে কী কাজ কম—তুই থাকিস বলে চলে যায়। আমি

বললাম রানী অমন মেয়ে নয়, কামাই করে না, রাগও করে নি, তুমি তো ওর মায়ের মত। নিশ্চয় শরীর খারাপ হয়েছে। তারপর শুনলাম নাকার ঘাড়ে ব্যথা। তাই খবর করতে এলাম। কী, নাকা কেমন আছিস্?'

'ভাল।'

'কী রানী যাবি তো কাল সকালে!'

'কেনে যাব না। তবে মাইনে বাড়াতে হবে। খুব খাটালি। তারপর তোমাদের মুখও কিছু কম লয়।'

'বাড়াতে হবে। আঁ। আরও কত চাস্!'

'কুড়ি টাকা বাড়বে।'

'কুড়ি টাকা!' বটু গেরস্ত বলে, 'ওরে নাকা, শোন। রানী কী বলে দেখ।'

নাকা এখন নিশ্চিন্ত। মেয়ে তাহলে কাজে জবাব দেয় নি। বলে, 'তা গেরস্ত, ফেলা তিনবার পা বুলিয়ে যদি দু'টাকা তাবাদে সিধে চায় তাহলে মেয়ে আমার দু'খানা হাত দিয়ে—। বুঝে দেখুন।'

সন্ধের তারা ঘন হয়ে আকাশে লক্ষ কুচো হয়েছে। বাগ্দীপাড়ায় আলোর ইশারা। বটু গেরস্ত বলে, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। কাল যাবি। তবে হ্যাঁ, এমুন করে ঘন ঘন বাড়াতে বলিস না।'

সকালবেলায় রানী তুলে দেয় নাকাকে। ঘাড়ে ব্যথা আছে। দু'টাকা সিধে হাতে ধরায়। বলে, 'যাও পা বুলিন্ এস গা। খুব বাজছে।'

'না, কালকের চেয়ে কম বটে।'

'তা হোক। মানুষট বাসি মুখে বসে থাকবে।'

নাকা হাঁটে। হাতে সিধে তার উপর দু'টাকা। দিতে কষ্ট হয় না। দামদর তা লাগবেই। মানুষ নিজের শুধু নয়, অন্যেরও দামদর বোঝে না বলেই না এত গণ্ডগোল! নাকা এখন দিব্যি বুঝতে পারে।

অতিথি

তিনদিন একটানা বৃষ্টি। ঘরের বাইরে পা রাখার উপায় নেই। আকাশের যা মুখভার তাতে ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখনও মুষলধারে কখনও বা ঝিরঝিরে ইলশেগুঁড়ি কিংবা কিছুটা সময় ছাড়ান দিয়ে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যে একাকার করে দিয়েছে। তিনদিন সূর্য মেঘের আড়ালে। ছিটেফোঁটা আলো-বর্ষণ করারও সুযোগ পেল না।

গরু ছাগল ভেড়া মোষ একবার করে ছাড়তেই হয়। মানুষেরা দরকারে বের হয় বৃষ্টি মাথায় করে। বাকী সময় দু'হাঁটুর খাঁজে মুখ গুঁজে বসে থাকে। পড়শীদেরও মুখ দেখা যায় না।

ভরা ভাদর। কাজকর্ম বন্ধ। চাষের কাজ শেষ হতেই হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকা। একবার অবশ্য ক্ষেতে আগাছা ওপড়াতে দরকার হবে মানুষের। তবে তাতে সব মানুষের কাজ জোটার সম্ভাবনা নেই। রোজগার যা করেছে আফড় তুলে কি ধান পুঁতে তা তো দিনে দিনেই শেষ। সুতরাং উনুনে আগুন ছোঁয়াবে কি করে? কাঠউপোস দিয়ে ঘরের মেঝেয় পড়ে থাকা।

মাঠে ঘাটে মাছ ধরলে দু'চার পয়সা হাতে আসে। কিন্তু বৃষ্টি তো বের হতে দেবে না। ঘাস কেটে বোঝা চারেক বাঁধতে পারলে কড়কড়ে একটা টাকা। কিন্তু ঘাস কোথায়? ঘোলা জলে ক্ষেতের আল ভাসছে।

এ দুঃসময়ে ঘরে কি না কুটুম! মেয়ের খোদ শ্বশুর অর্থাৎ বেয়াই।

'বেয়াই! বেয়াই আছ নাকি গো ঘরে?'

পদ্মার শ্বশুর। মা মরা মেয়ের গতবছরই বিয়ে দিয়েছে নব। এখনও দেনা শোধ হয়নি। তা ভর বর্ষায় জামাই-মেয়ে হলে কথা ছিল! বেয়াই কেন!

দরজা দু'পাট করে খুলে দেয়। ছেলে দুটো হাঁ হয়ে দেখে।

'আহা বাইরে কেন, বেয়াই! ভিতরে এস। ভিজে গেইছ।'

ছাতা আছে বেয়াইয়ের। কালো ছাতা, সাদা তাপ্পি। বৃষ্টির ঝাপটা কাকভেজা করেছে। গায়ে হাফসার্ট। জঙ্ঘার উপর তোলা কাপড়।

ছাতাটা এক পাশে রেখে ঘরে ঢোকে।

'তা দেখছি আসে নাই।' নিজের কাপড়ে মুখ মোছে বেয়াই। রক্তহীন সাদাটে পা ঝাড়ে।

'কে—কে আসে নাই বেয়াই?'

'এই বেটা আমার। বৌ নিয়ে তিনদিন আগে বেরিন্‌ছে।'

এই দুঃসময়ে একি সংবাদ! নব'র বুক গুরগুর করে।

'ইখানে আসব বলেছিল নাকি?'

'তা' বলে নাই।

'তা দু'দুটো মানুষ গেল কুথা?'

বেয়াই জামা খোলে। ধুতিটায় অদ্ভুত কৌশলে গায়ের জল মুছে নেয়।

বলে, 'কাজ কম্ম নাই উ পাশে। মাগ ভাতারে কাজের লেগেই বেরিন্‌ছিল। কিন্তু ফিরার নাম নাই।' বেয়াই উবু হয়ে বসে ভেজা মেঝেয়, 'ই পাশে আমি কেঁদে মরি। বাপের পেরান, থাকতে লারলম! ডাওর মাথায় করে খুঁজছি।'

'আহা, কাঁপছ বেয়াই।'

'তিনদিন খাওয়া নাই।' বেয়াই চোখ তোলে না। বিড়বিড় করে, 'খাব কি! পেরান শুধু কাঁদছে। উদের দুষ দুব! আমাদের পাশে ত কাজ কম্ম নাই। চাষ মেটার পর ঠায় উপোস। জোয়ান মদ্দমাগী না খেয়ে কি পড়ে থাকতে পারে? বেরিন্‌ গেল। কিন্তু হায় কপাল, আমি বাপ রইছি। হ্যাঁরে, বাপ কি কেউ লয়? হ্যাঁরে, বাপের তলাশ কে করবেক? তুরা ছাড়া বুড়োটর আর কে আছে?'

'কেঁদ না বেয়াই। কেঁদ না। উরা ঠিক আসবেক। ছুটু ছেলে লয়।'

বুক চাপড়ায় বেয়াই, 'পরান যে মানছে না বেয়াই। তিনদিন খাই নাই!'

নব বোঝে, খাওয়াটাই মুখ্য। কিন্তু তারও তো কোন সংস্থান নেই। তাই বলে কুটুমকে তো আর খালি পেটে রাখা যায় না। বড় দুঃসময়। ছেলে দুটো এতক্ষণ ক্ষুধাতেই চেঁচাচ্ছিল, 'অ বাবা খিদে লেগেছে। সেই সকালে চাট্টি মুড়ি খেন্‌ছি!' সে নির্বিকার প্রস্তরমূর্তি হয়ে ছিল। বড়টিকে একটা থাবড়াও মেরেছে। কিন্তু কুটুমের কাছে তো তা করা যায় না।

'তুমি বস বেয়াই। চাট্টি চালের লেগে দেখি গা। ঘরে একটো দানা নাই।'

'যাও দেখ গা।' ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ে বেয়াই, 'আমি ছেলে দু'টোকে লিয়ে থাকছি। যাও—দেরি করে কি হবেক।'

বেরিয়ে পড়ে নব—আকাশের দেবতা বুঝি করুণাপরবশ হয়ে ইলশেগুঁড়ি ছড়ায়। মুখভার অবশ্য কমে না। ঘোলাটে মেঘ ছোটাছুটি করছে। শীত-শীত বাতাস বইছে। নব জল ছপছপ পথে হাঁটতে হাঁটতে ভাবে, চাল দেবে কে! মেয়ে জামাইয়ের জন্যে ভাবনা হচ্ছে না, এমন নয়, কিন্তু কুটুমের মর্যাদা রাখা—সেটাও কম ভাবনার নয়।

রাস্তায় মানুষ নেই। একটা ন্যাংটো ছোঁড়া জলে খেলছে। হুঁ, কিপাদার বেটাই হবে। কৃপাদার কাছে যাবে! উহুঁ, নিজেরই চলে না, তাকে ধার দেবে কি! মাথা ধরে যায় নব'র। এতক্ষণ ক্ষুধার জ্বালা ছিল। এখন আর নেই। চাল। কিছুটা চাল চাই।

পুকুর ভেঙে রাস্তা বেয়ে জল আসছে। ভাঙ্গার মুখে জাল দেওয়া। মুরগীরা ছোটাছুটি করছে। একপাল হাঁস শব্দ বাজাতে বাজাতে পুকুরে নামল। এদিকে

বেলা পড়ে আসছে। মেঘের জন্যে সূর্যের অবস্থান কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। দিনের আয়ুটুকুও না।

নব থমকে গেল। বলাই ঘরে বসে। আগল খোলা। ওর কাছেই হাত পাতবে।

বলাইয়ের কাছে চাল ধার চাইতেই অবাক-করা চোখে তাকাল সে। বাইরে দিনের শেষ সূর্যহীন আলোটুকু। ঘরের ভিতর কিন্তু পাতলা আঁধার ধরা আছে। বলাইয়ের খালি গা। কোমরে লালচে কাপড়ের টুকরো। একমুখ দাড়িগোঁফ, মাথায় শুকনো চুলের রাশ। বিস্মিত চোখ দুটি ঠিকরে খলখলিয়ে হেসেই সে সারা। হাসি থামতে বলল, 'চাল! আঁ, তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখছ নবেদা।'

নব বলল, 'কুটুম এসেছে ঘরে।'

'কুটুম!' এবার খিক্‌খিক্ হাসি, 'কুটুমের লেগে চাল খুঁজছ! তা কুটুম আর আসার সময় পেল না।'

ও কথাটা গায়ে মাখল না নব। বলল, 'দে না মাইরি আধ পাইটেক। ঘরের কারু লেগে চাই না। খালি উর হলেই হবে। কুটুম মানুষ, মান ত রাখতে হবে।'

'তাহলে নিজের হাত-পা কেটে ভেজে দাও গা। কুটুম মানুষ যখন।' বলাই নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি টানতে থাকল। তারপর নবকে নীরব দেখেই বোধকরি অথবা মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল। বলল, 'বিশ্বাস কর নবেদা, সাতদিন শালা চালের মুখ দেখি নাই। চেহারাই ভুলে গেইছি চালের। রিলিফের গম পেন্‌ছিল ভাদুবুড়ী। ঢেঁকিতে কুটে চাট্টি দিন্‌ছিল, তাই ফুটিন্ খেন্‌ছি।'

'আমি ত শুধু লুব নাই। ধার চাইছি।'

'যা শালা।' বলাই মুখ কুঁচকে বলল, 'ধারই ত। আমি দানছত্তর খুলেছি! তা থাকলে ত ধার। মাটির হাঁড়িগুলা নিজেই ঘেঁটে দেখ কেনে।'

দাঁড়িয়ে লাভ নেই। পথে পা দিতে হল আবার। ইলশেগুঁড়ি নয়। ছিপছিপে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসও মাতলামি সুরু করল। গাছগাছালি যেন ভেঙে পড়বে। গা ভিজে উঠল। ডানা ভিজিয়ে একটা কাক এর মধ্যে উড়ে গেল। পেট বড় নাচার। খাদ্যের সন্ধান করতে হবেই। ডানা গুটিয়ে পাতার আড়ালে থাকা যায় না।

মাথালি মাথায় নিয়ে গরু ডাকিয়ে ফিরছিল হরেনের পিসি। দাদা মরতে পিসিই সংসারে কর্ত্রী। সচ্ছল সংসার। নিজেদের কিছু জমিও আছে।

নব গিয়ে পাশে দাঁড়াল, 'অ পিসি।'

ঘাড় ফেরাল পিসি। বলল, 'দেখ কেনে, সবগলান ঘরে ঢুকেছে আর ইটোই ঢুকে নাই। ধানে নামলে ত খুঁয়াড়।'

নব বলল, 'পিসি, চাট্টি চাল ধার লিতম। ঘরে কুটুম এসেছে।'

'কুটুম। কে এল?'

'পদ্মার শ্বশুর।'

'তা এমন সময়! এত জল ঝড়ে!' পিসী ভ্রু কোঁচকাল।

'আর জল ঝড়।' নব বলল 'মেয়েজামাই কাজের লেগে ঘর ছেড়ে বেরিন্‌ছে আজ পাঁচদিন। আর ঘরে ঢুকে নাই। তাই খুঁজে এসেছে।'

'ওমা, যাব কুথা! তা কাজের লেগে কুথা গেইছে? বদ্ধমান?'

'কে জানছে!'

'দেখ দেখিন বাবু। গোবিন্দ ত বদ্ধমান আগে গেইছিল। কিন্তুক কাজ পায় নাই। কি দিনকাল এল বাবা, লুকে কাজ পেছে নেই।' পিসি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নব বলল, 'কুটুম এসেছে ঘরে পিসি। চাট্টি চালের লেগে বলছিলম। ভাত ত দিতে হবেক।'

'তা আবার লয়। ভাত না দিলে হয়! বেয়াই মানুষ।'

'তারি জন্যেই ত বলছি। আধ পাইটেক ধার দাও আমাকে।'

'চাল? চাল কুথা পাব, নব?' পিসি চোখ কপালে তুলল। তারপর নীচু গলায় বলল, 'লাজের কথা কি বলব, সকালে দুটি মাত্তর রুটি খেন্‌ছি। ছেলেগুলা ভাতের লেগে কাঁদছিল। কি করব বল। রেতে যে কি হবে ভগবান জানে। হরেন পেরুল গেইছে। সাত সিকে সের নাকি! দেখি জুগাড়যন্ত্ত করতে পারে যদি কিছু! কি কাল পড়ল রে।'

অঞ্চল অফিসের দাওয়া থেকে হাঁক শুনতে পেল নব, পরশা ডাকছে। ঘাড় ঘোরাতেই পিসি সরে গেল। নব পাশের রাস্তা ধরল। দুদিকে আঁকড় ঝোপ, খড়ের চাল মাটির ঘর অঞ্চল অফিসের। সামনেই তেঁতুল গাছ। পাতা চুঁইয়ে জল পড়ছে। ঘোলাটে আকাশ সন্ধ্যেকে হুড়মুড় করে এনে ফেলছে। চারিদিকে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে বৃষ্টিভেজা বাতাস সোঁদা গন্ধ বয়ে আনছে। সূর্যালোক না পাওয়ার জন্যে মাটি এবং উদ্ভিদের গোমরানো গন্ধ।

থাকতেও পিসি ধার দিল না, একথা বোঝার পর মাথা চিড়িক্ চিড়িক্ করছিল, কার কাছে এরপর যাওয়া উচিত! তবে চিড়িক্ চিড়িক্ ভাবটা কেটে গেল পরশার কাছে যেতেই। পরেশ থেকে পরশা। একলা মানুষ। বৌ মরতে আর বিয়ে করেনি। চাষ করে না, জনমজুর খাটে। তার স্যাঙাত।

দাওয়ায় উঠে নব বলল, 'ঘরে কুটুম এসে হাজির। ই পাশে কিছুই নাই।'

'লে বিড়ি খা।' পরশা গেঁজে থেকে বিড়ি বের করে দিল। কুটুম আসার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করল না। বলল, 'ওঃ, জল বটে মাইরি। লোহার শিকও পচে যাবেক।'

'বুঝলি, কি যে করব, বুঝতে লারছি।' নব বিড়ি টানতে টানতে বলল, 'ইদিকে সাঁজ হল। ঘরে কুটুম বসে রইছে। রেতে চাট্টি ভাত ত দিতে হবে মানুষটকে।'

পরশা কোন উত্তর দিল না।

'তু আমার কথা শুনছিস নাই!'

'শুনছি।'

'মেয়ে জামাইয়ের যে কি হল! কুথা গেল? বেপদে পড়ল কি না, কে জানছেক। শালা কি যে করব! ভাবতেও পারছি না। আবার কুটুম মানুষ ঘরে এসেছে। তা চাল নাই। কি খেতে দুব! ঘরে কুটুম রেখে বেরিন্‌ছি।'

'বেশ করেছিস। পাবি ত নাই, ঘর যা।'

'তুর কাছে নাই?'

'না, আধ পাইটেক ছিল। হরেরাম ধার নিন্‌ গেইছে। দুদিন হাঁড়ি চাপে নাই।'

'তাহলে কি করব বল্‌ দেখিনি।'

'ইখানে বসে বিড়ি খা। এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনেছি।'

নব বুঝতে পারছিল, পরশা আজ চিন্তিত এবং বিরক্ত। এমন সুরে কথা বলে না। এমন গম্ভীরও না। তবে কি ব্যাপার তা জানার আগ্রহ তার থাকলও না। আর কোথায় যাওয়া যেতে পেরে সে ভাববার চেষ্টা করে। নিরাশ সর্বত্র না হতেও পারে। বোনাই হলধর কামার তো অবস্থাপন্ন লোক। তিনটে রোজগেরে ছেলে। দিতেও পারে। কিংবা সাহাদের ঠাকরুণ কিংবা উঁচুপাড়ার গোপালবাবু—

পরশা বলল, 'চরণ শালা রইছে তুর। উর কাছে যা।'

'চরণ!' নবর ঠোঁটে বিড়ি আটকানো থাকল।

চরণ মহাজন। খালি হাতে কিছুই পাওয়া যায় না ওর কাছে। জিনিষ ফেল, টাকা মিলবে। টাকা-পিছু মাসিক সুদ দশ পয়সা।

নব বলল, 'খালি হাতে একটা পয়সাও দিবেক না শালা।'

'কদিন আগে একটো কাঁসার ঘটি দিস নাই?'

'হুঁ। তিন টাকা দিন্‌ছিল। তা ও অনেক হাতে পায়ে ধরে। বলছিল, লেহ্য এক টাকা পাও।'

'শালা।' পরশা ঠোঁট কামড়াল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'তিন টাকা দিন্‌ছিল? বল্‌ গা, উ ট তুমি কিনে লাও। বাকী টাকা দাও। না হয় চাল দাও।'

আবার উঠে দাঁড়ায় নব। বৃষ্টির মধ্যেই প্রায় ছুটতে থাকল। শেষ পেতল কাঁসা বলতে ওই ঘটিটি ছিল। তিন টাকা নিলেও ছাড়ানোর মতলবই ছিল। তা না হোক ছাড়ানো, কুটুমের মানমর্যাদা যদি ঘটিটা রাখতে পারে তাতেই সে কৃতার্থ।

নব চরণের কাছে কথাটা বলতেই তো মানুষটা হেসে সারা। থলথলে শরীরখানা দোল খেতে থাকল। বলল, 'বন্ধক দিয়েছিস ঘটি, ছাড়িয়ে নিয়ে বিক্রি করগা যেখানে খুসী।'

'তাই দেন। বিক্রি করে তিন টাকা শোধ করে দুব।'

'মাথা খারাপ।' চরণের চোখ-জোড়া দুলতে থাকল। বলল, 'বন্ধকের জিনিষ

দেব কেমন করে? টাকা আন। সুদ দিয়ে ছাড়া।'

'সব দুব। ঘটি ট দেন। গাঁয়ের মানুষ। নিয়ে আমি ত গাঁ ছেড়ে পালাব না।'

'আহা, পালানোর কথা বলছি!' চরণ বলল, 'হ্যাঁরে নবে, তুই কি আমার অচেনা? তবে কি জানিস্, যার যা দস্তুর। বন্ধকী কারবারে ওসব চলে না। তা আমার কাছে বিক্রি কর। আর আট আনা পয়সা দুব।'

'আট আনা!'

'সুদ ধরলে ঠিকঠাক আট আনাও পাবি না।' একগাল হাসল চরণ।

নব পয়সা নিয়ে দরদস্তুর করতে গেল না। বলল, 'বাবু চাট্টি চাল দেন। সেরটেক দিলেই হবে।'

'চাল! চাল পাব কোথা!' চরণ বলল, 'তুই এমন কথা বলিস, নব!'

'একসের না হোক আধসের দেন।'

'খেপেছিস্।'

'আজ্ঞে বাবু, ঘরে কুটুম এসেছে।'

'গম নিয়ে যা। এক কেজি গম দিছি। তাহ'লে ঘটিটা আমাকে বিক্রী কর।'

'গম নিয়ে কি করব বাবু? ভাঙ্গব কুথা?'

'আটা নাইরে। কি করব বল। থাকলে আর আমি না-দেওয়া করি। বল না কবে তোকে ঘুরিয়েছি?' চরণের মুখে সুন্দর হাসি জড়িয়ে থাকে।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়। বৃষ্টির ছাড়ান নেই। ঘোরার ক্লান্তি পায়ের কাদার মত জড়িয়ে থাকে। হাঁটতে দেয় না। চারিদিকে কেবল বৃষ্টির শব্দ। অন্ধকার। অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে। একটানা বর্ষার পোকাদের তার সঙ্গে ঐক্যতান। ভেজা শরীর এখন হাড় অব্দি কাঁপিয়ে দেয়। একটা লেপমুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ার জন্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

ঘরের সামনে আসতে লম্ফ হাতে কুটুমই এগিয়ে আসে, 'দেখ, দেখ তোমার ছেলেদুটোর কাণ্ড দেখ, মারামারি করেছে দুটোতে। একজুনার দাঁত ভেঙেছে। একজুনা হাতে কামড় বসিন্‌ছে। সে রক্তারক্তি কাণ্ড। কিছুতেই ছাড়াতে লারি।'

নব ভয়-পাওয়া গলায় বলে ওঠে, 'কেনে? মারামারি কিসের লেগে?'

'আর কেনে! আমার পাতে যি ভাত পড়ে থাকবেক, তাই কে খাবেক, তাই লিয়ে। তা তুমিই বল, তিনদিন ভাতের মুখ দেখি নাই। পাতে কি কিছু পড়ে থাকবেক? তা যদি বুঝে! আঁ, শুধু শুধু মারামারি।'

একটু থামার পর লম্ফের লালচে আলোয় ক্ষুধার্ত মুখের ভয়ঙ্কর দুটি চোখের গোল তারা জ্বলতে থাকে, 'তা পেলে? চাল পেলে? ভাত হবেক?'

মজুরি

শাবল ঢুকিয়ে আসুরিক বলে পাথরটাকে ঝাঁকুনি দিতে এতক্ষণে নাড়া খায়। 'লড়েছে গো' হাঁপের মধ্যে একটা উল্লাসের স্বর ছিটকে বের হয় লখার মুখ দিয়ে। যার উদ্দেশে এই স্বর সহসা সে, 'এই গো দেখ, দেখ গাড়ি আটকিন্‌ছে কাদাতে,' বলে ওঠে ব্যস্ত স্বরে। শাবল ছেড়ে লখা চোখ লম্বা করে। কালো ঝাঁকড়া চুলের মাথা পেশীবহুল এই শরীর রৌদ্রঘন সকাল-বেলায় দরদর করে ঘামছে। তার ধারা নেমে আসছে কুলকুল করে। কোমরে একটুকরো সাদাকাপড় বর্ষার ঘোলা জলে বিবর্ণ। নেংটি মেরে গায়ে যেন চিটিয়ে আছে উরুর ওপর। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথার চুলে তেলহীন রুক্ষতা। বেঁটেখাটে মানুষ। কিন্তু খোদাইকরা কালোপাথুরে শক্ত শরীর, বড় মাথা, ড্যাবডেবে চোখ, চাপা নাক। কোমরে দুহাতে রেখে দেখে—গাড়িটা কাদায় আটকানো। কাদাতেই বসে পড়েছে একটা বলদ। গলা লম্বা করে মুখ ঘষড়াচ্ছে। গাড়োয়ান ব্যস্ত হাতে লাঠি দিয়ে পিটুতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। গাড়োয়ান সঙ্গে সঙ্গে চাকা ধরে ঠেলা লাগাল। মুখে হে হে রে রে রে বিচিত্র গাড়োয়ানী স্বর হাঁপের সঙ্গে মিশে বিকৃত আওয়াজ তুলতে থাকল। কিন্তু গাড়ি নড়ে না। গাড়োয়ান ব্যস্ত হয়ে একবার এ চাকা একবার ও চাকা ছোটাছুটি করে। মুখের শব্দটা উৎকট হয়ে ভেসে বেড়ায়। পাশেই সিগারেট হাতে বাবু।

লখা চোখ ফিরিয়ে পাথরটাকে দেখে। এখনও বোঝা যাচ্ছে না আকৃতিটা। তবে বিরাট নয়; এটাই সান্ত্বনা। শাবল চালিয়ে পাথরটার পাশে গর্ত খুঁড়ে যখন নাড়া দেওয়া গেল তখন উঠবেই। এবং সে একাই পারবে। হাতে ধুলো ঘষে আবার শাবলটা ধরল লখা। তারপর পাথরটার পাশে ঢুকিয়ে চাড় দিতে থাকল প্রচন্ড শক্তিতে।

শাঁখার চোখ এখনও গাড়ির দিকে। হাতে তার হাতুড়ি ধরা। গায়ে ন'হাতি লালপেড়ে নীল কাপড়, রঙ উঠে গেছে। হাতে কাঁচের চুড়ি। কানে পিতলের দুল। গলায় পুঁতির হার। গায়ের রঙ লখার মতো কালো নয়। উজ্জ্বল শ্যামলা। মাথায় মুঠোখানেক চুল। ছোট্ট খোঁপা কাঁটায় আটকানো। রোগা দোহারা শরীর। তবে যৌবনের একটা তীব্র সজীবতা আছে।

পাথরটা উঠলেই ভাঙতে বসবে শাঁখা। ছোট্ট ছোট্ট টুকরো করা চলবে সারাদিন ধরে। চার বিশ পাথর চাই কুড়ি টিন বাবুদের। ছাদ ঢালাই হবে। বিশের দাম ছ'টাকা। অর্থাৎ তেল ঘিয়ের বড় টিনে পাথর। বাবুরাই গাড়ি দেবে, গরু দেবে, বয়ে নিয়ে যেতে হবে এদের।

পাথরের অভাব নেই এ অঞ্চলে। মাঠে ঘাটে রুক্ষ প্রান্তরে ধানক্ষেতে খালে পুকুরে চ্যাঙড়া চ্যাঙড়া পাথর পড়ে আছে। আবার কোথাও কোথাও মাটিতে চোট মারলেই যেন পাথরের খনি। একটার পর একটা যেন লাগানো। আশেপাশে গাঁয়ে বাড়ি তৈরী হচ্ছে এখন। ছাদ ঢালাইয়ের পাথর চাই।

লখা এবং শাঁখার এখন এই কাজ। মেয়ে-মরদে এই ঘোর হা-অন্নের দিন ভাদ্র মাসে মাঠে ডাঙ্গালে পাথর খুঁড়ে পাহাড় করে। তারপর ভাঙে ঠন্‌ঠন্‌ ঠনাৎ ঠনাৎ। আগুনের কণা ছিটকে ছিটকে পড়ে। বড় বড় পাথরের চ্যাঙড়া নিমেষেই টিলি।

মাটিতে গেদে-থাকা পাথরটা এখন বারবার ঝাঁকুনি খেয়ে আলগা হয়ে গিয়েছে। শাবলটা পুরোপুরি নয় অর্ধেক ডুবিয়ে উল্টে দিতে হবে। তারপর মারো শাবলের বাড়ি। ঠিকরে আসবে শাবল। কিন্তু মানুষের শক্তির কাছে হার তার। টুকরো টুকরো হতেই হবে!

শাবলটা লাগিয়ে লখা ডাকল,'এই ইদিকে আয়!'

'কি হবে?' চোখ টেনে হাসল শাঁখা। বুঝেছে মানুষটা কেন ডাকছে।

'দু'জনাতে ঠিলে উল্টে দুব।' শাবলটা উঁচু করে লখা এক হাতে কপালের ঘাম মুছে বলল।

'ই কি গো, ইকা উল্টে দিবার মুরোদ নাই!' ঠোঁটে হাসি নিয়ে বলল শাঁখা। ঠোঁট কামড়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকল ভ্রূ কুঁচকে।

'তবে রে!' লম্বা শাবলটা ঢুকিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে চাড় দিতেই পাথরটা উল্টে গেল। তারপরই শাবল ফেলে ছুটে এল।

শাঁখা হাতুড়ি ফেলে, 'ও মা গো, লুক দেখছে,' বলে ছুট। খানিকটা ছুটে ঘাড় ফিরিয়ে সে মানুষটাকে দেখে কাপড়ের আঁচল দাঁতে কাটতে থাকল।

'আয়! দেখ মুরোদ আছে কিনা। ধরে তুকে ছুঁড়ে দিব।' লখা মাথা ঝাঁকিয়ে খদখদে দাঁতে হাসল।

'আছে! আছে!' শাঁখা হাসিমুখে ভয়ের স্বর মিশিয়ে হার মানল। নইলে উপায় নেই তার। মানুষটা দুহাতে জাপটে কোলে তুলে নেবে তাকে। এমনিতে তো দু'হাতের চাপে মনে হয় হাড়গোড় ভেঙে যাবে। বাব্বাঃ ব্যথা ধরে যায় শরীরে। তবু সুখ। কিন্তু এখন দিনের বেলা। তার ওপর অদূরে গাড়ি আটকে মানুষ দুজন! ছিঃ ছিঃ তাদের নজরে পড়বে না! মানুষটার না হয় লজ্জা নেই। কিন্তু তার তো আছে। তার চেয়ে হার মানা ভালো।

শাঁখা অবাক হয়ে মানুষটার ক্ষমতার কথা ভাবে। তাও যদি খেতে পেত পেট পুরে রোজ। মাংস ডিম দুধ ঘি নয়, পেট পুরে ভাত। শাঁখা জানে তাহলে এক মানুষ দশ মানুষের কাজ করত। চাষের কাজ শেষ হলে আর পেট পুরে ভাতের কথা ভাবা যায় না। ধানক্ষতের সবুজ শরীরগুলো কবে হরিদ্রাভ হবে, কবে সোনার ফসলের ভারে নতশীর্ষ গুচ্ছগুলি দোলা খাবে, তারই অপেক্ষায়

দিন কাটাতে হয়।

এরা মেয়ে মরদে অবশ্য চাষী নয়, মজুর। কিন্তু চাষের কাজ ফুরোলে অন্য কাজ কোথায়! ধান পাকুক ডাক পড়বে। কিন্তু পেট মানে না, শোনে না। সারাদিনভর তাই পাথরের সঙ্গে পাথর হওয়ার শক্ত খেলা। কাল ভাত হয়েছিল। সকালে ভিজে ভাত এক বাটি। মেয়ে-মরদে তাই গিলে এসেছে। আসার সময় পেটে কিঞ্চিৎ ভার ছিল। এখন হলকা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার পেট চুঁইচুঁই আরম্ভ হবে। উপায় নেই। বিকেলে বাবুঘরে গিয়ে টাকা নিয়ে চাল কেনা, তারপর ভাত ফুটানো। বাটি-ভর্তি ফেন ভাত খাওয়া।

ভাদুরে গরম গমগম করছে এই সকালবেলায়। বাতাস রয়েছে। গুমোট নেই। গায়ের কাপড় উড়ছে ফুরফুর করে। মাথায় শুকনো চুল কপালে পড়ছে। শাঁখার দাঁতে কাপড় আটকে থাকে। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে আসে। আসতে আসতে বলে, 'দেখ দেখ খালি গরু মারছে। চাকা উঠছে না।'

লখা পিছন ফিরে বসে পড়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে গাড়িটা দেখে না। চোখ শাঁখার ওপর পড়ে থাকে।

সামনে এসে দাঁড়াল শাঁখা। চোখ পাথরটার দিকে। বিরাট পাথর নয়। ও এই ছুটুপাথর!—বলতে গিয়েও সামলে নেয়। মানুষটা রেগে যেতে পারে আবার। বলে, 'এই চল কেনে!'

'কুথা?'

'গাড়িটকে দু'জনা'তে তুলে দি গা। আহা বিচারা গরুগুলা মার খেছে। আশেপাশে লুক নাই।' শাঁখা আর একবার দেখে নেয়।

ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। উঁচু-নীচু ভুঁইয়ে ভাদ্রের সবুজ তরঙ্গ। মানুষজন দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর একজোড়া টিয়া শব্দ করে উড়ে গেল। আকাশ পরিষ্কার। লখা শাবলের একটা জোরালো বাড়ি দিল পাথরটায়।

'উ দিকে লিয়ে যাবে না?' শাঁখা কালকের ডাঁই-করা টুকরো পাথরের স্তূপের দিকে তাকাল।

পাথরটাকে উল্টে উল্টে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু লখা তা করল না। বলল, 'ইখানেই ভাঙ। দেখি হাতুড়ি।'

'তুমি জিরেন লও।' শাঁখা পাথরটার ওপর এক পা রাখল। চোখ গাড়ির ওপর থেকে সরেনি। ওদিকে গাড়োয়ান এখনও ছাড়েনি। চারপাশ কাঁপিয়ে হাঁপের সঙ্গে বিচিত্র বিকৃত গাড়োয়ানী স্বর ছুঁড়ছে। তার সঙ্গে গদ গদে খিস্তি—পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে এখন থেকে। সন্দেহ নেই মাটির পথে পুরু করে মাটি ফেলায় যে হাঁটু অব্দি কাদা হয়ে গিয়েছে তাতে মানুষ হাঁটতে পারে না, গাড়িও চলে না। এ গাড়োয়ান তা জানে না, নিশ্চিত করেই দূরের গাড়ি। গরুগুলো মার খেয়ে ঘুরপাকে চলার পথ কঠিন করে তুলছে। মানুষ না চাগালে কাদাতেই থাকবে।

শাঁখা আবার বলল, ‘ কি গ আমার কথা কানে যেছে নাই? চল।’

লখার উৎসাহ্ দেখা গেল না। বলল, ‘কাদা ঠিলে যেতে পারবে নাই!’

‘পারলে আটকিন থাকে!’

‘তা কাদা দেখে গাড়ি নামালে কেনে!’ চোখ নাচাল লখা।

‘লতুন লুক নিশ্চয়।’ হাতুড়িটা শব্দ করে ফেলে দিল শাঁখা।

সামনে গোটাকেয়ক ক্ষেত, একটা ডোবা, তার ওপাশে পথ। খেজুরগাছ একটা মাঝে রয়েছে। বেশীদূর নয়। ওদের নজর নিশ্চয় পড়েছে। কিন্তু হাঁব পাড়ল না কেন! না পাড়ুক! বিপদে পড়েছে মানুষ, তবে লখার কেন যে রাগ হয়। কাদা দেখে গাড়ি নামায় কোন হাঁদারাম। কিন্তু হৈ হৈ করে গরু পিটুবে তাই কি সহ্য করা যায়! একটা বিড়ি আছে, দেশলাই নেই। ওদের কাছে গিয়ে বিড়িটা ধরাবে।

‘তুমার মুন নাই না-কি?’ শাঁখা বাঁকা চোখে তাকাল, ‘মানুষের উপকার হবেক।’

‘কে বলেছে মুন নাই?’

‘তাহলে চল।’

ওরা সামনে যখন দাঁড়াল, তখন দেখল মিথ্যে নয়। অচেনা গাড়োয়ান এবং বাবুমানুষ। নইলে কি কাদায় গাড়ি নামায়! বাবুমানুষটি সিগারেট ধরিয়েছেন। কোনো উদ্বেগ নেই। নির্বিকার মুখ। গাড়োয়ান একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ ঘোরে। গরু দুটো যেন পাথর। কাদায় পড়ে দুটিরই ছোপ সারা গায়ে! ভীরু চোখে রাজ্যের ক্লান্তি।

লখা সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কুথাকার গাড়ি বটে গো?’

‘তাঁতিপাড়া।’

‘অ, লাও গরু ডাকাও। আমি চাকা তুলে দিছি, যা কাদা।’ লখা পিছনে দাঁড়িয়ে উ়দলের বাঁশে হাত রাখল। শাঁখাকে বলল, ‘উদিকে তুল।’ গাড়োয়ানের চোখে চোখ রেখে বলল, ‘ঢেকট কাদা বটে।’

‘তাইত দেখছি। অত লজর দি লাই। তার জন্যে আটকে গেল।’ গাড়োয়ান ঘামে ভেজা মুখে আফসোস করল। তারপর ক্ষোভ নিয়েই বলল, ‘তার ওপর খালি গাড়ি ত লয়।’

‘তাই না-কি?’ ভিতরে চোখ ফেলল লখা। উঁচু উঁচু ঠেকছে।

‘হ্যাঁ, তিন বস্তা চাল আছে।’

চাল! তিন বস্তা চাল! তিন বস্তা চালে কত ভাত হয়! দু’চোখে তীব্র ক্ষুধা নিয়ে শাঁখা আর লখা পরস্পরের মুখ দেখে। তিন বস্তা চালে এক ঘর ভাত হয়! সাদা ধবধবে ভাত একঘর! আঃ! চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করতে থাকে ছবিটা। চাল নাই। দুয়ারে দুয়ারে টাকা নিয়ে ঘুরলে এক টাকার চাল জোটান শক্ত এখন। সেখানে তিন বস্তা চাল!

লখার মুখ ফসকে যায়, 'তিন বস্তা চাল!'

শাঁখার মুখ ফসকে যায়, 'তিন বস্তা চাল!'

বাবু বললেন, 'নে নে কথা বাড়াস না। তুল।'

'তুলছি বাবু।'

দু'দিকের উদল মেয়ে-মরদে কাঁধে নিতে গাড়ি আলগা হল। গরু জোড়াকে ডাকাতেই তারা চলতে সুরু করল। বেশ কাদা ওই বাঁক পর্যন্ত। তারপর মাটিবসা খড়খড়ে পথ। গাড়ির ভার দু'জনের কাঁধে সম্পূর্ণ। ভেঙে যাবে যেন শরীর। কেউ কোনো কথা বলে না। কুঁজো হয়ে দম ধরে কাদায় পা গেদে গেদে হাঁটতে থাকে। গাড়োয়ান তারস্বরে হে হে রে রে করে চিৎকার জুড়ে দেয়।

বাবুমানুষ পাশে হাঁটছেন। ঠোঁটে সিগারেট। বড় বড় চোখ করে তিনি দেখছেন। কাঁধে তুলে যেন খেলনা নিয়ে যাচ্ছে অবলীলাক্রমে। মেয়ে-মরদের মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। গাড়িখানা ঠিকই চলছে উঁচু হয়ে। এত শক্তি এরা পায় কোথা থেকে! তিন বস্তা চালের নামে মুখচোখ হয়েছিল যেন কেমন! তিনি তো দস্তুরমতো ভয় পেয়েছিলেন। এমন পথঘাট, মানুষজনের দেখা নেই। যা শক্তি তাতে তাদের দু'জনকে চিৎপাত করে লুট করে নিলেও কিছু করার ক্ষমতা নেই। কাদা পার করতে দেখে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত। ভালোয় ভালোয় সরে পড়তে পারলে হয়। কাদার সীমাটা কি দীর্ঘ।

কাদার সীমা শেষ হতে ওরা গাড়ি নামিয়ে দিল। হাঁসফাঁস করে বসে পড়ল না। গাড়োয়ানকে বলল, 'দাও হে একবার দেশলাইটা দাও।'

'দেশলাই ত নাই!'

'ধুস্। আছেট কি তাহলে!' লখা হাসল। শাঁখা গায়ের কাপড় ঠিক করছিল পিছন ফিরে। বাবু ভাবছিলেন কি দেওয়া যায়, আনা চারেক পয়সাই যথেষ্ট! এই তো সামান্য কাদা। কিন্তু যদি রাজী না হয়! এক টাকা খসাবে না-কি! বললেন, 'কি বলছে রে?'

'দেশলাই চাইছে।'

'এই নে দেশলাই।' ছুঁড়ে দিলেন বাবু।

লখা কুড়িয়ে নিয়ে ফস করে বিড়ি ধরাল। তারপর গাড়োয়ানের হাতে দেশলাইটা ফিরিয়ে দিল।

বাবু বললেন, 'তোরা না এলে ঠিক আমরা কাদা পার করতাম।' ওদের ঠিকঠাক দাম বুঝতে না দেওয়ার জন্যেই বাবুর এই কায়দা। চার আনাতেই রাজী হয়ে যাবে। বেশী প্রশংসা করলে—কি ভাগ্যিস তোরা ছিলি, বললেই লাই পাবে। চারকে আট কিংবা এক টাকা দাবীও করতে পারে।

লখা খদখদে দাঁতে হাসে, 'তা পারতেন। কিন্তু কাদা খুব।'

শাঁখা ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'তা এতেকখুন গরু পিটুছিলেন কেনে!'

বাবুর ভ্রু কুঁচকে উঠল। সিগারেটে টান দিয়ে ভাবলেন, মেয়েটাই চালিয়াৎ বেশী। বললেন, 'ঠেলতে সময় লাগছিল।'

খলখলিয়ে হাসল শাঁখা, 'সারাদিনভর ঠেলতে হত বাবু।' তারপর লখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল।'

বাবু এটা আশা করেননি। দাবী করছে না। না-কি এটাও চালাকি! পা বাড়াচ্ছি মানেই ছাড় পয়সা। তবে ওদের দাবীর আগেই দিয়ে দেওয়া ভালো। পকেটে হাত ভরে বললেন, 'নে চার আনা। তোরা গাড়ি তুলে দিলি। সামান্য কাজ। চার আনাই দাম এর।' বাবু সিগারেট টানলেন।

'না বাবু!'

'চার আনা নয় ত কত? এক টাকা?' বাবুর ভ্রু কুঁচকে উঠল।

'না বাবু!'

'তাহলে এক টাকাও নয়। দু'জনায় দু'টাকা লিবি। আঁ এ যে গলায় ছুরি। দে বাবা গাড়িটা কাদাতেই গেদে দে!'

শাঁখা খলখলিয়ে হেসে যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল।

লখা বলল, 'পয়সা কেনে দেবেন গো। গাড়ি আটকিন ছিল, বেপদে পড়েছিলেন, তুলে দিলম।'

ঠিক এই উত্তর আশাপ্রদ ছিল না। ফলে মুহূর্তে বাবুর ফরসা মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। কথা বেরুল না তাঁর। পাথরের মতোই তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন।

ওরা হাঁটতে শুরু করেছে ততক্ষণে। তারপর পাথর ভাঙতে শুরু করছে চুপচাপ। ওদিকে গাড়ি ছাড়ল। পথ ধরে গাড়ি চলেছে শব্দ করে।

লখা বলল, 'বাডা খিদে লেগেছে। বিকেল হলে তু যেঁয়ে ভাত বসাগি গা।'

'চাল নাই যি।' শাঁখা নীচু মুখ তুলল না।

'আহা পাথর ভাঙার দাম বাবুরা দিবেক নাই? চাল কিনে ভাত বসাবি গা! হ্যাঁরে, চাল কিনতে পাবি ত। সব শালা বলে চাল নাই।' লখা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভাদর মাসে খিদে বটে মাইরি।'

শাঁখা মানুষটার মুখের দিকে তাকাল একবার। তারপর ঠনাৎ ঠনাৎ করে পাথর ভাঙতে সুরু করল। লখাও সুরু করেছে। মেয়ে-মরদের শক্ত হাতে লোহাপাথর ঘর্ষণে আগুনের কণা ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকল আশেপাশে।

বাঘথাবায় শিকারি

মুখে পান, ঠোঁটে বিড়ি ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শামু। পঁয়ত্রিশ বছরের কালো ঢ্যাঙা লম্বা মুখো পুরুষ। পাজামার উপর ঘি রঙ টেরিকটনের পাঞ্জাবি। হাতের অদৃশ্য বন্দুকের নলের মাছিটাকে কার উপর বসাবে তারই তাক করছে।

বিস্তর মানুষ। মেলা বলে কথা। আশপাশের গাঁ ভেঙে মানুষ মধ্যনিশীথকে সরগরম করে তুলছে। বিদ্যুতের জোরালো আলোয় মাথার উপর অমন গোটাগুটি চাঁদটা ভারি বিষণ্ণ। জ্যোৎস্না নামিয়ে বেচারার যেন বড়ই বিভ্রম। কোথায় যে হারিয়ে গেল তার জ্যোৎস্না। জ্যৈষ্ঠ মাসের খরা দাগা দিনের পর নরমগরম রাত্রি। চতুর্দিকে ছড়ানো দোকানপাটে কেনা বেচা। ওদিকে মরণকূপের আহ্বান, মিনি সার্কাসের ঢাউস জামা প্যান্টপরা জোকারের অঙ্গভঙ্গি, ভি ডি ওর ডাক, টেপরেকর্ডার, স্টিরিও, মাইকের গর্জন, ঢাক বাজিয়ে চড়ক ভক্ত্যা বা দেয়াশিদের উদ্দাম নৃত্য। সব কিছু মিলে বিকট শব্দ।

কাল ছিল বুদ্ধ পূর্ণিমা। ধর্মরাজপুজো। আজ চড়ক। গাঁয়ের নাম মেটেলা। ধর্মরাজের জন্যে বিখ্যাত গ্রাম। ধন্য গ্রাম মেটেলা। যেখানে এমন জাগ্রত দেবতার অধিষ্ঠান। দেবতার মহিমা দর্শনে আগত এত মানুষের মধ্যে শামুর শিকার একজন হলেই হয়ে যায়। কিছু হাতাতেই হবে।

শামু বড়বোন শান্তির বাড়িতে থাকে। কাঁহাতক আর ওর ঘাড় ভেঙে খাওয়া যায়। জামাইদাদা গোড়ায় ঠারে ঠোরে ভাত দিতে হচ্ছে বলে কথা বলত, এখন সরাসরি দেগে দেয় তীক্ষ্ণ কথার হুল। বলে, দিদির কী তেলকল দেখেছে ভাইটি? বসে বসে খেছে। বেটা ছেলে, বসে থাকে কী করে! গাঁয়ে কিছু হবে না। বাইরে দেখ গা, দুবরাজপুর যাও।

জামাইদাদা চাষ করে। অবস্থা খারাপ নয়। কিন্তু বড় কৃপণ। আরে শালা বলে কথা, তার সঙ্গে কী না শেয়াল কুকুরের মত ব্যবহার, দু'চোখে জ্বালা ধরান চাউনি ফেলা, ভাতের থালা দেখে বলা, পেটটি ত হাঁড়ির মত করেছ। এই যে জামাইদার পাজামা পাঞ্জাবি পরে এসেছে, তাতে শুধু শালা তাকে বলবে না, শ্বশুরকেও ওই সম্বোধন থেকে রেহাই দেবে না। তবে দিদি আছে। জামাইদাদার মুখ ঘষে দেবে। প্রায় দিদি কাঁদ কাঁদ মুখে বলে, 'ভাইটিরে, থাকিস না। ইখান থেকে চলে যা। মনে করবি, দিদি মরেছে।'

মায়ের পেটের ছোটভাইকে বড় মায়া। ভাগনেটিরও মামা টান আছে। তবে টাকা ছুঁড়তে পারলে এই টান আরও গাঢ় হত। আর জামাইদাদাও নিশ্চয় হাতে

টাকা পেলে বলত, শালাবাবু। বলত, থাক কেন হে আরও ক'দিন। যাবে কোথায়! সব তো তোমার গেইছে।

শামুর বর্তমান কারবার হল হাতান, দিনমানে চুরি, বাগানো, গুলতাপ্পি দিয়ে কথার ফুলঝুরি চালিয়ে লোককে বধ করা।

বংশীর দোকান থেকে প্রায় নতুন একটা টর্চ ঝেড়ে দিতে মাত্র পনের টাকা পেল। অথচ উইথ ব্যাটারি। বোলপুরে প্রাণকান্তর কুচ্ছিত মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থার জন্য দারুণ ভাল পাত্রের সন্ধান করতে যাবার নামে রাহা খরচা বাগানো গেল চল্লিশ টাকা। নেদো ঘোষের ছেলেটার রাণীগঞ্জে চাকরি করে দেবার নামে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে। নেদো দশহাজার টাকা ঘুষ দেবে। চাকরি হয়ে গেলে আরও দশ। ওটা নিয়ে সরতে হবে। আসানসোলের সুলেমানের সঙ্গে কথা হয়েছে। ও সাজবে কোলিয়ারির লেবার অফিসার।

সে তো পরের কথা। এখন মেটেলার চড়কমেলায় যে কিছু আমদানির দরকার। শিকার যে কাকে করে। ছোট জিনিস হাতান যায়, সব রাস্তার ধারে মনিহারি সামগ্রী পেতে বসেছে। চুড়ি, আলতার শিশি, কুমকুম নখপালিশ, বল-খোঁপা। ধুৎ ওসব তুচ্ছ জিনিসে কী হবে।

শামু দাঁড়িয়ে মাথা চুলকায়। এত মানুষ যে একক একটা মানুষকে ধরা যায় না। একটা বোকাসোকা মুখ, ধুতি শার্ট, গেঁয়ো মানুষ দেখে সে হাসল, লোকটাও হেসে পেরিয়ে গেল। একজনকে কেমুন আছ বলতে গম্ভীরগলাতে সে শুধু বলল, 'ভাল।' কাকে ধরে!

তো শামুকেই ধরল। পাঞ্জাবির ঝুল ধরে টান। বছর সাত আটেকের এক বালকের কচি মুখ। হাফপ্যান্টের উপর লাল ডোরা শার্ট, গায়ের রঙ শ্যামলা, ফোলা গাল। উহুঁ, ভিখারি বাচ্চা নয়।

'কী রে।' শামু ঘাড় নিচু করে জিজ্ঞাসা করে।

ছেলেটা কথা বলে না। অদূরে একটা দোকান দেখায়। তারপর টেনে নিয়ে যায়। সামান্য ফাঁকা এ দিকটা। মিষ্টির দোকান। দু'টো বেঞ্চি পাতা।

শামু দেখে বেঞ্চিতে বসে ঝিনুক। ঝিনুক না অন্য কেউ। উহুঁ, ঝিনুকই। তার বিয়ে করা বউ। বছর সাত আট আগে শেষ দেখা। কোমরে দড়ি বেঁধে তারাপুরে মুখুজ্জে ঘরে ডাকাতি মামলায় তাকে যখন ধরে নিয়ে গেল, তখন মাথার চুল এলো করে আঁচল খসিয়ে এই ঝিনুকই কেঁদেছিল। তারপর হাজতের লোহার শিকে মুখ ঘষে এই ঝিনুকই বলেছিল, 'তোমাকে মিথ্যে ধরলে গো। দেখো, আদালতে ঠিক পেমান হয়ে যাবে, তুমি ছিলে নাই। তো প্রমাণ হল না, ঝিনুক মিথ্যে জানলেও অন্য কেউ বিশ্বাস করল না। দারোগাবাবুর পায়ে পড়েছিল, করুণা হয়নি। জজসাহেবও অকরুণ ছিলেন। জেল দিয়ে দিলেন।

সবই ডাকাত বুধের জন্য। গাঁয়ে চক্রবর্তী ঘরে ডাকাতি করার সময় সাহসী সেইই বুধেকে জাপটে ধরেছিল। তখন লোকের কী প্রশংসা। 'না, বুকের পাটা

আছে বাবু শামুর,' 'আচ্ছা কাজ করেছে শামু'। 'দেখ কেনে সরকার তোমাকে পুরস্কার দিবে।'

লোকের জমি চাষ করে দিন গুজরান, মাটির খড়ো চাল ঘর লাগোয়া সামান্য খামার বাড়িতে আনাজপত্র, ঝিনুককে নিয়ে দিব্যি জীবন কাটানো তাকে অহঙ্কারী করেছিল। তবে আতঙ্ক ছিল ঝিনুকের। বলেছিল, হ্যাঁ গো বুধে ডাকাত তোমার কিছু করবে না তো, আমার খুব ডর লাগছে। ঝিনুকের ভয় পাওয়াটাই সত্যি হল। লোক মুখে শুনেছিল, বুধে বলেছে, ছাড়া পেয়ে আমি শালাকে ফাঁসাব। এবং ফাঁসিয়ে দিল। তারাপুরে ডাকাতিতে দলে ছিল বলে দিল। একা নয়, সায় দিল ওর তিনসঙ্গী।

তো বুধের যেমন শামুর উপর প্রতিশোধ নেওয়া, তেমনি শামুও তো জেল ভোগ করে প্রতিশোধ নিতে ছুটেছিল। কিন্তু গিয়ে শোনে দু ঠ্যাংই টাঙ্গির কোপে উৎসর্গ করে বুধে অশেষ ভোগান্তিতে ফলিডলের হাতে নিজেকে নিকেশ করে ফেলেছে।

ঝিনুক বেপাত্তা। বাপের ঘরেও যায় নি, দিদির ঘরও যায় নি। কেবল একটা খবর, গাঁয়ের শ্যামলী যে বার্ণপুরে লোকের ঘরে কাজ করে তার সঙ্গে গিয়েছে। ওখানে নাকি কাজের ব্যবস্থা করেছে শ্যামলী। কিন্তু শ্যামলীও বহু দিন গাঁয়ে আসে না। শ্যামলীরও ঠিকানা জানা নেই। এদিকে শ্যামুর ভাগের জমি চক্রবর্তীরা নকুলকে দিয়েছে। ভিটে খামার বাড়ি জঙ্গল, গায়ে তার জেলখাটা আসামীর দগদগে রেখা টানা। জেলে সুলেমানের সঙ্গে ভাবসাব হয়েছিল। তারই নির্দেশমত এমন কাজ কারবার। রাণীগঞ্জে সুলেমানের ঘর। শেষপর্যন্ত দিদির ঘর ছেড়ে রানীগঞ্জে ওর ডেরাতেই উঠবে মতলব করে রেখেছে। এমন সময় কী না মেটেলার বাবা ধর্মরাজ তার ঝিনুককে এনে দেয়।

বিস্ময় মেলা-ছবি বিপর্যস্ত হয়ে যায় শামুর, ফিরে পাওয়ার উল্লাস তার বুকের মধ্যে বিপুল ধ্বনি তোলে। সে আওয়াজ করতে পারে না। আকস্মিক সাক্ষাতের বিহ্বলতা উৎফুল্লতার মধ্যেও চোখে পড়ে যায় পাশে একটা পুরুষকে। এতই ঘনিষ্ট যে দিন হঠাৎ রাত্রি হয়ে যাওয়ার মত কান্ড ঘটলে যেমন বিভ্রান্তি মানুষকে বিচলিত করে তেমনি তরঙ্গ আঘাত সে পায়।

ঝিনুক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসেছে। শামুর ঠোঁট যেন শিরীষের আঠায় জোড়া, 'তুমি,' উচ্চারিতও হয় না।

ঝিনুক অতি দ্রুততায় বলে, 'পরে কথা বলব। বিশুকে মেলা দেখতে নিয়ে যাও। তুমি আমার চেনা লোক, গাঁয়ের মানুষ, স্বামী পরিচয় দিও না। এস।'

শামুর বোঝার সঙ্গতি নেই। যেন সে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে ছেলেটার মাথায় হাত রাখে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত নিজস্ব চেতনা হারিয়ে ঝিনুকের অনুসারী হয়। পা চলে। অতীত নেই, অন্তহীন ভাবনা এক দুরন্ত স্রোত ধারায় ভাসা। মেলার এত মানুষ, এত শব্দ যেন বহু দূরবর্তী। কিছুই ছোঁয় না।

ঝিনুক বলে, 'এই দেখ, চেনা লোক পেয়ে গেলাম। গাঁয়ের লোক বললাম না, ঠিক চিনেছি। তারজন্যেই বিশুকে পাঠিয়েছিলাম।'

শামু দেখে পুরু কালো ঠোঁট, বেঁটেখাটো চেহারা, গায়ে নীল সাদা ডোরা শার্ট, কালো প্যান্ট, বয়েস তার মতই হবে, ফোলা গালে স্বচ্ছলতার ছাপ, ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে সৌজন্যও প্রকাশ করে না টুকরো হাসি দিয়ে। কেমন যেন সন্দিগ্ধ চাউনি ফেলে রাখে।

ঝিনুক বলে, 'যাও তো, মেলা ঘুরিয়ে নিয়ে এস ছেলেটাকে। বাব্বা যা ভিড়, আমরা হাঁটতে পারবো না, এত ভিড়ে। এখানেই থাকছি।' লোকটার দিকে ঘাড় ফেরায়, 'কী বল!' ব্লাউজের ভেতর থেকে মানিব্যাগ বের করে দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয় শামুকে।

শামু হাতে ধরে। তারপর ছেলেকে নিয়ে মেলায় মেশে। এতক্ষণে যেন তার মধ্যে সুস্থিরতা আসে কিছুটা এবং ক্ষণপূর্বের ঘটনা ঝিনুককে ঘিরে বিস্ময় শিহরণ রেখা আঁকা হতে চায়। কেন ঝিনুক এমনটি? ওকে কী বিয়ে করেছে? জেল থেকে তার ফেরার ভরসা করেনি? ছেলেটা কে?

'আমার নাম বিশু। তুমি কে?' ছেলেটা প্রশ্ন করে।

শামু এতক্ষণে যেন ছেলের মুখ পড়ে নেয়। ঝিনুকেরই ছেলে। এত বড়টি। তাহলে কী জেলসাজা পাওয়ার পরই বিয়ে করেছিল, রক্তে ক্রোধের সর্পজিভ লকলকে করে তার। মনে হয় এই তো শিকার, এই ছেলেটা। ফলে 'তুমি কে'র উত্তর দিতে 'তোর বাপ' হিংস্রগলায় বলতে গিয়েও থমকে যায়। নরম চাউনির বড় কোমল মুখ। চোখে পড়ে ছেলের গলায় সরু সোনার সুতো।

'ধরে নে কেউ একটা হব আর কী! ওই লোকটা কে?'

'কোন লোকটা?'

'যে তোকে আর তোর মাকে এনেছে।'

'আমরা মোটর সাইকেল এসেছি।'

'ওই লোকটার সঙ্গে তো, ও তোর বাপ?'

'না। আমার বাপ নাই।'

'মরে গেছে?'

'জানি না, বাবাকে দেখিই নাই।'

'ও তোর কে?'

'পানু রায়।' ছেলেটা অবাক। বলল, 'পানু রায়কে চেন না? পানু রায়।'

'মিষ্টি খাবি?'

'না। মাংস চপ খাব। ঘুগনি খাব।'

রেস্টুরেন্টের মত দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেটা চপ ছেড়ে ডিম দেখে খেতে চায়। খেয়ে দিঘিতে ঢাকের বোল শুনে বলে, 'ও দিকে কী হচ্ছে।'

'বাণেশ্বর আসছে।'

'আমি বাণেশ্বর দেখব।'

চড়কগাছের পরিসরটা ফাঁকা। ওখানে মানুষ ঝুলে পাক খাবে পিঠের মাংসে বঁড়শির মত আংটা লাগিয়ে। আলোময় চত্বরে তারজন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে। তারপরই মস্ত দিঘি। তেল সিন্দুর চর্চিত একটা চওড়া সূচালো মুখ মানুষ সমান কাষ্ঠখণ্ড বাবা বাণেশ্বর।

শামু ভাবে, ছেলেটা তো পানু রায়কে কেন চেনে না বলে অবাক হয়েছে, যেন পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না লোকটা, কিন্তু তার তো পরিচয় জানা নেই। দরকার বটে জানার। ছেলেটাকে খুঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে। কিন্তু এই ছেলেটা কার? ঝিনুকের গর্ভেই জন্ম? তাহলে? শামুর কাছে বদলে গিয়েছে চড়করাত্রির মেলা, এমন আলোক বন্যা, এমন মানুষের সমারোহ, শিকারের জন্য আসার উদ্দেশ্য। ঝিনুকের সঙ্গে বিয়ের পরের রাত্রিগুলি, প্রেমমুহূর্ত, স্বপ্ন দেখা, গাঁয়ের ঘর দাওয়া, বিকেল বেলায় তেল সিন্দুর টিপে ঝিনুকের অপরূপা হয়ে ওঠা কত কী যে এসে যায়। শামু কোনটাকেই আঁকড়াতে পারে না। বিশুর হাত ধরে সে বাণেশ্বরকে দেখতে হাঁটে। মন পড়ে থাকে দোকানে ঝিনুকের কাছে। ঝিনুক যদি আসত, ঝিনুক যদি কথা বলত।

ঝিনুক আসে হাঁপাতে হাঁপাতে। খুঁজে বের করতে কতক্ষণ সময় নিয়েছে কে জানে। কথা বের হয় না ওর।

চড়কগাছ থেকে একধারে দিঘির পাড়ে অন্ধকার ছায়ায় চলে এসেছে ওরা। ফিকে অন্ধকারে পরস্পরকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না। যেন দূরবর্তী হয়ে পড়ার ব্যবধানটা সামনে আঁকা হয়ে থাকে আঁধার লিপিতে।

শামু বলে, 'জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে এসে দেখি তুমি নাই।'

'কী করব! পেট ত মানে না। শ্যামলীর সঙ্গে বার্নপুরে লোকের কাজ করতে গেইছিলাম। পেটে তখন বিশু এসেছে।'

'তার মানে, বিশু আমার বেটা।'

'তুমি বিশুকে পেটে দিয়ে জেলে গেইছিলে।'

'সত্যি ঝিনুক—সত্যি।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। উ তোমার বেটা।'

প্রবল আবেগে যেন অপহৃত ঐশ্বর্য আবার করায়ত্ত এমন হর্ষে সে বলে, 'তুমি আমার বউ বটে।'

'না। না। হৃৎপিন্ড ভেঙে ঝিনুকের শাড়ি ঝলমলে আবেষ্টনী থেকে এই অন্ধকারে কঠিন শব্দপাত হয়, 'আমি এখন পানু রায়ের মেয়েমানুষ—উ আমাকে ছাড়বে না—তুমি চেন না উকে।'

শামুর ঝিনুককে ফিরে পাওয়া যেন অগাধ শক্তি সঞ্চারিত করেছে। সে বুক প্রশস্ত করে বলে,'ইস—ছাড়ব না বললেই হল।'

'ওর চোরাই কয়লার ব্যবসা রাণীগঞ্জে। পিছনে অনেক গুন্ডা, অনেক টাকা।'

'থাকুক। আমিও কিছু কম যাই না।'

বিশু মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'ভেবো না ঝিনুক। আমি এখন সেই চেষো মুনিষ লই।'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। ওদিক থেকে ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে ফুলের মালা মাথায়, গলায়, নতুন কাপড়ে ভক্ত্যাবৃন্দ নৃত্য করতে করতে বাবা বাণেশ্বরকে নিয়ে আসছে। চড়ক গাছ চড়ে এরাই বাবা ধর্মরাজের নামে পাক খাবে মাংস ফোঁড়া পিঠে আঁকশি নিয়ে, জিভে বাণ ফুঁড়ে।

বিশু বলে, 'ও মা, চল।'

এখন সস্নেহে হাত রাখে শামু তার ছেলের মাথায়। স্পর্শে শরীর সলিল পাতের মত গভীর স্নিগ্ধতায় ভরে ওঠে। তারপরই রক্তে স্পর্শ অধিকার শাণিত অস্ত্র হয়, ঝলসায়। বলে, 'চল আমার সঙ্গে। ও শালার কাছে যেতে হবে না। দিদির ঘরে আছি। ওখানেই উঠব। তারপর নতুন করে সংসার।'

'কেমন করে যাই। আমার ভয় লাগে গো। বিশ্বেস কর আমাকে।'

'কোন ভয় নাই। আমি তোমার স্বামী। চল।'

খানিকটা গিয়ে মেলা চত্বর ছেড়ে বেরোবে কী, পানু রায় ঠিক ধরে ফেলে, 'ওদিকে কোথা চললে? ওই দিকে দোকানে মোটর সাইকেল রইছে। চেনা লোক পেয়ে দেখছি—। এস। এস।'

ঝিনুককে প্রায় টেনেই নিয়ে যায়। পিছনে বিশুর হাত ধরে শামু হাঁটে। সে বুঝে উঠতে পারে না, কী ভাবে প্রমাণ করবে, ঝিনুক তার স্ত্রী।

মেলায় এ দিকটা কম ভিড়। দোকানের সেই বেঞ্চি।

শামু প্রতিবাদ করে, 'যাবে না ঝিনুক।'

'কেন?' অবাক হয়ে ভ্রু কোঁচকায় পানু রায়।

'ঝিনুক আমার বউ বটে।'

'অ্যাঁ'। শব্দটা পানু রায়ের ঠোঁটে বিদ্রূপ হয়ে বাজে, 'বউ, বলছ কী হে! ও যে আমার বউ। ছিঃ ছিঃ অমন ভুল করে। খুব টেনেছ মনে হচ্ছে।'

শামু চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিথ্যে কথা। শালা, আমার বউকে লিয়ে—।'

'গাল দিও না হে।' পানু রায় এখন দোকানীকে সাক্ষী মানে, 'দেখুন, কাণ্ড!'

দোকানদার অবাক চোখে তাকায়। দুটো খদ্দের ঘাড় ফেরায়। হেঁটে যাওয়া মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ে। সকলেরই জিজ্ঞাসা কী হয়েছে।

'এই লোকটা কী বলছে শুনুন। দুশ্চরিত্রা স্ত্রী হলে এরকমই হয়। পিরীতের মানুষের সঙ্গে মেলায় এসে ভেগে পড়ছিল ছেলে ফেলে দিয়ে—'

শামু বলে, 'মিথ্যে কথা। এ আমার বউ।'

'বুঝুন, বউ বলে দাবী করছে।'

শামু অসহায় গলায় বলে, 'বিশ্বাস করুন, সত্যি ও আমার বউ।'

'চোপ।' পানু রায় দাবড়ে ওঠে। তারপর ভিড় করা লোককে সাক্ষী মানে। বলে, 'মশাই, এই মেয়েমানুষকেই জিজ্ঞাসা করুন ও কার সঙ্গে এসেছে। জিজ্ঞাসা করুন। কী গো, আমার সঙ্গে এসেছ কী না?'

ঝিনুক চুপ।

'আহা বল, এই ছেলে রয়েছে! এই বিশু, আমার সঙ্গে এসেছিস তো?'

বিশু মাথা নাচায়, 'হুঁ।'

'দেখলেন তো মশাই। মোটর সাইকেলে ছেলেবউকে মেলা দেখতে নিয়ে এলাম। তখন কী জানি, ওর নাগর এখানে আসবে। তার জন্যেই মেলা আসব বায়নাক্কা। কী বলব, আমাকে মায়া ভালবাসা না থাকুক, ছেলেটাকে তো—।' পানু রায় ঝিনুকের হাত ধরে, 'চল, চল, খুব মেলা দেখা হয়েছে। এখন ঘর চল।'

শামু চেঁচাতে থাকে, 'ও আমার বউ। ওটা আমার ছেলে।'

'মাল টেনে খেপে গিয়েছে।' পানু রায় হাসে, 'ধর্ম্মরাজ পুজোয় তো মদের ফোয়ারা।'

'ঝিনুকই বলবে ও আমার বউ কী না।' শামু চেঁচায়।

'বুঝুন, বিড়ালকে জিজ্ঞাসা করছে মাছ খেয়েছে কী না। চল-চল।' লোকের ভিড় কাটিয়ে মোটর সাইকেলে ঝিনুক আর বিশুকে বসিয়ে নেয়। ঝিনুক প্রতিবাদ করে না। যেন বিহ্বলতায় ডুবে সে এক বস্তু পিণ্ড।

মেলার লোকেরা মোটর সাইকেল বেরিয়ে যেতে শামুকে দেখে, মন্তব্য করে, ছিঃ ছিঃ অত মদ খায় হে। পরে বউকে নিজের বউ বলে, ঘরে যাও বাছা, মার খেতে খেতে বেঁচে গেলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শামু দাঁড়িয়ে থাকে অজস্র ঘৃণায় প্রচুর ক্ষোভে অমিত বেদনায়। মাথার উপর চাঁদ নিজের অলোকিত চত্বরে জ্যোৎস্না হারিয়ে যেন গভীর বিষাদে শামুকে দেখে।

শামু দাঁড়িয়ে থাকে একভাবে। সে ঠিকানা জানে না পানু রায়ের। রানীগঞ্জে খুঁজে নেবে। বিশুকে ঘরে আনবে। সুলেমান তাকে সাহায্য করবে।

নিজের নারীর জন্যে এখন ভয়ঙ্কর এক পুরুষ হয়ে ওঠে শামু। অদৃশ্য তীক্ষ্ণ নখর আর শ্বদন্তে হিংস্র এবং আদিম সেই পুরুষ যে তার নারীকে চিরকালই জয় করে এসেছে।

গণেশ বাউরীর হক

বাপ ছিল মুনিষ। বাপের বাপ সেও ছিল মুনিষ। তার বাপ সেও মুনিষ। মুনিষের বংশ। বাপ বলত, বাপের মুখে শুনেছি। বাপ শুনেছে তার বাপের মুখে। বলেছে—বুঝলি কি না বেটা ওই যি জংলাডাঙা মৌজা উ ট ছিল ডাঙা। কাঁকুড়ে পাথুরে। এখুন ধানী জমি। বাইদ। জোল। তা ডাঙা কেটে উ জমি করেছে বাপের বাপ, তার বাপ।

গণেশ বাউরী শুনে প্রশ্ন করেছে,—তাহলে জমি কেনে আমাদের লয়?

—চক্করবিরিদ্ধিতে গেইছে।

—উ কি জিনিষ বাপ?

—দেনা। সুদ। চাকার পারা বেড়ে বেড়ে যায়। সুদের সুদ তার সুদ। পাঁচটাকা ধার লিলে পঞ্চাশ, পাঁচশ, হাজার।

—বাপের বাপ জানত নাই? উ কেনে চক্করবিরিদ্ধিতে পড়েছিল?

—জানত বটে। কিন্তুক রুগ জ্বালাতে অভাবে আকালে ধার না করলে যি চলে না।

—তা চক্করবিরিদ্ধি এখুনও আছে?

—হুঁ।

—কারা করে?

—যাদের ধন আছে বাপ। টাকা সুনা।

—আমি চক্করবিরিদ্ধি করলে উ জমি পাব?

—না, বাপ উ করতে নাই। পাপ। লুকের গলা টিপে খুন করা। তু মুনিষ খাটবি। ঘাম ঝরবেক। ছম করবি। পয়সা পাবি। চাল কিনবি খাবি। মাগ ছেলেকে খাওয়াবি।

—তুমার বাপের বাপ, তার বাপ ডাঙা কেটে ভুঁই করেছিল। আমার যি হক আছে।

—নাই বাপ হক নাই। লিখাপড়া করে হক গেইছে।

গণেশ বাউরীর বাপ কবেই মরেছে। বয়স বেড়েছে গণেশের। প্রাক-যৌবনে পৃথিবীটাকে যেমন মনে হয়েছিল এখন তেমনটি ঠেকে না। অনেক ঘোর প্যাঁচ জটিলতা। দূর থেকে দেখা পাহাড় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, শুধু সবুজের আস্তরণ ছবি নয়। বেঁচে থাকার মধ্যে অনেক রক্তপাত অনেক ক্ষয়। চারটি সন্তান। ওদের মা ঝি গিরি করে। মাসে পাঁচ টাকা। জলখাবার পায় মুড়ি চা। বছরে একজোড়া শাড়ি। সে মুনিষ। খাটালি পেলে সাড়ে তিন টাকা তার একদিনের

শ্রমের দাম। তা যে কোন কাজই হোক। সবই অনিয়মিত। কিন্তু নাচার পেটের দিব্যি নিয়ম। দু'বেলা ঠাসা চায়। না পেলেই নাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি।

এ সবের মধ্যে গণেশ বাউরী ভুলে গিয়েছে তার হকের কথা। ভাতের হাঁড়িতে ফোটানর মূল উপাদানটির জন্য সর্বদাই তার ঝাঁকড়া চুলো মাথার শুকনো পুরু ঠোঁটে মুখে দুঃশ্চিন্তা। উঁচু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রাখে। বেঁটেখাটো কালো মানুষটির শীত গ্রীষ্মে সর্বদাই উদোম গায়ে কোমরে ক্ষুদে টেনাটি দীর্ঘ হয় না। ভেঙে পড়া বিষণ্ণতা উত্তর চল্লিশেই ন্যুব্জতা এনে দিয়েছে। হক মানে অধিকার। অভাবতাড়িত গণেশ বাউরী তার কোন হকেরই খবর রাখে না।

অঞ্চল অফিসের সাহাবাবু বলতে গণেশের মনে পড়ে গেল বাপের কথা। বাপের বাপের কথা।

সাহাবাবুর ঠোঁটে সবসময়ই বিড়ি চিটিয়ে থাকে। সাদা হাফশার্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। সাইকেল নিয়ে টুঁড়ে বেড়ায় চারদিক। সেক্রেটারি। গরমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে গেল সাহাবাবু। রেশনকার্ড, রিলিফ, লোন সাহাবাবু। মানুষটা খেঁকিয়ে উঠলেও মুখ্যুসুখ্যু তাদের সব করে দেয়।

—গণেশ দরখাস্ত কর। জমি পাবি।

—সি ত আপুনি লিখবেন!

পানে ছোপপড়া দাঁত বের করে লম্বা গুঁফো নাক চ্যাপটা মানুষটা যেন কামড়াতে এল—হ্যাঁ, আমি দরখাস্ত করব না তো কে করবে! আমার মরা বাপ যে লাঙ্গল মারতে আসবে!

গণেশের পাহাড় দুঃখ থাকুক, হাসতে পারে। চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে ওঠে। বলে, তিনি সগ্‌গে গেইছেন। তাঁকে টানেন কেনে! তা জমি পাব?

—জমি তো আমার কোমরের গেঁজেতে। আমারই হাত। খুলে দিলেই হয়। বিভূতি গুহকে বলগা। তোর ত মাটি নাই!

—তা লিখে দেন। মুরগী ডিম দিছে না। দিলেই দিয়ে আসব।

—হ্যাঁ মনে করে দিয়ে আসিস। লিখে দেব এখন। জংলাডাঙ্গা মৌজার জমি। ডাকলে রা কাড়ে।

—উ জমিতে আমার হক আছে বাবু!

—হক। সাহাবাবু চোখ পিটির পিটির করল, বলিস কি! তোদেরও হক আছে। আমি তো জানতাম তোদের খালি উপোস দেবার হক আছে। হা কাজ করার হক আছে। নিজেদের ছোটলোক ভাবার হক আছে। বলি বেঁচে থাকার হক নাই যেখানে, জমির হক। তাজ্জব করলি যে।

সাহাবাবুর বলার ভঙ্গিতে গণেশ লজ্জা পায়।

—তা হকের লেগে কি করছ সোনার চাঁদ!

—জংলাডাঙ্গা মৌজার জমি আমার বাপের বাপ, তার বাপ, তার বাপ—।

—এসে তুকে দিবেক। যত সব। বিকেলে যাবি। দরখাস্ত লিখে দেব। বিভূতিবাবুকে বলব।

পুরোন সাইকেলে শব্দ বাজতে বাজতে সাহাবাবুর চলে যাওয়ার পর গণেশের মনে হল, যাক তাহলে সাহাবাবু তাকে মনে করেছে। কিন্তু খুসী হল না। হকের কথাটা ভাল করে না শুনে তাচ্ছিল্য করাটা সে বরদাস্ত করতে পারে না। কষ্ট হয়। ভারী কষ্ট হয়। মন উসখুস করে। জমি, ভেস্টের জমি পেয়েছে গাঁয়ের অনেকেই। সে পায়নি। দরখাস্ত করেও না পেতে পারে। কিন্তু জংলাডাঙ্গা মৌজার জমির উপর তার যে হক আছে, তা শুনবে না কেন!

ঘরে ফিরে কানির মাকে বলতে গেল। বড় মেয়ের নাম কানি। ছা সমেত ছাগলীটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছাগলীর মালিকানা কানির মায়েরই। স্বামী হলেও তার অধিকার নেই জন্তুটির উপর। স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যার মধ্যে পয়সার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন। স্ব স্ব পুঁজি একটা করে আছে। দু'চার টাকা সেই গুপ্তধন তুল্য। এ সব নিয়ে লেড়ো বিস্কুট, চানাচুর, তেলেভাজা খায় আড়ালে। ছাগলীর পাঁঠাছানাটা বেচে কানির মা একটা শাড়ি কিনবে। এখন থেকেই ঠিক করে রেখেছে। যা হোক, ছাগলীটার চিন্তাই তার বেশি।

কানির মা বলল,—রাখ ত তুমার হক। ওই নিয়ে ধুয়ে খাবে। পাঁঠিটি কুথা গেল এখুন দেখ গা!

গণেশ আরও বিষণ্ণ হল। ভেতরের ফুটন্ত টগবগে উৎসাহটা কিন্তু মরল না। কানি নিয়ে এল ছাগলীটাকে। আবার সে কথা পাড়ল। স্বপ্ন দেখান গেল না মেয়েমানুষকে। তবে কথা বলল।

—জমি তুমাকে দিবে? জিজ্ঞাসা করেই নিজেই উত্তর দিল,—তাহালেই হয়েছে।

—দিবার কথাই। আমি ত এমনি পাব না। আমার হক আছে। জানিস বাপের বাপ—।

কানির মায়ের বহুবার শোনা। কপালের রুক্ষ চুল এক হাতে সরাল। দাঁত বের করে দৃষ্টি শাণিত করে বিদ্রূপ হেনে মাথা নাচাল,—জানি। জানি। রাজা ছিল ত। ঘরে ধানের গোলা ছিল। গরু বাছুর—

গণেশ আর কথা বাড়াল না। মেয়েমানুষের সঙ্গে চৌদ্দবছর ঘর করছে।

সাহাবাবু লিখে দেবেন। কিন্তু দেবার মালিক বিভূতিবাবু। জি এল আর অফিসে তিনিই লিস্ট পাঠাবেন। খতিয়ান, দাগ নম্বর বেছে বেছে নাম। ওতেই বিলি হবে। বিভূতিবাবু বক্তিমে করেন, মিটিং করেন, মিছিল করেন।

বড় কষ্ট মুনিষের কাজের। কখনও জোটে কখনও জোটে না। দিনের পর দিন কাঠ উপোস। এই যে রুক্ষ চৈত্রদিন—খাঁ খাঁ করছে মাঠ, তাপে গ্রীষ্মজর্জরতা এ সময় জমির কাজ নেই। হঠাৎ কোন বাড়িতে মুনিষের কাজে ডাক পড়বে তার সম্ভাবনাও কম। বসে বসে কেবল হাড় মজ্জায় জং ধরান। খাল ডোবায়

মাপকাঠি

অনিল পি এফ লোনের মোটা খাতা পাশাপাশি কম্পিউটারের দেয় হিসেবের স্তূপ নিয়ে বসে। অন্ততঃ দশটা লোন ফর্ম ছাড়তেই হবে। কাজে ফাঁকি নেই অনিলের। সময়ে আসা এবং যাওয়া, চেয়ার ছেড়ে না ঘুরে বেড়ান, কাজ বোঝে, এ সবের জন্যে সুনাম আছে। তবে খাতা কলমের কাজ ক্রমশঃ খতম। এভরিথিং কম্পিউটারাইজড। একদার কম্পিউটার বিরোধীতা এখন কম্পিউটার প্রেমে পর্যবসিত। যাক্ গে, আর ক'বছরইবা চাকরি। দশ বারটা বছর দিব্যি পেরিয়ে যাবে।

কিন্তু আজ কাজে মন বসছে না। মাথায় একটা পোকা কুটকুট করে কেটে যাচ্ছে। খুবই মৃদু এবং নরম দাঁত পোকাটার। কিন্তু রয়েছে তো, কিন্তু কাটছে তো! পিরানহা বলে একরকমের মাছ আছে। ভয়ঙ্কর মাছ। জলে মানুষের মাংস খেয়ে হাড় বের করে দেয়। খায় যখন মানুষ টের পায় না। অদৃশ্য পিরানহারা জলের বাইরে দিব্যি মানুষের বিবেক, ধর্মাধর্মজ্ঞান, নৈতিকতা, সততা ইত্যাদি ইত্যাদি খেয়ে নেয়। মানুষ টের পায় না। সে তখন মানুষ থাকে না; তবে দিব্যি চলে ফেরে, বাসে ওঠে, অফিস যায়, ব্যবসা করে, রাজনীতি করে, বক্তৃতা দেয়, প্রেম করে, সন্তানের জন্ম দেয়, গাড়ি কেনে, বাড়ি করে। হ্যাঁ, টের পেলেই কিন্তু ঝামেলা!

অনিলের কয়েকটা পিরানহা মাছের খুবই প্রয়োজন ছিল। অন্ততঃ মাথার পোকাটা পিরানহার বাচ্চা হলে কী ভালই না হত। খাবে, অথচ সে টের পাবে না। খেত অথচ টের পেত না।

পিরানহা অনিল পাবে কোথায়! উল্টো দিকের চেয়ারে আর একটা অনিল এসে বসল। একটা ভেড়া থেকে দুটো। হুবহু এক। ক্লোনিংয়ে এরকম হয় যে। বিজ্ঞানের কী জয়যাত্রা! হুবহু আর একটা অনিল। সেই ফরশা রঙ, দোহারা চেহারা, সাদা শার্ট, প্যান্ট, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, সরু করে রাখা গোঁফ কামান মুখ, ব্যাকব্রাশ চুল। রীতা দু'টো অনিলকে দেখলে কী সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় পড়ত! কোনদিকে যায় বেচারা। যাঃ তা কেন। ক্লোনিং রয়েছে না। দু'টো রীতা হয়ে যেত। দু'জনের কাছে দু'টো দাঁড়াত। নিশ্চিন্ত।

'কী ব্যাপার পিরানহার দরকার পড়ল কেন?'

'দেখছ না, পোকাটা মাথার মাংস খাচ্ছে।'

'মাথায় মাংস নেই ঘিলু আছে। ঘিলু খাচ্ছে। খেতে দাও। গ্রাহ্য করো না।'

'খেলে ভাল হত। খেয়ে শেষ করত। এ নরম দাঁতে শুধু খুটছে।'

'তুমি বড্ড সীরিয়াস। জানি, কিছু বলতে হবে না, বড়লোক শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ। স্পেশাল। না না বিয়ে-থা কাজকর্ম নয়। এটা অন্যরকমের।'

'হ্যাঁ, অন্য রকমের। আমার দু'শ্যালকই আমাকে করুণা করে এ তো জান। আমি চাকরি করি। ওদের ব্যবসা। আমার শালীদেরও সব বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। শুধু আমরাই।'

'ছাপোষা। রীতা প্রেম করে তোমার মত ছেলেকে বিয়ে করেছে। কেরানির বেটা কেরানি। থুড়ি, ইংরেজি করে বলি, ক্লার্কের বেটা ক্লার্ক।'

'কেরানি বললেও কিছু আসে যায় না। এখন ও চাকরি পেতেই সাতহাত জিভ খুলে যাবে। ছেলেদুটোর যে কী হবে, ঈশ্বর জানেন।'

'শোন, তোমাকে আমি বোঝানোর জন্য এলাম। প্রেম করে না হয় বিয়ে করলে কিন্তু শ্বশুরের কিছু নেব না, এমন উদারতা, এমন মহান প্রেম কে দেখাতে বলেছিল? ওদের গোড়ায় আপত্তি ছিল, তারপর যখন দেখল জেদী মেয়েকে রোখা যাবে না, তখন তো সবই দিতে চেয়েছিল। আরে বাবা শ্বশুরের মেয়ে নিতে পারলে, টাকা নিতে পারলে না।'

'না, পারলাম না। তার জন্যে আমি মোটেই দুঃখিত নই।'

'রীতা দুঃখিত। রীতা বলে না রাগ করে, বাবা মা বেঁচে থাকার সময় টাকাকড়ি নিয়ে নিলে ভাল করতাম। তোমার পাল্লায় পড়ে সব হারাতে হয়েছে। তাহলে কী এ দশা হত আমাদের।'

'বলুক। ছাড় তো ওসব কথা। আমি কোথায় মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল দশায় আর তুমি এলে অতীত চর্চা করে জ্ঞান দিতে। বলছি না মাথায় পোকা।'

'সুবীর একটু আগে ফোন করেছিল? তোমার ছোট শ্যালক!'

'হ্যাঁ। এই নিয়ে তিনদিন বলা হল। নিজেও এসেছিল।'

'অথচ কত ব্যস্ত। নতুন বাড়ি হচ্ছে। পেট্রোল পাম্প চালানোর সঙ্গে, আর কী যেন করে!'

'অত খবর রাখি না। কোটি টাকার ব্যাপারে আমি নেই।'

'সেই মানুষ তোমাকে নেমতন্ন করেছে। ফোনে কী বলল?'

'দিদি আর অরুণ বরুণকে নিয়ে সকালেই চলে আসুন জামাইবাবু। রাত্রিতে খেয়ে তারপর যাবেন। দেখবেন, ডুব দেবেন না। আমি বলেছি হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব।'

'চেপে যাচ্ছ। সুকুমারবাবুর কথা বলল না? সুকুমারবাবুকেও খাওয়াবে। তাছাড়া ডোনেশান। পারলে রবিবার ধরে আনুন। এটাই রীতি। আমি বুঝে পাচ্ছি না, এতে পিরানহার কী দরকার! মাথায় ঢুকে পড়ে কী করে!'

'ন্যাকামো। বুঝছ না? আমাকে এত খাতির কেন? খাতির নয় ঘুষ। বন্ধুকে বলে যাতে ওর ছেলের স্কুলে অ্যাডমিশনটা হয়ে যায় তাই। এতদিন তো মনে ছিল না। যেই শুনেছে এভারগ্রীণে সুকুমার আছে, আমার ফ্রেন্ড, ওমনি—জান

বলেছে, অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন এনে দিতে।'

'ছিঃ অমন রাগে না।'

'রাগব না। এর জন্য দায়ী রীতা। ওদের ছেলে ভর্তি হল বা না হল, তোমার কী। একবার গিয়ে শুনেই কী না বলে এল, এভারগ্রীণে, ও তো ওর বন্ধু সুকুমারবাবুর স্কুল। এভরিথিং উনিই। ও বললেই হয়ে যাবে। তারপর ঘরে এসে, হ্যাঁগো, সুকুমারবাবুকে—এমন করে বলল যেন হাতের মোয়া। জানে না এভারগ্রীণের ব্যাপারটা, কী নাম ডাক। ওখানে ছেলে ভর্তির জন্য মা বাবাদের কী সাধনা। যত বড়লোকের নজর ওইদিকে। দারুণ স্ট্রিক্ট।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। চেষ্টা করতে দোষ কী। কোয়েশ্চেন পেপার এনে দিলে তো হয়ে গেল। সুকুমারের কেস মানে তোমারই। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তুমি এমন ভাবছ!'

'একে তুমি তুচ্ছ বল!'

'তুচ্ছই তো। তবে তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটাই কারণে। সেটা হল সততার মোহ। তোমাকে বন্ধুরা বলত, সততার প্রতীক। যুধিষ্ঠির। এখনও বলে। আর সুকুমারের বন্ধু হলেও আজকের যুগে তোমার মত মানুষ, যে ঘুষ নেবে না, অন্যায় করবে না, লোক ঠকাবে না, মিথ্যে কথা বলবে না, তাকে কী ভাল কী ভাল তোর মত মানুষ হয় না, মহান, ব্যতিক্রমী বলে ফুলিয়ে মালা পরিয়ে মজা করে। নিজেরা দিব্যি কাজ গুছিয়ে নেয়। আরে বাবা, মহৎ হবার চেষ্টা করে কিংবা হয়ে ফয়দা কী। স্রেফ তো মুখের বাহবা, পিঠ চাপড়ানি। তাতে কী যে আহ্লাদ বুঝি না।'

টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারে অনিল নেই। ক্লোনিং করা অনিল উধাও। বদলে চেয়ার ধরে ঝুঁকে আছে সঞ্জয়। কোঁকড়ান চুল, রোগাটে মুখ, সরু গোঁফ, শ্যামলা মুখ। গায়ে সবুজ সোয়েটার। এ ডিপার্টমেন্টের পিয়ন। অল্প বয়স, তড়িঘড়ি কাজ করতে পারে। পার্টি করে। ইউনিয়নের একজন ব্যস্ত কর্মী। বলল, 'কী ভাবছিলেন, আমাকে দেখতে পাননি! শরীর খারাপ?'

'না তো। কী বলছিলে?'

'কিছু না। দেখি নিষ্পলক চোখে সামনের চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছেন।'

অনিল হাসল। জল খেল।

পিয়ন হলেও ইউনিয়ন মদতে বড়বাবু ভঙ্গি করে, 'শরীর খারাপ থাকলে রেখে দিন না ফর্মগুলো। কাল পরশু করবেন। এখনও তো টাকাই ছাড়েনি। অত ব্যস্ততার কী আছে।'

'নারে ভাই, কাজ রাখব না। শোন, টিফিনে একটা কেক এনে দিও তো।'

'বাঃ আজ তো সরলবাবুর পয়সায় খাবার কথা। নতুন বাড়ি করেছে।'

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

অফিস থেকে ফেরার পথে মিনিবাসের জানলার ধার পেয়ে যায় অনিল। শীত জাঁকিয়ে নেমেছে। সারা শহর জড়সড়। সব কিছুই বেশ মোড়কের মধ্যে ঢুকে

পড়তে চায়। দিনভর কনকনে হাওয়া। রোদ ভাল করে ওঠেই নি। শহর কলকাতার এত ঘিঞ্জি, দম আটকান বাতাস, উষ্ণতা সব সময়ই তো মজুত থাকে। সে পর্যন্ত ফ্রিজ হয়ে যেতে বসেছে। জানলা বন্ধ। কিন্তু শার্সির ফাঁকফোঁকরে ঠান্ডা বাতাসের হামলাবাজি ঠিক চলছে। পাশের ভদ্রলোক মোটাসোটা ফলে প্রায় পিষ্ট অনিল। জানলার হিম কাঁচে চোখ ফেলতেই আবার অনিল।

'কী আশ্চর্য আবার তুমি কেন?'

'আর কেন! এলাম মাথায় পোকা কাটছে। পিরানহা চাই। অথচ সুকুমারকে এখনও বলনি। এটা কী মিথ্যাচার নয়?'

'বলব। কিন্তু যোগ্যতা দেখে নিয়মকানুন মেনে যদি হয়, হবে।'

'হবে না, এটা তুমি জান। ছেলেটা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। তাছাড়া তোমার তো কোয়েশ্চেন আনার কথা। রীতাকে কী বলবে। ও তো আশা করে আছে ছোট ভাইয়ের কাছে দেখিয়ে দেবে টাকা না থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা আছে। এভারগ্রীণের মত স্কুলে তোমার কথা চলে। বুঝলে, বাপের বাড়ি সম্পর্কে মেয়েদের একটা দুর্বলতা থাকেই। তারপর যদি স্বামী সন্তানের কৃতিত্ব দেখান যায়। তুমি তার আগুনে জল ঢেলে দেবে। স্ত্রীর সম্মান রাখা কী তোমার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।'

অনিলকে আরও বকবকানি শুনতে হত। পাশের মোটা ভদ্রলোক উঠলেন, তাতেই সজাগ হয়ে গেল। বুঝল, পরের স্টপে তাকেও নামতে হবে।

ছোট শ্যালকের বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতেই হয়। রীতার জন্য ট্যাক্সিও করতে হয়। এমনিতে তো বাড়ির বাইরে বের হয় না। আজ বড় খুশি রীতা। খুশি মেয়েমানুষকে সুন্দরী করে। বয়সের পরতটা ঢের নামিয়ে দেয়। ভুরেখায়, কপালের টিপে, গালের মসৃণতায়, সিঁথির সিঁদুরে রীতা যেন একেবারে ভিন্ন হয়ে ওঠে। আটপৌরে মুখের বদলে একেবারে পোষাকী মুখ। যৌবন যায় নি। আকাশী রঙা শাড়ি ব্লাউজে হালকা প্রসাধনে শরীরের সব রেখারা নতুন করে যেন জাগে, ভাল লাগায়।

রীতা ঠোঁটে আলগা হাসি রেখে বলল, 'কী দেখছ আমাকে?'

'তুমি এত সুন্দরী, অমন করে থাক কেন!'

'আঃ ছেলেরা রয়েছে।'

'ওরা দু'ভাই মামার বাড়ি যাওয়ার আনন্দে আছে।'

'ওখানে গিয়ে যেন আবার হাঁ করে বার বার শুধু আমাকেই দেখো না।' চাপা গলায় বলে রীতা হাসে। ঠোঁটে রাখে শাসনের মধুরিমা।

ট্যাক্সিতে অরুণ-বরুণ দু'দিকের ধার নেয়। মাঝে ঘেঁষাঘেঁষি রীতা আর অনিল। পরস্পরকে দেখে হাসে। অকারণে এমন হাসি কতকাল আগে যেন ছিল।

ছোট শ্যালকের নতুন বাড়ি ঢোকার মুখ থেকে ছাদ বরাবর মোজাইক। দরজা জানলা মেঝের রূপবৈচিত্র্য এবং রঙের চমৎকার ব্যবহার অবাক করে দেয়। ছোট শ্যালকটির এমন শিল্প সৌন্দর্য জ্ঞান ছিল বা আছে কে জানত। তারপরই মনে পড়ে ঘর সাজানর ঢের প্রতিষ্ঠান এখন। তাদেরই কেরামতি। সুবীর বিশাখা আপ্যায়নের

মাছ ধরতে যায় অবশ্য। তা কত হয়। সেদিন একটা বড় শোল জুটে গিয়েছিল। পেয়ে গেল সাড়ে ছ'টাকা।

পরের হোক, জমি নিয়ে কিষাণ হবার স্বপ্ন ছিল একদিন। জোটেনি। আসলে মুনিষের বেটা মুনিষ। সকলেই জানে। তাছাড়া জমি অত কোথা। গাঁ সুদ্ধ মরদ যাতে লাঙ্গল মারতে পারে।

পাবে, গণেশ জমি পাবে। এই সান্ত্বনা গণেশকে চমৎকার চমৎকার ছবি দেখাচ্ছিল। সে তন্ময় হয়ে চাষীর সাজের বিভিন্ন আত্মপ্রতিকৃতি পর পর এঁকে যাচ্ছিল। লাঙ্গল মারছে সে। ধবধবে সাদা নধর বলিষ্ঠ একজোড়া বলদকে হেট্ হেট্ করছে। মাথায় নিয়ে আসছে ধানের বোঝা! উঠোনে গোবর দিয়ে নিকিয়ে মস্ত যে পালোই উঠেছে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হুঁ, কানির মাও আছে বৈকি। লালপাড় কাপড়, কপালে সিঁদুরের টিপ, মিশকালো এক ঢাল চুল, ঠোঁটে হাসি, সারা শরীর জুড়ে স্বাস্থ্যশ্রীর লাবণ্য। সেই বিয়ের কনেটি যেন। কুলোয় ধান পাছড়াচ্ছে বসে বসে।

বিভূতি গুহ দরখাস্ত নিয়ে বললেন—দেখি কি করতে পারি তোর জন্যে!

—আজ্ঞে আপনিই ত সব।

জিভ কাটলেন বিভূতি গুহ—ও কথা বলিস না। কমিটি আছে। ইন-কোয়ারি হবে। আমি তো একা সব নই। তবে হ্যাঁ তোর জন্যে আমি বলব। কিন্তু মনে রাখিস আমাদের।

—সি বলতে হবে নাই। জংলাডাঙ্গা মৌজার জমি নাকি বিলি হবে!

—তিনটে মৌজার জমি আছে ভেস্টের।

—জংলাডাঙা দেখে দেবেন। উটিতে আমার হক আছে!

—হক। হক কিসের! বিভূতি গুহ কালো ফ্রেমের চশমাটাকে আঁটসাঁট করে বসালেন।

—উ জমি আমার বাপের বাপ তার বাপ করেছিল। গণেশ বুক প্রশস্ত করল পূর্বপুরুষদের কীর্তি গৌরবে।

—তাই বল। ডাঙা কেটে জমি করেছে। কিন্তু মালিক ত নয়।

—ডাঙা কেটে জমি করলে মালিক হয় না?

—উঁহু, কাগজপত্র চাই। দলিল চাই। সরকারী ছাপ্ চাই। বাদ দে ওসব কথা। তোর জমির চেষ্টা করছি।

বিভূতি গুহ যখন সত্যি সত্যি তার ভাগ্যে আড়াই বিঘে জমির আঁকচারা করে দেবার ব্যবস্থা করে দিল, তখন গণেশের মনে হল পৃথিবীটাকে সে এতদিন চেনে নি। মোটেই বাজে নয় এখানকার জীবেরা, বাতাস। গাছপালা। আসলে চোখে ছানি পড়েছিল। বড় ভাল লেগে গেল তার মানুষজন, আবাল্যের এই বাউরীপাড়া।

কানির মা চোখে কপালে তোলে, আড়াই বিঘে জমি দিলেক।

গণেশ মাথা নাচায়। যেখানেই সে ছোট হোক, এ সংসারে সেই মাথা। কর্তামি ভঙ্গি ফোটে। বলে,—হ্যাঁ, আড়াই বিঘে থেকে পাঁচ বিঘে হবে। পাঁচ থেকে দশ। বুঝলি মুনিষ খাটালিতে আর যেতে হবে নাই।

খয়েরি চুলের গুচ্ছ নিয়ে শীর্ণা মেয়েমানুষ যেন জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যায়। বলে—আমাদের জমিতে ধান হবেক।

—হ্যাঁ, ভিনু ফসলও লাগাব। গম হতে পারেক।

—কিন্তু জলের টান যে বড়। জ্যোৎস্নায় মেঘের ছায়া ঘনায়।

—বইব। বাঁকে করে জল বয়ে চাষ করব।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যেতে গণেশ দেখল, চাষ করাটা সম্পূর্ণ শক্তি নির্ভর নয়। সামগ্রীরও প্রয়োজন। যেগুলোর সঙ্গে জড়িত অর্থসমস্যা। তবে চাষের আনুষঙ্গিক এসব ব্যাপারে তৎপর হবার আগেই আসে ছোটবাবু। ভেস্ট হয়েছে ওরই জমি।

ধুতি আধাআধি করে লুঙ্গির মত পরা টকটকে ফরসা মানুষটি, বয়স হয়েছে। মাথায় টাক। কাঁচাপাকা চুল। জমি জিরেতের ব্যাপারে শিয়াল চাতুর্যে যথেষ্ট পারঙ্গম। অধিকার কব্জা রাখায় হীন অন্ধকার গলিখুঁজির খবর রাখেন। নিজেই হাজির তাই বাউরী পাড়ায়। বাঁশের বাতা বেরুন কালচে খড়ো চালের ঘর, নোংরা, শামুক গেঁড়ির ভাঙা খোলের স্তূপ, ছেঁড়া চাটাই, কালচে মাটির হাঁড়ি, ছেঁড়া টেনা ঝোলা আবেষ্টনীতে।

ঠোঁটের সিগারেট লোমশ আঙুলে সরিয়ে বলেন,—বুঝলি গণেশ, তোর নামে আমার জমির খানিকটা বিলি হয়েছে। শুনে ভাবলাম যাক্ নিজের লোকই পেয়েছে। খুব ভাল। জমি লক্ষ্মী। তোর ঘরে রেখেছে। কিন্তু কথাটা হল চাষ করবি কি করে? বোশেখে তো চলে এল।

—করব বাবু!

—উহুঁ, ও ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। সিগারেট বার আনা এখনও দগ্ধ হতে বাকী। বাড়িয়ে দেন।

গণেশ বাউরী কৃতার্থ হয়ে সিগারেট নেয়।

—বলদ, বীজ, সার, সেচন, অনেক ঝঞ্ঝাট। ও জমি আমার হালে যেমন উঠছে তেমন উঠবে।

—না বাবু উ জমিতে আমার এখন হক। গোঁজ হয়ে মাটি কামড়ায় বুঝি গণেশ।

—আহা, বটেই তো রে। এর পর পাট্টা পাবি। কিন্তু জমি তো ফেলে রাখা যায় না। উৎপাদন চাই। জানিস্ উৎপাদন বাড়ানর জন্য কত কি হচ্ছে ব্লকে। সবুজ বিপ্লবের নাম শুনেছিস? হ্যা হ্যা। ছোট রায় শরীর দুলিয়ে হাসেন, সেদিন আর নেই রে। এখন দেশ স্বাধীন। সব মানুষের কথা ভাবতে হবে। দেশের প্রগতি তো উৎপাদন নির্ভর। জমিতে ঠিকমত চাষ না করতে পারলে তুই

অপরাধী। দেশের শত্রু।

এসব কথা গণেশ বাউরীর বোধগম্য হয় না। সে শুধু বোঝে থাবা গেড়ে যে ভুঁইটুকু সে জাপটে আছে সন্তানের মত কিংবা মায়ের মত যার বুকের সৌগন্ধ তাকে নেশাচ্ছন্ন করছে, তার থেকে টেনে হেঁচড়ে তুলে দিতে চাইছে লোমশ কোন জন্তুর শয়তানি থাবা। আরও আঁকড়ায় সে মাটি।

—না বাবু আমি জমি চষব।

—আছে কি যে জমি চষবি। এ কি খেলা বটে? চাষ বলে কথা!

ছোটবাবুকে ঝাঁ করে জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয়, বাবু ঘরে বসে আপুনি কি চাষ বোঝেন। বড়ই সঙ্গত প্রশ্ন। নগ্ন সত্য। কিন্তু উচ্চারণে বাধা কঠিন, সূচাল। গণেশরা জানে সত্যকে নিষ্ঠুর কোন ঘাতক শাণিত তরবারি দেখায়।

—শোন এসব পাঁচকান করার দরকার নাই। তুই ধান পাবি।

—ধান পাব।

—হুঁ। পাবিই তো। কাগজে কলমে তুই এখন মালিক। মালিকের ভাগ পাবি। কেবল আমার হালে উঠবে। আমি চষব। বুঝলি, না খেটে ধান। না টাকা লাগিয়ে ধান। ব্যস হয়ে গেল কথা। বৌকে পাঠা। দু'সের চাল দেব।

—আমার নিজে চাষ করার মুন ছিল।

—মুন থাকলেই ত হবে না। হাত থাকলেও না। চাষে অনেক কিছু লাগে। থাক্ গে ওজন্যে ভাবনা করতে হবে না।

ছোটবাবু চলে যাবার পর একাই মাথা চুলকায় গণেশ। বৈশাখের জ্বালা ধরান দীপ্তি সহস্র রুপোলি ঝালরে চমক দিচ্ছে চতুর্দিকে। বাতাসে তাপ। শুষ্ক মাটির পিপাসায় ছাতি ফাটছে। হাঁ মুখ করে আছে আমড়াগাছের ডালে একটা কাক। কালোর বুড়ী পিসি হাতে টিনের কৌটো নিয়ে আসছে।

আড়াই বিঘে জমিতে কত ধান হয়? ছোট রায় কত ধান দেবে? দু'সের চাল। আজকের দিনটা পার হয়ে যাবে। পরশু ভাত ফুটেছিল। কাল একগাল মুড়ি হয়েছে। পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি খিঁচড়ে আছে ক্ষুধার আবেগে। তবু কেন সায় দেয় না মন! গ্রীষ্মের পর ঝপঝপ জল নামবে। আকাশ জুড়ে অবিরাম সুধাবৃষ্টি। মাখনের মত হবে মাটি। গণেশ জলে ভিজে যে লাঙ্গল টানবে। কানির মা হেঁট হয়ে পুঁতবে ধানের গুচ্ছ।

কানির মা বলল—কিন্তু বলদ কুথা? কুথা বীজ? কুথা সার? তাবাদে জান ছোটবাবু কি এমনি ছেড়ে দিবেক? জ্বালাবেক। পিছাতে লুক লাগাবেক। তুমাকে মারতে পারে। মাথা ফাটাতে পারে।

—আমার হক। পুলিশ আসবেক।

—হ্যাঁ, তুমার পিছা পিছা পুলিস ঘুরবেক। তুমি যে লাটসাহেব।

—গাঁয়ের লুক আছে।

—সবাই ত জমি পাই নাই। জান বেন্দার বৌ ঠারে ঠোরে ঢেক কথা

বলছে।

কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে গণেশ বাউরী। দু'সের চাল আনলে উনুন জ্বলে। ভাতের হাঁড়ি ফোটে। গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়। পেটের খিঁচড়ে থাকা নাড়িভুঁড়িতে আবেগের তীব্রতা কমে। ছেলেমেয়ে নাচে। কানির মায়ের মুখটা ঢলঢলে হয়। কিন্তু তবু সে বলতে পারে না, যা কেনে! অন্ধকার রাতে যেন একা একা সে হাঁটে। মাথার উপর আকাশে নক্ষত্র নেই। কিন্তু অজস্র জোনাকি। অন্ধকার কেবলই অন্ধকার। গণেশের পা পড়ে অতি সন্তর্পণে। অনেক বাধা। হকের পথে অনেক বাধা।

—কানির মা আমার হক!

—ওই যি ছোটবাবু ধান দিবেক চাট্টি।

—উ ত ভিক্ষে। লিলে জমি উর হন যাবে। আমার হক।

কানির মা উত্তর দিতে পারে না। মানুষটাকে দেখে বড় কষ্ট হয় মেয়েমানুষের। শীর্ণ শিরা ওঠা হাতের কাঠ কাঠ আঙুলে ইচ্ছে করে মাথার চুলে বিলি কাটতে। শুকনো বুকে টেনে বলতে, হেই গো, এমুন করো না।

—কানির মা চাল আনতে যাবি?

—তুমি কি বল?

—না।

—আমিও বলি, না।

কানির মা হাসে। গণেশ বাউরী হাসে। থাবা আরও শক্ত হয় গণেশের। পড়ে থাকে সে সন্তানের মত মাটিতে কিংবা মায়ের বুকের যে সৌগন্ধ তাকে নেশাছন্ন করেছে সেই ভূমিতে। দেখে হাতে তার লাঙ্গলের বোঁটা। দেখে নিচু হয়ে কানির মা ধান পুঁতছে। চোখাচোখি হতে ঢলঢলে মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

দেবতা! দেবতা না মানুষ! কোনজন বড় শত্রু।

আহা নিতাইয়ের মা বাডা ভালো ছিল....মরে গেল, আঁ কত বয়স হয়েছিল....খেতে না পেয়ে বিবাক মরবেক, শালা চালের দর....জ্বর হুনছিল না কি....আমাকে বাডা ভালবাসত....ওলো বউ ছেলে রইল তু কেনে গেলি লো তুর নিতাইকে কে দেখবে লো, তু বডা সুন্দর মাছের টক রাঁধতিস্ লো. ..তা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর....মলেও রেহাই নাই শালার খরচা....এখুন আবার কয়লারও আকাল....শব্দ আর কথা। পাড়ার মানুষের ভিড় আর ঝুপঝুপে বৃষ্টিতে, কালো ছাতা, মাথালি, বাঁশের ছাতির ঘোরাঘুরি উঠোনে। সুবল চোখ বড় বড় করে দেখে আর শোনে। নিতাই দাপাচ্ছে, 'অ মা গো আমি ভাতের লেগে কাঁদব নাগো, তু যাস না,' মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে, 'আমার মা কেনে মরবেক্ আমার মা কেনে মরবেক্।' পাশের ঘরের বউ জোর করে ধরে নিয়ে গেল ছেলেটাকে—চা নিতাই, মুড়ি খাবি চ। সুবলের চোখে জল নেই। সারা গায়ে বর্ষার গন্ধ। এই বর্ষা তার জন্য আরও কি দুর্ভোগ আনছে কে জানে! বর্ষার মুখেই তিন বছরের মেয়েটা চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। গাঁয়ের হাসপাতালে ওষুধ নেই। সদয় ডাক্তারবাবু বললেন, লিখে দিচ্ছি বুঝলে, কিনে আনাও। তা মেয়ে অপেক্ষা করল না।

পরেরদিনই ঘরে এল মুকুন্দবাবুর সঙ্গে ক'জন ছেলে। তা সুবল দেখেই তো কৃতার্থ। তারা নিতাইয়ের মায়ের মৃত্যু শুনেই ছুটে এসেছে। হ্যাঁ একেই বলে প্রাণ। আর কিনা কালই তার পাড়ার লোকেরা লাফাচ্ছিল বড়লোকদের জন্যেই এই হাল।

বললেন, 'প্রতিজ্ঞা কর সুবল। বৌয়ের মরণের শোধ লিবে। আঁ চালের কেজি দুটাকা, দু'টাকা চার আনা, আর খাটালির দাম দু'টাকা! খেটেও পেট ভরবেক নাই! কেনে? কেনে? নিতাইকে সামনে রেখে আমরা মিছিল করব। নিতাইয়ের মা না খেতে পেয়ে মরে কেনে? গাঁয়ের চাল কুথায় গেছে? জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবেক।'

কানাই হরিপদ, গোপাল সকলেই বলল, ঠিক, ঠিক, আমরা মানুষ নই, আমাদের খিদে নাই। সিনেমা, থেটার চাই না, মা বৌ বেটাবিটিকে পেটে খালি ভাত দিতে চাই।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তার জবাব নিতেই আমরা সদরে যাব।'

সবাই বলল, 'তাই করুন বাবু। আমরা সবাই যাব।'

বিকেলে এল অতীনবাবু। অনাহারে মৃত্যু গাঁয়ে এ সংবাদ তো বরদাস্ত করা যায় না। এ মানুষটিও নেতা। ঠোঁটে সিগারেট, ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, গলায় হাতায় কাজ করা। হাতে ঘড়ি। বলল, 'বুঝলে সুবল, নানা কথা শুনছি লোকের মুখে। গ্রামের অপমান হবার মতো কোন কাজ তুমি করো না! গ্রাম তো কেবল আমাদের নয়, তোমারও। তোমার বৌ না খেয়ে মরেছে এটা তো

গ্রামেরও অপমান। তাছাড়া তুমি আমাদের দলের!'

নিতাইয়ের মায়ের না খেয়ে মরাটা গ্রামের পক্ষে অপমানকর। আঁ, গ্রামের লোক মরে না-নাকি? সুবল অবাক চোখে তাকাল।

'কিছু লোক আছে, যারা নিজেদেরই নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করে।'

'বুঝতে তো পারছি না, আজ্ঞে!'

'বলছি এই তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা! অসুখ-বিসুখে মানুষ তো মরবেই! কি, মরে না? আরে বাপু মৃত্যুর ওপর কোন হাত নেই। আমরা সকলেই মৃত্যুর অধীন। ধনদৌলত ডাক্তার ওষুধপত্র কিছুই করতে পারে না। যার ডাক আসবে তাকে যেতেই হবে।'

'খোলসা করে বলুন, আমার মাথায় ঢুকছে না। তা নিতাইয়ের মা যদি মরে অন্যায় করে থাকে, আজ্ঞে ক্ষমা করে দেন। আজ্ঞে আমি তো জানি ওর মরার ইচ্ছে ছিল না! বলত, নিতাইয়ের বিয়ে দুব! নাতিপুতি নিয়ে ঘর করব।'

'আহা মৃত্যুতে কার ইচ্ছে থাকে বল!'

'তাহলে নিতাইয়ের মায়ের দুষ কি বলুন!'

'ছিঃ ছিঃ সুবল, তোমার স্ত্রীর দোষ দিচ্ছি না। তোমার স্ত্রীর আত্মা স্বর্গধামে শান্তিলাভ করুক। আমি বলছি অন্য কথা। তুমি তো সাদাসিদে মানুষ। মুনিষ খাটো, খাও। তোমার মত সবাই নয়। গাঁয়ে এখন তোমার স্ত্রীকে নিয়ে হৈ চৈ।' ঠোঁটের সিগারেটে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে অতীনবাবু বললেন, 'বুঝেছ, বলছে অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে তোমার স্ত্রীর।'

'অনাহারে! তা হতে পারে! ডাক্তারবাবু তো আসে নাই। এখন লোক যা রোগ বলবে তাই।'

'আহা অনাহার রোগ নয়। অনাহার মানে না খেতে পাওয়া।' ঝুঁকে পড়ে সুবল কিছু বলার আগেই ব্যস্ত স্বরে বলে চলল, 'বোঝ একবার, তোমার স্ত্রী না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছে, এটা যদি চারদিকে ছড়ায়, ছড়াবেই, তাহলে কি লজ্জার কথা। কাগজে বেরুবে খবরটা। ছিঃ ছিঃ মুখ দেখাব কেমন করে আমরা। তারপর তুমি পুরুষমানুষ, তুমিই বা মুখ দেখাবে কি করে। লোকে বলবে না—সুবল বাগ্দী বৌকে খেতে দিতে পারেনি।'

'সে তো বটেই। তা ছড়ানোর দরকার কি?'

'এই এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি। তুমি বুদ্ধিমান লোক সহজেই ধরে ফেললে!' সাফল্যের একগাল হাসিতে মুখ ভরিয়ে অতীনবাবু বললেন, 'ওরা আসবে তোমাকে নাচাতে। নিতাইকে সামনে রেখে হৈ-চৈ করতে চাইবে। তুমি রাজী হবে না! পরিষ্কার বলে দেবে, নিতাইয়ের মা ভাত খেয়ে ছিল কাল। রোগে ভুগে দুর্বল হয়ে ছিল, হার্টফেল করেছে।'

'ভাত!' সুবল বলল, 'ভাত তো খায় নাই। পরশু ছেলেট চাট্টি ভাত খেয়েছিল। আজ্ঞে দু'টাকা....।'

'আহা মুখে বলতে দোষ কি?

সুবল সাড়া দিল না। বোধকরি ঝট্ করে এমন মিথ্যেটাকে মেনে নিতে তার সায় নেই। বুকের মধ্যে গুরগুর করছে। না খেতে পেয়ে বৌটা মরল! অ্যাঁ সারাদিন মুনিষ খাটি, তবু কেনে বৌ না খেতে পেয়ে মরে। দেখ, আমি কারো সাতে পাঁচে থাকি না। হিংসা করি না কাউকে! অন্যায় করে কারও কাছে থেকে কিছু লি না, তা মাথার উপর ভগবানের কেনে এমনি হেনস্থা! কেনে! কেনে! তা মিথ্যে বললে আরও পাপ হবে লাই?

'যেই আসুক তাকে বলবে, বৌ ভাত খেয়েছিল। ঘরে তোমার চাল আছে। তার জন্য অবশ্য তোমাকে দেখব। আমরা এবছরই তোমাকে চাষ করতে জমি দেব। আর চাল পাঁচ সের নিয়ে এস কেমন।'

'আজ্ঞে।'

'আর আজ ভাত নিয়ে এসো আমাদের ঘর থেকে।'

'আজ্ঞে ভাত লাগবে না। পিসির ঘরে খেছি।'

'ঠিক আছে। আনতে যেও কিন্তু।'

ঘরের মধ্যেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল সুবল। দিন বাড়ার সঙ্গে রোদ যেন হাজার জিহ্বায় গিলে ফেলতে চাইছে সমগ্র সবুজের জগৎ। ঘরের চালের ঝড়ে-ওড়া ফাঁকা ফোকর দিয়ে রোদ আসছে। লম্বা ফালি একটা পিঠের চামড়া পোড়াচ্ছে সুবলের। বুকের মধ্যে নিতাইয়ের মায়ের জন্য কান্নাটা এখন পাকে পাকে পেট থেকে উঠে জমা হচ্ছে। টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো বিগত ক'বছরের যেন জলজ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চোখের সমানে। নিতাই পিসির ঘরেই আছে। ঘরে এলেই ফোঁপাচ্ছে। নিতাই-এর মা মরে গিয়ে এত বড় উপকার করে দেবে কে জানত। চষতে জমি পাবে। ভাগ্যিস অনাহার! অ্যাঁ রোগে মরলে কিছু পেত না-কি? স্রেফ বলতে হবে, অনাহারে নয়!

সন্ধ্যেবেলার ঘরে এলেন মুকুন্দবাবু। অন্ধকারে বসে আছে সুবল। বলার কিছু নেই। স্ত্রীর শোকে ঘর অন্ধকার করে থাকা নয়। কেরোসিন মিলছে না। সরষের তেল খেতে জোটানোই যায় না তা জ্বালানো! বাগ্দীপাড়া সন্ধ্যে হতে না হতে তাই অন্ধকার! ঘরের মধ্যে বিড়ির মুখে আলোর ফিনকি শুধু জ্বলে। রাস্তায় ধাক্কা লাগত বলাইয়ের মায়ের সঙ্গে। তার ঠোঁটের বিড়িটা রক্ষা করেছে। ঝট্ করে সরে গেল মেয়েমানুষ। বুড়োবুড়িরা সন্ধের পর বের হয় না। জোয়ানদের তো অন্ধকারকে ভয় নেই। পাঁচুর কত্তা-মা সন্ধে হলে বিড়বিড় করে বলে, 'হ্যাঁ বাবা কেরাচিন তো খাবার লয়। কেনে মিলছে না।'

অন্ধকার ঠাওর করে পাশে বসলেন মুকুন্দবাবু। আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। সুবলের চোখ তাতেই ধরা ছিল। নিতাইয়ের মা তারা হয়েছে নিশ্চয়। আহা, আলোর অভাবে নিজের ঘরখানাও দেখতে পাবে না বেচারা। সন্ধ্যে হতে না হতে বাগ্দীপাড়া নিঝুম। আসলে অভাবের দৈত্য ঘরের চালে বসে লম্বা পা

নামিয়ে কুৎসিত হাসি হাসছে। আনন্দ ফুর্তি আসবে কোথা।

মুকুন্দবাবু ফোঁস করে অন্ধকারে শ্বাস ফেলে বললেন, 'সব ব্যবস্থা সারা সুবল। গাঁ ঘুরব, তারপর বি. ডি. ও অফিস যাবো। ম্যাজিস্ট্রেটের উখানেও যাব। আগে থাকবে নিতাই। পিছনে আমরা সব।'

সুবল চুপ করে থাকল।

'কি কথা বলছ নাই কেন সুবল! কাঁদছ নাকি?'

'না। আমি যাব না।'

'অ্যাঁ!' মুহূর্তের বিহ্বলতা মুকুন্দবাবুর ওঁই শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। তারপরই বিদ্রূপের একটা ঝাপটা যেন বাতাস কাটল, 'টুপ গিলেছ তাহলে! অ্যাঁ এখনও একদিনও কাটে নাই। অ্যাঁ জন্তু জানোয়ারও একদিনে শোক ভুলতে পারে না। তুমি কি মানুষ লও। আমি ঠিকই খবর পেয়েছি তাহলে।'

'নিতাইয়ের মা কাল ভাত খেন্ছিল!' যেন রিহার্সাল দেয় সুবল।

'এত বড় মিথ্যেটা তুমি বলতে পারছ!'

'হ্যাঁ ভাত খেনছিল, অনাহার লয়।'

'গাঁয়ের অবস্থা দেখছ না? লুকে খেতে পেছে নাই। কন্টোলে চাল নাই। চালের দাম আড়াই টাকা। লুক মরতে বসেছে!'

'তার আমি কি করব! আমি কি করতে পারি!'

'তোমার বউ না খেতে পেয়ে মরেছে তার প্রতিকার করবে! আর যাতে তুমার বেটার পারা কাউকে মা হারাতে না হয় বুন হারাতে না হয় বাপ ভাই হারাতে না হয় তার ব্যবস্থা করবে।

সুবল চুপ করে থাকল। ওরা ব্যবস্থা করুক। সে তারমধ্যে নেই। মুকুন্দবাবুর দীর্ঘ বক্তৃতা ভেজাতে পারল না সুবলকে।

মানুষটা বেরিয়ে যাবার পর সুবল হাসল। বেটা নাচাতে এসেছিল। নাচবে কেন। নেচে কি সে এত বড় লোকসান করে বসবে নাকি। যা যাবার গিয়েছে, নিজেকে বাঁচতে হবে না, নিতাইকে ভাত দিতে হবে না? তা অতীনবাবু হাতে থাকলে ভাবনা কিসের আর!

মুকুন্দবাবু আর এল না। না আসুক, এলেই অস্বস্তি। বটতলাতে গোপাল হরিপদকে নিয়ে বসেছিল। সে ঘুরে দেখেনি! অতীনবাবু চাল দিয়েছিল ভাত হয়েছে। খেয়ে বিড়ি ধরিয়ে বেশ দিন কাটা। ক'দিন আর আলে বসে ঘাস কাটতে হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে বেশ উত্তাপ। সামনের চাষে জমিও পাবে। ভালো জমি। হ্যাঁ, ওরাও মিছিল করবে। আগে থাকতে হবে তাকে। সেই তো প্রমাণ, বৌকে ভাত দিয়েছিল। ভাত খেয়ে মরেছে নিতাইয়ের মা!

ছেলে নিতাই ছুটে এসে খবর দিল এক সকালে, 'ও বাবা দেখ গা কি হছে, সবাই লাইন দিয়ে গেছে। পিসি গেইছে, চাঁদুর মা, তারকের মা, ব্যাঙের মা, বিন্দার পিসি, সুবলের দিদি, কালুদার মা, জেঠাইমা, বলাইকাকা, গোপালকাকা,

জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। না, আর কারও নিমন্ত্রণ নেই।

'জামাইবাবু, আজ সব কাজ আমার বন্ধ। আপনি আসবেন বলে।'

বিশাখা বলল, 'ইস বন্ধ যেন করতে চেয়েছিল। আমার জোরে। বললাম তাই।'

সোফায় গা এলান সুবীর। বকসাদা পাঞ্জবি, পাজামা। কে বলবে সকাল ন'টাতে এমন শীতেও ওরকম হালকা পোশাকে থাকা যায়। মেঘ চাপা রৌদ্রহীন দিন, বাতাসে হিমগুঁড়ি যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। সোয়েটার গায়ে, শালও রয়েছে অনিলের। সে ভাবে, টাকার একটা উষ্ণতা আছে। ব্যাঙ্কে থাকুক অথবা ঘরেই, আলমারিতে, সেফটি লকারে কিংবা আয়কর দপ্তরকে লুকোতে বাথরুমে কী ঠাকুরের নিচে; যেখানেই থাকুক মালিকের দেহ পরিমন্ডলকে ঘিরে সে পশমের অদৃশ্য আবেষ্টনী হয়ে যায়। অনিল দেখে, সুবীর সিগারেট খাচ্ছে। ইমপোর্টেড সিগারেট। অনিলকেও দিয়েছে।

অনিল মিষ্টি খেতে ভালবাসে বলে, মিষ্টির আয়োজনই বেশি।

'জামাইবাবু আপনি তো এই বাড়িতে গৃহপ্রবেশে আসেন নি। এই এলেন।'

'না। দিদি এসেছিল!' বিশাখা বলল।

রীতা বলল, 'কোথাও বেরুতে চায় না। বলে, কে ঘর আগলাবে।'

অনিলের মনে হয় কথাটা যেন রীতার অভিযোগ নয়। প্রশংসা। ছেলে দুটোও ঘরে ছোটশ্যালকের পুত্রের সঙ্গে খেলছে।

রান্নার ঠাকুর আছে। ফলে গল্প ছাড়া কাজ নেই। সোফায় বসে বিশাখা। মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছে। রীতাও এক জায়গায় বসে। বাপের বাড়ি নয় ভাইয়ের বাড়ি। অন্য ভাইবোনদের কথা হচ্ছে না, মা বাবারও না।

'দেখুন জামাইবাবু আমি ব্যবসায়ী, ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু আপনারই আসেন না। বিশাখার সঙ্গে এই দিদির ভাব একটু বেশি। দিদিও খবর নেয় না।'

'তুই নিস্।'

'বারে আমি ত ব্যস্ত থাকি। এই তো আজকে ঘরে বসে থাকার জন্য কত ক্ষতি হবে জানিস।'

'ক্ষতি করতে বসে আছিস কেন। চলে যা। বিশাখা আছে।'

'এটা তো রাগের কথা।'

বিশাখা বলল, 'রাগ তো হবেই। ব্যবসা করে তোমার ব্রেনটাতেও সব সময় হিসেব ঘোরে। দিদি জামাইবাবুকে একদিনের জন্য পাচ্ছ। এই আনন্দটা বুঝতেও পারছ না।'

'খুব পারছি।' সুবীর বলে, 'আমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে না।'

আদর সম্মান, মূল্যদানের একটা অদৃশ্য লালা আছে। নিঃসারিত হয়ে যা কী না মাখামাখিতে একটা আঠালো অনুভূতি এনে দেয়। জড়িয়ে যেতে হয়। একটা গন্ধ আছে যার উৎসরণে নেশাচ্ছন্নতা নেমে আসে। যুক্তি, বিচার ইত্যাদি গোলমেলে ব্যাপারগুলো তখন বড়ই তুচ্ছ হয়ে পড়ে, হাল্কা হয়ে যায়। হাল্কার যা ধর্ম, দিব্যি

উড়ে যায়। অনিলের কাছে আর একটা অনিল এ সবের ভেতর আসতেই পারে না। স্কুলে ভর্তি করে দেবে ছেলেকে বলে শ্যালকের এই আদর কিন্তু এটাও তো অনিলের কৃতিত্বের ব্যাপার। সুকুমারের মত লোক কিনা তার বন্ধু, খাওয়ার আয়োজন বিশাল। মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, এলাহি কান্ড। খেয়ে উঠে বিশ্রামের সময় সুবীর বলল, 'তাহলে জামাইবাবু, কী মনে হচ্ছে, হয়ে যাবে!'

'কী বল তো!'

রীতা বলল, 'তুমি কী! বুবুনের ভর্তি। সুকুমারবাবুকে বলেছ! নিজে গেলেই পারতে। ফোনে কী বলল। বলে দাও।' অনিলের মুখ চোখ দেখে রীতাই সামলাল। স্বামীকে সে চেনে। বলল, 'এখন ফোন করে বলে দাও আর একবার।'

অনিলকে বাধ্য হয়েই ফোন করতে হয়। সুকুমার ফোন ধরল।

'শোন সুকুমার, তোকে সেই বলছিলাম না।'

'কী! কেমন আছিস আয় না একবার।'

'শোন, ছেলে ভর্তির ব্যাপারে।'

'ভাল ছেলে তো। আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টটা খুব কড়া।'

'সে তো জানিই।'

'ভাল করে তৈরী কর। ভালকথা, তোর খবর বল। রণেন এখন আমেরিকায়।'

'শুনেছি। যাক্‌গে ছাড়ছি।'

ফোন নামিয়ে রেখে অনিল বলল, 'বলছে, ছেলেকে ভাল করে তৈরি কর।'

সুবীর সোফায় এলিয়ে ছিল, চমকে বসল, 'তারমানে অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন পাওয়া যাবে না।'

'বাঃ ওকথা কী বলা যায়।'

'কেন বলা যায় না, আপনার তুই তোকারির বন্ধু।' সুবীর বলল, 'আর এসব ফোনে হয় না জামাইবাবু, যেতে হয় নিজেকে।' দিদির দিকে তাকাল, 'আমি জানি তুই যতই বল, জামাইবাবুর দ্বারা কিছু হবে না। আমাকে অন্য ওয়ে দেখতে হবে। আরে ডোনেশান তো দেব না বলিনি।'

রীতার মুখ কালো। আবহাওয়াটাই যেন অন্যরকম হয়ে গেল।

বিশাখা গৃহকর্ত্রী সামলে নিল, 'ছাড় তো, জামাইবাবু তো তোমাদের মত নন। না জামাইবাবু, কিছু মনে করবেন না। ছেলেটার প্রিপারেশন আমি নিচ্ছি।'

ফেরার পথে বিরক্ত ক্ষুব্ধ রীতা বলল, 'কী আশ্চর্য, তুমি আমাকেও বলনি।'

'কী বলব।'

'সুকুমারবাবু করে দেবেন জানতাম। তুমি কোশ্চেন আনবে জানতাম।'

'আমি ওকে বলেছি।'

'কোশ্চেনের কথা তো বলনি। ফোনে বলতে পারতে।'

'বলা যায় না।'

'খুব যায়। তুমি পারবে না, তাহলে নেমতন্ন খেতে এলে কেন? ছিঃ ছিঃ।'

ছেলে দুটো কত আনন্দ নিয়ে গিয়েছিল। আড়ষ্ট হয়ে ফিরল। বাবা মায়ের ঝগড়ার কারণ অনুধাবন করতে পারে না। বাড়ির আবহাওয়াও তার পর ঘোলাটে হয়ে থাকে।

রীতা তার সততার নিন্দে করে। বলে, 'জান তুমি কত ছোট হয়ে গেলে। আমাকে কত ছোট করলে। ওই বন্ধু নাকি বলে, তোর মত সৎ মানুষের কিছু হল না। তা সৎমানুষের জন্য, হ্যাঁ করে দেবে, বলতে পারল না।'

অনিল নীরব থাকে। রীতা কী ছোট হয়ে গেল! সে কী ছোট হয়ে গেল!

পরে একদিন সুবীরের ফোন, 'জামাইবাবু ছেলেটার অ্যাডমিশন হয়ে গিয়েছে। দিদিকে বলে দেবেন।'

'বাঃ খুব ভাল। বলে দেব।'

'বুঝলেন, আমি জানতাম আপনার দ্বারা হবে না। আমি মিঃ ঘোষ, আমার ম্যানেজারকে লাগিয়েছিলাম। ভুলেও আপনার নাম করিনি। ওই সব ম্যানেজ করেছে। কোয়েশ্চেন পেপার থেকে এভরিথিং। একটু পয়সা কড়ি খরচা হল এই যা—ওটা কিছু না। শুনুন, একদিন আসুন দিদিকে নিয়ে। ফোন করে আসবেন। থাকার চেষ্টা করব।'

'দেখি যেতে পারি তো।'

'আপনি কিছু মনে করলেন না তো।' সুবীর বলে।

'না। না।'

'জামাইবাবু ব্যবসা করি। কিন্তু মানুষ চিনি। জানি আপনাকে, আপনি সৎ মানুষ। এটা আমাদের গর্ব। আপনি কোশ্চেন এনে দেন নি, আলটিমেটলি এতে আমার অন্ততঃ গর্ব হয়েছে। সততা তো দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে। তবু আপনারা আছেন আচ্ছা, ছাড়ি।'

বাড়ি ফিরে বলতে রীতা ঝাঁকিয়ে উঠল, 'অপমানও বোঝ না। তোমাকে বিদ্রূপ করল। ছোট করল। আবার বড়াই করে বলছ। ছিঃ ছিঃ।'

অনিল চুপ করে বসে থাকে। পিরানহা মাছ নয়, এখন ছোট বড় মাপার যন্ত্র কী অসাধারণ ফিতে চাই একটা। ভাবনায় আর একটা অনিলের প্রয়োজন সে বোধ করে এবং ক্লোনিংয়ের অনিল আসে।

'কী ব্যাপার আমাকে ডাকা কেন?'

'মানুষ মাপার যন্ত্র, ফিতে। ধর, মাপকাঠি চাই একটা।'

'ন্যাকা। প্রত্যেক মানুষ ওটা নিজের জন্য বানিয়ে নেয়। নিজের মত করে। তোমার হাতেও রয়েছে।'

অনিল নিজের হাতটা দেখে।

নিতাইয়ের মায়েরা

সাত বছরের ন্যাংটো ছেলেটা ঝুপঝুপে জলে ধানক্ষেতের আল ধরে ছুটছে বাপকে খবর দিতে, মা কেমুন করছে ঘর এসো। ততক্ষণে ছেঁড়া তালাইয়ে মায়ের ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের শরীর হয়ে উঠল জড় পদার্থ। কড়িকাঠের দিকে অপলক চোখের স্থির দুটি তারা যেন আশ্চর্য তন্ময়।

এদিকে আকাশের দেবতা ভারী মুখে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে বিদ্যুতের ভ্রূভঙ্গি এবং ধমকানির মতো ডাকও দিচ্ছেন। শস্যভূমি এ সমস্ত সজীব সবুজ তরঙ্গায়িত সমুদ্র এবং স্নাত বৃক্ষশ্রেণী ঝোপঝাড় সকলই আশ্চর্য প্রাণময়। কচিৎ সাদা বক ডানা ভাসাচ্ছে। পাখ-পাখালিরা পাতার আড়ালে। নেহাতই নাচার দু-একটি ভাসমান ডানা আহারের অন্বেষণে। কাঁধে জাল, ব্যস্ত কেউ মাছের জন্যে। কেউ বা ক্ষেতে ডুবে আগাছা ওপড়াচ্ছে। আর আছে ঘাসুড়েরা। ক্ষেতের আলে কাস্তে হাতে ঘাস কাটছে।

ন্যাংটো ছেলেটা বাপকে হাতড়াতে এ আল ও আল ঘুরপাক খেয়ে কাতরাতে থাকল, বাবাগো! বাবাগো!

কান যেন পাতাই ছিল সুবলের। উঠে দাঁড়াল ঘাস ফেলে। হাঁটু পর্যন্ত লকলকে ধানের গুচ্ছ। বাতাস এবং বৃষ্টিপাতে সবুজ সাপের মতো ফণা নাচাচ্ছে। কাস্তে ধরা হাতখানায় কপাল চুলকে সে চেয়ে থাকল।

'মা কেমুন করছে গো বাবা। পিসি ডাকছে।' ন্যাংটো ছেলেটা দেখা মাত্র কাদায় জলে ছপাৎ ছপাৎ শব্দের সঙ্গে ছুঁড়ে মারল।

কাটা ঘাসগুলো জড় করে বোঝা বাঁধতে যতটুকু দেরী। ঘরে ততক্ষণে কান্নারোল। পাশেই পিসিরই ঘর। পিসিরই কান্না। জানা ছিল ব্যাপারটা। মেয়েমানুষ কতদিন ধুঁকবে। দু'বেলা কি একবেলা আহার জুটছে না। কালও সারাদিন হাঁড়ি চড়েনি। তারপর শরীর তো আধপেটা খেয়ে আর শরীর ছিল না। ঘাস কেটে কিছুটা চাল যোগাড় করে সাধের মেয়েমানুষকে খাওয়াবে জেদ নিয়ে বেরিয়েছিল। না, মেয়েমানুষ তার অন্ন আর মুখে দেবে না। বড় অভিমানী ছিল কিনা! পাউডারের জন্যে একবার রাতে উপোস করে বিছানায় পড়ে থাকল। মেলা গেলে—পাউডার আনলে না। আমাকে ভালবাস না তাই মনে ছিল না। হ্যাঁ ভালো না বাসার অভিমান! তা ভালোবাসা একটা বস্তু বটে, অমন হাড় জিরজিরে শরীর, মাংস নেই, নেই কোনো চমক, তবু কিনা কপালে ঠোঁট রাখলে—কি ঠান্ডা কি ঠান্ডা! তা অমন ঠান্ডাই বা ভোগ করতে দেবে কেন

উ পাড়ার জিঠা সবাই সবাই, অ বাবা কত লুক দেখবে চল। বলছে চাল নাই, না খেতে পেয়ে মরার বিচের চাই, চল চল কেনে বাবা দেখবে গা!'

সুবল বলল, 'না যাস্ না।'

আতা আর কাঁকড়ের ঝোপ এ-পাশটায়। ঝোপের ভেতর থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মাটির সড়ক ধরে পশ্চিম থেকে পূবে মিছিলটা যাচ্ছে। লম্বা তালগাছগুলো রাস্তায় সটান খাড়া। উবু হয়ে বসে ফাঁক দিয়ে দেখছে বাপ বেটা। কালো একটা কুকুর শুঁকে শুঁকে আসছিল। তাদের দেখে ফিরে গেল। বাঁশ গাছে একটা কাক কা-কা করছে।

'বাবা, মা থাকলে ঠিক যেত বল!'

'উঁ।'

'ও বাবা দেখ ওইট মায়ের পারা লাগছে না!'

'কুনট।'

'ওই যে ওইট। রুগা পারা, কে যেন বটে, ঠিক যেন মায়ের পারা।'

'সবাই তো রুগা নিতাই। কুনট? কুনট?' সুবল উৎসাহে ফুটতে থাকল, 'কুনট তুর মায়ের পারা?'

'ওই যে বাবা ওইট।' নিতাই আঙুল দেখাল।

দূরে সরে যাচ্ছে মিছিলটা। চোখ টান টান করে সুবল দেখতে থাকল।

'অ বাবা। ই-কি। এখন সব গলাই মায়ের পারা লাগছে গো?' নিতাই ককিয়ে উঠল, 'লাগছে না বাবা, মায়ের পারা লাগছে না। অ বাবা!'

'বলি অ নিতাইয়ের মায়েরা, বলি অ নিতাইয়ের মায়েরা, দাঁড়াও দাঁড়াও গো!' সুবল ছেলের হাত ধরে টান মারল, 'আয় বিটা তাড়াতাড়ি আয়!'

ছেলের হাত ধরে সুবল ছুটতে থাকল ভাঙা-চোরা আল, উঁচু-নীচু মাটি টপকে টপকে।

ভয়ঙ্কর খেলা

একা হতেই ষোল বছরের কুশকে দুপুরের দৃশ্যটা চেপে ধরে। যেন একটা শক্ত সাঁড়াশি তার গলায় চাপ হয়ে বসতে চায়। এইমাত্র শিবু রতন দু' দিকে মাটির সড়কে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। জোরে ডাক দিলে অন্ধকার ডোবা প্রান্তর, শাল মহুয়া ছড়ান গাঁয়ের মুখের ডাঙাটা থেকে প্রত্যুত্তর পাওয়া যাবে। ডাকতে পারে না কুশ। শক্ত আঠা যেন স্বরশক্তিকে আটকে দিয়েছে। সড়কে সাপ চলার সর সর শব্দের মত সাইকেলের চাকা ঘষার আওয়াজে কান পেতে থাকে। কী যেন বলতে চায় আওয়াজটা। কী যেন। আকাশ জুড়ে অসংখ্য আলোর বিন্দু। কুশের মধ্যে গুরগুর করে মেঘ ডাক পাড়ে। আতঙ্কে রক্তে দ্রুত হিমের মিশ্রণ ক্রিয়া চলে। সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারে। অন্ধকারে উজ্জ্বল সাদা পর্দায় যেন দুপুরের দৃশ্যটা। এই মাত্র ঘটে গেল। কিংবা এখনই ঘটতে চলেছে।

দ্রুত হাতে মুখে রুমাল বেঁধে শিবু, রতন এবং সে উদ্যত ছুরিকার শাণিত ফলকের মত টান টান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। রোদের রুপালি ঝালর লি লি করছে। হীরেখুনি জঙ্গলের ঝাঁটিশালের জমাট সবুজ স্তূপের উপর বাতাস দোল খেয়ে ফিরছে। রুক্ষ গ্রীষ্মতপ্ত প্রকৃতি। কোন জীবের সাড়া পর্যন্ত নেই। কেবলই উঁচু নিচু ভূখণ্ড, ধানের ক্ষেত, অনেকটা দূরে সাঁওতালপাড়া।

পিচ ঢালা পথটা সিউড়ী সদরের সঙ্গে যোগসূত্র। কালো গা চকচক করছে তপ্ত রৌদ্রস্নানে। হেঁটে আসছে হনহনিয়ে একটা মানুষ। মোটাসোটা শ্যামলা শরীরে অতি স্বচ্ছলতার মেদ। ভারী মুখ। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, ফিনফিনে ধুতি। পায়ে চটি।

লোকটাকে দেখামাত্র রতনের কী যে হয়! সে বলে ওঠে, 'এই মজা করবি। ঝটপট সাইকেল জঙ্গলে ঢুকিয়ে দে। রুমালগুলো মুখে বাঁধ। ঠিক চোখের নিচে। তাহলে চিনতে পারবে না। আছে তো তোদের রুমাল। আছে! ছুরিটা পকেটে আছে আমার। লোকটাকে ভয় দেখাব এইস্‌।'

শিবু বলে, 'সে কী রে!'

রতন সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তারাও। রতনের কথার যেন তীব্র সম্মোহন শক্তি। শয়তান দ্রুত কব্জা করে নেয় তাদের চিন্তন। ভয়ঙ্কর মজার দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে নেয় রতনের তাড়ায়।

উত্তেজিত রতন বলে, 'তোদের কিছু করতে হবে না। ঘিরে দাঁড়বি স্রেফ।'

রতন শিবু এবং কুশের চেয়ে বছর তিনেকের বড়। উনিশ কুড়ি হবেই।

কালো রঙ, মাথায় কোঁকড়ান চুল। স্বাস্থ্যবান। কালো প্যান্টের উপর নীল সাদা ডোরা শার্ট। ব্রণ কন্টকিত মুখ। পুরু ঠোঁটে, মোটা নাক। সব মিলিয়ে উগ্র এবং অস্থির মানসিকতা ফুটে থাকে। পড়াশুনায় ভাল না হলেও ফুটবল খেলে ভাল। গতবার ফেল করে এবার কুশেদের সঙ্গে মাধ্যমিক দিয়েছে। রতনের সৎমা, সম্পর্ক ভাল নয়। বারবছর বয়সের সময় বাবা আবার বিয়ে করেন। এ ব্যাপারে তীব্র ক্রোধ আছে রতনের। সে বলে, 'বোনটা না থাকলে কেটে পড়তাম শালা।' স্বভাবে অগ্নিদগ্ধ থাকার ফলে প্রায়ই মারামারি এবং ঝামেলা করে।

শিবু পড়াশুনায় মোটামুটি। প্রত্যেক বছর পাস করে যায়। কালো রঙ। গোলগাল চেহারা। বাবা শিক্ষকতা করেন। দু'দাদা কলেজে পড়ে। জমিজায়গা রয়েছে। ফুটবল ভাল খেলে। রতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও কারণেই বেশি।

কুশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের ছেলে। রোগা, ফরসা। লম্বাটে গড়ন। বড় বড় উজ্জ্বল এক জোড়া চোখ। কৈশোরের অমল ছায়া তাতে ভাসে। ভীতু স্বভাবও বটে। ভাল ছেলে বলে গাঁয়ে তার সুনাম আছে।

আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। আজ দুপুরে সাইকেল নিয়ে তাকে বের করেছে শিবু। সিউড়ী সিনেমা দেখতে যাবে। দুটোর শো। মাটির পথ ভেঙে পিচ রাস্তা। তারপর চন্দ্রপুর মোড়। বাস ধরবে সেখানে। সাইকেল দোকানে জমা রাখবে। এ রকমই কথা ছিল। কিন্তু হীরেখুনি জঙ্গলে সবই তো বদলে গেল।

রতন লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল। রুমাল চোখের নিচে থেকে মুখ পর্যন্ত ঢাকা। দাবড়ে উঠল উগ্র গলায়, 'ঝটপট যা আছে দিয়ে দিন—কুইক।' লোকটা আতঙ্কে শব্দ করে উঠতেই রতন স্প্রীংয়ে চাপ দেবামাত্র ছুরিটা চোখের সামনে ঝলসে উঠল। দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে শিবু আর কুশ। লোকটার ভয় বিহ্বল ঘর্মাক্ত মুখ। চোখের তার বিস্ফারিত। ঠোঁট কাঁপছে। রতন গর্জে উঠল, 'কুইক। ঘড়িটা খুলুন—আংটি। ইয়েস, আংটিও। এর হাতে দিন।' শিবুর পাতা হাতে টুপটাপ জিনিসগুলো পড়ে গেল। পকেটের টাকা, খুচরো পয়সা, আংটি, ঘড়ি। রতন যেন চাবুক কষাল তারপরেই, 'ছুটুন। এবার ছুটুন। চেঁচাবেন না। কোনদিকে তাকাবেন না।' লোকটা ছুটতে থাকল পিচঢালা সড়কে।

রতন হা হা করে হেসে উঠল। মুখের রুমাল সরিয়ে বলল, 'শালা।'

কুশ এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেল, 'এই লোকটাকে ডাক।'

রতন চোখ কপালে তুলে বলল, 'কেন চাঁদু। ওকে আবার ডাকা হবে কেন!' শিবুর দিকে ঘুরে বলল, 'শোন সিউড়ী নয়, চল সব রাজনগর যাই। ভি ডি ও দেখে ফিরব।'

শিবু বলল, 'লোকটা যদি পিচ রাস্তা ধরে লোকজন নিয়ে আসে।'

রতন তাচ্ছিল্যের থুথু ছিটিয়ে বলল, 'ও চাঁদুর সে ক্ষমতা নেই। দেখে বুঝলি না!'

কুশ কাতর গলায় বলল, 'সাইকেলে গেলে লোকটাকে ধরা যাবে। ভয় তো দেখানো হল।' রতন বলল, 'চোপ। ও বেটা ভয়ে যদি সব দিয়ে দেয়। না দিলে ছুরি মারতাম নাকি! সাহসের পরীক্ষা করলাম। বেটা হেরে গেল। ভালই হল, আমাদের ক'দিনের রেস্ত জুটে গেল।'

শিবু বলল, 'রাজনগর যাওয়াও ঠিক হবে না। লোকটা কোথাকার কে জানে।'

রতন বলল, 'চল তাহলে বানীপুরে ভি ডি ও দেখব। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে।'

পিচ রাস্তা ছেড়ে মাটির সড়ক ধরল তিনটে সাইকেল। কুশ সিগারেটের ধোঁয়ায় বিব্রত। বার কয়েক কাশল। সে টের পাচ্ছিল তার মস্তিষ্কে এক অদ্ভুত ক্রিয়া ঘটে চলেছে। রতন কেমন বদলে গেল। ব্রণভরা মুখ, রক্তিম চোখ, ঘামে ভেজা কপাল, গলা কালোবর্ণ আলকাতরা হয়ে উঠেছে। শিবুরও রূপান্তর ঘটেছে। তারও কী! আয়না থাকলে সে দেখতে পেত!

শিবু বলল, 'লোকটা কোথাকার হতে পারে বল ত!'

রতন বলল, 'কে জানে ছাড় তো।' শিবু বলল, 'যদি বানীপুরের হয়।'

রতন, 'না বানীপুরের নয়, আমি ও গাঁয়ের সবাইকে চিনি,' বলে সুর বদলাল, 'ও আলোচনা ড্রপ দে। মুখে রুমাল বাঁধা ছিল, চিনতে পারবে না।'

বানীপুরে ভি ডি ও দেখা হল। হিন্দী বই। রঙিন, ঝলমলে। আলো আর বহুবর্ণের যেন ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ। চোখকে পীড়া দেয়। কিছুই মস্তিষ্কে ঢোকে নি কুশের। দেখার পর সামনের দোকানে ভেজিটেবিল চপ, সিঙ্গারা, রসগোল্লা চা খাওয়া হল। একটার পর একটা সিগারেট। ধোঁয়া না গিললেও তার বিষ লালাকে তিক্ত করে দিয়েছে। কুশ একটাও কথা বলেনি। সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়ে ফেলার অপরাধ গ্লানি যেন চারপাশ থেকে সব বাতাস শুষে নিয়েছে। নিজেকেই নিজের কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছে।

শিবু সব কথাতেই রতনকে সায় দিয়ে গিয়েছে। কুশ নীরব। কুশের নীরবতাতে গ্রাহ্য নেই ওদের। দুপুর বিকেল। তারপর অন্ধকারের পাতলা চাদর নেমে এসেছে। তিনজনের ঘরের দিকে যাত্রা। রতনদের ঘর পশ্চিমপাড়ায়, দক্ষিণপাড়ায় শিবুদের। মাঝগাঁয়ে কুশেদের। দু'দিকে দু'জন চলে যেতে সে একা।

সাইকেল একটা গর্তে পড়তে কুশের রোগা শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে। পড়ে না। চেনা পথ। দিনে তো বটেই, সন্ধের অন্ধকারেও দিব্যি সে সাইকেল নিয়ে যাতায়ত করতে পারে এ রাস্তায়। এখন মনে হয়, কখনও যেন এ পথে আসেনি। সম্পূর্ণ অচেনা। এ কোথায় সে এল! সামনে হু হু করে বন্যার মত ছুটে আসছে অন্ধকারের ঘোলাস্রোত, গা ঘামছে। বুকের ভিতর কাঠঠোকরা। লেজ চেপে তীক্ষ্ণ নখরে হৃৎপিণ্ডে শক্ত ঠোঁট ঠুকে যাচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে

পাচ্ছে শব্দ। এতক্ষণে মনে হচ্ছে, ঘরের লোক নিশ্চয় চিন্তা করছে।

কুশের বাবা চাকরি করেন ধানবাদে। ই সি এলে। শনিবার বাড়ি আসেন। কাকা জমিজায়গা দেখাশোনা করে। বেসিক ট্রেণিং নিয়ে বসে আছে। কবে যে চাকরি হবে। কুশ বড় ছেলে। তারপর বোন, তারপর ছোট ভাই। মা বলেন, 'তুই বড়। তোকে দেখে ছোটরা শিখবে।' কুশ তো সব সময়ই ভাল থাকার চেষ্টা করে। সে বড়দের সম্মান করে। মায়ের সব কথা শোনে। এই তো আজ মা যেতে না দিলে যেত না। মা বললেন, 'যা'—তাই গেল। কিন্তু কী করে এল। যে কুশ গিয়েছিল—সে কী ফিরে এল ঘরে।

বাইরে থেকে দরজার কপাট সাইকেলের চাকায় ঠেলে কুশ উঠোনে পড়ল। দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। সজনে গাছের পাতা ইঁদারার পাশে ধরে আছে সেই আলো। গোয়ালের দিকটা অন্ধকার। টিনের চাল বাড়ি। দাওয়াটাও টিনেরই টানা ছাউনি। উঠোন থেকে দু সিঁড়ি উঁচু। লম্বালম্বি তিনখানা ঘর। মাটির দোতালা। সাইকেল উঠোন দিয়ে হাঁটিয়ে কুশ দাওয়ায় উঠল। সাইকেল ঠেলে চলার যান্ত্রিক একটা শব্দ হচ্ছে উঠোনে। দাওয়ার একপাশে দাদুর ঘর। দরজা খোলা। দাদু চোখে ভাল দেখতে পান না। কিন্তু শব্দ সম্পর্কে দাদুর ইন্দ্রিয় দারুণ রকমের সজাগ। বিড়াল হাঁটলে পর্যন্ত টের পান। উঠোন দিয়ে বাইরের দরজায় শব্দ না করে পেরিয়ে কেউ এলেও দাদুর শ্লেষ্মা জড়ান ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞাসা ছুটে আসে, 'কে এলি?' উত্তর পেলে নীরব। কিংবা বড়জোর 'অ'।

কুশ অবাক হয়ে গেল। দাদু কী ঘুমিয়ে পড়ল! বারান্দায় সাইকেলটাকে তুলে রাখল। বিছানায় দাদু বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। পাশেই লাঠিখানা নামান। তার আসায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তাহলে কী শব্দ হয়নি!

বাঁ দিকের ঘরে বিনু আর কমল পড়ছে। হ্যারিকেনের আলো দরজা ডিঙিয়ে এসেছে। আশ্চর্য! ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল না তার শব্দ পেয়ে। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হাতে আঁচল মুছতে মুছতে পাশের ঘরে ঢুকে গেল। তার দিকে তাকবে তো। না, ফিরেও তাকাল না। কী হয়েছে এদের? কেউ তার শব্দ পায়নি? শব্দ হচ্ছে না! কেউ কী তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কেন? সে কী কুশ নয়? নাকি অদ্ভুতভাবে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। রক্ত মাংসের শরীরটা মিশে গিয়েছে বাতাসে, আলোর সঙ্গে। সে কী চেঁচাবে! বলবে, আমাকে দেখতে পাচ্ছ না!

কুশ উঠোনে তাকাল। আলো অন্ধকার। তার দেরী দেখে কী রাগ করেছে সবাই। না, এমনটি হতেই পারে না। মাকে সে বলে গিয়েছে, সন্ধেতে ফিরবে। এমন কিছু রাত হয়নি। কাকা বাড়ি নেই। তার মানে পড়াতে গিয়েছে। তাছাড়া মা চুপ করে থাকবে কেন? রাগ হলে মা বকবেই।

কুশ চোখ বন্ধ করল। আবার খুলল। না, এটা তাদেরই ঘর। ওদিকে মা

আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তার আগেই কুশ ডাকল, 'মা'।

মা ঘাড় ফেরালো না।

কুশ নিজেকে নাড়া দিল। জেগে আছে। ঘুম নয়, স্বপ্ন নয়। চিৎকার করে সে বলল, 'আমি কুশ, তোমাদের বাড়ির কুশ। তোমরা ঘুরে দেখছ না কেন? তোমরা শুনছ না কেন? এই বিনু, এই কমল, দাদু, ও দাদু শুনছ।' কুশের গলা বাড়তে থাকল। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

অসম্ভব ভয় কুশকে ঘিরে ফেলল। তার কেন জানি মনে হল, সে কুশ নয়—অন্য কেউ। বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে সে থরথর করে কাঁপতে থাকল।

কোথায় যাবে এখন কুশ? কে তাকে বাঁচাবে? কে ফিরিয়ে দেবে তার প্রিয়জনদের? কুশের মনে হল, কাকুকে ডেকে আনুক। ছুটে গিয়ে বলুক, কাকু বাড়িতে কেউ আমাকে চিনতে পারছে না।

কুশ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা যেতেই দুর্গা মন্দির। রাস্তায় মানুষ নেই। কাদের রেডিও গান বাজছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত। এই তো শচীনস্যারের ঘর। গিয়ে সব কথা বলবে। অঙ্কের টিচার। তাকে স্নেহ করেন। কাকীমাও খুবই ভালবাসেন। আর রূপা!

রূপা ক্লাস এইটে পড়ে। কিশোরী। শচীন স্যারের মেয়ে। ফরসা রঙ, একজোড়া গভীর চোখ, ঝকঝকে দাঁত, ঠোঁট, চিবুক, নাক, কপাল, সব কিছুতেই শ্রী আছে। ওই চোখের চাউনিতে কুশ টের পায় এক মধুর রহস্যময়তা। শরীরে স্ফুট যৌবনরেখায়, বুক, কোমর, হাত, পুরুষ্ঠু আঙ্গুল কিরণ ছড়ায়। পাতলা ঠোঁটে হাসি, তার সঙ্গে কথা বলার সময় লজ্জার স্বচ্ছ রঙিন ওড়না বুকের মধ্যে ঢেউ তোলে। যাতে কুশ চমৎকার ভাসতে পারে। রূপাকে ঘিরে তার গোপন স্বপ্নময়তা আছে।

শচীনস্যারের বাড়ির রাস্তার দিকে জানলা খোলা। আলো এসে পড়েছে। কুশ দেখতে পায় টেবিলের উপর হ্যারিকেন রেখে রূপা পড়ছে। জানলার কালো রড ধরে সে ডাকে, 'রূপা। রূপা। সাংঘাতিক ব্যাপার হয়েছে।'

রূপা ঘাড় ফেরায় না। বইয়ের পাতায় চোখ এবং মন যেন নিবিষ্ট হয়ে আছে।

কুশ এবার চেঁচিয়ে বলে, 'রূপা। রূপা! শুনতে পাচ্ছ না!' রূপা ফিরেও তাকায় না।

ভয়ের হিম বৃষ্টি যেন তোড়ে নামতে থাকে কুশের উপর। অন্ধকারে সে ছুটতে থাকে। কাকুর কাছে যাবে। না, কাকুও তাকে দেখতে পাবে না। চিনতে পারবে না। রতন! হ্যাঁ, রতনই এজন্যে দায়ী! রতনকে সে চেপে ধরবে। বলবে, তোর জন্যে এ সব। চল, আমাকে চিনিয়ে দিবি তুই। কেন ছিনতাই করালি? কেন ভয় দেখাবি বলে মজা করতে সত্যি সত্যিই লোকটার সব নিয়ে নিলি?

কিন্তু রতনকে কিছু বলার আগেই দরজা খুলে চওড়া বুক বাড়িয়ে বলল, 'জানি শালা আসবি। টাকা, ঘড়ি আংটির জন্যে ঘুম হবে না। ভাবলি আমি মেরে দেব। কিন্তু আমি দেব না। শিবুকেও না।'

'না না। আমি সেজন্য আসিনি। আমাকে বাড়িতে কেউ চিনতে পারছে না। আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।'

'আমিও শালা চিনতে পারছি না। শুনতে পাচ্ছি না। ভাগ্।'

'আমি কুশ।'

'কে কুশ। আমি চিনি না। আমি তোকে চিনি না।' রতন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে ফেলল সশব্দে।

সামনে নদী

মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। বিক্রম ভট্ট আর মাখন হাড়ী। জমির মালিক আর লাঙ্গলদার বা কিষাণ। সরকারী ভাষায় জোতদার আর বর্গাদার।

বাঘ আর বাছুর। এখন বাঘ হয়েছে বাছুর। আর বাছুর হয়েছে বাঘ।

উপমাটা বিক্রম ভট্টের মাথায় ঝাঁ করে বেজে গেল। মহীতোষ চাটুজ্জে এজন্যেই বলে, বিক্রম, তুমি বড্ড দ্রুত সব বুঝে ফেলছ। ঠিক নয়। ক্লাস ওয়ানে বসে যদি টেন পর্যন্ত পড়ে নিতে চাও, তাহলে দশবছরের শিক্ষাক্রমের কি প্রয়োজন! ইতিহাস আর অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিতে শেখো।

কিন্তু বিক্রম ভট্ট কি আর করে! মাথা এখন শাণিত হওয়া কি তার দোষের! ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিল। অঙ্কে লেটার মার্ক। বি. এস-সি-তে গিয়ে ঠেকল। কারণ, প্রণয়! পাড়ার টুকি ঝাঁ করে অনুরাধা হয়ে যাবে সে কেমন করে জানবে! টসটসে আঙুর দেখলে তো জিভে জল আসবেই। কথামালার শিয়ালের ভাগ্য সবার হয় না। আঙুরলতা কখনও কখনও নুয়ে টুপটাপ তার ফল দান করে না, এমন কথা কে হলপ করে বলতে পারে! অন্তত বিক্রম ভট্টর ক্ষেত্রে হয়েছিল। অনুরাধা তখন আকাশ বাতাস। অনুরাধা তখন জীবন। তুচ্ছ পৃথিবী, তুচ্ছ ধন।

কলেজের বইপত্তরে পড়তে থাকল ধূলো। রইলো বিদ্যে। মেয়েমানুষকে বুকে নিয়ে দিব্যি উড়ে বেড়াতে থাকল একুশ বছরের টগবগে বিক্রম। 'কপোতকপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে'। ধরে রাখতে দিল না বাবা। অনুরাধা বলেছিল, 'বিক্রম চল আমরা পালিয়ে যাই।' পালাতে পারল না। সাহস ছিল না। পরে ভেবেছে ঠিকই করেছে সে। অনুরাধা এলে আঠার হাজার টাকা তার ঘরে ঢুকত না। এক মেয়েমানুষের শরীরের সঙ্গে আর এক মেয়ের শরীরের কিই বা তফাত। অনুরাধা দেড় বছরের মাথায় কোলে ছেলে নিয়ে এসে বলেছে, 'বিক্রমদা ওর বাবা আসবে, হাট থেকে মিষ্টিটা এনে দাও না!' সাইকেল হাঁকিয়ে দিব্যি মিষ্টি এনে দিয়েছে। ইয়ার্কি করেছে নির্ভেজাল, 'আহা এর বাবা হলাম না!' অনুরাধা ফিক করে হেসে বলেছে, 'কি অসভ্য রে বাবা!'

হুঁ, বলেছে। কিন্তু বি. এস-সি-র রেজাল্ট বদলানো যায়নি। না যাক্, প্রখরবুদ্ধি জীবনধারণের কলাকৌশলগুলিতে লেটার মার্ক দিয়ে বসে আছে। বড়দা চন্দননগরে চাকরি করেন। ফ্যামিলি ওখানে। পূজোতে আসেন। জোতজমি দেখেন না। বাবা স্ট্রোকে মারা যেতে পূর্ণ দায়িত্ব তার। স্ত্রী রত্নটি তো সন্তানের জন্মদানকে

একমাত্র নারীধর্ম বলে জানে! রক্তের মধ্যে আর একটা বড় দোষ, আত্মসন্তুষ্টি। কি মারাত্মক। সন্তোষই তো বিনাশ করে মানুষকে। যা হোক, পঁয়ত্রিশ বিঘে ধানী জমি, গরু বাছুর, ভেড়া মোষ, ঘরবাড়ি তার হাতের মুঠোয়। অনুরাধা ত্রিশ টাকা ধার নিয়েছিল, তিন টাকা সুদ। খুবই কম, অনুরাধা বলেই।

হুঁ, বাঘ আর বাছুর। গায়ে এখন তার বাঘের গন্ধ নাই। স্রেফ বাছুর। বাঘ মানে কেবলই হিংস্র নয়। সাহস আর শক্তির দ্বৈত প্রকাশ। বাছুর মানে ভীরুতা নয়, একটা পরম কল্যাণকারী অস্তিত্বের জীবন্ত রূপ!

কিন্তু উপমাটা কি ওই কারণেই মনে পড়ল? বাঘ আর বাছুর। বাঘ দেখে বাছুরের অনুভূতি কি তার! কেন? বিক্রম ভট্ট বাঘ হয়ে কি হিংস্রতা দেখিয়েছিল?

মোটেই না। মোটেই না।

মাখন হাড়ীকে ডাকাতি কেসে ফাঁসানোর সেই চেষ্টাটা? সেটা তো মহীতোষ চাটুজ্যে করেছিল। সে বরঞ্চ আপত্তি করেছিল। মহীতোষ চাটুজ্যে বলল, 'না, জাল পেয়েছ! ছোঁড় জাল। মাছ তোল। তোমার জমি নিয়ে তো বেটা হাঙ্গামা করছে। সরিয়ে দাও। বুঝলে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। সুযোগ কাজে না লাগালে সময় বাঁশ দিয়ে দেবে। ভারী বেয়াড়া জিনিষ সময়। তুমি তো বোকা নও, ভট্ট! সময়ের কেরামতি তো বোঝ। আজ তোমার কাল আমার। তোমার সময় এখন, নিয়ে নাও কোলে তুলে।' তাই না সে দু'শো টাকা খরচা করে ফেলল। শালা, টাকাতে কি না হয়! কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল পুলিস! কোর্টে ছোট। খসাও পয়সা। কেউ তোমার বাপ-ঠাকুর্দা নয়। মেজাজ দেখবে না। কিন্তু ফাঁসল না বেটা কারণ সেদিন বিছানায় ছিল মাখন। ডাক্তার বাঁচিয়ে দিল। ডাক্তার বেটাকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না। কিন্তু আর— কখন? দাবড়ানি দেওয়া? খুনের ভয় দেখানো? ওর গরুজোড়াকে খোঁয়াড়ে দেওয়া? বিষ্টু ঘোষকে ধার দিতে নিষেধ করা? ঝগড়াঝাটি হলে মানুষ ওসব করে। বেঁচে বর্তে থাকতে কে না ঝামেলা করে! কিন্তু তা বলে কি ভালবাসা থাকে না? পড়শী কি আর পর হয়ে যায়? অন্ধকারে একটা ফ্যাবড়া ছোঁড়া হয়েছিল। খোঁড়া হ'ত। লাগেনি! ভট্ট কিন্তু নিজের হাতে ছোঁড়েনি।

সাইকেল ঠেলে বিক্রম ভট্ট একমুখ হাসল, 'তুই!'

সাইকেল থামালো মাখন হাড়ী, 'আপনি!'

'ঘর যাব। দেখ্ না, অন্ধকার হয়ে গেল। জল আসতেও পারে।'

'তাই লাগছে। ঝেঁপে জল এলেই হল।'

মোড়মাথা এখন আলোময়। আগে হ্যাজাগ অজগরের মত ফোঁসফোঁসানি ছাড়ত। গ্যাস জ্বলত, লম্ফ ধোঁয়া ছাড়ত! বিদ্যুৎ এসে চেকনাই ফিরিয়ে দিল। মোড়। দু'দিকে রাস্তা ছুটেছে। কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর পানবিড়ির দোকান চারটে। তিনটে চা তেলেভাজা, মিষ্টির। একটা মনিহারি। একটা সাইকেল মেরামতির। আলোগুলো ঠিকরে পড়েছে। অদূরে গাঁ, নিপাট অন্ধকারে। ঘর আর গাছগাছালি

যেন কালো দৈত্যের মত ওত পেতে আছে। ওখানে রাত্রি। মোড়েও এই শেষ বাস যাওয়ার পর রাত্রি নামবে। পসরা গোটাতে এর মধ্যে সবাই ব্যস্ত।

দিন বদলে গিয়েছে। বাছুর এখন বাঘ। বিক্রমের গলার স্বরে ভয়। কিন্তু এর দেখ! বিক্রম ভট্ট ভাবল, কেস ঝুলছে। জমি ছাড়েনি। লাঙল দিয়েছে। কিছুই করার নেই। হুঁ, ওর গলার স্বর কেমন নির্ভয়। কুঁকড়ে থাকত। জমি অবশ্য ধরে রেখেছিল।

মাখন হাড়ীর বিদ্যে ক্লাস থ্রি। গরু বাগালি, তারপর জমি চষছে। বিক্রম ভট্ট স্কুল শিক্ষক। অভাব নেই তো মাছ দুধ ঘি-এর, চরম শত্রুতা করছে কিন্তু লিভারটি। ফলে রোগা প্যাংলা ফরসা শরীর। মাখন হাড়ীর ভাতই নেই তো দুধ ঘি! কিন্তু মা দুর্গার অসুরটির মত কাঠামো নিয়ে বসে আছে দিব্যি। সাইকেলটা বিক্রম ভট্টের নিজের। মাখন হাড়ী তারটা চেয়ে নিয়ে এসেছে লোচন ঘোষের কাছ থেকে। বিক্রম ভট্টের ধুতির উপর টেরিকটের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি, মাখন হাড়ীর লুঙ্গির উপর ছিটের হাফসার্ট। বিক্রম ভট্ট গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। বিয়ে হল ছোট শালীর। আটকে দিল বলে এত দেরি। মাখন হাড়ী গিয়েছিল খবর নিতে স্যাঙাত-ঘর। আচমকা মারা গিয়েছে স্যাঙাতের বাপ।

কিন্তু এক গাঁয়ে ঘর। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে তিন বছর। দু-জনের সামনেই এক অন্ধকার নক্ষত্রহীন আকাশ। বর্ষার কর্দমাক্ত খাল ডোবা এক-হওয়া পথ। আঁকাবাঁকা। হাঁটা দুষ্কর, সাইকেল তো বোঝা। এবং এক বাধা শীর্ণকায় নদীটিও। বর্ষায় কিছুক্ষণের জন্যে ফুলে ফেঁপে ওঠে। তার নাম বান। তারপর হাঁটু জল। সাঁকো নেই। ডিঙির ব্যবস্থা নেই। দু-জনেরই ভাবনা, নদী ফুলল কিনা। দু-জনেই মোড়ের আলো থেকে অন্ধকারে ডুব দিল।

বিক্রম ভট্ট বলল, 'তোকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। ভাবছিলাম, অন্ধকারে একা একা যাব কি করে! রাতে তো সাড়ে-তিন মাইলই ত্রিশ মাইল।'

মাখন ভয় করেনি। অন্ধকার তো বাঘ ভালুক নয়। ফলে উত্তর দিল না।

'সিগারেট খাবি?'

'না।'

'আহা, খা না। আরে মাখন, তুই তো শুধু গাঁয়ের লোক নোস। আমার খেলার সাথীও ছিলি। হেঁ-হেঁ। আহা, কি সুন্দর ছেলেবেলা রে। যা যায় আর আসে না। ধর সিগারেট।'

'না একটুস আগে বিড়ি খেন্‌ছি।'

গলার স্বর এত মোটা করছে কেন? বিক্রম ভট্ট ভাবল। মতলব নেই তো কিছু? অন্ধকারে বের হওয়া কি ঠিক হয়নি? না বেরুলেই পারত! একদিন ঘরে ছিল না, কি কাণ্ড হয়ে আছে কে জানে। ধান চাল, গরু বাছুর, টাকাকড়ি, বাসনপত্র, জমিজিরেত, সে ছাড়া যে পিতৃহীন! হুঁ, বাছুর যখন, তখন নমনীয় হলে ক্ষতি কি! অন্ধকারে মুখও দেখা যায় না।

অন্ধকারটা সয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় বালি। ফলে সাইকেল ঠেলে হাঁটতে কষ্ট নেই। দু'দিকে খেজুর গাছ, ছোট সাঁকো। তারপরই একটা গাঁ। লম্ফ দেখা যাচ্ছে।

'বুঝলি মাখন, আমরা আগেই ভাল ছিলাম রে।' বিক্রম ভট্টর সাইকেল গর্তে পড়ে একবার ঝাঁকালো। বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'শালা!'

আগে ভাল ছিলাম। কবে? মাখন হাড়ী সাড়া করল না।

'তখন খাও দাও, স্কুলে যাও, মাঠে ঘোরো, আম পাড়, বন থেকে ডুমুর কি কুল নিয়ে এস।' বিক্রম ভট্ট সূতো ছাড়তে থাকল। মাছ লাগুক না লাগুক, হুইল হাতে ঘুরিয়ে যাচ্ছে, 'তুই তো গাছে চাপতে পারিস খুব। সেই তালশাঁস খাওয়ার কথা মনে আছে? তুই যা দয়া করে দিতিস।'

মাখন বলল, 'সুনাম ভাগই ত দিতম।'

'দিতিস! উহুঁ, মনে পড়ছে না। না, মাখন, দিতিস না তুই। আর দিবিইবা কেন! গাছে কষ্ট করে চাপতিস তুই। অধিকার তো তোরই। তুই দয়া করতিস।'

'মুনে পড়ে না।'

'পড়ে না, এই নিয়ম।' বিক্রম ভট্ট হাসল, 'তখন তুই কর্তা।'

মাখন উত্তর দিল না।

বিক্রম ভট্টর ঝাঁ করে মাথাতে এসে গিয়েছে। এটাই নিয়ম, চাঁদ! কৈশোরে সেই তাল পাড়ার ঘটনাটা অনুধাবন কর। তুমি বেশী নিতে। সমান ভাগ কক্ষনো দিতে না। চমৎকার। হুঁ, তোমার শক্তি ছিল, তারই দাম। এখন আমার বুদ্ধির কৌশল, তার দাম দিতে ব্যাগরা দিচ্ছ কেন? পৃথিবী এভাবেই চলছে, চলবে। বিক্রম ভট্টর মনে পড়ে গেল, বিভূতির কথা, হাজার হাজার বছর ধরে রয়েছে ধনী আর দরিদ্র। থাকবেই। প্রকৃতির এটা নিয়ম। নইলে সামঞ্জস্য থাকে না। এই সভ্যতা, এই সংস্কৃতি, কৃষ্টি, প্রগতির ধারা সব রুদ্ধ হয়ে যেত। চমৎকার বলতে পারে মাইরি বিভূতি! যুক্তি! বড্ড বাজে জিনিস!

গাঁ পিছনে চলে গেল। এবার একটা ডাঙা। রাস্তাটা এখান থেকে ভাল। সাইকেলে চড়া যেতে পারে। এরপর শীর্ণকায় নদীটা। এই ডাঙাতে ক'দিন আগে ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। বিক্রম ভট্টের মনে পড়ে গেল। বুদ্ধির কোষে ফুঁড়ে গেল তীর। ঠিক বলা হচ্ছে না। মাখন চটে যেতে পারে। এই সেই ডাঙা। মাখন হাড়ী বাঘ।

'বুঝলি, তবে তোর মধ্যে হৃদয় ছিল। খাটতিস তুই। খেতাম আমরাই।'

খাটতিস তুই, খেতাম আমারই। এখনও তো সামনে চলছে। বিক্রম ভট্ট হে, ভারী ভয় পেয়েছ। কি সর্বনেশে কথা। আসামীর কবুল একেবারে, আজ্ঞে খুন আমি করেছি, তবে...। সাবাস দেবার জন্যে ব্যগ্র হল বিক্রম ভট্ট। সাইকেলটা পড়তে পড়তেও সামলালো।

'যাক ওসব কথা। মোদ্দা কথা হল, আমরা ভাল ছিলাম।'

'তা হয়ত ছিলম।'

'হয়ত কি রে!'

'কিছু ত মনে নাই। খালি মনে আছে পেট ভরে ভাত পেতম না। এখনও পাই না।'

'লোকসংখ্যা! লোক কত বেড়েছে! চল্ না একটু চেপে যাই সাইকেলে।'

পাশাপাশি দুখানা সাইকেল চলতে থাকল। গতি ধীর। বিক্রম ভট্ট ভাবল, শালাকে তো কিছুতেই কথা বলানো যাচ্ছে না! ভাবছে কি! কি মতলব আঁটছে? অন্ধকার চোখ-সওয়া। তবু এই উঁচু-নিচু ভূঁই, গাছ-গাছালি, রাস্তা, পুকুরের পাড়, দূরে অদূরে গাঁ, কিছুই স্বরূপে নেই। কালিস্তূপ কোথাও গাঢ়, কোথাও ফ্যাকাশে। ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে যেন পৃথিবী নামক প্রেক্ষাগৃহ চেপে বসে আছে। আক্রমণ করতে পারে। গুরগুর করে বুকের ভেতরটা। লিভার ট্রাব্ল জীর্ণ করে দিয়েছে। কলকাতা যেতে হবে একবার। ভাল ডাক্তার দেখানো দরকার। এত ভয় কোথায় ছিল? উঃ গরম লাগছে। জ্বলন্ত উনুন যেন সামনে পিছনে আগলে আছে।

'লোক বেড়েছেক। কিন্তু বাবুরা ত ঠিক খেতে পায়। আমরা পাই না কেনে।' সাইকেল টানতে টানতে মাখন এতক্ষণে বলল।

'খুবই অন্যায় বুঝলি। এক শ্রেণী সুখে আহ্লাদে বেঁচে রয়েছে। আর এক শ্রেণী নিরন্ন। এর প্রতিকার দরকার। আহা, আমরা তো সবাই মানুষ!'

'মানুষ বটি আমরা?'

বিক্রম ভট্ট প্রশ্নটায় থতমত খেল। মাখন ঠাট্টা করছে। কর। সামনে নদী পার হতে হবে। বলল, 'ছিঃ ও কি কথা মাখন! নিজেকে অত ছোট ভাবতে নাই। বুঝলি মাখন, সব মানুষের মধ্যেই এক শিবের অধিষ্ঠান। কেউ ভিন্ন নয়। তুমি আমি সব এক।'

'তা হবেক।'

মাখন হাড়ীর চিন্তা বিক্রম ভট্ট নয়। ঘর। চাল যোগাড় করে চিনুর মা ভাত চাপিয়ে রেখেছে কিনা। পেটে শালা এমন টান!

নদীর সমানে এসে দেখা গেল ফুলেছেন উনি। উত্তরে ঝেঁপে জল হয়েছে আর কি। ক্ষেতের, ক্ষুদে খালের জল ইনিই টেনে নিয়ে নিঃস্ব করেন। সেই কর্মেই ব্যস্ত। অন্ধকারে শব্দ করছেন বিচিত্র। দু-কূলের মধ্যিখানে কালো স্রোত একটু নজর দিলেই বোঝা যাচ্ছে প্রচন্ডবেগে ধাবমান। কিন্তু গভীর কতখানি! নদীর সঙ্গে আত্মীয়তা যথেষ্ট গাঢ়। কষ্ট হয় না টের পেতে। বড় জোর বুক সমান। তাই বা কম কি! টান তো ভয়ঙ্কর। মূল ছিঁড়ে কুপোকাত করতে পারে। এক হাঁটুতেই মুখটি গুঁজে আত্মস্থ করে নিতে চায়।

দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখ দেখল। অন্ধকারে দেখা যায় না। দুটি কালো অস্তিত্ব। এখন দুটিই সমান। ফারাক করার সাধ্য কারও নেই।

'মাখন, বেশ জল।'

'হুঁ।'

'পার হওয়া যাবে?'

'যেতে হবেই।'

'তুই তো পেরিয়ে যাবি! আমাকে পার করতে পারবি? হ্যাঁ রে, তুই আমাকে ফেলে যাবি না তো!'

'তাই কি পারি। মানুষ ত বটি। নদীর ইপাশে রেতের বিলা থাকলে খাওয়া হবেক নাই। জল হছে, দাঁড়ানর ঠাঁই নাই।'

'জানি, তুই খুব ভাল রে মাখন, হে হে।'

কি সব কথা যে বের হয়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করা ছেলে, অত ধনের মালিক, ভদ্রলোক, তার এহেন বাক্য! ছিঃ ছিঃ। বিক্রম ভট্ট নিজেকে ভৎর্সনা করল। কিন্তু নদী যে বোঝে না ফার্ষ্ট ডিভিশন, টাকার মালিক মালিকানা, ভদ্রলোক-ছোটলোক। সব সমান। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ঘোলা জলে পাক। হুড়ুম ধুড়ুম কেরামতি। দু পাশের মাটি খাওয়া আর সোঁ সোঁ করে টেনে নিয়ে যাওয়া। কোন বস্তুতেই অনাগ্রহী নয়।

'আগে সাইকেল পার করি আপনার আমার!'

'আর আমি?'

'কাঁধে করে নিয়ে যাব।'

বিক্রম ভট্ট অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। জলে যেন ভেসে যাচ্ছে কালো একটা সজীব বস্তু। শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে স্রোতের আওয়াজে। বুক ঢিব ঢিব করছে। বিক্রম ভট্ট ভাবল, মানবিক কর্তব্য করছে মাখন। ওটাই মানুষের ধর্ম।

স্রোতের সঙ্গে লড়াই ক'রে দু'খানা সাইকেল ওপারে চারবারে মাখনকে যথেষ্ট কাহিল করেছিল। ক্ষিধে ভয়ঙ্কর জিনিষ মাখনের কাছে, প্রচন্ডভাবে তাকে টানছে বলেই সে দ্রুত পথটা কমিয়ে আনতে চায়। নদীর সঙ্গে খেলা নয়, পাশ কাটিয়ে যেতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কাঁধে চাপুন।'

'তুই যে হাঁপাচ্ছিস্।'

'চাপুন বলছি।'

ধড়ফড়ানিতে ভয় পেল বিক্রম ভট্ট। উঠে পড়ল কিন্তু। এঃ জলে ভিজে গেল ধুতি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। মনে পড়ে গেল, কুমীরের পিঠে শেয়াল চলেছে! উহুঁ! উটের পিঠে শিয়াল চলেছে। উঁহু! বাঘের পিঠে বাছুর চলেছে। যা হোক। গল্প! গল্পটার মোদ্দা কথা হল, জলের মধ্যে ঝুপ করে ফেলে দিল দুষ্টু বন্ধুকে। মোদ্দা কথা, জলের মধ্যে ফেলে দিল!

এত নড়ছে কেন মাখন? কি দুলুনি। বিক্রম ভট্ট টের পেল, স্রোতে ফেলার জন্যেই মানুষটা চেষ্টা চালাচ্ছে। ওমনি হৃৎপিন্ড যেন ড্রাম হয়ে গেল। পিটুচ্ছে। অবিরত পিটুচ্ছে। দিল। দিল ফেলে! আঃ বিক্রম ভট্ট হাত বাড়াতে গেল। কিছু

নেই, চেপে ধরল ওর চুলের মুঠি। পারবে। ধরে রাখতে পারবে। উহুঁ, এক ঝটকায় পোকার মত ফেলে দেবে তাকে। দমবন্ধ হয়ে এল বিক্রম ভট্টের। ভাবল, হায়, কোথাও কোন শব্দ নেই। আঃ। বিক্রম ভট্ট টের পেল আসন্ন মৃত্যুকে। বিশাল কালো হিম থাবা নেমে আসছে। জীবনে এমন গভীর অন্ধকার ভট্ট দেখেনি। হয়ত মৃত্যুর আগে কোন মানুষই দেখে না।

'নামুন দেখি। বাপস্।'

আঁ। টলে পড়ল বিক্রম ভট্ট। পায়ের তলায় কাদামাটি। ওদিকে সাইকেল দুটো। অন্ধকারে গায়ের জল ঝাড়ছে মাখন হাড়ী। গায়ে জামায় হাতে ধুতিতে কাদা মাখামাখি। নদী পার হয়ে এসেছে। আঁ—নদী পাব হয়ে এসেছে!

'মাখন রে।'

উত্তর দিল না মাখন হাড়ী।

'মাখন রে আমি ভেবেছিলাম তু আমাকে জলে ফেলে দিবি।'

'বলেন কি!' হাঁপের সঙ্গে মাখনের বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটল।

'ফেলব কেনে!' বলেই মাখন যেন কৌতুকে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'যা কাঠ হয়ে কাঁধে ছিলেন, মুনে হচ্ছিল অবিশ্যি মরাই বটেক।'

মরা! আমি তাহলে মরে গিয়েছি। বিক্রমে ভট্টের ঝাঁ করে মাথাতে বাজল। মুখ্যু লোক। ইঙ্গিত, উপমা, অলঙ্কার জানে না। তাহলে সত্যিই কি মবা। রূপকথার গল্পে সেই দৈত্য যখন শুনল, সে মারা গিয়েছে, তখন নিজের কবর খোঁড়ার ব্যবস্থা করেছিল! সে কি নির্বোধ দৈত্য! হ্যাঁ, লেখা আছে রূপকথায়।

বিক্রম ভট্ট কুলকুল করে ঘামে। বড় অন্ধকার। সব অস্পষ্ট! তার বুদ্ধি আছে না। ফার্স্ট ডিভিশন, অঙ্কে লেটার মার্ক। এত ভুল হয়ে যাচ্ছে! মাখন ঠাট্টা করছে? ঠাট্টা।

'আমি যেছি।'

'দাঁড়া মাখন।'

বিক্রম ভট্ট উঠতে পারছে না। ঠাট্টা! সে তো বেঁচে আছে। কিন্তু মাখন যে চলে গেল! কি অন্ধকার! রাস্তাটা গোলমাল ঠেকছে। ওই তো গাঁ। মাখন রে, দাঁড়া। মাখন রে—।

বিক্রম ভট্ট কেবল টের পেতে থাকল, মাখনকে তার কত প্রয়োজন।

অনুভবের টুকরো

বেলা তিনটে নাগাদ ফাইলে মুখ গুঁজে থাকা শরৎকে সুদেব বলল, 'শরৎবাবু বড়বাবু আপনাকে ডাকছেন!

টেবিলের সামনে থেকে সুদেব সরে গেল দ্রুত।

বড়বাবু বিনয় সরকার। সবাই সরকারদা বলে। ক'দিন হল 'দা' বিয়োগ ঘটিয়ে সুদেব প্রয়োজনে তাকে বাবু সম্বোধন করছে। তাকে বলার অভ্যাস করাটা বোধ করি বিনয় সরকারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়ে গেল। এটাই নিয়ম। রাজনৈতিক যান্ত্রিকতায় শব্দ ব্যবহার নিখুঁত, হিসেবী এবং আঙ্কিক নিয়মবদ্ধ হয়, যেখানে সম্পর্কের মধুরতার কোন গন্ধ থাকে না। যন্ত্র এবং অঙ্ক দুই-ই নিয়মাধীন। বাবু দূরত্বসূচক। ফোর্থ ক্লাস স্টাফ হলেও সুদেব অলকেশ চ্যাটার্জির নাম্বার ওয়ান হ্যান্ড। ইউনিয়নবাজির খেলোয়াড়।

শরতের মস্তিষ্ক দ্রুত এরকম ভাবনা স্পন্দিত হওয়ার সঙ্গে ঘন্টাধ্বনি শোনে। আগুন লেগেছে। ফায়ার বিগ্রেডর লালগাড়ি বেপরোয়া ছুটে যাচ্ছে। ধ্বনিত হচ্ছে বিপদ বিপদ ত্রাস। জানা ছিল, তবু অনুভবে এমনটি হয়ে যায়। কালই ত্রিদিব এসপ্ল্যানেডে বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে বলেছে, 'তোকে ট্রান্সফার অর্ডার ধরাবে। কেন যে খোঁচাতে গেলি। দেখছিস সবাই মেনে নিচ্ছি। শরৎ বলেছে, 'তা বলে সত্যি কথাটাকে বলব না।' ওমনি ত্রিদিবের ঝাপটা, যাতে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়, 'কটা সত্যকে নিয়ে চলিস বল তো!'

কানের পাশে তার নিজেরই দীর্ঘশ্বাস পড়েছে, যথার্থ। কিছু সত্যকে বগলদাবা করে জীবন। তাতেই আত্মসন্তুষ্টি। সব সত্য সহনীয় নয়। বড় অগ্নিময় সময় সময় সত্যের স্পর্শ।

অলকেশের মুরোদ ওই ট্রান্সফার পর্যন্ত। অন্য কোন ফ্যাসাদে ফেলতে পারবে না। সে টাইমলি অফিসে আসে, কাজ করে। কিন্তু ট্রান্সফারকে ভয় কেন! ভয় নয়, ওই যে ফায়ার বিগ্রেড সে তো অপমানের আগুনের দিকে ছোটা। লালগাড়ি ছুটবে। আগুন নেবাবে না—শুধু ছুটবে। তারই জ্বালা শরতের ফরসা রোগা মুখে সরু গোঁফের রেখা কাঁপায়।

'সরকারদা ডেকেছেন।'

'হ্যাঁ। বস।' পঞ্চাশ পেরুন টেকো মাথা, কাঁচাপাকা চুল ঘাড়ে, মোটা গোঁফ, চোখে চশমা, পরিচ্ছন্ন বসা গলা। গায়ের বর্ণ শ্যামলা। ফাইল বেঁধে রাখে একটা। তারপর ওদিক থেকে একটা খাম বের করে। আবার বলে, 'বস।'

বসানর অর্থ সহানুভূতি প্রকাশ করা। কাজ থাকলে দাঁড়ান অবস্থাতেই ফাইল

দিতেন। ট্রান্সফার অর্ডার। বসে না শরৎ। একটা বাজে ডিপার্টমেন্টে নিশ্চয় ট্রান্সফার করেছে। যেখানে কাজের চাপ বেশি। বিশ্রি কলিগ, ক্ষুব্ধ পাবলিক রিলেটেড। যন্ত্রণা তো দিতে হবে তাকে।

তোমার একটা চিঠি আছে।'

'জানি। ট্রান্সফার। কোথায় দিয়েছে।'

'ডেসপ্যাচ।'

'আর কেউ ট্রান্সফার হল।'

'আমার কাছে তো এই একটাই চিঠি। বুঝলে খুব খারাপ লাগছে। তোমার মত একটা কাজের ছেলে চলে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে।'

শরৎ হাসল। প্রশংসটা অহেতুক নয়। লজ্জিত হবার কিছু নেই।

'বুঝলে আমার কোন হাত নেই। নইলে আটকাতাম।'

শরৎ দেখল, সরকারদার দুটো হাতই নেই। কাঁধের পর শূন্য। আহা বড় ভাল মানুষ। সাতে পাঁচে থাকে না। বড় ছেলেটির চাকরি হচ্ছে না। মেয়ে বি. এ পাস, অসম্ভব রোগা। বিয়ে দিতে পারছে না। সে আতঙ্কে চেঁচাতে গিয়েও থেমে গেল। হাত না থাকলে কি হবে! কাজ তো করে যাচ্ছে। ওই তো চিঠিটা বাড়াচ্ছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল শরৎ।

।।২।।

'বাবা একটা তেজওয়ালা টিয়া, দেখবে এস খাঁচায়।'

'সব টিয়ারই লেজ থাকে টুপুর!'

'লেজ নয় তেজ। ঠোকরাচ্ছে। ছোলা দাও, কাঁচালঙ্কা দাও—কী রাগ।'

'টিয়া এল কোথা থেকে?'

'সমীর ধরেছে।' দীপা বলল।

টুপুর বলল, 'জান বাবা, সমীরকাকুর হাত কামড়ে রক্ত বের করে দিয়েছে।'

সমীর পাশের ফ্ল্যাটের। রথের মেলায় টুপুর খাঁচা সমেত দুটো হলুদ বদরী কেনে। একটা মারা যায়। অন্যটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই শূন্য খাঁচা। কিন্তু টিয়া ধরা দিল। নিশ্চয়ই কারও পোষা। কিংবা বুনোও হতে পারে। খাঁচা বন্দী হয়ে খেপে আছে! স্বাভাবিক।

জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢোকা শরৎ জল স্পর্শেও উষ্ণতা মুছতে পারে না। জামার পকেটে চিঠিটা। অবিরত অগ্নিস্রাব করে চলেছে। এখনও বুকের মধ্যে খামটা। আগুনজ্বলা টাইপমালা। অফিস প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে ডেসপ্যাচ সেকসানে তাকে ট্রান্সফার করছে। মিথ্যে কথা। অলকেশের জেদে, ইউনিয়নকে তোয়াজ করতে এটা করা হচ্ছে। শরৎ অলকেশের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সমালোচনা করেছে কাজের। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। তাই শাস্তি। ট্রান্সফারের অপমান।

সনৎ মিত্র অলকেশের পাশের টেবিল। অলকেশের কাজকর্ম করে দেয়। ভীতু টাইপের ব্যক্তিত্বহীন চল্লিশ বিয়াল্লিশের মানুষটির ভীরু চাউনিতে সব সময় করুণা প্রার্থনার ভঙ্গি। অমন মানুষকে শরৎ ঘেন্না করে। অথচ লেট করে আসায় অলকেশ যখন বকাবকি করছে, তখন সে না বলে পারেনি, 'আপনি তো রোজই লেট। চলেও যান। আজ না হয় সকাল সকাল এসেছেন। নিজেরটা ভাবুন। অন্যকে জ্ঞান তারপর দেবেন।'

দীপার মাথায় ঘোমটা নেই। সবুজ ছাপা শাড়ি, সবুজ ব্লাউস, মাংসল কোমর, পেট, গলা চিবুক কাঁধে ঝলক দিচ্ছে। এখনও মাংসের বাহুল্য হয়নি। ক্রমে হবে। রোগা ভাব কেটে সেদিকেই যাচ্ছে। গোলধরণের মুখে লাবণ্যও যথেষ্ট রয়েছে। খাটের তলা থেকে টি-টেবিল টেনে তাতে জলের গ্লাস রাখল। বলল, 'পরোটা করছি খাবে?'

'না। চা বিস্কুট দাও।'

টুপুর সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দশ বছরের রোগা মেয়ে। টিয়া প্রসঙ্গ টানার জন্য সে ব্যস্ত। তবে বাবার মুখ দেখে সে বুঝি অনুভব করতে পারছে না আবহাওয়াটা। টিয়া না দেখে তার কথা না শুনে বাবা কখনও কী চা খায়?

'হ্যাঁরে টিয়াটা খুব রাগ করেছে।'

টুপুর মুহূর্তে খুশী হয়, 'হ্যাঁ বাবা, ঠুকরে ফেলে দিচ্ছে লঙ্কা। কামড়াতে আসছে। আনব খাঁচাটা ও ঘরের বারান্দার দিকে আছে।'

'না। আমি চা খেয়ে দেখতে যাব।'

'বাবা ও যদি না খায়। মা বলছে রাগ গেলেই খাবে।'

চায়ের কাপ বাড়িয়ে দীপা বলল, 'তা নয় তো কী। ক্ষিধে পেলে খাবে।'

'নাও খেতে পারে। জেদে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে।'

'সে তো মানুষ। এ যে পাখি।'

শরতের মাথায় ঝট করে এর উত্তর এল না। জীবন আছে. বেঁচে থাকার তাড়না আছে, বেঁচে থাকার তাড়নারই জটিল সূক্ষ্ম এক উৎপাদন তো জেদ। বলল, 'আরে পাখি হলে কী হবে, সুস্থভাবে স্বাধীনতা নিয়ে সবাই বেঁচে থাকতে চায়।'

দীপা হেসে বলল, 'সেজন্যেই তো বলছি, বাঁচতে গেলে খেতে হবে।'

শরতের মাথায় এ কথাটার উত্তর ছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে গেলে বিদ্রোহ যে কেউ করতে পারে। সে বিদ্রোহের ফল, মৃত্যুকে বরণ করাও হতে পারে। নতজানু হয়ে হাতের আঁচলায় স্বাধীনতার অর্ঘ্য সকলে দেয় না। তুমি জোর করে খাঁচায় ঢুকিয়েছ বলেই ভেবো না ও তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে।

'বাজারে যাবে তো। আজ মাংস খাবে বলেছিলে!'

'থাক রবিবারই হবে।'

'রবিবার বড্ড ভিড় হয়।'

'তো কী করা যাবে।'

দীপা তার পুরুষটিকে অন্যরকম দেখেই প্রশ্ন করে, 'তোমার শরীর খারাপ।'

'না তো। শরৎ অবাক হয়, 'দেখে মনে হচ্ছে!'

'ঠিক তা নয়। যাকগে, ডিম তাহলে আন। বাজারে যেতে হবে না। দীনেশের দোকান থেকেই আন। তুমি তো আবার নিরামিষ খেতে পার না।'

'পেঁয়াজ আলু পোস্ত কর। খেতে পারি না বলে, খাব না তা নয়। সবই সহ্য করতে হবে।

দীপা আর কোন কথা বলল না। ওদিকের ঘরে গেল। টুপুরের সঙ্গে টিয়া দেখতে গেল শরৎ। পিছনের দিকে গ্রিল দেওয়া সামান্য বারান্দা ঝুলে আছে। খাঁচাটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ওখানে। বারান্দাটা চাপা। নর্দমার পর দত্তদের দোতালা খয়েরী বাড়ির দেওয়াল আকাশ দেখতে দেয় না। প্রায় সময়ই নর্দমা দুর্গন্ধ বয়। শহরে এ এক নরকযন্ত্রণা।

দরজা খুলতে ঘরের আলো এসে পড়ে খাঁচাটার গায়ে। বেশ বড়সড় সাইজ। বাচ্চা নয়। বুনো হতে পারে। হাওড়ার বাকসাড়ার এ অঞ্চলটায় এখনও প্রচুর গাছ, জলাও রয়েছে। ওদিকে সাঁতরাগাছি স্টেশন। নতুন বসতিতে জলা বুঁজছে ঠিক কথা, কিন্তু এখনও তো প্রকৃতির সবুজ নিগড়।

টুপুর টুকটুকে লাল কাঁচা লঙ্কা এনেছে। বলে, 'বাবা খেতে দিয়ে দেখ।'

'ওকে রাগিয়ো না টুপুর।' গম্ভীর গলাতে বলে শরৎ।

'কামড়াতে পারবে না। খাঁচার মধ্যে রয়েছে না। আটকে যাবে।' বাবার ভয় পাইয়ে দেওয়াটাকে মেয়ে উড়িয়ে দেয়।

শরৎ দেখে ওদিকে খাঁচার গায়ে টিয়াটা লোম ফুলিয়ে আছে। কোন নড়াচড়া নেই। দু'চোখে ক্রোধ। শরতের হঠাৎই মনে হয়, খাঁচার মধ্যে সে। টিয়াটা বাইরে থেকে তাকে দেখছে। ছুটন্ত রেলগাড়িতে যেমন গাছ, বাড়ি, মাঠকে ছুটতে দেখা যায়, তেমনই উল্টোবাজি আর কী!

।।৩।।

রাত্রে দীপা শরতের মশারির ভেতর ঢোকে। পাশের ঘরে টুপুরকে নিয়ে শোয় এমনিতে। টুপুর ঘুমুলে তার কাছে আসে। কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে যায়। তার মধ্যে টুপুরের ঘুম ভেঙে গেলে মিথ্যে বলতে হয় আসার অজুহাত হিসেবে। শরৎ শরীর দিয়ে দীপাকে পায়। পাউডারের গন্ধের সঙ্গে ব্লাউস খোলা নগ্ন বুকের নরম চাপ, ভেজা ঠোঁট, মাথার এলো চুলের আঘ্রাণ, দীপার ভালবাসাভরা অঙ্গ সঞ্চালন, স্নায়ু শীতলকারী অবশ্য।

ঘুম আসছিল না। এখন দীপাকে পেয়ে সেই অস্বস্তি কাটে। তবে তার হাত কিংবা অন্য অঙ্গ তৎপর হয় না।

'আমাকে ট্রান্সফার করেছে দীপা।'

'কোথায়'। উদ্বেগের রেণু যেন শ্বাসের বাতাসের সঙ্গে ছড়ায় দীপা।

'ডেসপ্যাচে।'

'একই তো অফিস। ডিপার্টমেন্ট আলাদা। তাতে কী।'

'এটা আমাকে অপমান। বলেছি তো অলকেশ চ্যাটার্জির সেই ব্যাপারটা।'

'কোন ব্যাপার।'

'আঃ সেই দেরী করে আসা। যা নিয়ে আমি মুখের উপর বলেছি।'

'কেন বলতে গেলে? তুমি ত হেড নও। যে যা করছে করুক গে।'

'আমি অন্যায় কিছু বলি নি। মিথ্যেও না।

দীপা বলল, 'ছেড়ে দাও তো। তুমি লেট কর না, কাজ কর—তোমার ভয় কী?'

শরৎ নড়ে চড়ে, 'ভয় নয়। অপমান। এই শাস্তি আমার অপমান।'

'শাস্তি কেন ভাবছ।' দীপা চুমু খায়, 'এই টিয়াটা পোষ মানবে তো।'

'কখন খাঁচায় ঢুকিয়েছ?'

'সেই দুপুরে। কিছু খায় নি। বাটিতে জল দিয়েছি ঠোঁট ডোবায়নি।'

'খুবই নিষ্ঠুরতা হচ্ছে।

'নিষ্ঠুরতা আবার কী। টিয়া তো পোষে লোকে। বদরী সমেত খাঁচা তো তুমিই এনেছিলে।'

'ওরা খাঁচাটাকে মেনে নিয়েছিল।'

দীপা বলল, 'এটাও মেনে নেবে। জল, ছোলা বাটিতে দিয়েছি। দেখবে খেয়ে নিয়েছে।'

দীপা শরীরের নানান ভঙ্গি করে। আষ্টেপৃষ্ঠে পুরুষকে জড়িয়ে রক্ত জাগাতে চায়। ঠোঁট ঘষে। বুকের নরম ধাক্কা দেয়। বলে, 'তোমার হল কী আজ।'

ঘুরছে চিঠিটা। কিংবা বুকে সেঁটে অগ্ন্যুৎপাত করে যাচ্ছে। শরীরের এমন ঘনত্বে দীপার টের পাবারই কথা।

শরৎ বলল, 'তুমি সিওর পাখিটা সব খাবে।'

'হ্যাঁ। সিওর। ছাড় তো। এই—।' দীপা স্বর কামার্ত করে।

শরৎ ভাবে, টিয়াটাকে নিষেধ করা দরকার। ওর মনে সাহস দিতে হবে। সে অনুভব করে তার একজোড়া ডানা হয়ে গেল। ডানা সমেত স্বচ্ছ হালকা শরীর ভেসে উঠল। বদ্ধ দরজার বাধা রইল না। দিব্যি পেরিয়ে গেল। খাঁচাটার সামনে উড়ে উড়ে সে বলল, একদম জল ছোলা খাবে না। ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তোমার স্বাধীনতা নষ্ট করেছে। তুমি প্রতিবাদ করছ—করে যাও। আমি তোমার সঙ্গে আছি। বলে শরৎ আবার বিছানায় ফিরে আসে।

।।৪।।

সকালবেলায় বাজার যাবার মুখে সমীর সঙ্গী হয়। বাজার কাছেই। অল্প

হাঁটতে হয়। সমীর ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

সমীরের বয়স বছর পঁচিশ ছাব্বিশ। ফরসা রোগাটে চেহারা। পাজামার উপর ঢোলা পাঞ্জাবি পরে আছে। তাকে দেখে হাসল। বিয়ে করেনি এখনও। বাড়িতে ছোটভাই আর বোন রয়েছে। বোন সুব্রতা কলেজে পড়ে। ওরই মিত্রা নামে কোন এক বন্ধুর সঙ্গে সমীরের প্রেমপর্ব চলছে। দীপার কাছে শোনা। যাই হোক সমীর কেন ধরল? নেহাতেই ছেলেমানুষি, মজা!

'সমীর টিয়াটাকে তুমিই ধরেছ শুনলাম।'

'হ্যাঁ। আছে তো!'

'কিন্তু কিছু খায়নি। কামড়াতে আসছে। তোমার হাতে কামড়েছে।'

সমীর হাতটা দেখাল। ডান হাত। মধ্যমার উপর চাটুতে লালচে হয়ে আছে। লাল ওষুধ লাগান। বলল, 'মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। টেট ভ্যাক নিলাম।'

শরৎ বলল, 'তুমি ধরতে গেলে কেন?'

'বাঃ এসে বসেছে। হাত বাড়িয়েছিলাম। উড়ে গেল না। চেপে ধরলাম।'

'না ধরতে গেলে কামড়াত না।'

'সে তো নিশ্চয়ই।' সমীর হেসে বলল, 'বেটার তেজ আছে।'

'হ্যাঁ, প্রতিবাদ করেছে কামড়ে। মানুষ তো এখন তাও পারে না।'

'যা বলেছেন শরৎদা! আমাদের সহ্যশক্তি খুব বেড়ে গিয়েছে। নির্বিকার সব ব্যাপারে। এখন সব কিছুতেই সমঝোতা, মানিয়ে নেওয়া।

'কিন্তু কেউ যদি আপোষ করতে না চায় অন্যায়ের সঙ্গে?'

'মরবে। যন্ত্রণা পাবে। তবে ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে।'

'বল কী। সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ। মিনিমাম ম্যাক্সিমামের সঙ্গে অপটিমাম যোগ হয়েছে। আপনি ঘুষ নিচ্ছেন তার সীমা ঠিকঠাক থাকলেই হল। তাকেই বলা হবে অপটিম্যাম, কিন্তু শরৎদা মনে হচ্ছে কোন গভীর ভাবনায় আপনি আছেন।'

শরৎ ভাবল, অফিসের কথাটা সে বলবে কী না, থাক। হেসে বলল, 'তোমার টিয়াটার প্রতিবাদ নিয়ে ভাবছি। খামচে দিয়েছে তো।'

'উহুঁ কামড়েছে।' সমীর বলল, 'মানুষ কামড়াতে পারে না। খামচাতেও পারে না। কামড়ান আর খামচানটা হয়েছে এখন বুদ্ধি দিয়ে। রক্তপাতটা দেখা যায় না। মানে বলছি খামচানটা হয় অন্য ভাবে। আদিম মানুষের দাঁত আর নখ ছিল।'

একটা সাইকেল রিকশা পিছনে শব্দ বাজাচ্ছে। রাস্তায় দু'ধারে আনাজপত্র, মাছ, লোকের ভিড়, বেচাকেনার শব্দ। ওদিক থেকে একটা খালি মিনি পথ পাচ্ছে না। সামনে হর্ন বাজিয়ে চলেছে। সাইকেলের ভিড়ে ঘষাঘষি অবস্থা।

শরতের মনে হল, তাহলে এখনকার মানুষের দাঁত আর নখ নেই। ঠিকই। বাজারের এত মানুষ, সে সামনে লুঙ্গি উপর পাঞ্জাবি ফরসা মধ্যবয়স্ক লোকটাকে

দেখল, দাঁত নেই, সামনের সব্জি নিয়ে বসা তরুণটির দাঁত নেই, ওদিকে মাছওয়ালা দাঁত নেই, সাইকেল ধরে রাখা যুবকটির নখ নেই, দাঁত নেই, কথা বলছে প্যান্টশার্ট কালো চুলের চল্লিশের মত বয়সী ফোলাগালের মানুষটি, তারও দাঁত নেই, কী আশ্চর্য!

সমীর দাঁতহীন মুখ দেখিয়ে বলল, 'চলি শরৎদা! ঢেঁড়শ কিনব।'

।।৫।।

অফিস আসার সময়ও দেখে এসেছে শরৎ, পাখিটা খায় নি। এতে সে খুবই খুশী ছিল। কিন্তু অফিসে ঢুকে আবার আগ্নেয় অনুভূতি। চোয়াল শক্ত হয়ে থাকে। সবাইকে মনে হয় প্রতিপক্ষ। চোখ তুলে কাউকে সে স্পষ্ট দেখে না। এখনও ক'টা দিন এই ডিপার্টমেন্টে। সে সিদ্ধান্ত নেয় কাজ ঠিকঠাক করবে না। বসে থাকবে গোঁজ হয়ে। ফাইল খোলা থাকবে অবশ্যই। বিনয়দাকে স্পষ্টই বলবে, আমি থাকছি না, ওটা যারা থাকছে তাদের কাউকে দিয়ে করান। সুদেবকে না বলতেই গ্লাসে জল দিয়ে গিয়েছে। শরৎ মুখে দেয় নি।

টিয়াটার কথা আবার মনে হয়। সাহস আছে। যন্ত্রণার ছটফটানি নিয়ে সমীর হাত আলগা করে দিতে পারত। টিয়াটার শক্তি কম। চিল কিংবা বাজ হলে সমীরের আঙুল কেটে নিয়ে উড়ে যেত। সবই তো আর চিল, বাজ নয়।

'ঘোষ, আপনি ডেসপ্যাচে যাচ্ছেন শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছিলাম ঝেড়ে ট্রান্সফার হবে। কিন্তু কেবল দেখছি আপনার।'

শরৎ জবাব দিল না। অনন্ত দত্ত ওদেরই চামচে। অলকেশকে তেল মাখায়। হাতের লেখাটা ভাল। পোস্টার লিখে দেয়।

'অফিস প্রশাসনিক কারণে ট্রান্সফার করতেই পারে।'

শরৎ থামিয়ে দেয়, 'আমি কী বলেছি পারে না।'

অনন্ত দত্ত দাঁড়ায় না। 'যাই সরকারদা' বলে এগিয়ে যায়। যেন ডাকছে।

অলকেশ চ্যাটার্জি সময়ে এসেছে আজ। টেবিলে কাজে মনোযাগী। শরৎ আড়চোখে তারই সঙ্গে সুদেবকে দেখে নেয়। পাখার শব্দ, খাতা নামান, কথার গুঞ্জন, হাঁটাফেরা অফিস কক্ষটি একই। তার ট্রান্সফার নিয়ে আর কারও কোন প্রশ্নও নেই।

শুভেন্দু এল। ধুতি পাঞ্জাবি পরে। কবিতা লেখে। শ্রীরামপুর থেকে ট্রেনে আসে। মাঝে মাঝে পাঁচ সাত টাকার কবিতাপত্র গছায়। বলল, 'সামনের মাসে শরৎদা অন্য ডিপার্টমেন্টে।'

'হ্যাঁ, প্রশাসনের সুবিধার জন্যে। অফিসটাকে তো ঠিকঠাক চলাতে হবে। এখানে আমি অসুবিধা সৃষ্টি করছিলাম।' উঁচু পর্দায় স্বর রেখে শরৎ ঠোক্কর দেয়।

শুভেন্দু অগ্রাহ্য করে ঠোক্কর। বলে, 'একই তো অফিস। তবে ডেসপ্যাচের সমরবাবু খুব বাজে লোক। কলিগ ভাল না হলে কাজ করে সুখ হয় না।'

শরৎ বলল, 'আমি ভাই কাজ করি, আমার কিছু যায় আসে না।'

টিফিনের সময় পরিচিত ঘোষ, বোস, সেনগুপ্ত, দাশ, তাকে জিজ্ঞাসা করে। ব্যাপারটা চাউর হয়ে গিয়েছে। বিরুদ্ধ ইউনিয়নের বিনায়ক সাহা শুনেছে। মজার ব্যাপার কেউ অলকেশের এটা কারসাজি বলে না। সবাই হিসেবী, গাঁ বাঁচান কথা। বলে শরৎ তো অলকেশেরই মেম্বার। চাঁদা দেয়। রাজনৈতিক প্যাঁচে নেই। যাইহোক তার মন্তব্য ইউনিয়ন বিরোধী হয়ে গিয়েছে। এমন কথাও কারো মুখে নেই।

ঘনিষ্ঠ ত্রিদিবই শুধু বলল, 'সবাই জানে। বলবে না। কম্পিউটারইজড ব্রেন করে ফেলেছে। রোবট আর কী। এক্কেবারে হিসেবী, আঙ্কিক ব্যাপার।'

'মানুষ কম্পিউটারইজড। রোবট।'

'হ্যাঁ। ফসকে মানুষ হতে চাইলেই ফ্যাসাদ। কে ফ্যাসাদে পড়তে চায়।'

শরৎ দেখে কথাটা মিথ্যে নয়। সবই রোবট। মাথা ঢাকা, পা ঢাকা, ধাতব যন্ত্র। হাত যান্ত্রিক, পা যান্ত্রিক। কী সাঙ্ঘাতিক। সারা অফিস রোবট হয়ে গিয়েছে। ত্রিদিবও তাই। সেও তাই। চেঁচাতে গিয়ে দেখে, না, মানুষই তো।

।।৬।।

বাড়ি ঢুকতেই টুপুর চেঁচায়, 'বাবা খেয়েছে। ছোলা, জল, লাল লঙ্কা।'

সুসংবাদ বৈকি। শরৎ প্রফুল্লবোধ করে না।

দীপা হাসে। যথেষ্ট গরবিণী। কপালে বড় টিপ নিয়েছে। মুখে প্রসাধন লালিত্য। ছাপা শাড়ি, কচি কলাপাতা ব্লাউজ। চমৎকার লাগে। শরৎ স্ত্রীকে দেখে। জয়ীর বোধ হয় ভিন্ন একটা রূপ হয়। ঠোঁট টিপে হাসে।

দীপা বলে, 'কী গো বলেছিলে না, খাবে না, দেখলে তো! আমি জানি।' অহঙ্কারী কবুতরীর মত ঘরের কাজ করে। তারই ফাঁকে বলে, 'দেখ ওকে দিয়ে আমি বুলি বলাব। বাবা! কী ভাবনায় যে ফেলে দিয়েছিল।'

শরৎ বড়ই হতাশ হয়। পাখিটা দীপার শেখান বুলিও বলবে!

ডেসপ্যাচের সমরেশবাবু তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন। ভদ্রলোক পান খান। মুখ রক্তিম হয়ে থাকে। কথা বলতে ছিটকেও আসে রক্তিম কণা। বেশি কথা বলেন। প্রতিটি ব্যাপারে উপদেশামৃত দান করেন। নিজেকে মস্ত কিছু ভাবার মত মূর্খামি আর কী। কাজ বিশেষ নেই যে সে ফাঁকি দিয়ে প্রতিবাদ করবে। গল্প করতে হয়। ঠিকই কথা, এই লোকটাকে সে কতদিন সহ্য করতে পারবে কে জানে।

অলকেশ চ্যাটার্জি একদিন বলল, 'এই যে শরৎবাবু, অসুবিধে হচ্ছে না তো। হলে বলবেন আমি ব্যবস্থা করে দেব। আপনি আমারই ইউনিয়নের

লোক। আমার একটা দায়িত্ব আছে।'

মুখে রক্ত জমার তাপ হজম করে শরৎ বলল, 'না অসুবিধা কী!'

'অর্ডারটা বেরিয়ে যাবার পর খবর পেলাম। নইলে আটকাতাম।'

সুদেব বারান্দায় ধরল, 'এই যে শরৎদা, ভাল আছেন। আমাদের ওদিকে যান না। অলকেশদা বলছিল, আপনাকে অন্য ডিপার্টমেন্টে দেবে। ডেসপ্যাচটা খুবই বাজে। বলুন না বিল সেকশানে দিতে। ওভারটাইম আছে।'

'থাক ভালই তো আছি।' শরৎ ঝগড়ায় গেল না। ক্রোধ এখন নেই।

ঘরে দীপা টিয়াটাকে বুলি শেখাচ্ছে। টুপুরও। লাল লঙ্কা ধরে বলানর চেষ্টা। শব্দ করলেই লঙ্কাটা বাড়িয়ে দিচ্ছে। শরৎকে বলল, 'বুঝেছ, এভাবেই শেখাতে হবে, লোভ দেখিয়ে। লঙ্কা ছোলার লোভে বুলি বলবে।'

শরৎ বলল, 'নাও বলতে পার।'

ক্রুর গলায় দীপা বলল, 'ওর বাবা বলবে।'

সমরবাবু লোকটা সত্যিই বাজে। নিজে কাজ করবে না, অথচ গল্প করে ডিস্টার্ব করবে। ত্রিদিব বলল, 'আমাদের ডিপার্টমেন্টে চলে আয়।'

আরও বেশ কটা দিন কেটে গেল। সুদেব টিফিনের সময় ধরল, 'শরৎদা বিল সেকসানে যাবেন? ওখানে জগদীশদা আছে আমাদের। বোঝেনই তো ওঁকে ইউনিয়নের কাজ করতে হয়। অফিশিয়াল কাজে একটু হেলপ করবেন ওকে। তবে পুষিয়ে যাবে। অলকেশদাকে বলেছি।'

শরৎ নীরব থাকে। একটা মস্ত খাঁচায় নিজেকে ঘুরতে দেখে। দানা পড়ছে বাটিতে।

বাস্তুক্ষুধা

দরজা খুলে লাবণ্যর স্বামীমুখ পড়ে নেওয়াটা বিষণ্ণতা আনে। ক্লান্ত বিধ্বস্ত মানুষটা। নত মুখে শব্দ লুঠ হওয়ার শূন্যতা নিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। নিরুচ্চারিতা এবং ভঙ্গি বলে দেয়, পরাজয়ের ধারাবাহিকতা বিপরীতে বাঁক নেয়নি। এমনটিই তো হয়ে থাকে। হচ্ছে এবং হবেও। বিষণ্ণতার সীমা তার বড় ছোট। অসংখ্য আশাভঙ্গ এক ধরনের আঘাত প্রতিহত করার দেওয়াল গড়ে। বরাবর একটা জিনিস হয়ে না ওঠাটা সহনীয় হয়ে যায়। জলে ঢিল পড়ল, তরঙ্গ উঠল, তারপর স্থির। এমনই যেন স্বাভাবিক। লাবণ্য জিজ্ঞাসা না রেখেই পরোটা আলুভাজা গোছাতে যায়। সন্ধে থেকে যে শুভ সংবাদ শোনার ব্যাকুলতা নিয়ে ছিল ময়লা আঁচলে জলহাত মোছার মতো মুছে ফেলেছে এখন।

লাবণ্যর দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত পড়ে না। বাঁধাকপিটা রাঁধতে হবে। রুটি হয়ে গিয়েছে। সকালের ডাল আছে। বিকেলের রান্নাটা সে স্টোভেই সারে। সেটা জ্বলছে। কেরোসিনের অভাব। বেশি পুড়তে দিলে চলে না। আহত মানুষটাকে কথায় শুশ্রুষা দেওয়ার চেয়ে কেরোসিন ঢের দামি। জামাকাপড় ছাড়ুক। বাথরুমে যাক। তারপর সে জলের গ্লাস, পরোটা আলুভাজা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, হল না তো। জান, বেশি আশা করতে নেই। দুলালবাবুকেই ধরে থাক। ব্যবস্থা উনিই করবেন। দাঁড়াও চা আনি। এর সঙ্গে সে যোগ করতে পারে, বুঝলে এটা হলে আমাদের অসুবিধা হত। সাড়ে তিন কাঠা জমি। বাধ্য হয়ে দেড় কাঠা বেশি কিনতে হত। বাড়ি করা আছে। টাকা তো—। যদিও অফিস যাওয়ার সময় সে বলেছে, হোক সাড়ে তিন। একটু বেশি জায়গা থাকা ভাল। তো সান্ত্বনা দানে অনেক কিছুই বলতে হয়।

লাবণ্যর কথার আগেই বিছানায় লুঙ্গির উপর গেঞ্জি পরে বসে থাকা শৈলেন, বাহান্ন বছরের টেকো মাথায় পাকা চুলের বাহুল্য, চওড়া মুখ, বসা গাল, রোগাটে গড়ন, চোখে চশমা, শহর কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনযোদ্ধা, বলে ওঠে, আরও পাঁচ হাজার বেশি চাইছিল কাঠাতে। আমি না করে দিয়ে এলাম। এর মধ্যে ভক্তিবাবুর কিছু ব্যাপার আছে।

লাবণ্য, পরে শুনেছি তরকারি বসাব, বলে জলের গ্লাস টেবিলে নামায়। পরোটার ডিশটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে আর দাঁড়ায় না।

শৈলেনের কথায় বাধা মুখে কালো ছায়া আনে। সে লাবণ্যকে ভয় করে। কেন কে জানে! যেন ভেতরে তার অপরাধবোধের সদা ক্রিয়া। অথচ সে তো

সংসারেই নিবেদিত। দেহ, প্রাণ, মন। নিজস্বতা বলতে কিছু অবশেষ নেই। স্ত্রী এবং সন্তান তিনটির সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সব উপার্জন তুলে দেয়। নেশা বলতে সিগারেট। তাও গোনা গুনতি। সংসার ছাড়া অন্য কোনো সাধনা নেই। তবু যে নারীটি একদা যুবতী ছিল, প্রেমরঞ্জিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাত, শরীর স্পর্শে নুপূরের শব্দ বাজত হৃৎপিন্ডে—সবই ধূসর স্মৃতি। লাবণ্যকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ালেও দৈর্ঘ্যে অকুলান হয়। তার হাত আরও দীর্ঘ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। হাত দীর্ঘ করার ম্যাজিক দেখাতে পারে টাকা। এক্ষেত্রে তার বিপুল ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। কিছুতেই পূরণ করা যাচ্ছে না।

সামান্য চাকরি, একটা প্রেসের ম্যানেজারি। তো ম্যানেজার শব্দটার মতো ভারী মাইনে নয়। পরিশ্রমও বেশী। ভাড়াটে বাড়িতে বাস। বেলেঘাটার এ অঞ্চলে এ বাড়ি ও বাড়ি করে চল্লিশ বছর কেটে গেল। বর্তমান বাড়িটাতেই তো কাটলো আঠার বছর। এটা ঠিক, লাবণ্য সাংসারিক বুদ্ধিতে পাকা। সে তো পাল্লা দিতেই পারত না। সময় সময় মনে হয় লাবণ্য জীবন জিইয়ে রাখার জল কিংবা হাওয়া। নইলে কবেই টেসে যেত। তরুণ বরুণের কলেজ, নীলার স্কুল, বই, কোচিং, নীলার গানের ক্লাস, ঘরের টুকিটাকি জিনিস করা তার সঙ্গে কিছু সঞ্চয়, দ্রব্য মুল্যবৃদ্ধির রাক্ষুসে হাঁয়ের প্রসারণের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া—লাবণ্য কী ভাবে যে করে!

লাবণ্য আবার ঘরে আসতেই লোডশেডিং। নীলা পাশের ঘর থেকে চেঁচাল, মা আলো। শৈলেনের খাওয়া হয়েছে। অন্ধকারে সে কিছু করতে পারে না। কেমন যেন জবুথুবু হয়ে যায়। গা ছমছমানি এক ভাব আসে। লাবণ্যর সব সড়গড়। কোন কিছুকে আঘাত না করে দিব্যি কাজ করতে পারে অন্ধকারে। অরুণ বরুণ কেউ ঘরে নেই। এ সময় ওদের টিউশনি। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে এবারই পরীক্ষা দিল। বরুণ পাস কোর্সে বি কম করছে। তবে পড়াশুনা ওর হবে না। ভাল ফুটবল খেলে। পাড়াতে মাঝারি গোছের নেতার ভূমিকা। খেলা ওর ভবিষ্যৎ বানাবে। চেষ্টায় আছে। জীবনের প্রতিষ্ঠায় লেখাপড়ার চেয়ে ক্রীড়াবিদ্যা ঢের মূল্যবান এখন।

নীলার কাছে আলো দিয়ে লাবণ্য অন্ধকার ঘরে আবার ঢুকল। বলল, বল কী বলছ!

—অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

—দরকার কী। কথা তো আলো ছাড়াও চালানো যায়।

—ডাক্তারবাবুটির সঙ্গে দেখা হল না। যার উপর ভার দেওয়া তিনি পাশেই স্টেশনারি দোকানের মালিক। লোকটার কাছে ভক্তিবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন। তো বেশি দাম বলছে এখন।

বালী দুর্গাপুরে এক ডাক্তারবাবু বাড়ি তুলছিলেন। ভিতের পর ফুট চারেক উঠেছিল। তারপর কাজ বন্ধ। নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট কিনছেন। ও জমি রাখবেন

না। সস্তায় বিক্রি করবেন। সংবাদটা শৈলেনের প্রেসের কম্পোজিটার ভক্তিবাবুর দেওয়া। তারপর জমি দেখে আসা হয়েছে। পছন্দও হয়েছে। আজকে পাকা কথা হবার ঠিক ছিল।

লাবণ্য যা গিয়েছে, সেদিকে চোখ ফেরায় না। এমন ঘটনা তো একটা নয়। সে বলে, দুলালবাবুর সঙ্গে তো আর দেখা করলে না।

—কালই তো বাজারে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করলেন, হল কিছু দাদা! বালির কথাটা বললাম।

—কোনও খবর দিলেন না?

—না আমিও জিজ্ঞেস করিনি।

—তা কেন করবে! তুমি তো তখন বালির ওই বাড়িতে ইজিচেয়ারে বসে হাওয়া খাচ্ছ।

অন্ধকারে লাবণ্যর বিরক্তি হতাশা যেন তাপের টুকরো ছুঁড়ে মারে। শৈলেনের মুখে একটাও কথা আসে না। জ্বলুনি সয়ে কিছুক্ষণ পরে সে বলে, তুমি রয়েছ না চলে গেলে!

—আছি। আর কিছু বলার নেই তো তোমার! আমার কাজ আছে।

—এ ঘরে একটা আলো দাও না।

—কী করবে আলো নিয়ে। বসে থাক না চুপচাপ। উঠলে ডাকবে। নইলে কিছু তো দেখতে পাও না, ভেঙে চুরে বসবে।

—মোমবাতি ছিল না! অন্ধকারে নিজেকে কেমন ভূতের মতো মনে হয়।

লাবণ্যকে স্পর্শ করে না শৈলেনের অসহায় স্বর। সে বলে, অরুণ বরুণ এলে দেব।

আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় বসে থাকে শৈলেন। কালই দুলালবাবুর সঙ্গে দেখা করবে। তেমাথায় দুলালবাবুর পান বিড়ি সিগারেটের দোকান। নিজে এখন বসতে পান না। বড় ছেলে বসে। জমি বাড়ির দালালিতে তিনি ব্যস্ত। গোলগাল চেহারা, ধুতি শার্ট পরেন। গায়ের রং কালো। বয়স তারই মতো। অত্যন্ত ভদ্র মানুষটি। কথাবার্তাও সুন্দর করে বলতে পারেন। বছর কতক ধরেই উনি শৈলেনের বাস্তু সংগ্রহে সহযোগী। পাড়ারই গোবিন্দ মিত্র বলেছিল, কাজের লোক। ওঁকে ধরুন। কমিশন অবশ্য নেবে। তবে খাঁটি মানুষ। মিথ্যে ভড়ং আপনাকে দেবে না। ঠকাবেও না। মশাই জমিপত্রের ব্যাপারে বিশ্বাসী লোক দরকার। নইলে ঠকতে হয়। এক জমি পাঁচবারও বিক্রি হয়। কাগজপত্র তার জন্যে যেন ঠিকঠাক থাকে।

শৈলেন নিজেও জমি কী ছোটখাটো পুরনো বাড়ি সংগ্রহের জন্যে তার আগে থেকে চেষ্টা চালিয়ে যচ্ছে। জমানো টাকা বিরাট নয়। লাবণ্য তার সব গয়না বেচে দিয়ে কিছুটা বাড়াবে এই যা। পাড়াতেই ব্যানার্জির চার কাঠা জমি বিক্রি ছিল। দর হাঁকে কুড়ি হাজার করে। বেশ ক'বছর হয়ে গেল। এখন

আশি হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে। কেনা হয়নি। কুড়ি হাজারই বেশি মনে হয়েছিল। হাওড়ায় মামাতো ভাই দীপু একটা এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার পুরোন বাড়ি পৌনে দু'কাঠা জমি সমেত বিক্রি আছে খবর পাঠায়। কিন্তু লাবণ্য হাওড়ায় যাবে না বলে নাকচ করে দেয়। পাড়া ছাড়বে না, শহরতলীর একেবারে প্রান্তে যাবে না, এরকম জেদে অনেক জমিই ছেড়ে দেওয়া হয়। যা কেনা সাধ্য সীমাতেই ছিল। এখন মূলশহর ছাড়িয়ে দূরে যেতে চাইলেও অর্থসাধ্য নেই।

দুলালবাবুর প্রথম সংবাদটি ছিল পাড়ার কাছাকাছিই। বেলেঘাটার মধ্যেই। কিন্তু কাগজপত্র সার্চ করতে শরিকী ঝামেলার সাপ দেখা গেল। তো সে সাপ তাড়ানোর ওঝা এবং মন্ত্র দুলালবাবুর আছে, এমন অভয় দিয়েছিলেন। সাহস হল না। তারপর কিছু না কিছু ব্যাগড়া। মূল ব্যাগড়া তো টাকা। পছন্দর দিকে হাত বাড়াতেই দেখা যাচ্ছে তার টাকা অতদূর পৌঁছাবে না—সুতরাং পিছিয়ে আসা, ক্রমাগত এই পিছিয়ে আসার ফলে শৈলেন এখন মনে করে সে হাওড়া শিয়ালদহ লাইনের স্টেশনগুলি থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে চলে যাবে। কিন্তু ডানকুনি কিংবা বজবজ দ্রুতহারে তাদের মূল্য বাড়িয়ে চলেছে। কত লোকের তো ব্যবস্থা করে দিলেন দুলালবাবু। তার হল না।

নিজস্ব এক খণ্ড জমি এবং ছোট্ট একটা বাড়ির প্রবল বাসনা তাকে তাড়া করে ফেরে। কেউ বাড়ি করছে শুনলে ঈর্ষা জাগে। বাড়ির জঙ্গল এই শহরে কত বাড়ি, কত মাপের কত ঢঙের অথচ বুকের মধ্যে খাঁ খাঁ শূন্যতা তার। স্বপ্নে কতবার যে কত বাড়ি আসে। শৈলেনের এসব ভাবনায় মনে হয়, তার আকাঙ্ক্ষা বলতে একটাই। সে ইট, সিমেন্ট, বালি, রডের দামদর নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হয়। হাত পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে, তবু আবার ধরার জেদ নিয়ে সে হাত বাড়ায়।

শৈলেন দুলালবাবুর কাছে এজন্যে লজ্জাও প্রকাশ করে। দুলালবাবু বলেন, তাতে কী, পছন্দ হবে আপনার, ক্ষমতায় কুলুবে তবে তো। বেয়াড়া মাপের জুতো নিয়ে কষ্ট ভোগ করবেন কেন? ঘরবাড়ি বলে কথা মশাই। আমি কিছু মনে করি না। এটা আমার কাজ। আর মশাই আমি লোক চিনি। আপনি ভদ্রলোক, ভোগা দিচ্ছেন না, এ কী বলে দিতে হবে আমাকে।

শৈলেনদের বর্ধমানের গলসীর কাছে গ্রামে বাড়ি। কোনও যোগাযোগ নেই। সেখানে ধানী জমি নেই। পুকুর বাগান নেই। তবে ভিটে আছে। বাবা কলকাতা এসে থেকে গিয়েছিল। কখনও সখনও গাঁয়ে গিয়েছে। শৈলেন ঠাকুমার শ্রাদ্ধে সেই কোন কৈশোরে গিয়েছিল। ঠাকুরদার সংসারটি বড় সড়। ছয় পুত্র সন্তান। ফলে ভিটের কতটুকু অংশ পাবে! তারা অবশ্য এক ভাই বোন। দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে তখন স্কুল ছাড়েনি। বোলপুরে শ্বশুরবাড়ি। দিদিকে শৈলেন চিঠিপত্র দেয়। অনেকদিন দেওয়া হয়নি। শৈলেন বোলপুরেও বাড়ি করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু সংসার এ শহর ছাড়বে না। তারও কী ছাড়ার ইচ্ছে আছে!

মোটেই না। সারাজীবন ভাড়া বাড়িতে কেটে গেল। এখন একটা ঘর—নিজস্ব ঘর। এই শহরে। এই কলকাতায়। কলকাতা কী এক খণ্ড জমি দেবে না!

হাওড়ার জগাছার জমিটা তাঁর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বাস রাস্তা থেকে মিনিট ছয় সাত হাঁটা। ফাঁকা জমি। আশপাশে নতুন বাড়ি উঠছে। কাছেই একটা পুকুর। আড়াইকাঠা জমি। দাম সীমার মধ্যে তার, বাড়ি তৈরীর জন্য কো-অপারেটিভ থেকে লোন পাওয়া যাবে। কাছাকাছি চুন সুরকির গোলা। ধার দেবে। লতা বাইন্ডিংসের সত্যেনবাবুর চেনাজানা এলাকা। তাঁর সাহায্য তো আছেই। তিনিই সংবাদটা দেন। একদিন দেখিয়ে আনেন। জমিটায় একজোড়া ফলন্ত নারকেল গাছ আর একটা ডুমুর গাছ। ওই জমিতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছিল নীল খণ্ড আকাশ মাথার উপর থেকে আর্শিবাদ করছে। পায়ের তলায় নিবিড় ঘাস আহ্লাদে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। অথচ ভিড়ের চাপ নেই। নেই শব্দ ধোঁয়া জটিলতা। দূরত্ব হাওড়া স্টেশন থেকে কতটুকু বা। বাস, ট্রেন। ট্রেনে পনেরো মিনিট। আর হাওড়া স্টেশন, গঙ্গা, ওপারে কলকাতা। হাত বাড়লেই ছোঁয়া যায়। কল্পচিত্রে নিজের একতলা বাড়িখানা পর্যন্ত দেখতে পায় শৈলেন। কিন্তু ঘোরতর প্রতিবাদী অরুণ বরুণ।

অরুণ বলল, হাওড়া নয় বাবা, এদিকেই দেখ। কোথায় অচেনা জায়গায় যাবে।

বরুণ তাতে সায় দিল।

নীলা শুধু তার পক্ষে। মেয়ে বলেই হয়তো। বাবাকে নিঃসঙ্গ দেখে মমতায়।

শৈলেন লোডশেডিংয়ের ঘরটিতে বিছানায় বসে সিদ্ধান্ত নেয়, কালই লতা বাইন্ডিংসে যাবে। সত্যেনবাবুকে বলবে, ওই জমিতে তার বাড়ি হবে। কেনার পর সে লাবণ্যকে জানাবে।

অরুণ ফেরার পরই আলো এল। বিছানায় আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা শৈলেনকে বলল, অমন করে বসে আছ বাবা। শরীর খারাপ?

—না।

—হল না তো বালিতে। আমি জানি। দাঁড়াও আমার একটা কিছু হোক। তুমি ভেবো না বাবা। মা, খেতে দাও। বরুণ আসেনি?

অরুণ বেরিয়ে গেল বারান্দায়। শৈলেনের পিতৃস্নেহ এখন ঝরে পড়ল হৃৎপিণ্ডে। অরুণ ভাল ছেলে। তাকে বোঝে। বাস্তক্ষুধার যে যন্ত্রণাটা লোডশেডিংয়ে পাচ্ছিল, থাকল না।

পরের দিন সত্যেনবাবুর কাছে কথাটা তুলতেই ভ্রু কুঁচকে বললেন, কী আশ্চর্য! তখন তো না করে দিলেন। ওটা দীপ্তি পাবলিশার্সের সুব্রতবাবু কিনেছেন। তবে বাড়ি করবেন না। বিক্রি করে দেবেন বলে শুনছি। ওঁর কাছে একবার যান না। এই তো সামনে। তবে দাম মনে হয় বেশি চাইবে। আরে মশাই মন স্থির করে নিতে হয়। একবার ছাড়লে আর ধরা যায় না।

সুব্রতবাবু ছিলেন। বছর চল্লিশ বয়স। প্যান্ট, শার্ট। পাবলিশিং বিজনেসে নতুন এসেছেন। বললেন, হ্যাঁ। বিক্রি করে দেব। সত্যেনবাবুর কাছে শুনে তখন ঝোঁকে কিনেছিলাম। এক পার্টির কাছে দর পেয়েছি চব্বিশ হাজার করে। কথা দিইনি। আপনাকে ওই চব্বিশেই—।

শোনামাত্র শৈলেনের যেন ধাতব বস্তুর আঘাত লাগে মস্তিষ্কে। বারো হয়ে গেল চব্বিশ। কমাসেই বা। বিস্ফারিত হয় চোখের তারা। সে বলে, আপনি তো বারতে কিনেছেন।

—তাতে কী। আরে মশাই তখন শেয়ারে লাগালে ওটা আটচল্লিশে হত। দেখলেন না মাস্টার প্লাসের কারবার।

শৈলেনের মনে হয় এতদিনে সে তার শত্রুকে প্রত্যক্ষ করল। এই মানুষটিই তার আকাঙ্ক্ষা পুরণের অন্তরায়। প্রতিনিয়ত ছিনিয়ে নিচ্ছে জমির টুকরো, বাড়ির দেওয়াল। ভয়ঙ্কর শত্রুকে প্রত্যক্ষ করায় তাঁর কী যে হয়ে যায়। একটা অস্ত্র লাভের প্রবল তাড়না জাগে। ধারাল ছুরি কী পিস্তল। মানুষ কেন হত্যাকারী হয় এখন শৈলেন টের পায়। হাত টান টান, সমস্ত পেশী শক্ত। আদিম মানুষের মতো দীর্ঘ নখ এবং ইস্পাত কঠিন শালপ্রাংশু বাহুর জন্য খেদ হয়। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে। এক্ষুনি যেন তার বিস্ফোরণ ঘটবে।

সুব্রতবাবু কিছু বোঝেন। বলেন, এখন যেতে পারেন, আমি ব্যস্ত আছি।

শৈলেনের প্রেসের রাস্তাটা বড় দীর্ঘ মনে হয়। শহরে কেন যে এত মানুষ এত গাড়ি আর শব্দের জটলা। সব মাথাতে পাক খাচ্ছে। বাড়ি ফেরার পরও ক্ষণিকের সেই উত্তেজনা পরবর্তী অবসাদ, কাটে না কিছুতেই।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে? প্রেসে কোনও গোলমাল?

—না। শরীরটা ভাল লাগছে না। একটু শুয়ে থাকি।

দোকানের সামনে দুলালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঠোঁটে সিগারেট, মুখে পান। বললেন, এই যে শৈলেনবাবু। বলুন কী খবর। হল কিছু?

—আর হওয়া? আপনার কাছে খবর কিছু আছে।

—আমাব কাছে কী থাকবে। এখন তো আপনার কাছেই খবর। দুলালবাবু ক্ষণকাল মুখ পড়ে গিয়ে বললেন, শোনেননি? আপনাদের বাড়িটা তো প্রোমোটারের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্যানালবাবু। সাততলা বিল্ডিং হবে। ফ্লাটের জন্যে এর মধ্যেই তো—। আপনার ছেলেরা বলেনি? অন্য ভাড়াটে? আরও তো তিন ঘর রয়েছে।

শৈলেন অবাক হল, আমি তো এই আপনার কাছে শুনেছি।

—আপনাদের অবশ্য খুব কম টাকায় ফ্ল্যাট দেবে। নইলে ছেড়ে দেবার জন্য টাকা অফার করবে। তবে মিনিমাম লাখের কমে রাজি হবেন না। ও টাকায় আপনাকে ব্যবস্থা করে দেব।

রাত্রিবেলায় খেতে বসে বরুণ বলল, হ্যাঁ শুনেছি। তুমি কার কাছে শুনলে?

তবে ও নিয়ে ভেবো না। ফ্ল্যাট আমরা পাব। আর টাকা কেন নিতে যাব। এ কেসটা আমাকে হ্যান্ডল করতে দাও। অজয়কাকু, বিনয়জ্যাঠা কী মাসিমারা যে যা খুশি করুন, আমরা ফ্ল্যাট নেব। এ পাড়া ছাড়ব না। আর বাড়ি তৈরীর সময়টা আমরা থাকব সুহাসদের বাড়িতে। ওর বড়দার দু'খানা ঘর আছে। বড়দা থাকে চিত্তরঞ্জনে। ছ'আট মাসের জন্যে দেবে আমাদের। সুহাসের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে।

শৈলেন ভাবল, বরুণ তো খেলা নিয়েই থাকে। পড়াশুনায় মনযোগ নেই। তাহলে সংসারের কথা ভাবে, ঘরের কথা ভাবে। তবে এও মনে হল, আসলে এ জায়গাটা ছাড়তে হবে বলেই এমন তৎপরতা।

এ ঘরে আরও তিন ভাড়াটে, সামনে দুটো দোকানও আছে। অজয়বাবু রাইটার্সে চাকরি করেন। স্ত্রী, দুটি কন্যা। মেদিনীপুরের মানুষ। বাসুদেবরা তিন ভাই। কেউ বিয়ে করেননি। মা আছেন আর এক বিধবা দিদি। আর রয়েছেন সুপ্রভা। প্রাথমিক শিক্ষিকা। ছেলে অসীম এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে।

শৈলেনের জানার ইচ্ছে হয় ওরা কী করছে। তবে বরুণের নিষেধ আছে। কিন্তু অজয়বাবু কথাটা তুললেন। বললেন, কিছু ভাবলেন? বুঝলেন যা করব, সব একসঙ্গে। তবে আমার সাজেশন ফ্ল্যাট নেওয়া। প্রবলেম বাড়ি তৈরির সময় কোথায় থাকব।

একঘরে থাকলে সবসময় সম্পর্ক ঠিক রাখা যায় না। তবে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য আছে, অন্তত ব্যবহারের ক্ষেত্রে। মনে যাই থাকুক না কেন।

শৈলেন বলল, সে আমাদের খুঁজে নিতে হবে।

—আপনার ব্যবস্থা হয়েছে?

—না। আগে ফ্ল্যাট হোক। বাসুদেববাবু কী বলেছেন?

—শুনুন। এ রবিবার চারজনে বসে আমরা আলোচনা করি। আমার ঘরেই আসুন না।

শৈলেন বলল, ঠিক আছে। কিন্তু খবরটা কী ঠিক?

—ঠিক। আমি একেবারে সিওর। সান্যালবাবুকে ফোন করে জেনেছি। লোকটা ভাল।

তাহলে সংবাদ মিথ্যে নয়। ভাড়াটেদের স্বার্থেও ভাবা হবে। ফ্ল্যাট নিলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। তা লাগুক। লাবণ্য বড়ই খুশি, সংসারও। বাস্তুর জন্যে, নিজস্ব ঘরের জন্য ক্ষুধা তো লাবণ্যরও কিছু কম নয়। বলে, জান, খুব ভাল হয়েছে। আমি তো ভেবেছিলাম। এ জন্মে ঘর হবে না।

শৈলেন বলল, এটা কী নিজের ঘর হবে?

—নিজের নয়। কী যে বল। ফ্ল্যাটের মালিকানা ত পাওয়া যাবে।

শৈলেন ব্যথিত গলায় বলল, ফ্ল্যাট বাড়ি নয়। আকাশ কিংবা মাটি কিছুই পাচ্ছ না।

নীলা বলল, ঠিক বলেছ বাবা। আকাশ মাটি কিছু পাচ্ছি না।

অরুণ বলল, কলকাতার আকাশ মাটি কাজে লাগে না। কী দরকার?

—বলিস কী! কলকাতার তো আকাশ মাটিরই হাহাকার!

—হাহাকার তো খুঁজছ কেন? যা পাবে না।

শৈলেন সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, বরঞ্চ টাকাটা নিলে নিজস্ব একটা বাড়ি তৈরী করা যেত। কত তো জায়গায় কলকাতার আশপাশে কত সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি করেছে। আমরাও করতাম। টাকার অভাব রয়েছে। সান্যালবাবু দিলে—।

লাবণ্য শৈলেনের কথা শুনে বলল, পাগল হয়েছ?

অরুণ বলল, বাবা যে কী। আমরা ফ্ল্যাট নিচ্ছি। এখন আবার—।

নীলা একসময় বাবাকে একা পেয়ে বলল, তুমি ঠিক বলেছ বাবা। টাকা পেলে তোমার টাকাটা লাগিয়ে একটা ছোট্ট বাড়ি হয়ে যেত। সামনে বাগান থাকত। আমি গাছে জল দিতাম! রোদ আসত ঘরে। কত ভাল হত।

শৈলেন হাসল। সময় ফুরিয়ে গিয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষ। ঘন্টা বেজে গিয়েছে। পরাজয়ের গ্লানি তার মুখে। আর লড়াইয়ের দরকার নেই। টান টান করতে হবে না স্নায়ু পেশী। একধারে শুধু সরে দাঁড়ানো। বলল, ঠিক বলেছিস মা। কিন্তু তোকে আমাকে নিয়ে তো সংসার নয়। ওরা তিনজন রয়েছে।

শৈলেন বদলে যেতে থাকে। সংসারের আনন্দ সে নিতে পারে না। যেন তার কোন কাজ নেই। একটা উদ্দেশ্যের দিকে ধাবমানতা শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু তো ক্ষুধা যায় না। বাস্তুর ক্ষুধা, নিজস্ব ঘরের ক্ষুধা। দেশলাইয়ের বাক্সের মত করে সাজানো হবে সাততলা আটতলা। সম্পূর্ণ আকাশ দেখা যাবে না, মাটি দেখা যাবে না। শুধু কী তাই! ফ্ল্যাট বাড়ির নানা সমস্যার কথা সে তো আগেই শুনেছে। জল নিয়ে প্রবলেম হতেই পারে, পাশের বাসিন্দা শুধু নয়, সিঁড়ি থেকে শুরু করে মেঝে কী মাথার উপর শিলিং তাও সম্পূর্ণ তোমার নয় সে কী তার ঘর। তার আকাঙ্ক্ষার, স্বপ্নের গৃহক্ষুধা কী মিটবে? না মিটবে না। কল্পিত দু'কামরা ঘর, রান্নাঘর, সামনে উঠোন, এক চিলতে বাগান, বাঁশের বেড়া, আধ কাজ হওয়া, সবটা পলেস্তরা হয়নি যেন সামনে দাঁড়ায়। অসহায় বালকের মত সে হাত বাড়ায়। বালকটি অরুণ কিংবা বরুণের চেয়ে ভিন্ন নয়।

লাবণ্য বলে, তোমার কী হয়েছে বল তো। বলেছি তো ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। অরুণ বরুণ সব কিছু করবে। ছেলেরা বড় হয়েছে। ওদের ওপর ভরসা রাখ।

প্রেসে সুদেববাবু বলল, কী মশাই আপনার ফ্রেশ ভাব চলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার! লিভার না প্রেসার?

—ও কিছু না। আচ্ছা সুদেববাবু. কলকাতার আকাশ মাটির দরকার লাগে না?

—লাগলেও পাবেন কোথায়? কেন বলুন তো?

—না এমনি। শৈলেন হাসে না। তার ভেতরে পরবর্তী প্রশ্ন, আকাশ মাটির জন্যে কলকাতার প্রচন্ড খিদে বলুন,কলকাতা এই খিদেতে কিন্তু খাবার পাচ্ছে না এতে তো তার স্বাস্থ্য নষ্ট—ঠিক কি না? সুদেববাবু তাকে আধপাগল ঠাওরাতে পারেন। শুধু বলে, আকাশ মাটি নেই। শূন্যও বিক্রি হচ্ছে।

—ফ্ল্যাটের কথা বলছেন? কিনছেন নাকি?

—না।

—কিনলে দেখেশুনে কিনবেন। তবে কী জানেন নিজের বাড়ি—। আমার বড় ছেলে তো কিনেছে মানিকতলায়। কিন্তু বাড়ি—আমার তো বাড়ি মনে হয় না।

লাবণ্য বলল, নিজের চেহারাটা একবার দেখ। দিন দিন হচ্ছ কী। নীলা বাবাকে একবার আয়নাটা এনে দে—দেখুক।

নীলা বলল, সত্যি বাবা, তুমি কী রকম হয়ে যাচ্ছ।

আমার বড় খিদে রে। বড় খিদে। শৈলেন বলতে পারে না। শুধু ভাবে, আয়না। আয়নায় সে চেহারা দেখতে পাবে।

অমনি মনে পড়ে গেল সত্যেনবাবুর বাইন্ডিংখানায় আজই দেখে আসা একটা পত্রিকার চিত্তপ্রসাদের হ্যাংরি বেঙ্গলের ছবি ছাপা ফর্মাটা। ক্ষুধা পীড়িত মুমূর্ষ মানুষ। কলকাতার আকাশ আর মাটির জন্য হ্যাংরি ক্যালকাটা নামে চিত্তপ্রসাদ যদি বেঁচে থাকতেন, আঁকতেন, তাহলে সে চমৎকার একটা মডেল হতে পারত। আয়নায় শৈলেন সেই মুখ প্রত্যক্ষ করতে চায় না।